শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা অমনিবাস

সম্পাদনা

পৃথ্বীরাজ সেন

আদিত্য পাবলিশার্স
২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা-৯

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ
সাধন বিশ্বাস
বি. বি. বুক কনসার্ন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

দাম ১৭০ টাকা

খুনী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমাগত মোটরের শব্দে অধৈর্য হন। রাত দেড়টার সময়, এই হাড়জমানো শীতে, কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা বিশ্রী গাল উচ্চারণ করলে হাজারী।

প্রাইভেট গাড়ী কিংবা লরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথ এ নয়। যুদ্ধের আমলে মিলিটারী যা খোয়া ছড়িয়েছিল, কিন্তু সে খোয়ার খবর নিতে গেলে এখন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হয়। এখন পায়ের পাতা ডোবানো লাল ধুলো আর গোরুর গাড়ীর দয়ায় এলোমেলো গর্ত। কয়েকটা আদিবাসীদের টুকরো টুকরো গ্রাম, কিন্তু শাল-পলাশের বন, ছোট ছোট দু'তিনটি পাহাড়, তারই ভেতর দিয়ে পথটা দামোদরের বালুচরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরের ভেতরে গনগনে তাওয়া জ্বালিয়ে তাই

নিশ্চিন্তে কম্বলের তলায় ডুব দিয়েছিল লেভেল ক্রসিঙের প্রতিহারী হাজারী। আন্দাজ চারটের সময় মেল ট্রেন পাস করবে, গেট বন্ধ করে নির্ভাবনায় শুয়ে পড়েছিল সে।

এমন সময় মোটরের হর্ণ তাকে ঘুম থেকে জাগাল। ঘুঁটের ধোঁয়ায় জমাট হয়ে আসছে ছোট্ট ঘরটা। চোখ জ্বালা করে উঠলো হাজারীর। কিন্তু হর্ণের তাড়ায় চোখটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেলনা। দরজা খুলতেই তীব্র হিম হাওয়ায় এসে আছড়ে পড়ল হাজারী। কিন্তু হর্ণের তাড়ায় চোখটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেলনা। দরজা খুলতেই তীব্র হিম হাওয়ায় এসে আছড়ে পড়ল গায়ে, কান দুটো কনকন করে উঠল। কম্বলটাকে ভালো করে মাথায় গলায় জড়িয়ে দুপা এগোতেই একরাশ বীভৎস গালাগাল তাকে অভ্যর্থনা করল।—উল্লুক, রাস্কেল, ইউনিট। মরে ছিলি নাকি? একটি ল্যান্ডেরোভার গাড়ী গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে; তার প্রকান্ড আলোটা সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। গায়ে ওভারকোট চড়ানো তিনটি মানুষ। একজনের হাতে চুরুট।

চুরুটওয়ালা আবার কটুগলায় ধর্ম নিয়ে উঠল; এমন করে ডিউটি করো তুমি? রিপোর্ট করব তোমার নামে। সন্ধ্যে হতেই গেট বন্ধ করে তুমি নাক ডাকাচ্ছ আর আধ ঘন্টা ধরে আমরা সমানে হর্ণ বাজাচ্ছি। নির্বিকার মুখে চাবি খুলছিল হাজারী, এবার ফিরে তাকালো এদের দিকে। হয়তো বলতে যাচ্ছিল, রাত দেড়টাকে সন্ধ্যে বলে না। উত্তরটা তার আর দেওয়া হল না—চুরুট হাতে মানুষটির ওপর চোখ পড়তেই ঠান্ডা হাত পা আরো ঠান্ডা হয়ে গেল তার।—সেলাম হুজুর।

—সেলাম হুজুর?—চুরুটধারী মুখ বিকৃত করল—সেলামটা ছিল কোথায় এতক্ষণ? ট্রেনের সঙ্গে খোঁজ নেই—দিব্যি গেট বন্ধ করে রেখে সুখ নিদ্রায় শুয়ে পড়েছে। পাবলিকের সঙ্গে বুঝি এই রকম ব্যবহারই করো তোমরা? পাথুরে ঠান্ডায় এমনিতে হাত-পা কাঁপছিল, প্রায় ঠক্ঠকানি শুরু হল এবার হাত জোড় করল হাজারী। কসুর মাপ করুন মালিক। এদিকের দেহাতী লোক এত রাতে কেউ তো গাড়ী নিয়ে বেরোয় না, তাই—তাই যা খুশি করবে? ভেবেছ ইংরেজের আমল আছে এখনো? মনে রেখো জমানা বদলে গেছে। এখন চাকরি রাখা নয়—দেশের সেবা করাই তোমাদের কাজ। আর একজন সিগারেট ধরালেন। করাপশন্ চ্যাটার্জি, করাপশন্। পট্ টু বটস্। চ্যাটার্জী এবার কথা বললেন না, কদর্য মুখ করে নাক দিয়ে ঘোড়ার মতো আওয়াজ তুললেন একটা। তা থেকে বোঝা গেল, তিনি শুধু এ ব্যাপারে যে একমত তাই নন, এর চাইতে উগ্র মতামত পোষণ করে থাকেন।

—কিছু হবে না দেশের। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি। —চুরুটের মুখ থেকে একরাশ মোটা ছাই ঝরিয়ে দিয়ে চ্যাটার্জী বললেন,—নাও হে, এবার ওঠো গাড়ীতে।

যা শীত—প্রায় জমিয়ে দিলে! তৃতীয় লোকটি চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চমকে নড়ে উঠলেন,—অ্যাঁ!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছিলেন নাকি মিষ্টার মাইতি? হাউ ফানি!—চ্যাটার্জি এবং তাঁর সঙ্গিটি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

চ্যাটার্জির মোটা ভাঙা গলার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরু গলার আওয়াজ মিলল, কেমন আঁতকে উঠল হাজারী। আর আতঁকে উঠল একটু দূরের আকন্দ ঝোপের ভেতরে বসে থাকা একটা শেয়াল—খ্যাঁক্ করে একটা লাফ দিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটে পালালো সেটা। —ওঠো হে ঘোষ উঠে পড়ো—চ্যাটার্জি তাড়া দিলেন ঠান্ডায় নাক কান ছিঁড়ে গেল যে।

ঘোষের কিন্তু গাড়ীতে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল না, কেমন উস্‌খুস করতে লাগলেন। আর তেমনি নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন মিষ্টার মাইতি—খুব সম্ভব আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শীতল অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখার মতো উল্কা ঝরল একটা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘোষ বললেন, এখনো পনেরো মাইল পেরুলে তবে ডাক বাংলো। কী যে বোগাস এরিয়া—যেন পান্ডব-বর্জিত দেশ। সত্যি বলছি, স্টিয়ারিং ধরতে আর ইচ্ছে করছে না—হাত অসাড় হয়ে গেছে! একটু যদি গরম হওয়া যেত—

গেট খুলে দিয়ে হাজারী অপেক্ষা করে আছে। শীতের হাওয়ায় তারও মুখচোখ কালিয়ে যাচ্ছে। আপদগুলো চলে গেলেই বাঁচে—কতক্ষণ আর এই ঠান্ডায় এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কিন্তু সেকথা বলা তো দূরে থাক, হাজারী ভাবতেও সাহস পেলনা! চ্যাটার্জির মহিমা সে জানে—জানে তিনি কে এবং কী! তাঁর কলমের একটি খোঁচাতেই তার চাকরি খতম হয়ে যেতে পারে।

চ্যাটার্জি বললেন, এখানে গরম হবে কোথায়? কাছাকাছি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আছে ভেবেছো নাকি?

মিষ্টার মাইতি আবার ঘুম থেকে জাগলেন। শেষ কথাটা বোধ হয় তাঁর কানে গিয়েছিল।—চলুন না, পয়েন্টস্‌ম্যানের ওই ঘরটা তো রয়েছে। বসা যাক্ একটু ওখানেই। সভয়ে হাজারী একবার নড়ে উঠল। কথাটা ঠিক শুনেছে কিনা বুঝতে পারল না।

—ওই ঘরে? সে কি হে!—চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন। ঘোষ যেন লুফে নিলেন কথাটা।—তা আইডিয়াটা মন্দ কী। ম্যাস্ কন্টাক্ট আমাদের কাজের একটা বড় অঙ্গ! আর এ-ও ম্যাসের একজন। না হয় একটু কন্টাক্ট এর সঙ্গে করা যাক। সত্যি

বলছি, এই শীতের মধ্যে পনেরো মাইল কেন, এক মাইল যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

মিস্টার মাইতির মুখ দিয়ে ঘর্ ঘর্ করে একটা চাপা আওয়াজ হচ্ছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খুব সম্ভব। কিন্তু ঠিক স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে ওঁর ঘুম ভাঙে। জেগে উঠে বললেন, চলুন না—একটু বসাই যাক ওর ঘরে। ডাকবাংলোতে গিয়েও জায়গা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। কয়েকজন ভি আই পি আসবার কথা আছে শুনেছি। তার চাইতে এখানে একটু বসে গেলে—

মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যান্টেড চ্যাটার্জি দাক্ষিণ্যের হাসি হাসলেন। তারপর ডাকলেন ঃ ওহে, কী নাম তোমার? এসো এদিকে। সম্ভাষণ হাজারীর উদ্দেশ্যে। শীতে আর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মুমূর্ষ হাজারী সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্বল গলায় বললে, সেলাম হুজুর।—সেলাম ইতিপূর্বেই তুমি করেছ, ভক্তিতে আর প্রয়োজন নেই—চ্যাটার্জি গণ-সংযোগের জন্যে বক্তৃতা করে থাকেন, তাই সাধুভাষা ব্যবহার করলেন! তারপর বললেন, কী নাম তোমার? —হুজুর, হাজারী সিং। —বাড়ি কোথায়?—জী, ছাপ্রাজিলা। ছাপ্রাজিলা?—ঘোষ ফোড়ন কাটলেন ঃ তবে আর তোমার ভাবনা কি হে? দিল্লী তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে—এক্ষুনি অ্যাম্ব্যাসাডর। তুমি কেন ভ্যারেন্ডা ভাজছ এখানে বসে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কেমন বেয়াড়া ধরনের হেসে উঠলেন মিস্টার মাইতি— ব্যাঙের সাপ গেলার মতো ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে আওয়াজ হল। চ্যাটার্জি মৃদু হেসে বললেন, ওয়ল সেড্। কিন্তু এমন উঁচু ধরনের রসিকতাটা মাঠেই মারা গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল হাজারী, এক বর্ণও বুঝতে পারল না।—শুনেছ—সদয়ভাবে এবার চ্যাটার্জি বললেন, তোমার ঘরে একটু বসব আমরা। হাজারী বার কয়েক খাবি খেলো কেবল।—জী, গরীবের ঘর, দড়ির খাটিয়া—এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়ে চ্যাটার্জি আরো উদার হয়ে উঠলেন।

—সারা ভারতবর্ষেই গরীবের দেশ বুঝেছ হাজারী?—চ্যাটার্জির হৃদয়ে গণসংযোগের প্রেরণা এসে গেল ঃ সেই কোটি কোটি গরীবই হচ্ছে দেশের শক্তি, তার প্রাণ, তার আত্মা। সেই আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য—আমাদের কর্তব্য—আমাদের মিশন—অর্থাৎ ব্রত। চলো আজ আমরা তোমারই অতিথি।

মাইতির কেমন আশা হচ্ছিল চ্যাটার্জি এবার জড়িয়ে ধরবেন হাজারীকে কিন্তু ধরলেন না দেখে একটু নিরাশই হলেন মনে মনে। ঘোষের ইচ্ছে হল, হাততালি দিয়ে ওঠেন, নেহাৎ একলা হাততালি জমবে না বুঝেই থেমে গেলেন। হাজারীর হাঁটু এবার শব্দ করেই কাঁপতে লাগল।—কিন্তু হুজুর—এসো এসো, তোমার কোনো ভয় নেই—হাজারীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন

চ্যাটার্জি। মাটির একটা বড় মালায় গন্‌গন করছে আগুন। বাইরের তীক্ষ্ণশীতল হাওয়ার মধ্যে থেকে এই ঘরে পা দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই।

ঘোষ বললেন, নট্ ব্যাড্! অবশ্য ধোঁয়াটা না থাকলে আরো ভালো হত। আর মাইতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালেন খাটিয়াটার দিকে। তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ময়লা ধুষো কম্বল। ছারপোকাও নিশ্চয় আছে কয়েক লাখ। তবু মাইতির বাসনা হল, সোজা বিছানাটাতেই লম্বা হয়ে পড়েন। চ্যাটার্জির পাল্লায় পড়ে সারাদিন এক ফোঁটা বিশ্রাম জোটেনি। হুজুর এইটুকু তো ঘর। কোথায় যে আপনাদের বসতে দিই—

কথাটার ভেতরে বিনয়ের আতিশয্য নেই এক বিন্দুও। ঘরটা হাত ছয়েক লম্বা, হাত চারেক চওড়া হবে বলে মনে হয়, সামান্য কিছু বেশি হতেও পারে। ভেতরে হাজারীর খাটিয়া, একটা চৌপাই, কোম্পানির গোটা দুই বাতি, ফ্ল্যাগ, উনুন হাড়িকড়াই দড়িতে ঝোলানো পোষাক, একটা মোটা লাঠি। টিনের বাক্সও আছে—তবে সেটা খাটিয়ার তলায়।

ঘুঁটের হাল্কা ধোঁয়ায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, তবু চ্যাটার্জি বললেন, আরে, এক কম্বলে অনেক ফকিরের জায়গা হয়। ভালোই হল, তোমার ঘর দেখে গেলাম না। স্পেস্ সত্যিই খুবই কম ফ্যামিলি নিয়ে তো থাকাই যায় না দেখছি। ওয়েল, আমি দিল্লীতে লেখালেখি করব এ-নিয়ে।

চ্যাটার্জি খাটিয়ায় বসে পড়লেন, তাঁর দৃষ্টান্তে ঘোষ এবং মাইতিও আসন নিলেন। খাটিয়াটা খটখট করে উঠল—হাজারীর বরাত গুণেই ছিঁড়ে পড়ল না। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল হাজারী সিং—বিছানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল একটা—দাঁড়িয়ে কেন হাজারী, বোসো।—হুজুর আপনাদের সামনে—আরে বোসো,—চ্যাটার্জির মুখে অনুগ্রহের হাসি বসে পড়ো। নাউ উই আর ফ্রেন্ডস্। এ-যুগে সবাই সমান।

অগত্যা বসতে হল হাজারীকে। আধখোলা দরজায় পিঠ দিয়ে। পেছন থেকে কন্‌কনে হাওয়া আসছে—কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েও তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।—কত মাইনে পাও তুমি?—ঘোষের জিজ্ঞাসা। হাজারী জানালে।

—এত কম?—ঘোষের চোখ বিস্ফোরিত হল। চলে কি করে? এর উত্তর নেই। বিনীত হাসিতে চুপ করে রইল হাজারী।

চুরুট নিভে গিয়েছিল, চ্যাটার্জি সেটাকে ধরালেন। তারপরে আস্তে আস্তে বললেন, রেলওয়েতে মাইনে সত্যিই বড্ড কম দিচ্ছে। আমি ভাবছি, এ নিয়ে মুভ্ করব। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওয়ার্কিং ক্লাসকে নেগলেক্ট করবার আর কোন মানেই হয় না।—এক্‌জাকটলি!—ঘোষ কথাটা লুফে নিলেন ঃ এইগুলোই

,তো সুইসাইডাল্ পলিসি। নইলে কি এসব যা-তা সেট্ ব্যাক হয় ইলেকশনে? চ্যাটার্জি গভীরভাবে চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ।

—কিন্তু কি জানো ঘোষ, এদের লোভ যে-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে যতই করো পেট ভরাতে পারবে না। অথচ, সত্যিই দ্যাখো—এদের নীড কতটা? ফ্রী কোয়ার্টার পাচ্ছে নেচারের ভেতরে হেল্‌দি হ্যাপি লাইফ— মাইতি এর মধ্যেই দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচমকা জেগে উঠে জড়ানো গলায় বললেন, সেদিন কাগজে দেখছিলাম আসামে কোন এক লেভেল ক্রসিং থেকে গেটম্যানকে বাঘে নিয়ে গেছে। চ্যাটার্জি শুনতে পেলেন না। কিংবা শুনলেও কর্ণপাত করলেন না।

—খায় শাকসব্জী —ক্ষেতের টাটকা চাল— —চালের মণ পঁয়ত্রিশ টাকা, আর আটা—বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে গেলেন মিঃ মাইতি। চ্যাটার্জি এবার তাঁর দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ফেললেন একটা। ঘোষ বললেন, ঘুমের ঘোরে কথা কইছেন।

—হুঁ, তাই দেখছি।—কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চ্যাটার্জি এবার হাজারীর দিকে ফিরলেন।—দেশে কত পাঠাও হাজারী? —জী দশ-পনেরো— চ্যাটার্জির মুখে এবার জয়ের পরিতৃপ্তি দেখা দিল!

—দেন ইউ সি ঘোষ, এই টাকাতে চালিয়েও দশ-পনেরো টাকা দেশে পাঠাতে পারছে—তার মানে, যা পায় তাতে প্রয়োজন মিটিয়েও ওর বাড়তি থাকছে। তা থেকে বোঝা যায় এর বেশি নীড্ ওর নেই। হোয়্যার অ্যাজ একটা উঁচুদরের গর্ভমেন্ট সার্ভেন্টকেও মাসের শেষের দিকে টানাটানিতে পড়তে হয়—গাড়ীর তেলে ঘাট্‌তি পড়ে। —সবই স্ট্যাটাস্ আর স্ট্যান্ডার্ড অফ্ লিভিং—শীতে আর ঘুমে হাজারীর সারা শরীর কুঁকড়ে আসছে। কতক্ষণে এরা যাবে তার ঘর থেকে? না হয় তার খাটিয়াতেই শুয়ে পড়ুক এরা—সেও মেজেতেই খানিকটা গড়িয়ে নিক। এই রাত দুটোর সময়, এমনি হিম ঠান্ডার ভেতরে কেন খামাখা বকবক করছে বসে?

চ্যাটার্জি বলে চলেছেন, হ্যাঁ-স্ট্যান্ডার্ড অফ্ লিভিং। একটু খোঁজ করলে দেখবে, ইভ্‌ন তোমার জেনারেল-ম্যানেজারের চাইতেও কত সুখী এরা—কী কন্‌টেন্টমেন্ট! আর সাধারণ মানুষের এই যে সন্তোষ—ভারতবর্ষের আইডিয়াল হচ্ছে ঠিক এইটেই। আজ যারা এদের ক্ষেপিয়ে তোলে, তারা শুধু নিজেদের পোলিটিক্যাল অ্যাম্বিশনটাকেই ফুলফিল করতে চায়। যে অভাব এদের কোনোদিনই নেই কৃত্রিমভাবে তাকেই সৃষ্টি করে তারা। আর—

ঘোষ মুখ ফিরিয়ে হাই তুললেন, সেই সঙ্গে ঈর্ষাতুর চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাইতির দিকে। মাইতি এবার সত্যি নিথর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। মুখটা একটু ফাঁকা হয়ে আছে, ঘরঘর করে চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ঘোষের মনে হল, একটা চিমটি কেটে, মাইতিকে জাগিয়ে দেন তিনি। দিব্যি নিশ্চিন্তে

ঘুমিয়ে পড়েছেন, অথচ চ্যাটার্জির মত্ বক্তৃতা সমানে শুনতে হচ্ছে তাকেই।

চ্যাটার্জি বললেন, দেশ গড়তে হবে—সকলকে নিতে হবে কর্তব্যের ভার। আজ যাঁরা লীডার, তাঁরা একদিন কত স্যাক্রিফাইস করেছেন। কিন্তু শুধু তাঁদের ত্যাগেই তো চলবে না। আজ দেশের সব মানুষকে ত্যাগ শিখতে হবে—শিখতে হবে কর্তব্য—

ঘোষ হঠাৎ উঁঃ করে উঠলেন। ভুরু কোঁচকালেন চ্যাটার্জি।—কী হল হে? ছারপোকা নাকি?—না হুজুর, খটমল নেই—নির্বাক হাজারীর এতক্ষণে ত্রস্ত কৈফিয়ত একটা।—খট্‌মল ছাড়া তোমাদের খাটিয়া আর কলের জল ছাড়া কলকাতার গয়লার দুধ—দুই-ই অ্যাবসার্ড!—ঘোষ গজগজ করে উঠলেন। ঘোষকে সত্যিই ছারপোকা কামড়ায়নি—কিন্তু সরব স্বগতোক্তির ত্রুটিটা এ-ভাবে ছাড়া ঢাকবার কোনো উপায় ছিল না।

চ্যাটার্জি থামবার পাত্র নন। আবার আরম্ভ করলেন ঃ দুশো বছরের একটা পরাধীন জাতকে রাতারাতি ঘুম থেকে জাগানো যায় না। প্রত্যেকে যদি ত্যাগ করতে পারে—কর্তব্য যদি—

এবারেও শেষ করতে পারলেন না। লেভেল ক্রসিং এর ঠিক পিছনেই সাতটা আটটা শেয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে শাল পলাশের বন কাঁপিয়ে হু হু করে ছুটে এল উত্তরের হাওয়া। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল এক ঝটকায়—ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় ঘুমন্ত মিষ্টার মাইতি শেষ পর্যন্ত চোখ মেলে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঘোষ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। —বাপরে, নর্থ পোলে এসে পড়েছি নাকি? কী যেন নাম তোমার—ওহে হাজারী, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও না— — না না, খোলা থাক খানিকটা।—চ্যাটার্জি কোটের কলারটা তুলে দিয়ে বললেন, ধোঁয়া দেখছ না ঘরে? গ্যাসে মরবে নাকি শেষে?— হুঁ, তাও বটে!—একটু চুপ করে থেকে ঘোষ বললেন আরতো পারা যায় না। নিয়ে আসবো ব্যাগটা?

চ্যাটার্জি একবার আড় চোখে তাকালেন হাজারীর দিকে। ঘুমে আর ঠান্ডায় অদ্ভুত রকম কুন্ডলী পাকিয়ে বসে আছে হাজারী। বললেন, আমিও সেইকথাই বলতে যাচ্ছিলাম, তবে কি না আমরা পাবলিক ম্যান—আমাদের কর্তব্য হল লোকের কাছে সবসময় নিজেদের ডিগনিটি বাঁচিয়ে চলা। এই লোকটার সামনে—ঘোষ মুখ বাঁকালেন, ইংরাজীতে বললেন, এর জন্য ভাবতে হবে না। এরা আমাদের চাইতে এ-সবের মর্ম অনেক ভাল বোঝে। একেও একটু গরম দেওয়া যাক—খুশিই হবে।

ঘোষ উঠে দাঁড়াতে হাজারীও দাঁড়িয়ে পড়ল। হায়, মিথ্যে আশা! ঘোষ বেরিয়ে গেলেন, নির্বিকার ভেবে নেভা চুরুটে আগুন ধরালেন চ্যাটার্জি। মাইতি ঘুমোতে লাগলেন এক মনে।—দেশে-টেশে যাওনা হাজারী?—যাই হুজুর। দো-চার বরিষমে

এক দফে। —চাষ-বাস আছে? এক মুহূর্তে হাজারীর মন দূরে চলে গেল। চাষ-বাস ছিল বই কি এক সময়। অরহড়ের খেত ছিল, ছোট একটা ফলের বাগিচা ছিল, একটা তালাও ছিল। কিন্তু সে-সব কোথায় গেল, তার খবর জানত তার বাপ—যে চোখে ভালো দেখতে পায় না সাদা কাগজে টিপসহি দিয়েছিল, আর জানে জমিন্দার ব্রিজনন্দন চৌধুরীজি যার বাড়িতে বহুৎ ভারি ভারি আদমি পাটনা থেকে এসে খানাপিনা করে।—চাষ এক সময় ছিল হুজুর। এখন নেই।—হুঁ চাকরির লোভে সে-সব বিসর্জন দিয়েছ?—চ্যাটার্জির মুখে ক্ষোভের চিহ্ন ঃ এই শ্লেভ মেন্টালিটির জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে গেল! মাটিই যে সব চাইতে খাঁটি জিনিস—তোমাদের কে বোঝাবে সে কথা? আমরা কেবল বকেই মরি! ঘোষ একটা ছোট ট্রাভেলিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলেন। —জাগাব মাইতিকে ?—কী হবে জাগিয়ে? ওর চলে না। ব্যাগ খুলে বোতল-গ্লাস বার করতে করতে মুখভঙ্গি করলেন ঘোষ।

—এদিকে রাইট অ্যান্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছে, আর একটুখানি এ সব ঠোঁটে ছোঁয়ালেই ক্যারাক্টার নষ্ট হয়। হিপোক্রিট।

সোডা খোলার আওয়াজে একটুখানি নড়ে উঠলেন মাইতি, মুখটা কপ করে বন্ধ হয়ে গেল। পাছে ঘুমের ঘোরে তাঁর মুখে খানিকটা ঢেলে দেওয়া হয়—সেই ভয়েই যেন সতর্ক হয়ে গেলেন আগের থেকে। দুটি গ্লাসের তরল সোনালীর ওপর সাদা ফেনা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল হীরের মতো। আর চক্‌চক্ করে উঠল হাজারীর চোখ। এই শীত, এই জড়তা আর ওই গন্ধটা। তাকেও চকিত করে তুলল। চ্যাটার্জি লক্ষ্য করেছিলেন। একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়।—এ চীজ মালুম হ্যায় হাজারী?

মালুম আছে বইকি হাজারীর। নইলে তার মতো গরীব গরবা এক আধটা দিন খুশী হবে কী করে। তবে মাতোয়ালা নয় হাজারী ন'মাসে এক-আধটা হাটের দিন সামান্য হাঁড়িয়া মেলে আদিবাসীদের কাছ থেকে।

বিনীত হাসিতে হাজারী মাথা নিচু করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার জ্বলন্ত চোখ দুটো আবার উঠে এল সোনালীর উপর হীরের ফেনা জমে ওঠা গ্লাসের দিকে। বড্ড শীত পড়েছে আজ—বড় বেশি। চ্যাটার্জী বললেন, খাবে হাজারী? মুখের ভেতর ধক্ করে উঠল হাজারীর। প্রাণপণে সামলাতে চাইল নিজেকে।—না হুজুর। —আপত্তি কেন হে? যা শীত—একটু তাজা হয়ে নাও না। ভয় নেই—আমরা তো রয়েছি।—ডিউটি আছে হুজুর। একটু পরেই মেল ট্রেন পাশ করাতে হবে—

—যে রকম কুকুর-কুন্ডলী পাকিয়েছ, তাতে মেল ট্রেন পাস করাতে পারবে বলে তো ভরসা হয় না। আরে, গিলে ফেলো এক চুমুক গা গরম হয়ে যাবে।—

চ্যাটার্জি মুখে দেবদুর্লভ হাসি। স্নেহ, অনুকম্পা, বন্ধুত্ব—কী নেই সেই হাসিতে?

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষীণ গলায় হাজারী বললে, না হুজুর, সরকারী কাজ—

ঘোষ ইংরাজীতে বললেন, ইনসিস্ট করছ কেন? না খায় বয়েই গেল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন ইংরেজীতেই উইট্‌নেস রাখতে চাই না—পার্টি করে ফেলতে চাই—বুঝতে পারছনা? আমাদের পজিশনের কথাটাও ভেবে দেখো।—দ্যাট্‌স রাইট! চ্যাটার্জির মুখে রঙ বদলেছে এর মধ্যেই। মেজাজ খুশি হয়ে উঠেছে আরো। এখন তিনি ধীরে ধীরে জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। —ওই পেতলের গ্লাসটা বুঝি তোমার? ধরো—

—হুজুর—

—আমি বলছি তোমাকে। —হাজারী আর একটু কাছে থাকলে চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে বোধ হয় তার গলা জড়িয়েই ধরতেনঃ আরে, আভি জামানা বদল হো গয়া। আমরা সব ভাই ভাই। তোলো গেলাস—

এবার শেষ বাধাটাও উপড়ে গেল হাজারীর। আর মনে পড়ল, চ্যাটার্জি বলেছিলেন ডিউটি নেহি করতা—সামসে্ গেট বন্ধ করে নিদ লাগাও—তোমার নকরি আমি—। না—হুকুম মানতেই হবে। কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে বললে, হুজুর—থোড়া—

ঘোষ ইংরেজীতে বললেন, র? রিয়্যাল স্কচ—ওলড স্মাগলার—

দ্যাটস অল রাইট! ওরা ওস্তাদ লোক অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের এক গ্যালনেও ওদের কিছু হয় না। ঢালো—

কিন্তু সাঁওতালী হাঁড়িয়া আর রিয়্যাল স্কচের তফাৎ জানা ছিল না গরীব হাজারীর। এক চুমুকে সবটাই শেষ করতে গিয়ে বুক পর্যন্ত আগুন ধরে গেল। তারপর মনে হল, এইবারে উঠে দাঁড়িয়ে তার চীৎকার করে একখানা গান গাওয়া দরকার, শুনে হুজুরেরা খুশি হবেন। তারপর—

কখন ঘুমন্তপ্রায় মাইতিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখন খুশির ঝোঁকে হাওয়ার মতো ল্যান্ডরোভার উড়িয়ে বেরিয়ে গেছে ঘোষ তার কোন খবর হাজারী জানত না। হঠাৎ একটা বীভৎস বিকট আওয়াজে তা ঘোর কাটল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে।

মেল ট্রেন ঠিকই বেরিয়ে গেছে। গার্ডের গাড়ীর লাল আলো অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তবিন্দুর মতো। শুধু লাইনের পাশে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে গোরুর গাড়ীটা—আহত বলদ দুটো গোঙাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। আর তার ঘুমের সুযোগ

খোলা গেট পেয়ে যে লোকটা গাড়ী নিয়ে লাইনে উঠে এসেছিল, সে লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে প্রায় দশ বার গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে—শেষ রাতের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় লাইন-স্লিপার নুড়ী রক্তে স্নান করছে।

চাকরি যাবেই —সে ভাবনায় নয়। খুনী—বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা মনে পড়তেই হাজারী টলতে টলতে সেই রক্তমাংস ছড়ানো লাইনের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মার্ডার কেশ হিস্ট্রিটা পড়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্যামল সেন ভাবতে লাগলেন ঃ খুনে সব মৃত্যুর পরিণামই সত্য। কিন্তু এ ধরনের খুনীকে চিহ্নিত করা শক্ত। তবু কর্ত্তব্য তো করতেই হবে—অন্তত একটা তদন্ত।
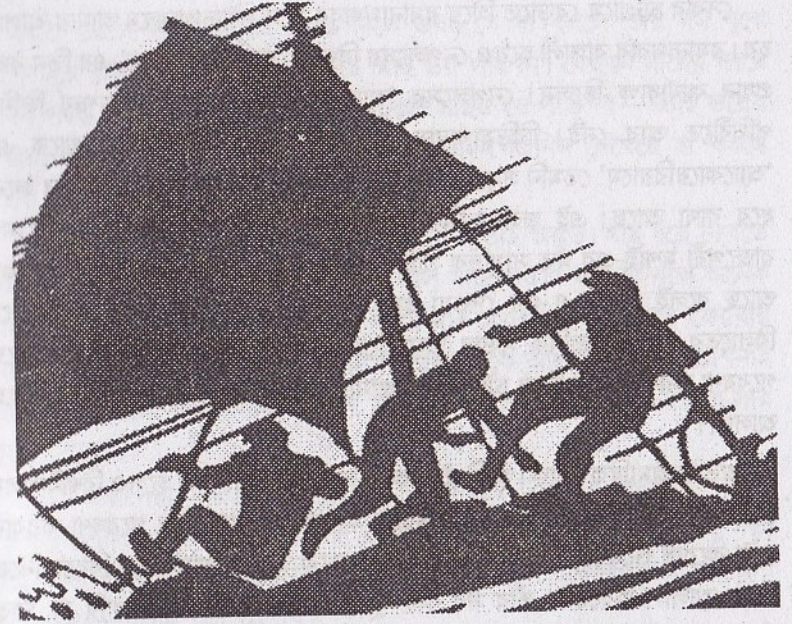
কালাপানির অতলে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমাদের যদি বলি আর বছরের গোড়ার দিকে আলিপুরের হাওয়া অফিসের ভূমকম্পমান যন্ত্রে, শ'তিনেক মাইল দূরের পৃথিবীর মাটির ওপরে নয়, বঙ্গোপসাগরে জলের নিচে, এমন একটা দারুণ ভূমিকম্প ধরা পড়ে, যাতে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গেছ্‌ল এবং তারই সাথে যদি বলি চাটগাঁয়ের কক্সবাজারে শুঁটকি মাছের বাজার বছরের মাঝামাঝি অত্যন্ত চড়ে যায়, আর এই দুই অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যদি জুড়ে দিই যে, জল-ঝড় নেই-পৌষ মাসের শেষাশেষি একদিন কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর এক বিরাট বহর আশ্চর্য ভাবে সমুদ্রের মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—তাদের কারও কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না,—তাহলে তোমরা এই তিনটি ছাড়া ছাড়া ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না পেয়ে নিশ্চয়ই আমায় পাগল ভাববে।

কিন্তু এই তিন পৃথক্ ব্যাপারের ভেতর কি ভয়ঙ্কর সম্বন্ধ যে আছে তাই তোমাদের আজ বলতে বসেছি।

সেবার চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে রমানাথবাবুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার আলাপ হয়। রমানাথবাবু বাঙ্গালী হয়েও নেপল্‌সের বিখ্যাত 'অ্যাকোয়েরিয়াম'-এর তিন বছর প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নেপলসের 'অ্যাকোয়েরিয়াম'-এর মত আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। চিড়িয়াখানায় যেমন পৃথিবীর জীবজন্তু ধরা থাকে এই 'অ্যাকোয়েরিয়ামে' তেমনি সমুদ্রের যত অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী সাধারণের দেখবার জন্যে ধরে রাখা আছে। এই জলচর-নিবাসের অধ্যক্ষের পদ যে সে লোক পায় না। বাজপেয়ী মশাই-এর মত সামুদ্রিক প্রাণিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ইউরোপেও খুব কম আছে বলেই তাঁকে এ পদ দেওয়া হয়। অপাততঃ তিনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলাতের এক বৈজ্ঞানিক সভার অনুরোধে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিকপ্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা করবার ভার নিয়ে চট্টগ্রামে আস্তানা পেতে ছিলেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ।

অত্যন্ত অমায়িক লোক। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আমাদের দেশের সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করবার চেষ্টা করেছি শুনে তিনি অত্যন্ত আদর করে ডেকে আমার সঙ্গে এসব বিষয়ে নিজে থেকে আলাপ করতেন। তাঁর সব কথা বুঝতাম এমন গর্ব করতে পারি না, কিন্তু তাঁর কাছে যে অনেক কিছু শিখেছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর বহর যখন আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার কিছুদিন আগের কথা বলছি।

সকাল বেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে আছি। তিনি শীঘ্রই সমুদ্রে তাঁর গবেষণার জন্যে সামুদ্রিকপ্রাণী শিকারে যাবেন ঠিক হয়েছে। তার জন্যে ইতিমধ্যে একটি মাঝারি আকারের মোটর লঞ্চ জোগাড় করা হয়েছিল, আপাততঃ তাতে জাল ফেলার সরঞ্জাম খাটিয়ে কয়েকজন ভাল জেলে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। জেলেদের একজন সর্দারকে ডাকিয়ে তিনি তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমি তাঁর শেষ লেখা একখানি বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিলুম।

হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন,—"শুনছ সুধীর! সমুদ্রে যাদের চোদ্দ পুরুষ একরকম ঘর-বাড়ি করে বাস করছে তাদের সমুদ্র সম্বন্ধে কি রকম কুসংস্কার এখনও আছে, শুনলে?"

আমি তাঁদের কথাবার্তা এতক্ষণ অনুসরণ করিনি। জিজ্ঞেস করলাম,—"কি বলছে?"

"বলছে, সমুদ্রে মাছটাছ আজকাল ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, জেলেদের অবস্থা

অত্যন্ত খারাপ, তা সত্ত্বেও ওরা আজকাল কাজে বেরুতে চায় না—ওদের বিশ্বাস সমুদ্রে দানো জেগেছে।" জিজ্ঞেস করলাম,—"সে আবার কি?"

এবার জেলে-সর্দার নিজেই উত্তর দিলে এবং সে যা বললে তার মর্ম বুঝে অবাক হয়ে গেলুম। জেলেরা নাকি মিছি মিছি ভয় পায় নি। যেখানে মাছের ভারে সেদিন পর্যন্ত জাল ছিড়ে পড়ত, সেখানে একটি মাছও যে পড়ে না—এটাই ভয়ের ব্যাপার; কিন্তু এ ছাড়া তাদের অনেকে স্বচক্ষে এমন জিনিস দেখেছে যা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না।

সর্দারকে আবার প্রশ্ন করায় সে যা বললে তা সত্যিই অদ্ভুত। মাছ ধরে ফিরতে অনেক সময়ে তাদের রাত হয়ে যায়। আজকাল মাছ পাওয়া যায় না বলে অনেক সময় তারা রাত পর্যন্ত না ঘুরে ফিরতেই পারে না। কয়েকদিন ধরে রাতে ফেরবার সময় তাদের অনেকে দেখেছে, দূরে সমুদ্রের জল থেকে আশ্চর্য রকমের রোশনাই উঠছে—সে আলো নাকি এমন তীব্র যে মনে হয় সমুদ্রে কে বিজলী—বাতির সার জ্বেলে রেখেছে।

হেসে বাজপেয়ী মশাইকে ইংরাজীতে বললাম,—"এ সব সর্দারের মাইনে বাড়াবার ফিকির হয় তো?" বাজপেয়ী মশাই বললেন, "না, এর ভেতর কিছু সত্য আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্রে মাছ দুষ্প্রাপ্য হওয়াটা তো আর ওর বানানো নয়—এটাই তো আশ্চর্য।"

সেদিন সর্দারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন জেলে যোগাড় করে দেবার চুক্তি বিনা গোলমালে হয়ে গেল। সমুদ্রের অদ্ভুত আলোর কথাও সেই সঙ্গে আমরা ভুলে গেলাম।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই যখন জেলে-নৌকোর বহর হারিয়ে গেছে সংবাদ এল এবং জল—ঝড় না থাকা সত্ত্বেও দু'দিন ধরে তাদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন বাজপেয়ী মশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে আমি যেতেই বললেন, "কালকের খবর শুনেছ তো?" বললাম, "জেলে-নৌকোর কথা তো? শুনেছি!" তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "না হে, না! শুধু ওই নয়। যে ক'জন লোক কাল ওদের খোঁজ করতে দু'খানা নৌকো নিয়ে বেরোয় তাদেরও পাত্তা নেই।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—"না, এ কথা তো শুনি নি! কি ব্যাপার?"

তিনি বললেন, "আমিও তো তাই ভাবছি।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন,—"দেখ, আমার আগেকার প্ল্যান আমি বদ্‌লালাম। আমি আজই লঞ্চ নিয়ে বেরুব। এ ব্যাপারের তদন্ত একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। তুমি আসতে পারবে তো?" না আসবার কোন কারণ ছিল না। আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

দুপুরবেলা কক্সবাজারের জেটি থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চের সারেঙ, খালাসী ও কয়েকজন জেলে ছাড়া আরোহী মাত্র আমরা দু'জনে।

লঞ্চটি যেমন মজবুত তেমনি বেগবান্। দেখতে দেখতে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আমরা অকূল সমুদ্রে এসে পড়লাম। কক্সবাজারের পূর্বে মহিষখালি দ্বীপ। তারই কাছে কাছে সাধারণতঃ এই সব জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়। সেই দিকেই আমাদের লঞ্চ চলছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌঁছে আমরা হারানো জেলেদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

এবার কি ভেবে জানি না, বাজপেয়ী মশাই লঞ্চের মুখ আরো দক্ষিণে ফিরিয়ে চালাতে বললেন। জিজ্ঞাসা করতে জানালেন, "কয়েকদিন এদিকে মাছ না পেয়ে নতুন জলের সন্ধানে জেলেদের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।"

তাঁর অনুমান যে সত্য কিছুক্ষণ বাদেই তার ভয়ঙ্কর প্রমাণ আমরা পেলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা এগিয়েছি, হঠাৎ একজন জেলে চিৎকার করে বললে, "ওই দেখুন বাবু!"

ততক্ষণে আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেছে। দেখলাম উল্টো হয়ে জেলেদের একটি নৌকো ভাসছে! আমাদের লঞ্চ তার কাছে গিয়ে থামল। খালাসী জেলেরা সবাই রেলিঙের ধারে এসে ভীড় করে দেখতে এল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। জেলেদের নৌকোগুলি দস্তুরমত মজবুত এবং ঝড়ের ভেতরেও সহজে তা ডোবে না; তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রে থাকার দরুণ নৌকো চালানোতে তাদের জুড়ি পাওয়া ভার। সুতরাং তাদের নৌকো অকারণে এমন উল্টে যাওয়া আশ্চর্য নয় কি? নৌকোর আশেপাশে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না।

খানিক বাদে আবার লঞ্চ ছাড়া হল। এবার আমরা যত এগিয়ে যেতে লাগলাম, ততই এক এক করে হারানো বহরের নৌকো একটি একটি করে দেখা দিতে লাগল। তাদের সবগুলিই কোন অজানা কারণে একই ভাবে উল্টে গেছে এবং কোথাও জেলেদের একটু চিহ্ন নেই।

সত্যিই এবার আমার ভয় করছিল। আগের দিন হারানো জেলেদের খোঁজ করতে যারা এসেছিল—তাদেরও কি পরিণাম হয়েছে স্মরণ করে বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে উঠছিল। খালাসী ও জেলেদের সবার মুখেই দেখলাম ভয়ের ছায়া; শুধু বাজপেয়ী মশাই সমস্ত ভয়ের ওপরে থেকে অত্যন্ত তন্ময় ভাবে কি চিন্তা করতে করতে ডেকের ওপর পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

ভাবছিলাম, বাজপেয়ী মশাইকে লঞ্চ ফেরাবার আদেশ দিতে অনুরোধ করব কিনা, এমন সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে রমানাথবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বললেন,

"সুধীর, শীগ্‌গির আমার দূরবীনটা দাও।"

দূরবীনটা তাঁর হাতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা দেখেছেন তাও চোখে পড়ল। আশ্চর্য ব্যাপার! কিছু দূরে সমুদ্রের কালো জলে মনে হল কে যেন মোটা একটা সবুজ পেন্সিল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লাইন টেনে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় রমানাথবাবু দূরবীন হাতে করতে না করতেই লাইন মিলিয়ে গেল। তিনি হতাশ হয়ে দূরবীন নামিয়ে বললেন—"দেখেছ তো?"

বললাম,—"হ্যাঁ। ওই দেখুন, ডান দিকে আবার সেই রকম দেখা যাচ্ছে!"

এবার আমাদের লঞ্চের ডানদিকে অতি অল্প দূরেই—লাইনের মত নয়, খানিকটা থাবড়ার মত ওই সবুজ রং দেখা গেল! ঠিক যেন খুব খানিকটা সবুজ কালিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আমাদের চারিধারেই এবার এইরকম সবুজ রং দেখা দিতে লাগল। রমানাথবাবু লঞ্চ থামাতে বললেন, দূরবীন চোখে নিয়ে সেই সবুজ ছোপ দেখতে দেখতে তাঁর মুখ, কেন জানি না, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর তন্ময়তা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করলাম না।

লঞ্চ কয়েক মিনিট মাত্র থেমেছে, এমন সময় সেটা অত্যন্ত দুলে উঠল এবং বেশ টের পেলাম, হঠাৎ লঞ্চ একদিকে হেলছে। সেই মুহূর্তেই—সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখলাম।

লঞ্চ হেলে পড়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে সমুদ্রের পানে চেয়ে ছিলাম। মনে হল ঠিক আমাদের ডেকের কাছে সমুদ্রের জলের কিছু নিচেই অমনি খানিকটা সবুজ রঙ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই সবুজ রং আরো স্পষ্ট হয়ে এল এবং তারপর যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকেই প্রথমতঃ বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ল। দেখলাম, ছোট খাট শুশুকের মত একটি সবুজ জীব, কিন্তু তা শুশুক তো নয়ই—সমুদ্রের যত প্রাণী মানুষের চোখে এ পর্যন্ত পড়েছে তার কোনটির সঙ্গে তার মিল নেই। পেছনের দিকে খানিকটা শুশুকের মত হলেও সামনে তার অনেকটা অক্টোপাসের মত গুটি চারেক নুলো বেরিয়েছে। সবচেয়ে ভীষণ সে জীবটির দাঁতালো প্রকাণ্ড মুখ, আর সাপের মত নিষ্ঠুর চোখ। দেখতে দেখতে সেটা ডুবে গেল, কিন্তু তারপরেই দেখলাম আমাদের লঞ্চের চারিধারে ক্ষুধিত নেকড়ের পালের মত অসংখ্য এই জাতীয় জীব ঘিরে এসেছে। আমাদের চারিধারের জল সবুজ হয়ে গেছে তাদের ভিড়ে।

লঞ্চের সবাই এখন বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে সেইদিকে চেয়েছিল। সারেঙ একটা বালতিতে খানিকটা নোংরা এঞ্জিনের তেল বাইরে ফেলতে এসে বললে, "লঞ্চ ভয়ানক হেলছে কেন বুঝতে পারছি না বাবু!" লঞ্চ যে হেলছে এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলুম কিন্তু তাতে বিশেষ ভয়ের কিছু আছে এতক্ষণ আমাদের মনে হয়নি। সারেঙের কথায় আমরা চমকে উঠলাম। লঞ্চ হেলার সঙ্গে এই জীবগুলির

কোন সম্বন্ধ নেই তো? আর সকলের কথা জানি না, আমার মনে ওই রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

রমানাথবাবুর ধ্যান তখনও ভাঙেনি। ডেকের নিচে যেখানে সারেঙের ফেলা ময়লা তেলটা ভাসছিল। সেই দিকে চেয়ে তিনি তখনও একমনে কি ভাবছিলেন। লঞ্চ তখন এতটা হেলে পড়েছে যে আমরা ভয়ে ভয়ে অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। জেলেদের মুখ, দেখলাম, শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে। সর্দার আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাতে সে মগ—শুকনো মুখে "ফয়ার" নাম করে সে বললে, "আজ আর নিস্তার নেই বাবু, জেলের বহরের যে দশা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে। সমুদ্রে দানো উঠেছে আমি তো আগেই বলেছিলাম।"

তার কথার উত্তর দিলাম না। সামনের দিকে তখন দেখছিলাম কালো সমুদ্র সবুজ করে বহু দূর থেকে এই সামুদ্রিক নেকড়ের পাল আসছে। তাদের আসা সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ঠিক শিক্ষিত সৈন্যের মত সার বেঁধে ছাড়া তারা চলে না। মাছের ঝাঁক অনেক সময়ে একসঙ্গে চলে, কিন্তু তাদের ভেতর এমন শৃঙ্খলা নেই। এদের প্রত্যেক সারে একটির বেশী দু'টি প্রাণী পাশাপাশি নেই। কেউ কাউকে এগিয়েও যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা সাপ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে আসছে; তবে এঁকে বেঁকে নয়, একবারে তীরের মত সোজা।

এর মধ্যে লঞ্চ ক্রমশঃ এতটা হেলেছে যে আর একটু বাদেই সমুদ্রের জল ডেকের ওপর উঠবে। সারেঙ ভীত হয়ে রমানাথবাবুর আদেশ না নিয়েই লঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু নীচের স্ক্রু তখন ভালো করে আর জল পায় না, লঞ্চ কাৎ হয়ে এগুতে গিয়ে আরো বেশী জল ডেকে উঠে পড়বার সম্ভাবনা হল।

আমি ভয়ে একরকম উন্মত্ত হয়ে রমানাথবাবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললাম,—"লঞ্চ যে ডোবে তা দেখতে পাচ্ছেন?"

ভয়ে আমার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। এমন কি এই বিপদের ভেতর আনবার জন্যে রমানাথবাবুর ওপর রাগই হচ্ছিল। তিনি কিন্তু অবিচলিত ভাবে আমার দিকে ফিরে জলের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্লেন,—"দেখতে পেয়েছ?"

সারেঙের ফেলা তেলটা ভাসছে। এ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বললাম,—"আপনি পাগল হয়ে গেছেন। লঞ্চ ডুবছে তা খেয়াল আছে?"

রমানাথবাবু এবার বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠের মত চমকে উঠে ডাকলেন,—"সারেঙ!"

সারেঙ কাছেই ছিল। শুক্‌নো মুখে বললে, "আর আশা নেই বাবু।" সে কথায় কান না দিয়ে রমানাথবাবু পাগলের মত জিজ্ঞেস করলেন,—"কত পেট্রোল আছে

ষ্টোর রুমে?"

সারেঙ আমারই মত অবাক হলেও উত্তর দিলে, "তা অনেক আছে বাবু, দুদিনের আসা-যাওয়ার মত তেল কেনা হয়ে ছিল।" "শীগগির সব বার করে নিয়ে এসে লঞ্চের চারধারে ঢাল। শুধু ফিরে যাবার মত তেল থাকলেই চলবে।"

রমানাথবাবুর কথা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই তিনি আবার জলের দিকে আমাকে তাকাতে বলে বললেন, "এখনও বুঝতে পার নি? আমাদের চারিধারে সব জল সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

সত্যিই সমস্ত জায়গা সেই প্রাণীর ভিড়ে সবুজ হয়ে গেলেও, সেই তেলটুকু যতখানি স্থান জুড়ে ভাসছিল তার ত্রিসীমানায় সবুজ রঙের আভাস ছিল না।

লঞ্চ তখন একেবারে হেলে পড়ে একদিকের ডেক জলের প্রায় সমান হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি আমি রমানাথবাবুকে টেনে না নিলে একটি জানোয়ার নুলো বাড়িয়ে আর একটু হলেই তাঁকে ধরে ফেলেছিল আর কি! খালাসীরা রমানাথবাবুর আদেশের তাৎপর্য না বুঝলেও ইতিমধ্যে চারধারে পেট্রোল ঢালতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে যে কিছু হবে আমার আশা ছিল না। পরমুহূর্তেই আমাদের চোখের উপর যে ব্যাপার ঘটল তাতে আশা হারানো অস্বাভাবিকও নয়। একজন জেলে তেল ঢালবার জন্যে রেলিঙের একটু বেশী রকম কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চিৎকার শুনে দেখি দু-তিনটে জানোয়ার তাদের চাবুকের মত নুলো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা তার সাহায্যে যেতে না যেতেই তারা তাকে চক্ষের নিমেষে টেনে একেবারে জলের তলায় নিয়ে গেল। লোকটা একবারের বেশী চিৎকার করবার অবসরও পেল না। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের সকলেরই ওই দশা হবে জেনে গভীর হতাশায় আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু সেদিন প্রাণ নিয়ে অক্ষত শরীরে কক্সবাজারে ফিরেছিলাম। না ফিরলে এই গল্প তোমাদের শোনাতে পারতাম না। বেঁচেছিলাম শুধু রমানাথবাবুর বুদ্ধিতে সেকথা আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। চারধারে পেট্রোল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রের মত কি করে যে সেই ভীষণ সামুদ্রিক নেকড়ের পাল সরে গেল তখন বুঝতে পারিনি। স্টীমার একটু সোজা হতেই সারেঙ সেদিন প্রাণপণে এঞ্জিন চালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রমানাথবাবু নিজে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এসেই অবশ্য নিশ্চিন্ত হননি। তাঁরই চেষ্টায় ও পরামর্শে অনেক গড়িমসির পর শেষ পর্যন্ত কক্সবাজারের পুলিশ রাজী হয়ে কয়েকটি জলে তেল ছড়াবার স্টীমার পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ঝড়ের সময় যেমন করে কোন কোন জাহাজ চারিধারে তেল ছড়ায় তেমনি করে ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র জুড়ে কয়েক দিন ধরে তেল ছড়ানো চলে। তার ফলে আশ্চর্য ভাবে কয়েক দিনের ভেতর তারা অন্তর্ধান করেছে। কক্সবাজারে এখনও সামুদ্রিক মাছ দুস্প্রাপ্য, কিন্তু আশা করা

যায় আর বছরের ভেতর আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে।

কয়েক দিন বাদে রমানাথবাবুকে এই অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর রহস্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন—"ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য বটে, কিন্তু সমুদ্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা অনেক দিন আগেই এমন ঘটা যে সম্ভব তা অনুমান করে রেখেছেন। মানুষ এ পর্যন্ত সামুদ্রিক যে সব জীবজন্তুর সন্ধান পেয়েছে সেগুলি সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত ওপরের স্তরের। কিন্তু সমুদ্রের গভীর তলায় যে কি আছে মানুষ তার কিছুই জানে না। সমুদ্রের তলা তো বড় কম কথা নয়! হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গটিকে উল্টো করে যদি ডুবিয়ে দেওয়া যায় তা হলেও তল পাওয়া যায় না—গভীর সমুদ্রও আছে। সেখানে মানুষের কোন জালই পৌঁছয় না। আর যদি বা পৌঁছত তা হলেই বা হতো কি? সমুদ্রের এ পর্যন্ত কতটুকু আর মানুষ খুঁজে দেখেছে? বৈজ্ঞানিকেরা তাই অনেকদিন আগেই অনুমান করেছেন সমুদ্রের গভীর স্তরে আমাদের অজানা অনেক অদ্ভুত জীব থাকা সম্ভব। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে সত্যি তাই প্রমাণিত হয়ে গেল। যে জীব আমরা দেখেছি, সমুদ্রের কোন গভীর স্তরে এদের বাস। এরা এত দিন ওপরে ওঠেনি বলেই মানুষ এদের পরিচয় পায় নি। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এদের বুদ্ধি আর শৃঙ্খলা।"

"সমুদ্রের তলায় কোন প্রাণী যে এত খানি বুদ্ধি, এ রকম দল বদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারে এ কথা কেউ ভাবে নি। জেলেদের নৌকা উল্টানোর ব্যাপার থেকেই এদের অসামান্য বুদ্ধির আমি প্রমাণ পাই। সার বেঁধে আক্রমণ করার শৃঙ্খলা তো তুমিই দেখেছ।"

বললাম, "আমাদের লঞ্চ তো উল্টোতে বসেছিল, কি করে তা এখনও বুঝতে পারি নি।"

"এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়, শুধু একটা সামুদ্রিক প্রাণীর মাথায় এসেছে এইটেই আশ্চর্য। নৌকো ও আমাদের লঞ্চের তলার মেরুদণ্ডে নুলো জড়িয়ে এদের গোটা কতক প্রাণী একদিকে টানবার চেষ্টা করলেই তো কাৎ হয়ে পড়বে। কাৎ হবার পর সামনে থেকে নুলো জড়িয়েও নিচে টানা যায়। একটু কাৎ হলেই জল উঠে উল্টোতে কতক্ষণ? অবশ্য এতে ভীষণ শক্তিরও দরকার।"

জিজ্ঞাসা করলাম,—"কিন্তু এরা হঠাৎ নিচের স্তর ছেড়ে উপরেই বা উঠল কেন?"

রমানাথবাবু বললেন, "প্রথমে আমিও তা ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তার পরেই মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে কাছাকাছি সমুদ্রের তলায় এক জায়গায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। সেই আলোড়নেই হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই,—এরা

স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে এদিকে এসে পড়েছে। এসে প্রথমতঃ সমুদ্রের মাছ অর্ধেক খেয়ে সাবাড় করেছে। বাকি অর্ধেক এদের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। মাছও মানুষের ওপর এরা যা বুদ্ধি খাটিয়েছে তা অপূর্ব। দৈব পথ না দেখালে এতদিনে আমরাও তাদের পেটে হজম হয়ে যেতাম। সারেঙ যদি সেই সময় জলে ময়লা তেল না ফেলত, আমার যদি সেই দিকে চোখ না পড়ত তা হলে আমরা তো মারা যেতামই, আরো কি সর্বনাশ যে মানুষের ওই জীব থেকে হোত কে জানে? সামান্য পেট্রোলের তেল কেন যে ওদের অসহ্য তা এখনও ভাল করে বুঝি না, এবং দৈব সহায় না হলে শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে এ ওষুধের সন্ধান কখনো পেতাম কিনা সন্দেহ।"

আমি বললাম, "এ সব তো বুঝলাম, কিন্তু জেলেদের সর্দার রাত্রে সমুদ্রে যে আলোর কথা বলেছিল সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যা?"

রমানাথবাবু হেসে বললেন, "সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। রাত্রে যে আলো জেলেরা দেখেছিল সে এই প্রাণীগুলিরই গায়ের আলো এবং এরা যে সমুদ্রের গভীর স্তরের জীব এই আলোই তার আর একটা প্রমাণ। সমুদ্রের গভীর তলায় একেবারে অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার। সূর্যের আলো জলের রাশি ভেদ করে অতদূর পৌঁছতে পারে না। সেখানে যে সব প্রাণী থাকে প্রকৃতির আশীর্বাদে তাই তাদের আলো তারা নিজেদের দেহ থেকেই বার করবার ক্ষমতা পেয়েছে।"

খানিক চুপ করে থেকে রমানাথবাবু আবার বললেন, "আমরা এই দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি, কিন্তু অসীম অতল সমুদ্রের ভেতর আরো কত রহস্যময় প্রাণী আছে কে জানে? পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ স্থলে যদি মানুষের মত বুদ্ধিমান্ জীবের উদ্ভব সম্ভব হয়, তা হলে এই বিশাল জলের জগতে নতুন ধরণের বুদ্ধিমান্ কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হবে না কে বলতে পারে?"

শ্যামকিংকরের হারানো রহস্য

সমরেশ বসু

একজন জীবিত মানুষ কি চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারে?

পারে। এমন অনেক ঘটনাই আমরা সকলে কমবেশী জানি। গল্প উপন্যাসে এরকম ঘটনা আমরা কম পড়িনি। সত্যিকারের জীবনেও, জীবিত মানুষের চিরকালের মত হারিয়ে যাবার ঘটনা মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু এরকম বরাবরের মত, একটা জলজ্যান্ত মানুষের হারিয়ে যাবার ঘটনা কতটা সত্যি, তা কি ঠিক করে বলা যায়।

আজকাল খবরের কাগজে, টেলিভেশনের পর্দায়ও আমরা হারিয়ে যাওয়া মানুষের খবর আর ছবি দেখতে পাই। সেসব হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে হয়ত অনেক কারণ থাকতে পারে। কেউ হয়ত ইচ্ছে করেই পালিয়ে যায়। টেলিভিশন ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন

দিয়ে, এদের অনেককেই হয়ত খুঁজে পাওয়া যায়। যারা অসুস্থ, তারা হয়ত পথে-ঘাটে বা হাসপাতালে মারাও যায়। আবার এমনও হতে পারে, সেইসব হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হয়।

আমি মাথা খারাপ, অসুস্থ বা খুন হওয়া লোকদের সম্পর্কে কিছু বলছি না। এমন কি পালিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, তেমন লোকের কথাও বলছি না। সত্যি হারিয়ে যাওয়া একজন ভদ্রলোকের কথাই আমি বলছি। ভদ্রলোকের হারিয়ে যাওয়া যেমন একটা রহস্যজনক ঘটনা, তেমনি হারিয়ে যাবার পরেও তিনি আমার জন্য অনেক রহস্য রেখে গেছিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতার বাইরে একটা ছোট শহরে। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনের। ছোট শহরের একটা ব্যাপার হল, আলাপ পরিচয় না থাকলেও, সবাই সবাইকে চেনে। বিরাট শহর কলকাতার মত নয়, যে পরিচিত ছাড়া কেউ কারোকে চেনে না। এমন কি পাশের বাড়ির লোককেই অনেকে চেনে না। কিন্তু মফস্বলের ছোট শহর অনেকটা গ্রামের মতই। বিশেষ করে সেই সময়ে, আমার বয়স যখন ছিল চোদ্দ-পনের সেই সময়ে ছোট শহরে, সকলেই সকলের মুখচেনা ছিল। এমন কি, মুচি, ফেরিওয়ালারাও বাদ যেত না।

আমি যে ভদ্রলোকের কথা বলছি তাঁর নাম ছিল শ্যামকিংকর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পরিচিত শহরের লোকেরা তাঁকে শ্যামবাবু বলেই ডাকত। যে সময়ের কথা বলছি, তখন শ্যামকিংকরবাবুর বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি নয়। তিনি আমাকে চিনতেন কিনা আমি জানি না। আমাদের বাড়ির সঙ্গে, তাঁদের বাড়ির কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু আমি শ্যামবাবুকে চিনতাম। তাঁকে চেনার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। শহরের অনেককেই যেমন চিনতাম, তাঁকেও সে রকমই চিনতাম। শহরের পশ্চিম দিকে, তাঁদের সেকালের বিরাট দোতলা বাড়িটাও বাইরে থেকে দেখেছি। বাড়িটা আমার চোখে কেমন ভূতুড়ে লাগত। এত বড় বিরাট বাড়িটার অধিকাংশ দরজা জানালা সব সময়েই বন্ধ থাকত। মনে হত, বাড়িটা ফাঁকা, লোকজন নেই। বাড়িতে শ্যামকিংকরবাবুর কে কে ছিল, তাও আমি জানতাম না। শহরের অনেক বাড়ির ছেলের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। শ্যামকিংকরবাবুদের বাড়িতে আমার বয়সী কোন ছেলে ছিল কিনা, জানতাম না। থাকলেও আমার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি।

শ্যামকিংকরবাবু শহরের একটি সরকারি অফিসে চাকরি করতেন, সেটা আমার জানা ছিল। কোর্টের পাশেই একটা সরকারি অফিসবাড়িতে তাঁকে সকালে বিকেলে যাতায়াত করতে দেখতাম। শীতকালের সময় ছাড়া, সব সময়েই তাঁর হাতে থাকত একটি ছাতা। তিনি মানুষটি ছিলেন ছোটখাটো পাতলা চেহারার। গায়ের রঙ ছিল বেশ ফর্সা। নাক ছিল চোখা। চোখ দুটো ছিল বড় বড়। মাথার কালো চুল কখনও

খুব বড় দেখিনি। বারো মাস ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। বেশিরভাগ গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবিই তাঁর গায়ে দেখতাম। তাঁকে দেখলেই মনে হত, তিনি বেশ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। খুব অল্প লোকের সঙ্গেই তাঁকে মেলামেশা করতে দেখতাম। কথা বলতেন আস্তে। খুব গম্ভীর হয়ে থাকতেন না। তবে তাঁকে খুব বেশি হাসতেও বিশেষ দেখিনি।

শহরের কোন কোন লোককে নিয়ে ভাল-মন্দ নানারকম আলোচনা হত। শ্যামকিংকরবাবুকে নিয়ে কোনরকম আলোচনা হত না। কেনই বা হবে। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে দাঁড়াতেন না। স্কুল কলেজে ধর্মঘট করতেন না, বক্তৃতা করতেন না। থিয়েটার করতেন না, গান করতেন না। কোন খারাপ কাজও করতেন না। তাই তাঁকে নিয়ে কোনরকম আলোচনা হত না। আমি বা আমার বন্ধুরা কোনদিন তাঁকে নিয়ে কোন কথা বলিনি। তিনি ছিলেন শহরের একজন খুব সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই সাধারণ মানুষটিই একদিন শহরের সকলের আলোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন। আমরা শুনলাম, শ্যামকিংকরবাবুকে দুদিন ধরে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুদিন আগে খেয়েদেয়ে বেলা দশটা নাগাদ তিনি অফিসে গেছিলেন। তারপর আর তিনি বাড়ি ফিরে যাননি। অফিসে খবর নিয়ে জানা গেছে, তিনি নাকি সেদিন অফিসেই যাননি।

আমরা দুদিন পরে খবরটা পেয়েছিলাম, কারণ শ্যামকিংকরবাবুর বাড়ির লোকেরা নাকি ভেবেছিলেন, তিনি হঠাৎ কোথাও গেছেন। পরের দিনই ফিরে আসবেন। আসেননি। বাড়ির লোকেরা তাঁর অফিসের বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ করেও যখন কিছু জানতে পারেননি, তখন থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই খবরটা ছোট শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমি আর আমার বন্ধুরা খুবই অবাক হয়েছিলাম। শ্যামকিংকরবাবুর মত বয়সের একজন লোক কখনও হারিয়ে যেতে পারেন না। অথচ পুলিশ তাঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। রেল লাইনের ধারে, নদীতে, কোথাও খুঁজতে বাকি রাখেনি। শহরে কয়েকদিন ধরে কেবল একটা কথা নিয়েই সবাই আলোচনা করেছিল। ছোট বড় সকলের মুখে শ্যামকিংকরবাবুর নাম। আর সত্যি মিথ্যে কত রকমের গুজব যে রটেছিল, তার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

আমাদের বাড়ির বড়রাও অনেক আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা নাকি শুনেছিলেন, শ্যামকিংকরবাবু তাঁদের এজমালি সম্পত্তির একটা অংশ নিজে বিক্রি করে লাখ টাকা সবাইকে ফাঁকি দিয়েছিলেন। সেই সম্পত্তি ছিল অন্য এক দূরের জেলায়, গ্রামাঞ্চলে। ধরা পড়ে জেলে যাবার ভয়েই তিনি পালিয়েছেন। কিন্তু দিনে দুপুরে, সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথায় যেতে পারেন? ট্রেনে চেপে কোথাও গেলে টিকিট কাটবার সময়েই জানা যেত। সেখানে তাঁকে দেখা যায়নি। নদী পেরিয়ে গেলেও

জানা যেত। কারণ খেয়াঘাটের মাঝি-মাল্লা সবাই তাঁকে চিনত। তারাও কেউ দেখেনি। বাসে চেপে কোথাও যে যাবেন, তার উপায়ও ছিল না। কারণ তখনও আমাদের সেই শহরে বাস চলাচল শুরু হয়নি। একথাও শোনা গেছিল, বাড়ি থেকে তিনি টাকা-পয়সা, জামা-কাপড়, কিছুই নিয়ে বেরোননি। অফিসে যেমন যান, তেমনই গেছিলেন। সময়টা শীতকাল ছিল বলে, হাতে ছাতাও ছিল না। ব্যাপারটা সত্যি রহস্যজনক।

এরকম ধারণা ছিল আমাদের বাড়ির বড়দের। তবে এরকম একটা ঘটনা নিয়ে কতদিনই বা আর লোকে মাথা ঘামায়। শহরের যার যতরকম ধারণা ছিল, কেউ তা বলতে বাকি রাখেনি। তারপর মাসখানেকের মধ্যেই সবাই শ্যামকিংকরবাবুর কথা ভুলে গেছিল। কেউ আর তাঁকে নিয়ে কথা বলত না। আমার বন্ধুরাও আর কিছু বলত না। আমিও কিছু বলতাম না। তবে আমি ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। আমার প্রায়ই মনে হত, একটা জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন? কেনই বা গেলেন?

একটা বছর কেটে গেছিল। আবার শীত এসেছিল। আমাদের শহরের পূর্বদিকে রেল লাইন পেরিয়ে গেলেই গ্রাম। শহর থেকে প্রায় পাঁচ-ছ মাইল দূরে ছিল বিরাট একটা বিল। বর্ষাকালে সেই বিলকে সমুদ্রের মত মনে হত। শীতকালে জল কমে যেত, আর বিলের ধারে জঙ্গলে, গাছপালায় ভিড় করত বহু রকমের পাখি। সেই জঙ্গলে কেবল বুনো খরগোসই ছিল না। বুনো শুয়োরও ছিল। আশেপাশের গ্রামে, যেসব সাঁওতালরা ছিল, তারা তাদের শিকারী কুকুরদের নিয়ে, তীরধনুক হাতে, বিলের জঙ্গলে শিকার করতে যেত। শহরে যাদের বন্দুক ছিল, তারাও কেউ কেউ সেখানে শিকারে যেত।

আমি বা আমার বন্ধুরা শিকারে যেতাম না। বিলের ধারে, আশেপাশের গ্রামে বেড়াতে যেতাম। শীতের বেলার দশটা-এগারটার মধ্যেই খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। সন্ধেবেলার অন্ধকার নেমে আসবার আগেই বাড়ি ফিরে আসতাম। পৌষ, মাঘ, দু মাসের মধ্যে অন্তত দু-তিন দিন আমরা বিলের ধারে বেড়াতে যেতাম।

শ্যামকিংকরবাবু যে বছর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন, সে বছরেও আমরা দুদিন বিলের ধারে বেড়াতে গেছিলাম। পরের বছরও গেছিলাম। পরের বছর প্রথম যেদিন গেছিলাম, আমরা প্রায় বেলা একটায় বিলের ধারের প্রথম গ্রামটায় পৌঁছেছিলাম। প্রত্যেক বছরই যেতাম বলে, গ্রামের লোকেরা আমাদের চিনত। আমরা বাড়ি থেকে সবাই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে যেতাম। তবু তেষ্টা পেলে, গ্রামের লোকেদের কাছে যখন জল চাইতাম, তারা শুধু জল দিত না। নতুন গুড়ের পাটালি তো দিতই। তাছাড়া অন্যরকমের মিষ্টিও দিত। সেই সময় ক্ষেতে থাকত ছোলা আর কড়াইশুটি।

গ্রামের লোকেরাই আমাদের ছোলা আর কড়াইশুটি হাতে তুলে দিত।

যাই হোক, আমরা বিলের ধারে যাবার আগে, প্রথম গ্রামে ঢুকে, এক বাড়িতে নতুন গুড়ের পাটালি আর জল খেয়েছিলাম। তারপর বিলের ধারের জঙ্গলে গেছিলাম। সাঁওতালদের একটা দল শিকারে এসেছিল। জঙ্গল আর গাছপালা ক্রমেই ঢালুতে নেমে গেছে। জঙ্গলের পরে চাষের জমি। আরও দূরে নিচের দিকে জল।

আমার চোখে পড়েছিল, জঙ্গলের উঁচু পাড়ের দিকে, নতুন মাটির ঘর। মাথায় টালি। বেড়ার ফণিমনসা তেমন বড় হয়নি। উঠোনটা গোবর-মাটি দিয়ে লেপা মোছা তকতকে। তবে একটাও ফলের গাছ ছিল না। একদিকে একটা বটগাছ। অন্যদিকে একটা গাম্বিল গাছ ছিল। বিলের ধারের উঁচু পাড়ের জঙ্গল সাফ করে, নতুন ঘর তোলা হয়েছিল। আগের বছর বাড়িটা দেখিনি। গ্রামের বাইরে ওরকম কোন বাড়ি বিলের ধারে ছিল না।

বাড়িটা দেখে আমার কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু খুব অবাক হয়ে গেছিলাম অন্য কারণে। ফণিমনসার বেড়ার এক জায়গায় একটি কঞ্চির আগল ছিল। সেই আগলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, গেরুয়া থান আর চাদর পরা এক সাধুবাবা। সাধুবাবার মাথার লম্বা চুলে জটা পড়েছে। লম্বা গোঁফদাড়িতে ভরা মুখ। তাতে কিছু পাকও ধরেছে। তার পা দুটো ছিল খালি। আমার বন্ধুরা কেউ সাধুবাবার দিকে তাকিয়েই দেখেনি। তখন ওরা সবাই জঙ্গলের দিকেই তাকিয়ে হাঁটছিল। কিন্তু আমি যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলাম! মাথায় যতই জটা থাকুক, তার মুখ গোঁফদাড়ির জঙ্গলে ঢাকা পড়ুক, নাক চোখ দেখে আমার শ্যামকিংকরবাবুর মুখ মনে পড়ে গেছিল। তাঁর চোখ আমাদের দিকে ছিল না। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। অনেকগুলো তিতির তখন আকাশে উড়ছিল।

আমি সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। বন্ধুরা এগিয়ে গেছিল। সাধুবাবাকে যতই দেখছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল, উনি শ্যামকিংকরবাবু ছাড়া আর কেউ নন। বন্ধুরা খানিকটা এগিয়ে আমাকে চিৎকার করে ডেকেছিল। তখন সাধুবাবার আমার দিকে নজর পড়েছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে আগলের ভেতরে চলে গেছিলেন।

সারাদিন বিলের ধারে জঙ্গলে আর গ্রামে গ্রামে বেড়ালেও, সাধুবাবার সেই মুখ আমি ভুলতে পারিনি। কিন্তু আমার সন্দেহের কথা বন্ধুদের বলিনি। কারণ ওরা তা হলে হৈ চৈ করে সাধুবাবাকে দেখতে ছুটত। আর বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটত।

আমি গ্রামের লোককে বিলের ধারে বাড়িটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলেছিল, কয়েক মাস আগে একজন সাধুবাবা এসে ওখানে ঘর তুলে আশ্রম করেছে।

অন্য লোক হলে গ্রামের লোকেরা তাড়িয়ে দিত। কিন্তু লোকটা নাকি সত্যি ভাল। কারোর সাতে-পাঁচে থাকে না। তার চাষ-আবাদ করা বা মাছ ধরার কোন ইচ্ছেই নেই। যা সামান্য পুঁজিপাটা ছিল, তা দিয়ে জঙ্গল সাফ করে ঘরটা তুলেছে। সাধুবাবা নিজের মনেই থাকে। সে কোন ভোজবাজী দেখায় না। জলপড়া মাদুলি দেয় না। এমন কি তার নিজের খাবার সংস্থানও নেই। তাই গ্রামের লোকরাই তাকে চাল, ডাল, তরিতরকারি দেয়। কিছু বলতে বললে সে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শোনায়। তাই শুনতেই অনেকে সাধুবাবার কাছে যায়।

আমার মন থেকে সন্দেহ যায়নি। সেবারের শীতে বন্ধুদের সঙ্গে আমি আরও দুবার বিলের ধারে বেড়াতে গেছিলাম। বিলের ধারে বেড়ান আমার মাথায় ছিল না। সাধুবাবাকে দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। সেই বছরেই, তারপরে আমি একবার একলা গেছিলাম। আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সাধুবাবা শ্যামকিংকরবাবু ছাড়া আর কেউ নন।

কয়েক বছর পর পর আমি সাধুবাবাকে দেখেছিলাম। আশ্রমের চেহারা গ্রামের লোকেরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। অনেক গাছপালা লাগিয়েছিল। ফুলের বাগান করে দিয়েছিল। এমন কি সাধুবাবাকে গরুও দিয়েছিল। আর আলাদা একটা মাটির ঘরেরই মন্দির করে দিয়েছিল।

আমার সন্দেহের কথা কারোকে বলতে পারিনি। আমার বন্ধুরা সাধুবাবাকে দেখে কোনরকম সন্দেহ করেনি। শ্যামকিংকরবাবুর কথাও ওদের মনে আসেনি।

পাঁচ বছর পরে, একদিন বিকেলে আমি রেল লাইনের ওপারে আমার বন্ধুর বাড়ি গেছিলাম। দেশ বিভাগের পর, রেল লাইনের পুবদিকে অনেক নতুন ঘরবাড়ি হয়েছিল। বৈশাখ মাস। বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেছিলাম, আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ করেছে। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল। তখন বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে আসছিল। রাস্তায় লোকজন কমই ছিল। দু-চারজন যারা ছিল, তারা সব বাড়ির দিকে ছুটছিল। আমিও ছুটছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল সাধুবাবাও হন হন করে রেল লাইনের দিকে চলেছেন। তিনি আমাকে লক্ষ্যই করেননি।

আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সাধুবাবা শহরে কোথায় যাচ্ছেন? একটু দূরে থেকে আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেছিলাম। শহরে তখন রাস্তায় দোকানে আলো জ্বলে উঠেছিল। আবার মেঘের ডাকের সঙ্গে ঝড়ও শুরু হয়ে গেছিল। সাধুবাবা তখন ছুটছিলেন। আমিও তাঁর পেছনে ছুটছিলাম। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে শহরের পশ্চিমদিকে শ্যামকিংকর চট্টোপাধ্যায়দের সেই বিরাট পুরনো দোতলা বাড়িতেই সাধুবাবা ঢুকে পড়েছিলেন!

তারপরে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। শুধু আমি আজ পর্যন্ত এ

বিষয়ে কারোকে বলিনি। পরের দিন আমি একলা হেঁটে বিলের ধারে গেছিলাম। দেখেছিলাম, সাধুবাবা ওঁর আশ্রমেই আছেন। তার মানে, রাত্রেই তিনি শহর থেকে ফিরে গেছিলেন।

আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সাধুবাবাকে আমি দেখেছি। তার মধ্যে অন্তত বার তিনেক রাত্রে তাঁকে আমি শহরে সেই চাটুয্যে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও আমি বিলের ধারে যেতাম। বিলের ধারে বেড়াতে যেতে আমার বরাবরই ভাল লাগত। যদিও চারপাশে অনেক কিছুই বদলে গেছিল। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, শীতকালের এক দুপুরে, কলকাতার এক বন্ধুকে নিয়ে বিলের ধারে গেছিলাম। বন্ধুকে সাধুবাবার বিষয়ে আমার মনের কথাও বলেছিলাম। কিন্তু সেবার গিয়ে শুনেছিলাম, সাধুবাবা গত হয়েছেন—অর্থাৎ মারা গেছেন কয়েক মাস আগেই।

শ্যামকিংকর চট্টোপাধ্যায়ের হারিয়ে যাওয়ার রহস্যের কোন কিনারা আজও হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সাধুবাবাই ছিলেন শ্যামকিংকর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আমাদের শহরের লোকদের আমি সে-কথা কোনদিন বলিনি।

রহস্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বন্ধুর মুখে শোনা এ গল্পটি। বন্ধুটি বর্তমানে কলকাতার কোন কলেজের প্রফেসর। বেশ বুদ্ধিমান, বিশেষ কোন অনুভূতির ধার ধারেন না। উগ্র বৈষয়িকতা না থাকলেও জীবনকে উপভোগ করবার আগ্রহ আছে, সে কৌশলও জানা আছে।

সেদিন রাত্রে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নানারকম গল্প হচ্ছিল গরম চা ও আনুষঙ্গিক খাদ্যের সঙ্গে মজিয়ে। অবিশ্যি ভূতের গল্প হচ্ছিল। আমার বন্ধু একটা গল্প বল্লেন। আশ্চর্য লাগলো গল্পটা। একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন এই গল্পটা করলেন, তখন এর একটা মূল্য আছে ভেবেই এ গল্পটা বলছি। তাঁর নিজের কথাতেই বলি ঃ

সেবার আমি বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছি। অনার্স পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে দিন চার-

পাঁচ ছুটি পাওয়া গেল। কিসের ছুটি তা আমার এতকাল পরে মনে নেই। ভবতারণ ঘোষাল বলে আমার এক বন্ধু ছিল, ওর বাড়ী ছিল বেলঘরেতে। ভবতারণ ক্লাসে খুব পান খেতো, ক্লাসের বাইরে ঘন ঘন সিগারেট খেতো, অশ্লীল কথাবার্তা বলতো, লম্বা লম্বা কথা বলতো—চালবাজীর অন্ত ছিল না তার। আমার সঙ্গে খুব বনতো, কারণ আমি নিজেও চালবাজ ছিলাম। সে সব কথা ভাবলে হাসি পায়। তারপর যা বলছিলাম।

অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার দিন ভবতারণ আমায় টেনে নিয়ে গেল ওদের বাড়ীতে। যাবার সময় ট্রেনে গেলুম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হোল, ওদের বাড়ীটা প্রায় গঙ্গার ধারের কাছে। কিছুক্ষণ ওর বাড়ী থেকে হঠাৎ কি একটা বিষয়ে ঘোর তর্কবিতর্ক হোল ওর আর আমার মধ্যে। এমন চরমে উঠল সে তর্ক, যে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম! হায়রে সে সব দিন! এই রোদ, এই মেঘ—তখনকার জীবনে তাই ছিল স্বাভাবিক।

যা হোক, আমি ভয়ানক রেগে ওদের বাড়ি থেকে সেই সন্ধ্যাবেলায়ই বেরিয়ে পড়লুম। এমন জায়গায় ভদ্রলোকের থাকতে আছে!

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বেয়ে হন-হন করে হাঁটছি কলকাতা মুখো। দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। মাঝে মাঝে এক আধখানা মোটর দ্রুতবেগে চলেছে কলকাতার দিকে। সম্পূর্ণ নির্জন রাস্তা, একবার একটা মাতাল কুলি ছাড়া আর কোন লোকের দেখা পাইনি।

একটু বিশ্রাম দরকার, ডাইনে বাঁয়ে চাইতে চাইতে যাচ্ছি—কিছুদূর গিয়ে একটা বাগানবাড়ি দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাইরে থেকেই মনে হয়েছিল এ বাগানবাড়িতে কেউ থাকে না, আছে হয়তো একটা উড়ে মালী, তাকে দু'চারটে পয়সা দিলে বাগানের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করতে দেবে এখন। নিশ্চয় একটা পুকুর আছে বাগানে, নিশ্চয় তার ঘাট বাঁধানো। এমন গ্রীষ্মের দিনে জ্যোৎস্না রাতে পুকুরের বাঁধা ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার আনন্দ অনেকদিন পরে হয়তো কপালে জুটে যাবে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে মনে হল এ বাগানে কেউ বাস করে না। ঘন ঘন কেউ আসেও না। লাল কাঁকরের পথগুলোর ওপরে এক হাত লম্বা উলু ঘাস, ফুলের ক্ষেত আর আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। আরও একটু অগ্রসর হয়ে মনে হল, এ বাগানবাড়ি খুব বড়লোকের। অন্ততঃ যে সময় এ বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সে সময়ে মালিকের অবস্থা ছিল খুব ভাল। শৌখিন রুচির পরিচয় আছে এর প্রত্যেকটি গাছপালায়, প্রত্যেকটি ইঁটে, পাথরে। আগাছা ভরা ফুলের ক্ষেতের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে পাথরের অপ্সরী মূর্তি। দু'একটির মুখ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা নাক। অনেক

এমন অপ্সরী মূর্তি আছে বাগানের এদিকে ওদিকে। কোনটার পিঠ দেখা যাচ্ছে, কোনটার মুখ—ঝোপের আড়ালে আড়ালে।

একটু দূরে গিয়ে বাঁদিকে চওড়া পথ ধরলাম। দেখলাম, পুকুরে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। তবে যে ধরনের পুকুর আশা করেছিলাম, এ তা নয়। অনেক কালের পুরানো পুকুর, বাঁধাঘাট এক সময়ে ছিল, এখন তার মাঝামাঝি প্রকাণ্ড ফাটল ধরেছে, রাস্তায় দু'পাশে বট-অশ্বথের গাছ গজিয়েছে, সে ঘাটে নামাও যায় না সিঁড়ির সাহায্যে। এই রাত্রে তো সাপের ভয়ে সেদিকে যেতেই আমার সাহস হোল না।

ঘাটের থেকে কিছু দূরে একখানা বেঞ্চি পাতা। ক্লান্ত শরীরে বেঞ্চির ওপর শুতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। আমার তন্দ্রা যখন ছুটে গেল, তখন অনেক রাত। সামনের দিকে একটা অদ্ভুত সন্দেহ হোল আমার মনে।

আমার বেঞ্চিখানা থেকে কিছু দূরে যে অপ্সরীমূর্তি আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার দিকেই ঘুম ভেঙ্গে আমার চোখ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এতক্ষণ সে মূর্তিটা অন্য কি কাজ করছিল বা অন্যদিকে অন্যভাবে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে জাগতে দেখেই সেটা চট করে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পূর্ববৎ ভঙ্গীতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অবাক বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসলাম। চোখ মুছলাম ভাল করে। ঘুমের ঘোর! কিন্তু তা বলে তো মনে হোল না। আমি ঘুম ভেঙ্গে স্পষ্টই দেখেছি ও পুতুলটা কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে সামলে নিয়েছে।

সমস্ত শরীর যেন অবশ—ভারি। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নি। রাস্তা হাঁটবার ইচ্ছে নেই মোটে। আবার সেই বেঞ্চিখানাতেই শুয়ে পড়লাম। শোয়া মাত্র আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম আসবার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু একটা কৌতুহল আমার মনে বার বার উঁকি দিয়েছে। পুতুলটা কি করতে যাচ্ছিল? আমার ঘুম ভেঙ্গে দেখে কি একটা করতে করতে ও সামলে গেল।

অনেক রাতের ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ায় আমি গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন আমার ঘুম ভাঙলো, তখন চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। গাছপালার পিছনে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পশ্চিম দিক থেকে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়েছে ফুলের ক্ষেতে, আগাছার জঙ্গলে।

ঘুম ভেঙ্গে উঠেই আমার মনে হোল আমি প্রথম যখন এ বাগানে ঢুকি, তখন বাগানের যা ছিল এখন তা নেই। কোথায় কি যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ঘুমের ঘোর যতই ভাঙতে লাগলো, আমার মনে এ ধারণা ততই বদ্ধমূল হতে লাগলো। আগে যা ছিল, তা এখন যেন নেই। কি একটা বদলে গিয়েছে। অথচ কি

যে সেটা বুঝতেও পারছি নে। কি বদলে গেল কোথায়? হঠাৎ আমার চোখ পড়
সামনে। চোখ ভাল করে মুছলাম। পরিবর্তন ওখানেই হয়েছে যেন। আগে যা ছিল
তা এখন নেই।

কিন্তু কি পরিবর্তন? কি বদলে গেল? এক মিনিট কি দেড় মিনিট কেটে গেল
সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুতের স্রোতের মত বয়ে গিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ আড়
ও অবশ করে দিল, আসল—সত্যটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

ওই উচ্চ বেদিটার ওপর বসানো সে অপ্সরী পুতুলটা কোথায় গেল? বেদিট
খালি পড়ে আছে। পুতুলটা নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হোল না—সত্যি কি ওখানে অপ্সরী মূর্তিটা ছিল? অন
জায়গায় ছিল হয়তো। আমি হয়তো ভুল দেখেছিলাম। তা কি কখনো হয়
পাথরের অত বড় পুতুলটা গভীর রাত্রে কে নিয়ে যাবে?

আমারই ভুল।

কিন্তু এই অপ্সরী মূর্তিটিই অন্য দিকে চেয়ে কি-একটা করতে যাচ্ছিল, আমি ঘু
ভেঙে দেখেছিলাম। এই বেদিটার ওপরেই সেই পুতুলটা ছিল। না থাকলে আমি
এই বেঞ্চিতে শুয়ে দেখলাম কি করে? বেশ মনে আছে, এই বেঞ্চিতে শু
পুতুলটা প্রথম আমার চোখে পড়েছিল। আমার দিকে ওর পাশ ফেরানো ছিল। এ
ভেবেছিলাম আমার মনে আছে, এ ধরনের পুতুল কি ইটালি থেকে আসে, ন
এদেশে তৈরি হয়।

এত সব একেবারে ভুল হয়ে যাবে? কিন্তু তা যদি না হয়, তবে সে অপ্সরী
মূর্তিটা! চোরে নিয়ে গেল কি!

তাই যদি হয়, এতকাল তা বাগানে অরক্ষিত ভাবে পড়ে আছে। এতদিন কেউ
চুরি করলে না, আর আজ একজন জলজ্যান্ত মানুষ শুয়ে আছে সামনের বেঞ্চিতে
আজই এসে অতবড় ভারী একটা মূর্তি চুরি করে নিয়ে যাবে!

না, তাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

কেন জানি না আমার কেমন ভয় হলো। গা ছমছম করতে লাগলো। রাত আ
বেশি নেই। এ বাগানে আর শুয়ে থাকার দরকার নেই। আস্তে আস্তে কলকাত
মুখো হাঁটা দিই।

যেমন একথা মনে আসা, অমনি আমি বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লাম। পুকুর ঘাটে
নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে নেব বলে ঘাটের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় আবার
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাঁধাঘাটের ঠিক ওপরেই আমলকী তলায় যে স্ট্যাচুটা ছিল, সেটাই বা কই
সেটার হাত ভাঙা ছিল বলে আরও বেশি করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ও

তো তার শূন্য বেদিটা পড়ে আছে।

তখন মনে কেমন সন্দেহ হোল। বাগানের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। কত
পুতুল ছিল এখানে ওখানে, বন-ঝোপের মধ্যে, আড়ালে-আব্ডালে। সাদা পাথরের
পুতুলগুলো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছিল। এখনো তেমনি সাদা জ্যোৎস্না
বাগানের সর্বত্র, কিন্তু কই সে অপ্সরী পুতুলগুলো একটাও তো নেই? এক রাত্রে
কি বাগানের সব পুতুল চুরি হয়ে গেল? এই রাত্রিটার জন্যেই কি চোরেরা ওৎ
পেতে বসেছিল?

আশ্চর্য! বোকার মত চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে যা ভাবছিলাম বাগানের কোথায় কি পরিবর্তন ঘটেছে, সে
হোল এই পরিবর্তন। গোটা বাগানের এই মস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আমার
ঘুমের মধ্যে।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে আমি উঠে গিয়ে পুকুরের বাঁধা ঘাটের ওপরটাতে
দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পুকুরের জলের দিকে চাইতে আমার কেমন যেন হয়ে গেল।
সারা শরীর দোল দিয়ে উঠল ভয়ে, বিস্ময়ে।

বাগানের সব অপ্সরী পুতুলগুলো জলে নেমে সাঁতার দিচ্ছে! দিব্যি সাঁতার
দিচ্ছে, এপার-ওপার যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম
সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আড়ষ্ট ভাবেই পুতুলরূপে সাঁতার দিচ্ছে।

এইখানে আমাদের মধ্যে কে যেন বন্ধুকে প্রশ্ন করল,—আপনি স্পষ্ট দেখতে
পেলেন?

অধ্যাপক বন্ধুটি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—অনেক দিনের কথা
হয়ে গেল বটে, কিন্তু আমি আজও ভুলিনি সে রাত্রের কথা। সে দৃশ্য আজও আমি
দেখছি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে যেমন দেখি! বিশ্বাস করা ন-করা অবিশ্যি
আপনাদের ইচ্ছে। আমি কাউকে বলিনা বিশ্বাস করতে।

আমি বললাম—নিশ্চয়ই সিদ্ধি খেয়েছিলে বন্ধুর বাড়ি বেলঘরেতে? বা—

—আমি ওসব ছুঁতাম না তখন, এখনো তাই। বিশ্বাস করুন এ কথাটা—

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম। আমরা বললাম—তারপর? বন্ধু বললেন,—
মনে হল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিংবা আমার কোন শক্ত রোগ হয়েছে। যা
দেখেছি এসব কি? বেশ মনে আছে, পশ্চিম দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা বড় তাল
কি নারকোল গাছ ছিল। চাঁদ তখন গাছটার ঝাঁকড়া মাথার ঠিক আড়ালে। সে
ছবিটা বেশ মনে আছে আমার। আবার তখনি চোখ নামিয়ে পুকুরের দিকে
চাইলাম—সেখানে সেই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক দৃশ্য। সাদা সাদা বড়
মর্মরমূর্তিগুলো জীবন্তের মত জলকেলি করছে পুকুরের জলে।

আমার মাথা ঘুরে গেল যেন। নিজের ওপর কেমন একটা অবিশ্বাস হোল। সেখান থেকে মারলাম টেনে ছুট—একেবারে সোজা দৌড় দিয়ে ফটকের কাছে এসে যখন পৌঁচেছি, তখন আমার মনে হলো যেন—অবশ্যি হলফ করে বলতে পারবো না, সত্য কিনা—তবে আমার মনে হলো যেন অনেকগুলো মেয়ে খিলখিল করে একযোগে হেসে উঠলো। হাসির একটা ঢেউ যেন আমার কানে এসে পৌঁছলো। পরক্ষণেই আমি একেবারে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর এসে পড়লুম।

এবার আপনারা যে প্রশ্ন করবেন তা আমি জানি। সেখানে আর আমি গিয়েছিলাম কিনা?

পরদিন গিয়েছিলাম, একা নয়, তিনটি বন্ধুকে সঙ্গে করে। গিয়ে দেখলাম পুরানো ভাঙা বাগানবাড়ি, আগাছার জঙ্গলে ভরা ফুলের ক্ষেত। কতকগুলো হাত ভাঙা, নাক ভাঙা অপ্সরী পুতুল এদিক-ওদিক বন-জঙ্গলের আড়ালে পাথরের বেদির ওপরে দাঁড় করানো। কোথাও কোনদিকে অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই।

হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাকে ডাক দিলে। ঘাটের ওপরে আমলকী তলায় যে হাত ভাঙা পুতুলটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা মোটা বিছুটিলতা মাটি থেকে গজিয়ে উঠে সেটার দুখানা পা আষ্টেপৃষ্ঠ জড়িয়ে রেখেছে, অন্ততঃ এক বছরের পুরানো লতা। গত বর্ষায় এ বিছুটিলতা গজিয়ে উঠেছিল এমনই মনে হয়। লতাটার কোথাও ছেঁড়া নেই, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল।

অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি এ পুতুলটাও কাল জলে নেমেছিল। অন্ততঃ এ বেদিটা আমি কাল খালি দেখেছি। এই ঘাটের ধারেই ত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

বন্ধুরা বললেন—তাহলে বিছুটিলতাটা এমন থাকে কি করে? এ লতা জড়ানো তো একবছরের জড়ানো। রাতারাতি গাছটা গজায়নি।

ওদের যুক্তি অকাট্য।

কি উত্তর দেবো ওদের? আমার নিজেরই যখন ক্রমশঃ অবিশ্বাস হচ্ছে আমার নিজের ওপর।

বন্ধু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিচে প্রায় সদর দরজার কাছেই ছোট একটা ঘরে বিনোদ শোয়,—এবং একা শোয়, নিচে একদম ফাঁকা, তবু কিছুতে বিনোদের ভয় নেই। সেদিন তাদের পাশের বাড়ির ছাদে যে একটা জলজ্যান্ত খুন হল—এত হৈ চৈ, এত কান্নাকাটি—এবং তারই ঘরের পাশের গলি দিয়ে যে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা মোটরে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল—এতেও বিনোদের ঘুম ভাঙেনি। মা তাকে জাগাতে এসে বলেছিল,—পায়ের দিকেরও জানালাটা খুলে দাও, যা গরম আজ!

মা বললেন,—না তুই ওপরে চল, আমার কাছে শুবি।

বিনোদ পাশ ফিরে বললে,—কিসের তোমার ভয়! এত গোলমালে সেই খুনেটা তো আর ঘাপটি মেরে বসে থাকেনি, কখন দিব্যি সরে পড়েছে। সে আবার এখানে

ফিরে আসবে নাকি?

মা অবুঝের মত বললেন,—না তুই চল ওপরে। তুই এ ঘরে একা থাকিস বলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। চ্যাঁচালেও শুনতে পাবো না।

—চ্যাঁচানি তোমাদের শুনতে দেব নাকি ভেবেছ? যদি ব্যাটা আসে টুঁটি টিপে তার দম বন্ধ করে দেব না?

তার দিদি বললেন,—কিন্তু যাকে মেরেছে, সে যদি জানালা দিয়ে এসে মুখ বাড়ায়।

বিনোদ হেসে বললে,—তার মুখটা ভালো করে দেখার জন্যই তো পায়ের দিকের জানালাটা খুলে রাখতে বললাম। মুখ যদি বাড়ায়-ই, তবে নেহাৎ না হয় দুটো গল্প করা যাবে।

কিছুতেই বিনোদের ভয় নেই। তার স্কুলের বন্ধু কত ষড়যন্ত্র করে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, রাত্রিবেলায় জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মশারির দড়ি নাড়ে, ঢিল ছোঁড়ে, বিকট স্বরে হরিবোল দেয়, চাকরের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে দরজা খুলিয়ে ওর তক্তপোশের তলায় গিয়ে লুকোয়, গোঁ গোঁ করে, ঠুক-ঠাক দুম-দাম শব্দ করে, কিন্তু বিনোদের যেই ঘুম সেই ঘুম। শেষকালে আরশুলার উৎপাতে ওরাই বেরিয়ে আসতে পথ পায় না, গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, কিছুতেই তোকে ভয় দেখাতে পারলাম না বিনু।

বিনোদ হেসে বলে,—দুবেলা যে নিয়মিত ডন-বৈঠক করে, তার আবার ভয় কি? খেয়ে হজম করি, আর গভীর করে ঘুমোই—

শেষকালে অভয়কে বলতে হয়,—একা একা বাড়ি ফিরে যেতে আমারই এখন ভয় হচ্ছে।

বিছানা থেকে ঝট করে লাফিয়ে উঠে বিনোদ বলে,—চল তোকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে আসি।

রাত তখন প্রায় বারোটা। রাস্তা-ঘাট নিঝুম। বিনোদ তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। কে যেন গলা খাঁখরে ডাকলে, বিনু।

সাধারণত এত সহজে বিনোদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু সেই অস্ফুট কণ্ঠের ডাক শুনে চট করে তার ঘুম ভেঙে গেল। এমন অনেক কালা আছে, চেঁচিয়ে কথা বললে তার একবর্ণও যারা শুনতে পায় না, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যেও একটু নিন্দে করলে তেড়ে উঠে বলে,—কী বললে? ভাবো, আমি শুনতে পাইনি?—বিনোদেরও আজ সেই দশা। চুপিচুপি কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে বুঝি! কিন্তু সব সময়েই সে সাবধানী। জোরে ডাকলে সে তেমনি ঘুমোয় বটে, কিন্তু আস্তে ডাকলে জেগে উঠতে

জানে।

পাছে লোকটা সাড়া পেয়ে পালায়, বিনোদ তাই কোন কথা না বলে হাতে একটা লকলকে বেত নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল।

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অভয় হাসছে।

বিনোদ তো বললে,—তুই এই সময়? এত রাতে? কী দরকার?

অভয় ভিতরে ঢুকে বললে,—সাড়ে ন'টার শোতে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।

—বাড়ি যাসনি?

অভয় চাপা গলায় বললে,—বাড়ি আর ফিরবো না।

—কেন, কী হলো?

—বাবা-মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আরো রহস্য রোমাঞ্চের গল্প।

বিনোদ বিস্মিত হয়ে বললে—তাড়িয়ে দিয়েছেন? কেন কী অপরাধ?

—অপরাধ আবার কী! ও-বাড়ীতে আমার আর পোষাবে না। তারপর ঘরের চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—চল ভেতরে, বলছি।

ঘরের এক কোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, তার উপর বসে অভয় বললে,—তোর এখানে আজ আমি শোব। দিবি তো শুতে?

বিনোদ আলো জ্বালালো। বললে, স্বচ্ছন্দে!

আলোতে বিনোদ দেখল অভয় অদ্ভুত সেজেছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবীর ওপরে দামী শাল, পরণে শিল্কের ধুতি, পায়ে জরির জুতো, হাতের কব্জিতে সোনার রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা। সারা গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুর-ভুর করছে—পরিপাটি করে টেড়ি কাটানো। ডান হাতের আঙ্গুলে হীরের একটা আংটি।

বিনোদ বললে,—এত সেজে-গুজে বেরিয়েছিস! চেহারা দেখে তো ত্যাজ্যপুত্তুর হয়েছিস বলে মনে হয় না! অভয় হেসে বললে,—বাবা-মা বাড়ি থেকে বার করে দিলেন বটে কিন্তু যত-কিছু আমার জিনিস ছিল, সব সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন,—এই নাও তোমার জিনিস-পত্তর আর এ-মুখো হয়ো না বাছাধন! যেখানে খুশি বেরিয়ে পড়। সেই যে জাপানি বাক্সটায় রোজ দু'আনা চার আনা করে জমাতাম বিনু, সে বাক্স ভেঙে সহ খুচরো সিকি আদুলি আমার পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। বললেন—যেখানকার খুশি টিকিট কেটে ভেগে পড়, তোমার ঐ কালো মুখ আর দেখতে চাইনে।

বিনোদ বিছানায় বসে অভয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। পরে বললে,—কিন্তু কী তুই করেছিলি শুনি?

—বলছি। অভয় হাত বাড়িয়ে বললে—তোর ম্যাপের বইটা দে তো?

—কী করবি?

—একটা জায়গা খুঁজে বের করব। খুব দূরে—যেখানে মানুষ সহজে যেতে চায় না। ধর গ্রীন্‌ল্যাণ্ড—বছরে ছ'টা মাস সেখানে রাত, কঠিন বরফের দেশ—পড়িসনি ভূগোলে?

বিনোদ হেসে উঠলো। বললে,—কিন্তু পকেটে মাত্র তো কয়েকটা টাকার খুচরো দেখতে পাচ্ছি। ঐ নিয়ে তুই গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে যাবি?

টেবিলের উপর 'ঢ্যাটলাসটা' পড়েছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে অভয় পাতা ওলটাতে লাগলো। বললে,—এমন জায়গায় যাবো যেখানে যেতে ভাড়া লাগে না।

বিনোদ হেসে বললে,—আপাতত দেখছি সে তো আমার শোবার ঘর। তুই পাগলামি করিসনে অভয়। চল তোকে বাড়ি রেখে আসি। বাবা বকে থাকেন, এখন নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অভয় বললে, খুঁজুন গে! কিন্তু একবার যখন বেরিয়েছি, আর আমি ফিরছি না। জাহাজে করে আমি স্পেনে যাবো, সেখান থেকে কলম্বাসের মতো নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করতে বেরুব, জাহাজ না পাই, সঙ্গী না জোটে, তবু আমি পেছ-পা হব না। নে, আলোটা নেবা—আজ রাতটা তো এখানে ঘুমোই!

বিনোদ বললে,—আমার বিছানায় উঠে আয়। দু'জনে খুব ধরবে।

অভয় বললে,—না, না, আমি চিৎ হয়ে আরাম করে শুতে পারবো না, আমার মেরুদণ্ডে খুব চোট লেগেছে। এই বেশ ঘুমতে পারবো এখানে। একটা বালিশ এগিয়ে দে দেখি। বলে সে নিজেই আলো নিবিয়ে একটা বালিশ টেনে পিঠের তলায় রেখে আবার বললে,—নে, তুই এখন শুয়ে পড়, ঢের রাত হয়েছে। কাল ভোরে উঠে চা খেতে খেতে না হয় কর্তব্য ঠিক করা যাবে।

বিনোদ বললে,—এমনি তোর ঘুম আসবে? হতভাগা, উঠে আয় ওপরে। অন্ধকারে অভয় খিল-খিল করে হেসে উঠলো, বললে,—পাগল! ঘুম আসবে নাকী! ইস্কুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পর্যন্ত ঘুমুই, আর এ তো দিব্যি মোলায়েম একটি চেয়ার। কলম্বাসের মতো যে দেশ জয়ে বেরুবে, তাকে খালি গায়ে শীতের রাতের শুকনো কাঠের ওপর শুলেও বেমানান দেখাবে না। থাম, তোকে আর বকাবো না, ঘুমো।

বিনোদের একটুতেই ঘুম আসে, কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকেও কিছুতেই আজ তার ঘুম এলো না। অভয়ের সঙ্গেই আরো খানিকক্ষণ গল্প করা যাক। চোখ না মেলেই ডাকলে,—অভয়।

অভয়ের কোন সাড়া নেই।

মেরুদণ্ডে চোট পেয়েও ঘুমের তার এক বিন্দু ব্যাঘাত হয়নি।

আবার ডাকলে,—অভয়!

সেই অন্ধকার কালো রাত্রি, আর স্থূল নিঃশব্দতা!

বিনোদ লাফিয়ে উঠে বসলো। ঘরে কেউ নেই। ম্যাপের খাতাটা মেঝের ওপরে ওলটানো, চেয়ারের উপরে বালিশটা কুঁচকে পড়ে আছে। দরজাটা খোলা।

বিনোদ ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এলো—সদর দরজাটাও দু'ফাঁক। অভয় আবার কখন দরজা খুলে বাইরে গেছে।

দুষ্টু ছেলে, তাকে ভয় দেখাবার নতুন ফন্দি করেছে বুঝি! কিন্তু বিনোদ দমবার পাত্র নয়। গরম কোটটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় নামলো। কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই, নিজের দ্রুত ও সশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়া একটা সামান্য শব্দও সে কোথাও শুনতে পাচ্ছে না। আরো রহস্য রোমাঞ্চের গল্প।

আবার সে ডাকলে,—অভয়।

মুহূর্তমধ্যে তার খুব কাছে খিল-খিল করে কে জোরে হেসে উঠলো এবং সেই খণ্ড-খণ্ড হাসির ঢেউ নিমিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো অভয়।

বিনোদ বললে,—কোথায় গেছিলি?

—বা, এইখানে তোর পাশেই তো দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে ভীষণ গরম—অত গরমে কখনো ঘুম আসে?

—গরম কি রে পাগলা? এই কনকনে শীতের রাতে তোর গরম লাগছে?

অভয় হেসে বললে,—গরম বলে গরম! চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে। টিকতে পাচ্ছি না। চল রাস্তায় একটু হাঁটি!

বিনোদ ভাবলে মন্দ নয়, বেড়াতে-বেড়াতেগল্পের ফাঁকে অভয়কে তাদের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পূর্ণবাবুকে ডেকে তাঁরি ছেলেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ বললে,—চল, কিন্তু সদর দরজাটা যে খোলা থাকবে। দাঁড়া, ভজুয়াকে বলে আসি বন্ধ করে দিতে। থাকগে, ডাকতে গেলেই আবার মা টের পাবে। ভেজিয়েই আসি দরজাটা। খানিক বাদেই তো ফিরে আসছি, কী বল?

অভয় বললে,—তোর ভাবনা কী! তোকে তোর বাপ-মা তাড়িয়ে দেয়নি। আমার জন্যে না হয় দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

দু'বন্ধু বড় রাস্তায় এসে পড়লো। কারুর মুখে কোন কথা নেই। বিনোদ ভয় পেয়ে বললে,—এবার ফের।

অভয় হেসে বললে,—কোথায়? এই তো বেশ যাচ্ছি।

খানিক দূরে কয়েকজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। একজনকে বিনোদের মনে হল খানিকটা যেন পূর্ণবাবুর মতো দেখতে। লোকজন নিয়ে ছেলের

খোঁজে বেরিয়েছেন নিশ্চয়। অভয়কে এবার স্বচ্ছন্দে ধরিয়ে দেওয়া যাবে। গায়ের জোরে বিনোদের সঙ্গে সে কখনই এঁটে উঠবে না।

লোকগুলো না বেঁকে সামনে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বিনোদ ভরসা পেল। অভয়কে বুঝতে না দিয়ে বললে,—হ্যাঁ, আরো একটু বেড়াই আয়।

অভয় বললে,—কিন্তু সে পকেট হাতড়ে কতকগুলো পয়সা বার করলে, বললে,—গুনে নে শিগগিরি। বাবা, মেজদা, ন'কাকা, রামখুড়ো—সব এসে পড়লেন যে। দেরি নয়, শিগগির তুলে নে পয়সাগুলো আহাম্মক—বলে পয়সা-ভরা হাত মেলে অভয় কাঁপতে লাগল। এখনি সে যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে।

বিনোদ এরি জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গায়ের জোরে তার সঙ্গে তাদের স্কুলের ছাত্র দূরের কথা, মাস্টাররাই পেরে ওঠেন না। সে তাড়াতাড়ি অভয়কে দুই শক্ত হাতে জাপটে ধরে বললে—কিন্তু কোথায় তুই যাবি? তোকে ধরিয়ে দেব না আমি?

কিন্তু কোথায় অভয়? বিনোদ দু'হাত দিয়ে নিজের বুকটা জোরে চেপে ধরে নিজের সঙ্গে অকারণ ধস্তাধস্তি করছে।

অভয় কোথায় নেই। কখন টুপ করে সরে পড়েছে। নিশ্চয়ই পাশের গলি দিয়ে। এখনো ছুটলে তাকে ধরা যায়। দেখতে দেখতে পূর্ণবাবু দলবল নিয়ে কাছে এসে পড়লেন। বিনোদ তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

পূর্ণবাবুকে দেখে তার বুকে বল এল। সে এগিয়ে গিয়ে বললে,—আপনারা অভয়কে খুঁজতে বেরিয়েছেন তো?

পূর্ণবাবু তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

বিনোদ বললে,—সে এই গলি দিয়ে পালিয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে। খুব জোরে ছুটলে এখনো তাকে ধরতে পারবেন। আমি তাকে জাপটে ধরেও রাখতে পারলুম না। খুব যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখেছে যাহোক, আপনারা কেউ ও দিক দিয়ে ঘুরে যান,—আমি এ-দিকে যাচ্ছি। ঐখানে কোথায় লুকিয়ে আছে নিশ্চয়।

পূর্ণবাবু হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে শিশুর মত ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন,—কৈ আমার অভয়? ঐ দেখ। বলে চার জনের কাঁধে উত্তোলিত একটা খাটিয়ার পানে ইঙ্গিত করলেন।

বিনোদ কিছু বুঝতে পারল না। খাটিয়ার উপরে লম্বালম্বি কি একটা জিনিস আগাগোড়া ঢাকা।

কে একজন বললে,—আজ বিকেলে মোটর চাপা পড়ে সে মারা গেছে—

বিনোদ সমস্ত গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—মিথ্যা কথা। সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে, দুজনে বেড়াতে বেরোলাম—কেন আমায় মিছামিছি ভয় দেখাচ্ছেন। সে বললে,—আপনারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে স্পেনে যাচ্ছে। সেখান থেকে জাহাজ করে আমেরিকায়—কত কথা বললে, আমাকে পয়সা দিতে

চাইলে—গরদের পাঞ্জাবির উপরে মেরুনের শাল—আসুন না আমার সঙ্গে এই গলিতে। তাকে বার করে না দেই তো কী বলেছি—

পূর্ণবাবুরা এগোতে লাগলেন। বিনোদ হতভম্বের মত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে এখনো বুঝতে পাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি? না তো। রসা রোড, রাস্তার এক পারে ইলেকট্রিক ও অন্য পারে গ্যাস জ্বলছে—লাঠি হাতে ঐ একটা কনেস্টবল, দূরে ঐ পূর্ণবাবুদের দল চলেছে শ্মশানে।

পূর্ণবাবু হেঁকে বললেন,—তুমি এবার বাড়ি যাও বিনু।

বিনোদ তবু নড়ে না। ভয়ে সে জমে গেছে। তার কেবলি মনে হচ্ছে পূর্ণবাবুরা কালীঘাটের দিকে ঘুরে গেলেই পাশের গলি থেকে অভয় বেরিয়ে আসবে। অভয় আবার বেরিয়ে আসবে ভাবতে বিনোদ হঠাৎ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু আবার তেমনি সেই খিল-খিল হাসি। একেবারে তার কাছে—কিন্তু অভয় কোথাও নেই। একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে মাত্র।

ট্যাক্সিটা বিনোদ দাঁড় করালো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সে চলে এসেছিলো, এখন পায়ে হেঁটে কিছুতেই যে যেতে পারবে না। পেছন থেকে অভয় এসে তার সঙ্গ নেবে, তার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে চাইবে, সাত আনা সে ধরে ছিলো, এখনো সে তোলেনি।

ট্যাক্সি চেপে বিনোদ বললে, চালাও এলেনবি রোড।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই মনে হল ট্যাক্সিটার আগে-আগে অভয়ও ছুটে চলেছে। কিছুতেই সে বিনোদকে ছেড়ে দেবে না। বিনোদ চেঁচিয়ে উঠলো,—খুব জোরে চালাও সাঁয়জি।

শিখ ড্রাইভার গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়েছে! অভয় ট্যাক্সির সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না। হাত তুলে স্পষ্ট সে বললে,—আস্তে।

কিন্তু ট্যাক্সি থামাল না, তার গায়ের উপর হুড়মুড় করে পড়ল। বেচারা অভয় দলা পাকিয়ে চাকার তলায় চেপটে গেল। বিনোদ চোখ বন্ধ করে কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠল,—গেল, গেল বাঁধো শিগগির বলছি।

ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে বললে,—ক্যা হুয়া?

বিনোদ ঝুঁকে পড়ে গাড়ির তলাটা দেখতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও একবিন্দু রক্ত নেই। অভয় তাড়াতাড়ি উঠে এসে খিল খিল করে হেসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে,—ভয় নেই, আমার কিছু হয়নি। খালি এই মেরুদণ্ডটায় সামান্য একটু চোট লেগেছে, খুব হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলি যা হোক। আচ্ছা, গুডনাইট।

আর তাকে দেখা গেল না।
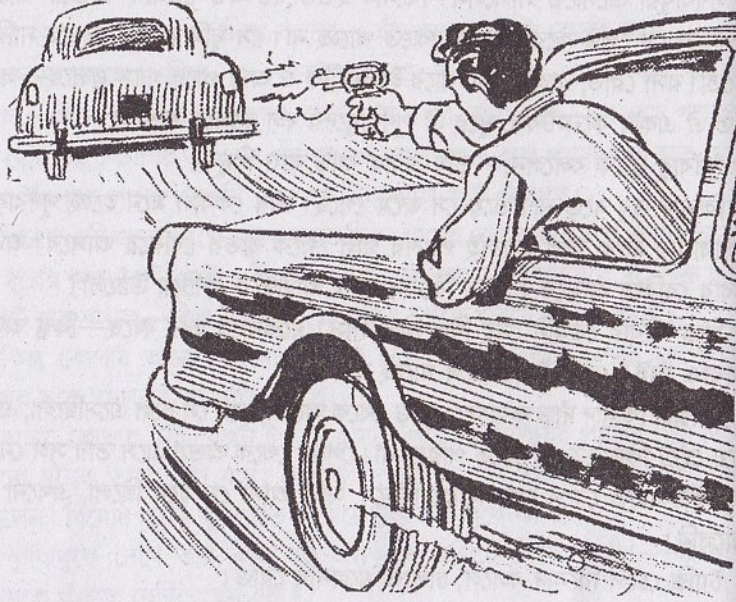
শেয়াল-দেবতা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

'টেলিফোনটা কে ধরেছিল ফেলুদা?'

প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম যে বোকামি করেছি, কারণ যোগব্যায়াম করার সময় ফেলুদা কথা বলে না। এক্সারসাইজ ছেড়ে ফেলুদা এ-জিনিসটা সবে মাস ছয়েক হল ধরেছে। সকালে আধঘণ্টা ধরে নানারকম 'আসন' করে সে। এমনকী, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে শূন্যে তুলে শীর্ষাসন পর্যন্ত। এটা স্বীকার করতেই হবে যে একমাসে ফেলুদার শরীর আরো 'ফিট' হয়েছে বলে মনে হয়; কাজেই বলতে হয় যে যোগাসনে রীতিমত উপকার হচ্ছে।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই পিছন দিকে টেবিলের উপর রাখা ঘড়ির টাইমটা দেখে নিলাম। ঠিক সাড়ে সাত মিনিট পরে আসন শেষ করে ফেলুদা জবাব দিল—

'তুই চিনবি না।'

এতক্ষণ পরে এরকম একটা উত্তর পেয়ে ভারি রাগ হল। চিনি না তো অনেককেই, কিন্তু নামটা বলতে দোষ কী? আর না চিনলেও, চিনিয়ে দেওয়া যায় না কি? একটু গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি চেনো?'

ফেলুদা জলে-ভেজানো ছোলা খেতে খেতে বলল, 'আগে চিনতাম না। এখন চিনি।'

কয়েকদিন হল আমার পুজোর ছুটি হয়ে গেছে। বাবা তিনদিন হল জামশেদপুরে গেছেন কাজে। বাড়িতে এখন আমি, ফেলুদা আর মা। এবার আমরা পুজোয় বাইরে যাব না। তাতে আমার বিশেষ আফসোস নেই, কারণ পুজোয় কলকাতাটা ভালই লাগে, বিশেষ করে যদি ফেলুদা সঙ্গে থাকে। ওর আজকাল শখের গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নামটাম হয়েছে, কাজেই মাঝে মাঝে যে রহস্য সমাধানের জন্য ওর ডাক পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী? এর আগে প্রত্যেকটা রহস্যের ব্যাপারেই আমি ফেলুদার সঙ্গে ছিলাম। ভয় হয় ওর নাম বেশি হওয়াতে হঠাৎ যদি ও একদিন বলে বসে, 'নাঃ, তোকে আর এবার সঙ্গে নেব না?' কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা ঘটেনি। আমার বিশ্বাস ওর আমাকে সঙ্গে রাখার একটা কারণ আছে। হয়তো সঙ্গে একটা অল্পবয়স্ক ছেলেকে দেখে অনেকেই ওকে গোয়েন্দা বলে ভাবতে পারে না। সেটা তো একটা মস্ত সুবিধে। গোয়েন্দারা যতই আত্মগোপন করে থাকতে পারে ততই তাদের লাভ।

'ফোনটা কে করল জানতে খুব ইচ্ছে করছে বোধহয়?'

এটা ফেলুদার একটা কায়দা। ও যখনই বুঝতে পারে আমার কোনও একটা জিনিস জানবার খুব আগ্রহ, তখনই সেটা চট করে না-বলে আগে একটা সাসপেন্স তৈরি করে। সেটা আমি জানি বলেই বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম, 'ফোনটার সঙ্গে যদি কোনও রহস্যের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে তা হলে জানতে ইচ্ছে করে বৈকি।'

ফেলুদা গেঞ্জির উপর তার সবুজ ডোরাকাটা শার্টটা চাপিয়ে নিয়ে বলল, 'লোকটার নাম নীলমণি সান্যাল। রোল্যান্ড রোডে থাকে। বিশেষ জরুরি দরকারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

'কী দরকার বলেনি?'

'না। সেটা ফোনে বলতে চায় না। তবে গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।'

'কখন যেতে হবে?'

'ট্যাক্সিতে করে যেতে মিনিট দশেক লাগবে। ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সুতরাং আর দু'মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ট্যাক্সি করে নীলমণি সান্যালের বাড়ি যেতে যেতে ফেলুদাকে বললাম, 'অনেক

রকম তো দুষ্টু লোক থাকে; ধরো নীলমণিবাবুর যদি কোনরকম বিপদ না হয়ে থাকে—তিনি যদি শুধু তোমাকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই ডেকে থাকেন।'

ফেলুদা রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, 'সে রিস্ক তো থাকেই। তবে সেরকম লোক বাড়িতে ডেকে নিয়ে প্যাঁচে ফেলবে না, কারণ সেটা তাদের পক্ষেও রিস্কি হয়ে যাবে। সে সব কাজের জন্য অল্প টাকায় ভাড়াটে গুণ্ডার কোনও অভাব নেই।'

একটা কথা বলা হয়নি—ফেলুদা গত বছর অল ইন্ডিয়া রাইফল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। মাত্র তিনমাস বন্দুক শিখেই ওর হাতে যা টিপ হয়েছিল সে একেবারে থ মেরে যাবার মতো। ফেলুদার এখন বন্দুক রিভলভার দুই-ই আছে, তবে বইয়ের ডিটেকটিভের মতো ও সারাক্ষণ রিভলভার নিয়ে ঘোরে না। সত্যি বলতে কী, এখন পর্যন্ত ফেলুদাকে ও দুটোর একটাও ব্যবহার করতে হয়নি; তবে কোনওদিন যে হবে না সে কথা কী করে বলব?

ট্যাক্সি যখন ম্যাডক স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেছে, তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রলোক কী করেন সেটা জানো?'

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক পান খান, বোধহয় কানে একটু কম শোনেন, "ইয়ে" শব্দটা একটু বেশি ব্যবহার করেন, আর অল্প সর্দিতে ভুগছেন—এ ছাড়া আর কিছু জানি না।'

এর পরে আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

নীলমণি সান্যালের বাড়িতে পৌঁছতে ট্যাক্সিভাড়া উঠল একটাকা সত্তর পয়সা। একটা দু'টাকার নোট বার করে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দিয়ে ফেলুদা হাতের একটা কায়দার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে তার চেঞ্জ ফেরত চাই না। গাড়ি থেকে নেমে পোর্টিকোর তলা দিয়ে গিয়ে সামনের দরজায় পৌঁছে কলিং বেল টেপা হল।

দোতলা বাড়ি, তবে খুব যে বড় তাও নয়, আর খু ব পুরনোও নয়। সামনের দিকে একটা বাগানও আছে, তবে সেটা খুব বাহারের কিছু নয়।

একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে ফেলুদার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বসতে বলল। ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে বেশ তাক লেগে গেল। সোফা, টেবিল, ফুলদানি, ছবি, কাচের আলমারিতে সাজানো নানারকম সুন্দর পুরনো জিনিস-টিনিস মিলিয়ে বেশ একটা জমকালো ভাব। মনে হয় অনেক খরচ করে মাথা খাটিয়ে এসব জিনিস কিনে সাজানো হয়েছে।

ফেলুদা নিজেই উঠে পাখার রেগুলেটারটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। গায়ে স্লিপিং সুটের পায়জামার উপর একপাশে বোতামওয়ালা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, আর দু'হাতের আঙুলে অনেকগুলো

আংটি। হাইট মাঝারি, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় চুল বেশি নেই, রং মোটামুটি ফর্সা, আর চোখ দুটো ঢুলুঢুলু—দেখলে মনে হয় এই বুঝি ঘুম থেকে উঠে এলেন। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয়।

'আপনারই নাম প্রদোষ মিত্তির?' জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি যে এত ইয়াং সেটা জানা ছিল না।'

ফেলুদা একটু হেঁ হেঁ করে আমার দিকে দেখিয়ে বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি চাইলে আমাদের কথাবার্তার সময় আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন, 'কেন, থাকুন না—কোনও ক্ষতি নেই।' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ইয়ে—আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা বা কফি?'

'নাঃ। এই সবে চা খেয়ে বেরিয়েছি।'

'বেশ, তা হলে আর সময় নষ্ট না করে কেন ডেকেছি সেইটে বলি। তবে তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন আমি একজন সৌখিন লোক। পয়সাকড়িও কিছু আছে সেটাও নিশ্চয়ই অনুমান করছেন। তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না, ব্যবসাও করি না, বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সাও পাইনি।'

নীলমণিবাবু রহস্য করার ভাব করে চুপ করলেন।

ফেলুদা বলল, 'তা হলে কি লটারি?'

'আজ্ঞে?'

'বলছিলাম—তা হলে কি কখনও লটারিটটারি জিতেছিলেন?'

'এগজ্যাক্টলি!' ভদ্রলোক প্রায় ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এগারো বছর আগে রেঞ্জার্স লটারি জিতে এক ধাক্কায় পেয়ে যাই প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তারপর সেই টাকা দিয়ে, খানিকটা বুদ্ধি আর খানিকটা ভাগ্যের জোরে, বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি। বাড়িটা তৈরি করি বছর আষ্টেক আগে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরকম অকেজোভাবে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কী করে; কিন্তু আসলে একটা কাজ আমার কাছে—একটাই কাজ—সেটা হল, অকশান থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো!'

ভদ্রলোক তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে চারিদিকের সাজানো জিনিসপত্রগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—

'যে ঘটনাটা ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এইসব আর্টিস্টিক জিনিসপত্তরের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো থাকতেও

পারে। এই যে—'

নীলমণিবাবু তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাগজগুলো দেখে নিলাম। তিনটে কাগজ, তার প্রত্যেকটাতেই লেখার বদলে লাইন করে ছোট ছোট ছবি আঁকা। সেই ছবির মধ্যে কিছু কিছু বেশ বোঝা যায়—যেমন, প্যাঁচা, চোখ, সাপ, সূর্য—এইসব। আমার কেমন যেন ব্যাপারটাকে দেখা দেখা বলে মনে হচ্ছিল, এমন সময় ফেলুদা বলল, 'এসব তো হিয়েরোগ্লিফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে?'

ফেলুদা বলল, 'প্রাচীনকালে ঈজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বার করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ। তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কি না সন্দেহ।'

ভদ্রলোক যেন একটু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তা হলে? যে জিনিস দু'দিন অন্তর অন্তর ডাকে আমার নামে আসছে, তার মানে না করতে পারলে তো ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে! ধরুন যদি এগুলো সাংকেতিক হুমকি হয়—কেউ হয়তো আমাকে খুন করতে চাইছে, আর তার আগে আমাকে শাসাচ্ছে।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার যে-সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে—তার মধ্যে ঈজিপ্সিয়ান কিছু আছে?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'দেখুন, আমার কোন জিনিস কোথাকার, সেটা আমি নিজেই ঠিক ভালভাবে জানি না। আমি কিনি, কারণ আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন সৌখিন লোককে এসব জিনিস কিনতে দেখেছি, তাই।'

'কিন্তু আপনার এত জিনিসের মধ্যে একটিকেও তো খেলো বলে মনে হচ্ছে না। যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে রীতিমতো সমঝদার লোক বলে মনে করবে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ওটা কী জানেন? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভাল হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে, তখন আমি সেরা জিনিসটা কিনব না কেন! অনেক ভারী ভারী খদ্দেরের উপরে টেক্কা দিয়ে নীলাম থেকে এসব কিনেছি মশাই, কাজেই ভাল জিনিস আমার কাছে থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়।'

'কিন্তু মিশরের জিনিস কিছু আছে কিনা জানেন না?'

নীলমণিবাবু সোফা ছেড়ে উঠে একটা কাচের আলমারির দিকে গিয়ে তার উপরের তাক থেকে একটা বিঘতখানেক লম্বা মূর্তি নামিয়ে এনে সেটা ফেলুদার হাতে দিলেন। সবুজ পাথরের মূর্তি, তার গায়ে আবার নানা রঙের ঝলমলে পাথর বসানো।

এক জায়গায় যেন সোনাও রয়েছে। তবে আশ্চর্য এই যে, মূর্তিটির শরীর মানুষের মতো হলেও, তার মুখটা শেয়ালের মতো। 'এটা দিন দশেক আগে কিনেছি অ্যারাটুন ব্রাদার্সের একটা নীলাম থেকে। এটা বোধহয়—'

ফেলুদা মূর্তিটায় একবার চোখ বুলিয়েই বলল, 'আনুবিস।'

'আনুবিস? সে আবার কী?'

ফেলুদা মূর্তিটা সাবধানে নেড়েচেড়ে নীলমণিবাবুর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'আনুবিস ছিল প্রাচীন মিশরের গড অফ দ্য ডেড। মৃত আত্মাদের দেবতা।...চমৎকার জিনিস পেয়েছেন এটা।'

'কিন্তু—' ভদ্রলোকের গলায় ভয়ের সুর '—এই মূর্তি আর এইসব চিঠির মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা বলা মুশকিল। চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে শুরু করেছেন?'

'গত সোমবার থেকে।'

'অর্থাৎ মূর্তিটা কেনার ঠিক পর থেকেই?'

'হ্যাঁ।'

'খামগুলো আছে?'

'না, ফেলে দিয়েছি। রেখে দেওয়া হয়তো উচিত ছিল—তবে খুবই সাধারণ খাম, সাধারণ টাইপরাইটারে ঠিকানা লেখা। পোস্টঅফিস এলগিন রোড।'

'ঠিক আছে।' ফেলুদা উঠে পড়ল। 'আপাতত কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। শুধু সেফ সাইডে থাকার জন্য মূর্তিটা ওই আলমারিতে না রেখে আপনার হাতের কাছে রাখবেন। সম্প্রতি একজনদের বাড়ি থেকে এ ধরনের কিছু জিনিস চুরি করেছিল।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। একজন সিন্ধি ভদ্রলোক। যদ্দুর জানি এখনও সে চোর ধরা পড়েনি।'

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ল্যান্ডিং-এ এলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে এমন কারুর কথা মনে পড়ছে?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'কেউ না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'আর শত্রু?'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ধনীর তো শত্রু সব সময়ই থাকে তবে তারা তো কেউ আর শত্রু বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না! সামনা-সামনি দেখা হলে সকলেই খাতির করে কথা বলে।'

'আপনি মূর্তিটা তো নীলামে কিনেছিলেন বললেন।'

'হ্যাঁ। অ্যারাটুন ব্রাদার্সের নীলামে।'

'ওটার ওপর আর কারও লোভ ছিল না?'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে হাত কচলাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কথাটা জিজ্ঞেস করে আমার ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোকের অনেকবার নীলামে ঠোকাঠুকি হয়েছে—সেদিনও হয়েছিল।'

'তিনি কে?'

'প্রতুল দত্ত।'

'কী করেন?'

'বোধহয় উকিল ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। সেদিন ওর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেষারেষি চলে। তারপর আমি বারো হাজার বলার পর উনি থেমে যান। মনে আছে, নীলামের পর আমি যখন বাইরে এসে গাড়িতে উঠছি, তখন হঠাৎ ওর সঙ্গে একবার চোখাচুখি হয়ে পড়ে। ওর চোখের চাহনিটা মোটেই ভাল লাগেনি।'

'আই সি।'

আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ি থেকে বেরোলাম। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'কী বলছেন মশাই? আমার মতো একা মানুষ বোধহয় কলকাতায় দুটি নেই। ড্রাইভার, মালি, দুটি পুরনো বিশ্বস্ত চাকর, ও আমি—ব্যস!'

ফেলুদার পরের প্রশ্নটা একেবারেই এক্সপেক্ট করিনি—

'বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে?'

ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্য একটু অবাক হয়ে তারপর হো হো করে হেসে বললেন, 'দেখেছেন—ভুলেই গেছি! আসলে আমি লোক বলতে বয়স্ক লোকের কথাই ভাবছিলাম! আজ দিন দশেক হল আমার ভাগনে ঝন্টু এখানে এসে রয়েছে। ওর বাবা ব্যবসা করেন। এই সেদিন সস্ত্রীক জাপানে গেছে। ঝন্টুকে রেখে গেছে আমার জিম্মায়। বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বাচ্চার কথা মনে হল কেন?'

ফেলুদা বলল, 'বৈঠকখানার একটা আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উঁকি মারছিল। সেইটে দেখেই....'

নীলমণিবাবুর চাকর একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, সেটা নুড়ি ফেলা পথের ওপর দিয়ে কড় কড় শব্দ করে পোর্টিকোর তলায় ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেলুদা ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলল, 'সন্দেহজনক আরো কিছু যদি ঘটে তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে বললাম, 'শেয়াল-দেবতার চেহারাটা দেখে কীরকম ভয় করে—তাই না?'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের ধড়ে অন্য যে-কোনও জিনিসের মাথা জুড়ে দিলেই ভয় করে—শুধু শেয়াল কেন?'

আমি বললাম, 'পুরনো ঈজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে রাখা তো বেশ বিপজ্জনক।'

'কে বলল?'

'বাঃ—তুমিই তো বলেছিলে।'

'মোটেই না। আমি বলেছিলাম, যেসব প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ঈজিপ্সিয়ান মূর্তি টুর্তি বার করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই যে একজন সাহেব—সে তো মরেই গিয়েছিল—কী নাম না?'

'লর্ড কারনারভন।'

'আর তার কুকুর....?'

'কুকুর তার সঙ্গে ছিল না। কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ঈজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর খুঁড়ে বার করার কিছুদিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে মারা যান। তারপর খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, যে সময় সাহেব মারা যান, ঠিক সেই একই সময়ে বিনা অসুখে রহস্যজনকভাবে বেশ কয়েকহাজার মাইল দূরে তার কুকুরটিও মারা যায়।'

প্রাচীন ঈজিপ্টের কোনও জিনিস দেখলেই আমার ফেলুদার কাছে শোনা এই অদ্ভুত ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। শেয়াল-দেবতা আনুবিসের মূর্তিটাও নিশ্চয়ই কোন রাজারাজড়ার আমলের ঈজিপ্সিয়ান সম্রাটের কবর থেকে এসেছে। নীলমণিবাবু কি এসব কথা জানেন না? সাধ করে বিপদ ডেকে আনার মধ্যে কী মজা থাকতে পারে তা তো আমি ভেবেই পাই না।

পরদিন ভোর পৌনে ছ'টায় আমাদের বারান্দায় খবরের কাগজের বান্ডিলটা পড়ার

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলছি, কিন্তু উলটোদিকের কথা শোনার আগেই ফেলুদা সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। পর পর তিনবার 'হুঁ', দু'বার 'ও', আর একবার 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলেই ফোনটা ধপ করে রেখে দিয়ে ও ধরা গলায় বলল, 'আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।'

সকাল বেলায় ট্রাফিক কম বলে নীলমণি সান্যালের বাড়ি পৌঁছাতে লাগল ঠিক সাত মিনিট। ট্যাক্সি থেকে নেমেই দেখি নীলমণিবাবু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা ভাব করে বাড়ির বাইরেই আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গেছি মশাই। এরকম হরিব্‌ল অভিজ্ঞতা আমার কক্ষণও হয়নি।'

আমরা ততক্ষণে বৈঠকখানায় ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাদের আগেই সোফায় বসে প্রথমে তাঁর হাতের কব্জিগুলো দেখালেন। দেখলাম, লোকে যেখানে ঘড়ি পরে, তার ঠিক নীচ দিয়ে দুই হাতে দড়ির দাগ বসে গিয়ে হাতটা লাল হয়ে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

ভদ্রলোক দম নিয়ে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনার কথা মতো গতকাল মূর্তিটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একেবারে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেখানে ছিল সেখানেই রাখলে আর কিছু না হোক, অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হত না। যাক গে—মূর্তিটা তো মাথার তলায় নিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছি, এমন সময়—রাত কত জানি না—একটা বিশ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কে জানি আমার মুখটা আষ্টেপৃষ্ঠে গামছা দিয়ে বাঁধছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার পথ বন্ধ দেখে হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, আর তখনই বুঝতে পারলুম যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখতে দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে। ব্যস—তারপর বালিশের তলা থেকে মূর্তি নিতে আর কী?'

ভদ্রলোক দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক বোধহয় হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলুম। সমস্ত শরীরে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেসল। সকালে চাকর নন্দলাল চা নিয়ে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বাঁধন খুলে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ফোন করি।'

ফেলুদার দেখলাম চোখ-মুখের ভাব বদলে গেছে। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার ঘরটা একবার দেখব, আর প্রয়োজন হলে আপনার বাড়ির কিছু ছবি তুলব।' ক্যামেরাটাও ফেলুদার নতুন বাতিকের মধ্যে একটা।

নীলমণিবাবু দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই ফেলুদা বলল, 'এ কী—জানলার শিক নেই?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'আর বলবেন না—বিলিতি কায়দার বাড়ি তো! আর আমি আবার জানলা বন্ধ করে শুতে পারি না।'

ফেলুদা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখে বলল, 'খুব সহজ—পাইপ রয়েছে, কার্নিশ রয়েছে। একটু জোয়ান লোক হলেই অনায়াসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে।'

তারপর ফেলুদা ঘরের চারিদিকে খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছবি-টবি তুলে বলল, 'বাড়ির অন্য অংশও এবার ঘুরে দেখতে চাই।'

নীলমণিবাবু প্রথমে দোতলা দেখালেন। পাশের ঘরটাতে দেখলাম একটা খাটে বারো-তেরো বছর বয়সের একটা ছেলে গলা অবধি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখগুলো বড় বড়, আর দেখলেই মনে হয়, তার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। বুঝলাম, এই হল ঝন্টু। নীলমণিবাবু বললেন, 'কালই আবার ডাক্তার বোস ঝন্টুকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন। তাই ও রাত্রে কিছুই শুনতে পায়নি।'

দোতলার আরো দুটো ঘর দেখে, একতলার ঘরগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে এলাম। নীলমণিবাবুর ঘরের জানলার ঠিক নীচেই দেখলাম কয়েকটা ফুলের টবে পামজাতীয় গাছ লাগানো। ফেলুদা টবগুলোর ভিতর কিছু আছে কি না দেখতে লাগল। প্রথম দুটোয় কিছু পেল না। তৃতীয়টার পাতার ভিতর হাতড়ে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো পেল। সেটার ঢাকনা খুলে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'এ বাড়িতে কারুর নস্যির বাতিক আছে?'

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে না বললেন। ফেলুদা কৌটোটা নিজের প্যান্টের পকেটে রেখে দিল।

এবার নীলমণিবাবু যেন বেশ মরিয়া হয়েই বললেন, 'মিস্টার মিত্তির—আর কিছু না—মূর্তি একটা গেছে, আরেকটা না হয় কিনব—কিন্তু একটা ডাকাত আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার উপর যা-তা অত্যাচার করে চলে যাবে—এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। আপনাদের একটা বিহিত করতেই হবে। যদি লোকটাকে ধরে দিতে পারেন তা হলে আমি আপনাকে ইয়ে—মানে, ইয়ে আর কী—'

'পারিশ্রমিক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। পারিশ্রমিক—মানে, রিওয়ার্ড দেব।'

ফেলুদা বলল, 'রিওয়ার্ডটা বড় কথা নয়। সে আপনি দিতে চান দেবেন। কিন্তু আমি কাজটার ভার নিচ্ছি তার প্রধান কারণ হল, এ ধরনের অনুসন্ধানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, একটা আনন্দ আছে।'

এটা শুনে আমার মনে হল, বড় বড় গোয়েন্দাকাহিনীতে ডিটেকটিভরা যে ভাবে কথা বলে, ফেলুদাও যেন ঠিক সেইভাবেই কথাটা বলল।

এর পরে প্রায় দশ মিনিট ধরে ফেলুদা নীলমণিবাবুর ড্রাইভার গোবিন্দ, চাকর নন্দলাল, আর পাঁচু, আর মালি নটবরের সঙ্গে কথা বলল। তারা সবাই বলল রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। বাইরের লোক আসার মধ্যে এক রাত ন'টা নাগাদ ডাক্তার বোস এসেছিলেন ঝুন্টুকে দেখতে। নীলমণিবাবু নিজে নাকি তারপর একবার বেরিয়েছিলেন—ও এন মুখার্জির ডাক্তারখানা থেকে ঝুন্টুর জন্য ওষুধ কিনে আনতে।

ফেরার পথে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল ট্যাক্সি আমাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলেছে। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। ট্যাক্সি থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে। দেখলাম বাড়ির সদর দরজার উপরে সাইনবোর্ডে উঁচু উঁচু রূপোলি অক্ষরে লেখা রয়েছে—'অ্যারাটুন ব্রাদার্স—অকশনিয়ার্স'। এটাই সেই নীলামের দোকান।

আমি কোনওদিন নীলামঘর দেখিনি। এই প্রথম দেখে একেবারে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত রকম হিজিবিজি জিনিস একসঙ্গে এর আগে কখনও দেখিনি।

ফেলুদার কাজ দু'মিনিটের মধ্যে সারা হয়ে গেল। প্রতুল দত্তের ঠিকানা সেভেন বাই ওয়ান লাভলক স্ট্রিট। আমি মনে মনে ভাবলাম প্রতুল দত্তের বাড়ি গিয়েও যদি ফেলুদাকে হতাশ হতে হয়, তা হলে ওর কোথাও যাবার থাকবে না। তার মানে এবার ফেলুদাকে হার স্বীকার করতে হবে। আর তা হলে আমার যে কী দশা হবে তা জানি না। কারণ এখন পর্যন্ত ফেলুদা কোথাও হার মানেনি। ও কোনও ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ চুন করে বসে আছে—এ দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। আশা করি শিগগিরই ও একটা 'ক্লু' পেয়ে যাবে। আমি অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুপুরে খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'এর পর?'

ও ভাতের ঢিপির মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে একবাটি সোনামুগ ডাল ঢেলে বলল, 'এর পর মাছ। তারপর চাটনি, তারপর দই।'

'তারপর?'

'তারপর জল খেয়ে মুখ ধোব। তারপর একটা পান খাব।'

'তারপর?'

'তারপর একটা টেলিফোন করে আধঘণ্টা ঘুম দেব।'

এর মধ্যে টেলিফোনটাই একমাত্র ইন্টারেস্টিং খবর, কাজেই আমি সেটার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ডিরেকটরি থেকে প্রতুল দত্তর নম্বরটা আমি বার করে দিয়েছিলাম। নম্বরটা ডায়াল করে 'হ্যালো' বলার সময় দেখলাম ফেলুদা গলাটা একদম চেঞ্জ করে বুড়োর গলা

করে নিয়েছে। যে কথাটা হল ফোনে, তার শুধু একটা দিকই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, আর সেইভাবেই সেটা লিখে দিচ্ছি—

'হ্যালো—আমি নাকতলা থেকে কথা কইচি।'

—

'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীজয়নারায়ণ বাগচি। আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই বিষয় নিয়ে আমি পুস্তক রচনা করেচি।'

—

'হ্যাঁ....আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সংগ্রহের কথা শুনেচি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কিছু জিনিস আমাকে দেখতে দেন....'

—

'না না না! পাগল নাকি!'

—

'আচ্ছা।'

—

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।'

—

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।'

টেলিফোন শেষ করে ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোকের বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে—তাই জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রেখেছেন। তবে সন্ধের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।'

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'কিন্তু প্রতুলবাবু যদি সত্যিই আনুবিসের মূর্তি চুরি করে থাকেন, তা হলে তো আর সেটা আমাদের দেখাবেন না।'

ফেলুদা বলল, 'যদি তোর মতো বোকা হয় তা হলে দেখাতেও পারে, তবে না দেখানোটাই সম্ভব। আমি মূর্তি দেখার জন্য যাচ্ছি না, যাচ্ছি লোকটাকে দেখতে।'

তার কথামতো ফেলুদা টেলিফোনটা করেই নিজের ঘরে চলে গেল ঘুমোতে। ফেলুদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা হল, ও যখন তখন প্রয়োজন মতো একটু-আধটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। শুনেছি নেপোলিয়নেরও নাকি এ ক্ষমতা ছিল; যুদ্ধের আগে ঘোড়ায় চড়া অবস্থাতেই একটু ঘুমিয়ে নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতেন।

আমার বিশেষ কিছুই করার ছিল না, তাই ফেলুদার তাক থেকে একটা ঈজিপ্সিয়ান আর্টের বই নিয়ে সেটা উলটে পালটে দেখছিলাম, এমন সময় ক্রী—ং করে ফোনটা

বেজে উঠল।

আমি এক দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম।

'হ্যালো!'

কিছুক্ষণ কেউ কিচ্ছু বলল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিলাম ফোনটা কেউ ধ[illegible] আছে।

আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে একটা গম্ভীর কর্কশ গলা শুনতে পেলাম।

'প্রদোষ মিত্তির আছেন?'

আমি কোনওমতে ঢোক গিলে বললাম, 'উনি একটু ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে ক[illegible] বলছেন?'

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর কথা এল, 'ঠিক আছে। আপনি তাকে ব[illegible] দেবেন যে মিশরের দেবতা যেখানে যাবার সেখানেই গেছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন[illegible] ব্যাপারে আর নাক গলাতে না আসেন, কারণ তাতে কারুর কোনও উপকার হবে না[illegible] বরং অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।'

এর পরেই কট করে ফোনটা রাখার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই সব চুপ।

কতক্ষণ যে ফোনটা হাতে ধরে প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিলাম জানি না, হঠা[illegible] ফেলুদার গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটাকে জায়গায় রেখে দিলাম।

'কে ফোন করেছিল?'

আমি ফোনে যা শুনেছি তা বললাম। ফেলুদা গম্ভীর মুখ করে ভুরু কুঁচকে সোফা[illegible] বসে বলল, 'ইস—তুই যদি আমাকে ডাকতিস!'

'কী করব? কাঁচা ঘুম ভাঙালে যে তুমি রাগ করো।'

'লোকটার গলার আওয়াজ কীরকম?'

'ঘরঘরে গম্ভীর।'

'হুঁ....। যাক গে, আপাতত প্রতুল দত্তের চেহারাটা একবার দেখে আসি। ম[illegible] হচ্ছিল একটু আলো দেখতে পাচ্ছি; এখন আবার সব ঘোলাটে।'

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট, আমরা প্রতুল দত্তর বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি যে, বাবাও আমাদের দেখে চিনতে পারতে[illegible] না। ফেলুদা সেজেছে একটা ষাট বছরের বুড়ো। কাচা-পাকা মেশানো ঝোলা গোঁফ[illegible] চোখে মোটা কাচের চশমা, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর উপর তোলা ধুতি, আ[illegible] মোজার উপর বাটার তৈরি ব্রাউন কেডস জুতো। আধঘণ্টা ধরে ঘরের দরজা ব[illegible]

[illegible]রে মেক-আপ করে বাইরে এসেই বলল, 'তোর জন্য দু'-তিনটে জিনিস আছে—[illegible]ট করে পরে নে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকেও মেকআপ করতে হবে নাকি?'

'আলবাত!'

দু'মিনিটের মধ্যে আমার মাথায় একটা কদম-ছাঁট পরচুলা, আর আমার নাকের [illegible]পর একটা চশমা বসে গেল। তারপর একটা কালো পেন্সিল দিয়ে আমার পরিষ্কার [illegible]রে ছাঁটা-জুলপিটা ফেলুদা একটু অপরিষ্কার করে দিল। তারপর বলল—

'তুই আমার ভাগ্নে, তোর নাম সুবোধ—অর্থাৎ শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট ভালমানুষটি। [illegible]খানে মুখ খুলেছ কি বাড়ি এসে রদ্দা!'

[illegible]তুলবাবুর বাড়ি চুনকাম প্রায় হয়ে এসেছে। ডিজাইন দেখে বোঝা যায় বাড়ি [illegible] পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরনো, তবে নতুন রঙের জন্য দরজা জানলা দেয়াল সব কিছু ঝলমল করছে।

গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়েই দেখি বাইরে একটা খোলা বারান্দায় একটা [illegible]তের চেয়ারে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের এগোতে [illegible]খেও তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও বুঝলাম তাঁর [illegible]খটা বেশ গম্ভীর।

ফেলুদা দু'হাত তুলে মাথা হেঁট করে নমস্কার করে তার নতুন বুড়ো মিহি গলায় বলল, 'মাপ করবেন—আপনিই কি প্রতুলবাবু?'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে আমারই নাম জয়নারায়ণ বাগচি। আমিই আপনাকে আজ দুপুরে টেলিফোন করেছিলাম। এটি আমার ভাগ্নে সুবোধ।'

'আবার ভাগ্নে কেন? ওর কথা তো টেলিফোনে হয়নি।'

আমার মাথার পরচুলা কুটকুট করতে শুরু করেছে।

ফেলুদা গলা ভীষণ নরম করে বলল, 'আজ্ঞে ও ছবি আঁকা শিখছে তাই....'

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'আপনারা আমার জিনিসগুলি দেখতে চাইছেন তাতে আপত্তি নেই; তবে সরিয়ে [illegible] জিনিস সব টেনে বার করতে হয়েছে। অনেক হ্যাঙ্গামা। একে বাড়িতে রাতদিন মিস্ত্রিদের ঝামেলা, এটা ঠেলো, ওটা ঢাকো....চারিদিকে কাঁচা রং....রঙের গন্ধটাও ধাতে [illegible] না। সব ঝক্কি শেষ হলে যেন বাঁচি। আসুন ভেতরে....'

লোকটাকে ভাল না লাগলেও, ভিতরে গিয়ে তার জিনিসপত্তর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার কাছে মিশর দেশের শিল্পকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন

রয়েছে দেখছি।'

'তা আছে। কিছু জিনিস কায়রোতে কেনা, কিছু এখানে অকশনে।'

'দ্যাখো বাবা সুবোধ, ভাল করে দ্যাখো।' ফেলুদা আমার পিঠে একটা চিমটি কেটে আমায় জিনিসগুলোর দিকে ঠেলে দিল। 'কতরকম দেবদেবী—দ্যাখো! এই যে বাজপাখি, এও দেবতা, এই যে প্যাঁচা—এও দেবতা। মিশরদেশে কতরকম জিনিসকে পূজো করত লোকেরা দ্যাখো।'

প্রতুলবাবু একটা সোফায় বসে চুরুট ধরালেন।

হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি বলে উঠলাম, 'শেয়াল-দেবতা নেই, বড় মামা?'

প্রশ্নটা শুনেই প্রতুলবাবু যেন হঠাৎ বিষম খেয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুরুটের কোয়ালিটি ফল করছে। আগে এত কড়া ছিল না।'

ফেলুদা সেই রকমই মিহি সুরে বললেন, 'হেঁ হেঁ—আমার ভাগ্নে আনুবিসের কথা বলছে। কালই ওকে বলছিলাম কি না?'

প্রতুলবাবু হঠাৎ ফোঁস করে উঠলেন, 'হুঁ!—আনুবিস! স্টুপিড ফুল!'

'আজ্ঞে?' ফেলুদা চোখ গোল গোল করে প্রতুলবাবুর দিকে চাইলেন। 'আনুবিসকে মূর্খ বলছেন আপনি?'

'আনুবিস না। সেদিন নীলামে—লোকটাকে আগেও দেখেছি আমি—হি ইজ এ ফুল। ওর বিডিং-এর কোন মাথামুণ্ডু নেই। চমৎকার একটা মূর্তি ছিল। এমন এক অ্যাবসার্ড দাম হাঁকলে যে যার ওপর আর চড়া যায় না। অত টাকা কোথায় পায় জানি না।'

ফেলুদা চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি মহাশয় ব্যক্তি। পরম আনন্দ পেলাম আপনার শিল্প সংগ্রহ দেখে।'

এসব জিনিসপত্র ছিল দোতলায়। আমরা এবার নীচে রওনা দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে লোকজন আর বিশেষ....?'

'গিন্নি আছেন। ছেলে বিদেশে।'

প্রতুল দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম পাড়াটা কত নির্জন। সাতটাও বাজেনি, অথচ রাস্তায় প্রায় লোক নেই বললেই চলে। দুটি বাচ্চা ভিখারি ছেলে শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছে এলে পরে বুঝলাম একজন গাইছে আর অন্যজন বাজাচ্ছে। ভারী সুন্দর গান করে ছেলেটা। ফেলুদা তাদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে গেয়ে উঠল—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা....

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে কিছুদূর হেঁটে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সির দেখা পেয়েই ফেলুদা হাঁক দিয়ে সেটাকে থামাল। ওঠার সময়ে দেখি বুনো ড্রাইভার ভারী অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। এই চিমড়ে বুড়োর গলা দিয়ে ওরকম জোয়ান চিৎকার বেরোল কী করে সেটাই বোধহয় চিন্তা করছে ও।

পরদিন সকালে যখন টেলিফোনটা বাজল, তখন আমি বাথরুমে দাঁত মাজছি। কাজেই ফোনটা ফেলুদাই ধরল।

জিজ্ঞেস করে জানলাম নীলমণিবাবু ফোন করেছিলেন একটা খবর দেওয়ার জন্য।

প্রতুলবাবুর বাড়িতেও কাল ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, আর এ খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে। টাকা পয়সা কিছু যায়নি; গেছে শুধু কিছু প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনা। আট-দশটা ছোট ছোট জিনিস, সব মিলিয়ে যার দাম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার কম না। পুলিশ নাকি তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রতুলবাবুর বাড়িতে যে সকালেই পুলিশের দেখা পাব, আর তার মধ্যে যে ফেলুদার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়বে সেটা কিছুই আশ্চর্যের না। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন সোয়া সাতটা। অবিশ্যি আজ মেক-আপ করিনি। ফেলুদা দেখলাম তার জাপানি ক্যামেরাটা নিতে ভোলেনি।

আমরা গেটের ভিতর সবে ঢুকেছি—এমন সময় একজন বেশ হাসিখুশি মোটাসোটা উর্দি পরা পুলিশ—বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর হবেন—ফেলুদাকে দেখেই এগিয়ে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কীহে, ফেলুমাস্টার!—গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছ দেখছি!'

ফেলুদা বেশ নরমভাবে হেসে বলল, 'আরে কী করি বলুন—আমাদের তো ওই কাজ।'

'কাজ বোলো না। কাজটা তো আমাদের। তোমাদের হল শখ। তাই না?'

ফেলুদা একথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিছু কিনারা করতে পারলেন। বার্গলারি কেস?'

'তা ছাড়া আর কী? তবে ভদ্রলোক খুব আপসেট। খালি মাথা চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন কাল এক বুড়ো নাকি এক ছোকরা সঙ্গে করে ওঁর জিনিস দেখতে এসেছিল। ওঁর ধারণা এই দু'জনই নাকি আছে এই বার্গলারির পেছনে।'

আমার কথাটা শুনেই গলা শুকিয়ে গেল। সত্যি, ফেলুদা মাঝে মাঝে বড্ড বেপরোয়া কাজ করে ফেলে।

ফেলুদা কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, 'তা হলে তো সেই বুড়োর সন্ধান করতে পারলেই চোর ধরা পড়বে। এ তো জলের মতো কেস।'

গোলগাল পুলিশটি বললেন, 'বেশ বলেছে—একেবারে খাঁটি উপন্যাসের গোয়েন্দার মতো বলেছে—বাঃ।'

ভদ্রলোকের পারমিশন নিয়ে ফেলুদা আর আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতুলবাবু দেখি আজও সেই বারান্দাতেই বসে আছেন। বুঝলাম তিনি এতই অন্যমনস্ক যে আমাদের দেখেও দেখতে পেলেন না।

'কোন ঘরটা থেকে চুরি হয়েছে দেখবে?' মোটা পুলিশ জিজ্ঞেস করলেন।

'চলুন না।'

কাল সন্ধেবেলা দোতলার যে ঘরটায় গিয়েছিলাম, আজও সেটাতেই যেতে হল। অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ফেলুদা সটান ঘরের দক্ষিণদিকের ব্যালকনিটার দিকে চলে গেল। সেটা থেকে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে বলল, 'হুঁ, পাইপ বেয়ে অনায়াসে উঠে আসা যায়—তাই না?'

মোটা পুলিশ বললেন, 'তা যায়। আর মুশকিল হচ্ছে কী—দরজার রং কাঁচা বলে ওটাকে আবার দুদিন থেকে বন্ধ করা হচ্ছিল না।'

'ঠিক কখন হয়েছে চুরিটা?'

'রাত পৌনে দশটা।'

'কে প্রথম টের পেল?'

'এদের একটি পুরনো চাকর আছে, সে ওদিকের ঘরে বিছানা করছিল। একটা শব্দ পেয়ে দেখতে আসে। ঘর তখন অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর আগেই সে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সুযোগে চোর বাবাজি হাওয়া।'

ফেলুদার কপালে আবার সেই বিখ্যাত ভ্রূকুটি। বলল, 'একবার চাকরটার সঙ্গে কথা বলব।'

চাকরের নাম বংশলোচন। দেখলাম ঘুঁষিটা খাওয়ার ফলে তার এখনও যন্ত্রণা বা ভয়—কোনওটাই যায়নি। ফেলুদা বলল, 'কোথায় ব্যাথা?'

চাকরটা চিঁ চিঁ করে উত্তর দিল, 'তলপেটে।'

'তলপেটে? ঘুঁষি তলপেটে মেরেছিল?'

'সে কী হাতের জোর—বাপ্‌রে বাপ! মনে হল যেন পেটে এসে একখানা পাথর লাগল। আর তার পরেই সব অন্ধকার।'

'আওয়াজটা শুনলে কখন? তখন তুমি কী করছিলে?'

'টাইম তো দেখিনি বাবু। আমি তখন মায়ের ঘরে বিছানা করছি। দুটো ছেলে এসে কীর্তন গান করছিল তাই শুনছিলাম। মা ঠাকরুণ ছিলেন পুজোর ঘরে; বললেন ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে আয়। আমি যাব যাব করছি এমন সময় বাবুর ঘর থেকে

জিনিসপাতি পড়ার মতো একটা শব্দ পেলাম। ভাবলাম—কেউ তো নেই—তা জিনিস পড়বে কেন? তাই দেখতে গেছি—আর ঘরে ঢুকতেই....'

বংশলোচন আর কিছু বলতে পারল না।

সব শুনে-টুনে বুঝলাম, আমরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চোর এসেছিল।

আমি ভাবলাম ফেলুদা বোধহয় আরো কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আর কোনও কথাই বলল না। সেই মোটা পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে রাস্তায় এসে ফেলুদার মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। এ চেহারা আমি জানি। ফেলুদা কী জানি একটা রাস্তা দেখতে পেয়েছে, আর সে রাস্তা দিয়ে গেলেই রহস্যের সমাধানে পৌঁছনো যাবে।

পাশ দিয়ে খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, কিন্তু ফেলুদা থামল না। আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদার দেখাদেখি আমিও ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে খুব বেশিদূর এগোতে পারলাম না। প্রতুলবাবু যে চোর নন সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও প্রতুলবাবুকে বেশ জোয়ান লোক বলে মনে হয়, আর ওঁর গলার আওয়াজটা বেশ ভারী। কিন্তু তাও এটা কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না যে, প্রতুলবাবু একটা বাড়ির পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠতে পারেন। তার জন্য যেন আরো অনেক কম বয়সের লোকের দরকার। তা হলে চোর কে? আর ফেলুদা কোন জিনিসটার কথা এত মন দিয়ে ভাবছে?

কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখি আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে এসে পড়েছি। ফেলুদা পাঁচিলটা বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর গিয়ে পাঁচিলটা বাঁদিকে ঘুরেছে। ফেলুদাও ঘুরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এদিকে রাস্তা নেই, ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। মোড় ঘুরে আঠারো কি উনিশ পা হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে পাঁচিলের একটা বিশেষ অংশের দিকে খুব মন দিয়ে দেখল। তারপর সেই জায়গাটার খুব কাছ থেকে একটা ছবি তুলল। আমি দেখলাম সেখানে একটা ব্রাউন রঙের হাতের ছাপ রয়েছে। পুরো হাত নয়—দুটো আঙুল আর তেলোর খানিকটা অংশ—কিন্তু তা থেকেই বোঝা যায় যে সেটা বাচ্চা ছেলের হাত।

এবার আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরে গিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা একেবারে বাড়ির দিকে চলে গেলাম।

খবর পাঠাতেই নীলমণিবাবু বেশ ব্যস্ত হয়ে নীচে চলে এলেন। আমরা তিনজনেই বৈঠকখানায় বসার পর নীলমণিবাবু বললেন, 'আপনি শুনলে কী বলবেন জানি না, তবে আমার মনটা আজ কালকের চেয়ে কিছুটা হালকা। আমার মতো দুর্দশা যে

আরেকজনেরও হয়েছে, সেটা ভেবে খানিকটা কষ্টের লাঘব হচ্ছে। কিন্তু তাও একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট যাবে না—কোথায় গেল আমার আনুবিস? বলুন আপনি এত বড় ডিটেকটিভ—দুটো দুটো ডাকাতি দু'দিন উপরি উপরি হয়ে গেল আর আপনি এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরেই?'

ফেলুদা একটা প্রশ্ন করে ফেলল।

'আপনার ভাগ্নেটি কেমন আছে?'

'কে, ঝন্টু? ও আজ অনেকটা ভাল। ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ জ্বরটা অনেক কমে গেছে।'

'আচ্ছা—বাইরের কোনও ছেলেটেলে কি পাঁচিল টপকে এখানে আসে? ঝন্টুর সঙ্গে খেলতে-টেলতে?'

'পাঁচিল টপকে? কেন বলুন তো?'

'আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখেছিলাম।'

'ছাপ মানে? কীরকম ছাপ?'

'ব্রাউন রঙের ছাপ।'

'টাটকা?'

'বলা মুশকিল—তবে খুব পুরনো নয়।'

'কই, আমি তো কোনওদিন কোনও বাচ্চাকে আসতে দেখিনি। বাচ্চা বলতে এক আসে—তাও সেটা পাঁচিল টপকে নয়—একটা ছোকরা ভিখিরি। দিব্যি শ্যামাসংগীত গায়। তবে হ্যাঁ—আমার বাগানের পশ্চিমদিকে একটা জামরুল গাছ আছে। মধ্যে মধ্যে বাইরের ছেলে পাঁচিল টপকে এসে সে গাছের ফল পেড়ে খায় না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।'

'হুঁ...'

নীলমণিবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'চোরের বিষয়ে আর কিছু জানতে পারলেন কি?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

'লোকটার হাতের জোর সাংঘাতিক। এক ঘুঁষিতে প্রতুলবাবুর চাকরকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।'

'তা হলে এ চুরি-ও চুরি এক চোরই করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে।'

নীলমণিবাবু যেন মুষড়ে পড়লেন। বললেন, 'আশা করি সে বুদ্ধিকে জব্দ করার মতো বুদ্ধি আপনার আছে। না হলে তো আমার মূর্তি ফিরে পাবার আশা ছাড়তে হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আরো দুটো দিন অপেক্ষা করুন। এখন পর্যন্ত কখনও ফেলু মিত্তিরের ডিফিট হয়নি।'

নীলমণিবাবুর বাড়ির গাড়িবারান্দা থেকে গেট অবধি নুড়ি পাথর দেওয়া রাস্তা। সেটার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি তখন একটা কট কট শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি নীলমণিবাবুর বাড়ির দোতলার একটা ঘরের জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ছেলে—ঝন্টুই বোধহয়—জানলার কাচটাকে হাত দিয়ে টোকা মারছে।

আমি বললাম, 'ঝন্টু।'

ফেলুদা বলল, 'দেখেছি।'

সারা দুপুর ফেলুদা তার নীল খাতায় অভ্যাসমতো গ্রিক অক্ষরে কী সব হিজিবিজি লিখল। আমি জানি ভাষাটা আসলে ইংরিজি, কিন্তু অক্ষরগুলো গ্রিক, যাতে আর কেউ পড়ে মানে বুঝতে না পারে। আমার সঙ্গে ওর কথা একেবারেই বন্ধ, তবে সেটা এক হিসেবে ভাল। এখন ওর ভাববার সময়, কথা বলার সময় নয়। মাঝে মাঝে শুনছিলাম ও গুন গুন করে গান গাইছে। এটা সেই ভিখিরি ছেলেটার গাওয়া রামপ্রসাদী গানটা।

বিকেলে পাঁচটা নাগাদ চা খেয়ে ফেলুদা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। পপুলার ফোটো থেকে আমার ছবির এনলার্জমেন্টগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

আমি একাই বাড়িতে রয়ে গেলাম।

দিন ছোট হয়ে আসছে। তাই সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্য ডুবে অন্ধকার হয়ে এল। পপুলার ফোটো দোকানটা হাজরা রোডের মোড়ে। ফেলুদার ছবি নিয়ে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগা উচিত না। তবে এত দেরি হচ্ছে কেন? অবিশ্যি অনেক সময় ছবি তৈরি না হলে দোকানে বসিয়ে রাখে। আশা করি অন্য কোথাও যায়নি ও। আমাকে ফেলে ঘোরাঘুরিটা আমার ভাল লাগে না।

একটা করতালের আওয়াজ কানে এল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলায় সেই গান—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা....

সেই ছেলে দুটো। আজ আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসেছে।

গান ক্রমে এগিয়ে এল। আমি আমাদের ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখান থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। ওই যে ছেলে দুটো—একজন গাইছে, একজন করতাল বাজাচ্ছে। কী সুন্দর গলা ছেলেটার।

এবারে গান থামিয়ে ছেলেটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ করে বলল, 'মা দুটি ভিক্ষে দেবে মা?'

কী মনে হল, আমার ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ নয়া বার করে জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে ফেলে দিলাম। টিং শব্দ করে পয়সাটা মাটিতে পড়ল। দেখলাম ছেলেটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলার মধ্যে পুরে আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

একটা ব্যাপারে আমার মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে গেল। যদিও আমাদের রাস্তাটা বেশ অন্ধকার। তবুও ভিখিরি ছেলেটা যখন ওপর দিকে মুখ করে ভিক্ষে চাইল তখন যেন মনে হল তার মুখের সঙ্গে ঝুন্টুর একটা আশ্চর্য মিল আছে। হয়তো এটা আমার দেখার ভুল, কিন্তু তাতে মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগল। আমি ঠিক করলাম ফেলুদা এলেই কথাটা ওকে বলব।

প্রায় সাড়ে ছ'টার সময়ে মেজাজ বেশ গরম করে ফেলুদা এনলার্জমেন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরল। যা ভেবেছিলাম তাই, ওকে দোকানে বসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বলল, 'এবার থেকে নিজেই একটা ডার্করুম তৈরি করে ছবি ডেভেলপিং-প্রিন্টিং করব। বাঙালি দোকানের কথার কোনও ঠিক নেই।'

ফেলুদা যখন ওর বিছানার ওপর ছবিগুলো বিছিয়ে বসেছে, তখন আমি ওকে গিয়ে ভিখিরি ছেলেটার কথা বললাম। ও কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে বলল, 'সেটা আর আশ্চর্য কী?'

'আশ্চর্য না?'

'উঁহু।'

'কিন্তু তা হলে ভীষণ গণ্ডগোল বলতে হবে।'

'গণ্ডগোল তো বটেই। সেটা তো আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি।'

'তুমি বলতে চাও যে ওই ছেলেটা চুরির ব্যাপারে জড়িত?'

'হতেও পারে।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ঘুঁষির এত জোর যে একটা ধেড়ে লোককে অজ্ঞান করে দেবে?'

'বাচ্চা ছেলে ঘুঁষি মেরেছে তা তো বলিনি।'

'তাও ভাল!'

যদি ভাল বললাম, কিন্তু আসলে মোটেই ভাল লাগছিল না। ফেলুদাও যে কেন

রিষ্কার করে কিছু বলছে না তা জানি না।

খাটের উপর বিছানো বারোটা ছবির মধ্যে দেখলাম একটা ছবি ফেলুদা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা আজই সকালে তোলা নীলমণিবাবুর পাঁচিলে বাচ্চা ছেলের হাতের দাগের ছবিটা। এনলার্জমেন্টের ফলে হাতের তেলোটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বললাম, 'তুমি তো বলো হাত দেখতে জানো—বলো তো ছেলেটার কত আয়ু।'

ফেলুদা কোনও উত্তর দিল না। সে তন্ময় হয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে। লক্ষ্য করলাম যে তার মধ্যে একটা দারুণ কনসেনট্রেশনের ভাব।

'কিছু বুঝতে পারছিস?'

হঠাৎ ওর প্রশ্নটা আমাকে একেবারে চমকে দিল।

'কী বুঝব?'

'সকালে কী বুঝেছিলি, আর এখন কী বুঝলি—বল তো।'

'সকালে? মানে, যখন ছবিটা তুললে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আর বুঝব? বাচ্চা ছেলের হাত—এ ছাড়া আর কী বোঝার আছে?'

'ছাপের রংটা দেখে কিছু মনে হয়নি?'

'রং তো ব্রাউন ছিল।'

'তার মানে কী?'

'তার মানে ছেলেটার হাতে ব্রাউন রঙের কিছু একটা লেগেছিল।'

'কিছু মানে কী? ঠিক করে বলো।'

'পেন্ট হতে পারে।'

'কোথাকার পেন্ট?'

'কোথাকার পেন্ট....কোথাকার....?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

'প্রতুলবাবুর ঘরের দরজার রং!'

'এগজ্যাক্টলি। সেদিন তোরও সার্টের বাঁদিকের আস্তিনে লেগে গিয়েছিল। এখনও গিয়ে দেখতে পারিস লেগে আছে।'

'কিন্তু'—আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল, '—যার হাতের ছাপ, সেই কি প্রতুলবাবুর ঘরে ঢুকেছিল?'

'হতেও পারে। এখন বল—ছবি দেখে কী বুঝছিস।'

আমি অনেক ভেবেও নতুন কিছু বোঝার কথা বলতে পারলাম না।

ফেলুদা বলল, 'তুই পারলে আশ্চর্য হতাম। শুধু আশ্চর্য হতাম না—শক পেতাম কারণ তা হলে বলতে হত তোর আর আমার বুদ্ধিতে কোনও তফাত নেই।'

'তোমার বুদ্ধিতে কী বলছে?'

বলছে যে এটা একটা সাংঘাতিক কেস। ভয়াবহ ব্যাপার। আনুবিস যেরকম ভয়ঙ্কর—এই রহস্যটাও তেমনই ভয়ঙ্কর।

পরদিন সকালে ফেলুদা প্রথম নীলমণি সান্যালকে ফোন করল।

'হ্যালো—কে, মিস্টার সান্যাল?...আপনার রহস্য সমাধান হয়ে গেছে....মূর্তি এখনও হাতে আসেনি, তবে কোথায় আছে, মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছি....আপনি কি বাড়ি আছেন?...অসুখ বেড়েছে?...কোন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন....ও, আচ্ছা। তা হলে পরে দেখা হবে....'

ফোনটা রেখেই ফেলুদা চট করে আরেকটা নম্বর ডায়াল করল। ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হল সেটা ভাল শুনতে পেলাম না—তবে ফেলুদা যে পুলিশে টেলিফোন করছে সেটা বুঝলাম। ফোনটা রেখেই ও আমাকে বলল, 'এক্ষুনি বেরোতে হবে—তৈরি হয়ে নে।'

একে সকালে ট্রাফিক কম, তার উপর ফেলুদা আবার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল টপ স্পিডে যেতে। দেখতে দেখতে আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির রাস্তায় এসে পড়লাম।'

গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন দেখি নীলমণিবাবু তাঁর কালো অ্যাম্বাসাডারে বেরিয়ে বেশ স্পিডের মাথায় আমরা যেদিকে যাচ্ছি তার উলটো দিকে রওনা দিলেন। সামনে ড্রাইভার আর পিছনে নীলমণিবাবু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

'আউর জোরসে'—ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। ট্যাক্সি ড্রাইভারও কীরকম একসাইটেড হয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা চেপে দিল।

সামনের গাড়িটা দেখলাম বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ করে ডানদিকে মোড় নিচ্ছে।

এইবার ফেলুদা যে জিনিসটা করল সেটা এর আগে কক্ষনও করেনি। কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হঠাৎ তার রিভলভারটা বার করে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনের টায়ারের দিকে অব্যর্থ টিপ করে রিভলভারটা মারল।

প্রায় একই সঙ্গে রিভলভারের আর টায়ার ফাটার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। দেখলাম নীলমণিবাবুর গাড়িটা বিশ্রী ভাবে রাস্তার একপাশে কেতরে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমাদের গাড়িটা নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনে থামতেই দেখি উলটোদিক থেকে পুলিশের জিপ এসেছে।

এদিকে নীলমণিবাবু গাড়ি থেকে নেমে এসে ভীষণ বিরক্ত মুখ করে এদিক ওদিক চাইছেন।

ফেলুদা আর আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। পুলিশের জিপটাও কাছাকাছি এসে থেমেছে। দেখলাম সেটা থেকে নামলেন সেই মোটা অফিসারটি।

নীলমণিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসব কী হচ্ছে কী?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কে আছে জানতে পারি কি?'

'কে আবার থাকবে?' ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বললাম তো আমি আমার ভাগ্নেকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি।'

ফেলুদা এবার আর কিছু না বলে সোজা গিয়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ি থেকে তীরের মতো বেরিয়ে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি টিপে ধরল। কিন্তু ফেলুদা তো শুধু যোগব্যায়াম করে না; ও রীতিমতো যুযুৎসু আর ক্যারাটে শিখেছে। ছেলেটার কবজি দুটো ধরে উলটে তাকে অদ্ভুত কায়দায় মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলল। যন্ত্রণার চোটে একটা চিৎকার শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেল!

কারণ সেটা মোটেই বাচ্চার গলা নয়।

সেটা একটা বয়স্ক লোকের বিকট হেঁড়ে গলার চিৎকার!

এই গলাই সেদিন আমি টেলিফোনে শুনেছিলাম!

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে নীলমণিবাবুর গাড়ির ড্রাইভার আর 'বাচ্চা'টাকে ধরে ফেলল।

ফেলুদা তার জামার কলারটা ঠিক করতে করতে বলল, 'পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ দেখেই ধরেছিলাম। অল্প বয়সের ছেলের হাতে এত লাইন থাকে না। তাদের হাত আরো অনেক মসৃণ থাকে। অথচ সাইজ যখন ছোট, তখন তার একটাই মানে হতে পারে। এটা আসলে একটা বেঁটে বামনের হাতের ছাপ। বাচ্চাটা আসলে আর কিছুই না—একটি ডোয়ার্ফ। কত বয়স হল আপনার সাকরেদের, নীলমণিবাবু?'

'চল্লিশ!' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে ভাল করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না!

'খুব বুদ্ধি খাটিয়েছেন যা হোক। আগে জিনিস চুরির মিথ্যে ঘটনাটা খাড়া করে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, তারপর নিজেই লোক লাগিয়ে পরের জিনিস চুরি করছেন। আপনার বাড়িতে কাল যাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখারি ছেলেটি?'

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'তার মানে আপনার ভাগ্নে বলে আসলে কেউ নেই। ওকে বাড়িতে এনে ধরে রেখেছেন এই চুরির ব্যাপারে হেল্প করার জন্য?'

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলেন।

ফেলুদা বলে চলল, 'ছেলেটা গান গাইত আর বামনটা খঞ্জনি বাজাত। কেবল চুরির টাইম এলে খঞ্জনিটা ভিখারির হাতে দিয়ে যেত, এবং তখন সে-ই বাজাতে থাকত। বামন বলেই তার গায়ে জোরের অভাব নেই। এক ঘুঁষিতে একজন জোয়ান লোককে ঘায়েল করতে পারে। ওয়ান্ডারফুল! আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছি এই নিয়ে। সাধে কি প্রতুল দত্তের উপর হিংসা হয়েছিল।'

ফেলুদা বলল, 'অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট হয় না, বামুনও হয়। কারণ আপনার ওই বেঁটেটিও বামুন, আর আপনি সান্যাল—একেবারে উচ্চশ্রেণীর বামুন!...যাকগে—এবার একটা শেষ অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'আমার রিওয়ার্ডটা।'

নীলমণিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'রিওয়ার্ড!'

'আনুবিসের মূর্তিটা আপনার কাছেই আছে বোধহয়?'

ভদ্রলোক কেমন যেন বোকার মতো ডান হাতটা নিজের পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

হাতটা বার করতে দেখলাম তাতে রয়েছে এক বিঘত লম্বা কালো পাথরের উপর রঙিন মণিমুক্তা বসানো চার হাজার বছরের পুরনো মিশর দেশের শেয়ালমুখী দেবতা আনুবিসের মূর্তি।

ফেলুদা হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কৃত্রিম-মুদ্রা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর অতীত হইল, এক সময়ে কলিকাতায় বহুল পরিমাণ কৃত্রিম-মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। সেই সময়ে দিন দিন এত পরিমাণ ওই সকল মুদ্রার আমদানি হইতে থাকে যে, সকলেই চমকিত হইয়া পড়েন। নানা স্থান হইতে প্রেরিত কৃত্রিম-মুদ্রা রাখিবার নিমিত্ত ব্যাঙ্কে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংস্থাপিত করিতে হয়; হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও দুই-এক জন স্বতন্ত্র কর্মচারীও নিয়োগ করিতে হয়।

কৃত্রিম-মুদ্রার বহুল প্রচলনে গভর্নমেন্টকে ভাবনাতীত ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। কারণ, অকৃত্রিম মুদ্রার প্রচলন দিন দিন হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। পুলিশ ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। যাঁহার নিকট কৃত্রিম-মুদ্রা পাওয়া যায়, কৃত্রিম-মুদ্রা নির্মাণ ও প্রচলন-অপরাধে সন্দেহ করিয়া, পুলিশ তাঁহাকেই ধৃত করেন; তাঁহার দোকান ঘর-বাড়ি ও অন্তঃপুর পর্যন্তও

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকেই বিশেষ-রূপে অপমানিত হইতে লাগিলেন, অনেকেই বন্দীরূপে বিচারালয়ে প্রেরিত হইতে লাগিলেন। তথাপি কিছুই হইল না, কৃত্রিম-মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইল না।

এই ব্যাপার লইয়া চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কৃত্রিম-মুদ্রা-প্রস্তুতকারীগণকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অনেক পাকা পাকা নামজাদা কর্মচারীগণ নিযুক্ত হইলেন। সাজ-বেসাজে ডিটেক্‌টিভ-কর্মচারীগণও নানাদিকে নানা-প্রকার গুপ্ত-অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমার উপরও এক হুকুম জারি হইল। আমিও ওই কার্যে নিযুক্ত হইলাম।

এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ গত হইয়া গেল। এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ করিয়া একটি মাসও চলিয়া গেল; কিন্তু কেহই কিছুই করিতে পারিলেন না; প্রকৃত অপরাধীগণের কোন সন্ধানই কেহ বাহির করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া যায়, এমন সময় আমি ইহার একটু সন্ধান পাইলাম। আমার একজন গোয়েন্দা এক দিবস আমাকে সংবাদ দিল যে, কয়েক জন কৃত্রিম-মুদ্রা-নির্মাণকারী প্রায় ১৫ দিবস হইতে চোরবাগানের ভিতর একখানি খোলার ঘরে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। একটু গুপ্ত অনুসন্ধানেই জানিতে পারিলাম, বাখরগঞ্জনিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামীয় এক ব্যক্তিই এই দলের প্রধান নেতা। যে সকল বিষয় আমি অবগত হইলাম, তাহার কোন কথা আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণকে না বলিয়া আমি নিজেই গুপ্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

যে ঘরে উহারা বাস করিতেছিল, তাহা একখানি সামান্য খোলার ঘর মাত্র। ওই ঘরের পশ্চাতে আর একখানি ভগ্ন খোলার ঘর ছিল। উহাতে লোকজন কেহই থাকিত না। এই ভগ্ন ঘরখানি আমার বিশেষ উপকারে আসিল। রাত্রি ১০টার পর ওই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। ওইরূপ নির্জন, ভগ্ন, অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট স্থানে একাকী চুপ করিয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা যিনি ভুগিয়াছেন তিনিই জানেন। জোরে নিশ্বাস ফেলিবার যো নাই, কাশির উপক্রম হইলে কাশিবার উপায় নাই, শত-সহস্র মশার কামড়ে অস্থির হইলেও তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিবার উপায় নেই! এইরূপ অবস্থায় কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। সমস্ত দিবস শুইয়া ঘুমাইতাম; আর সমস্ত রাত্রি সেই ভগ্ন ঘরে বসিয়া কাটাইতাম। এইরূপে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অষ্টম রাত্রে, দেখিলাম, রাত্রি ২টার পর, উহারা কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। সেই ঘরের বেড়ার সামান্য ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলাম, কেহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে, কেহ বা একটি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছে। এই অবস্থা

দেখিয়া আমি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। দ্রুতপদে আমাদিগের আফিসে আসিয়া আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণকে সকল কথা কহিলাম। লোকজন লইয়া সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ-পূর্বক উহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত, তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন; নিজে কিন্তু আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসিলেন না। আমি চারি জন মাত্র লোক সঙ্গে করিয়া পুনরায় দ্রুতপদে সেইস্থানে আসিলাম। তখন পর্যন্ত সেই ঘরের ভিতর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল ও লোকজনের মৃদু-মৃদু কথা শ্রবণগোচর হইতেছিল। আমরা আস্তে আস্তে সেই বাড়ির দরজায় গমন করিলাম, কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমাদিগের সমভিব্যহারী একজনকে প্রাচীরের উপর উঠাইয়া দিলাম। সে প্রাচীরের উপর দিয়া বাড়ির ভিতর লাফ দিয়া পড়িল, ও যত শীঘ্র পারিল, সদর দরজা খুলিয়া দিল। আমরা দ্রুতপদে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া কি দেখিলাম! দেখিলাম, বাড়ির ভিতরে যে কয়েকজন লোক ছিল, সকলেই যে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন।

বাড়ির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি, এক বাড়িতে প্রবেশ করিতে ভুল করিয়া অন্য বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু, বিশেষরূপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমার ভ্রম হয় নাই, প্রকৃত বাড়িতেই প্রবেশ করিয়াছি। সুতরাং বাড়ির এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও আমরা অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করিলাম না। সকলে মিলিয়া সেই বাড়ি উত্তমরূপে তল্লাস করিলাম; কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্য কিছুই না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে সে দিবস সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

পূর্বকথিত ঘটনার ২/৩ দিন পরেই শ্যামাচরণ সে বাড়ি পরিত্যাগ করিল। আমি যদিও একবার অপ্রস্তুত হইয়াছি, তথাপি আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, শ্যামাচরণ তখন বেনেটোলায় আর একখানি খোলার বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে। এবার মনে মনে স্থির করিলাম যে, ঠিক সংবাদ ভিন্ন শ্যামাচরণকে আর স্পর্শও করিব না। সুযোগও ঘটিল সেইরূপ। যে বাড়িতে শ্যামাচরণ বাস করিত, সেই বাড়ির সংলগ্ন আর একখানি বাড়ির এক ব্যক্তির সহিত আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করিলাম। তাঁহার ঘর ও শ্যামাচরণের ঘর এক বলিলেই হয়—কেবল একটিমাত্র মৃত্তিকা-নির্মিত দেওয়াল ব্যবধান-মাত্র। আমি সর্বদা আমার এই নূতন বন্ধুর বাড়িতে যাইতাম; তিনিও আমাকে ডিটেকটিভ-কর্মচারী বলিয়া জানিতেন। তবে যে কারণে আমি তাঁহার বড়িতে সর্বদা যাতায়াত করিতাম, তাহা কিন্তু তাঁহার নিকট একদিনের নিমিত্তও বলি নাই। রাত্রে যখন আমার বন্ধুর ঘরে বসিয়া থাকিতাম, সেই সময় প্রায়ই শ্যামাচরণের ঘর হইতে কল চালাইবার শব্দ, টাকার বাদ্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শব্দও শুনিতে পাইতাম। এই সংবাদ আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট বলিলাম। তিনিও এক দিবস নিজে আসিয়া এই শব্দ স্বকর্ণে শ্রবণ

করিলেন; এবং বলিলেন যে, 'এখন নিশ্চয়ই মুদ্রা নির্মাণ হইতেছে।' কাজেই তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আরও লোকজন সংগ্রহ করিলাম, ও দরজা ভাঙ্গিয়া সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। সমস্ত ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করিলাম; ঘরের মেঝে উঠান প্রভৃতি খনন করিয়া ফেলিলাম; কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। এই ঘটনাকে তখন যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি তখন শ্যামাচরণকে কহিলাম, 'দেখ, শ্যামাচরণ, তুমি এইরূপে কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া আর কত দিন আমাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? এখনও তুমি এই নিকৃষ্ট কার্য পরিত্যাগ-পূর্বক দেশে গমন করিয়া আপন জীবন রক্ষা কর; আমরাও এই প্রকার কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাই।'

শ্যামাচরণ কহিলেন আপনারা নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, দুই দুইবার, আমার ঘর অনুসন্ধান-পূর্বক, আমাকে বিশেষরূপে অপমানিত করিলেন। আপনারা পুলিশ-কর্মচারী; ভদ্রলোকের অপমান করিতে আপনাদিগের সৃষ্টি। ইহাতে যে নিরপরাধ আমাকে অপমানিত করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি! আপনারা কৃত্রিম-মুদ্রা-প্রস্তুতকারীকে ধরিতে এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু সে ক্ষমতা আপনাদিগের নাই। কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুতকারীকে ধরিবার ক্ষমতা যদি আপনাদিগের থাকিত, তাহা হইলে চোরের মত আমার বাড়িতে প্রবেশ করিয়া নিরপরাধ লোকের অবমাননা করিতেন না।

শ্যামাচরণের এই কথা শুনিয়া আমার একটু রাগও হইল, লজ্জাও হইল; মনে মনে একটু অপমানও বোধ করিলাম। এবং শ্যামাচরণকে কহিলাম, 'দেখ শ্যামাচরণ, তুমি যে এই কার্যের গুরু, তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই। কিন্তু যখন দুই দুইবার তোমাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারি নাই, তখন তোমাকে কোন কথা বলা বৃথা। যদি কখনও তোমাকে ধরিতে পারি, তখনই দেখিব যে কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুতকারীগণকে ধরিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না!' এই বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে আমরা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সে দিবস সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম সত্য, কিন্তু হৃদয় হইতে আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম না। শ্যামাচরণের উপর আমার যেরূপ তীব্র দৃষ্টি ছিল তাহারও কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। দেখিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে শ্যামাচরণ সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবাজারের একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর ইষ্টক নির্মিত একটি দ্বিতল বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। এই বাড়িটি পূর্ব-দেশীয় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের। বৃদ্ধাও ওই বাড়িতে থাকিতেন। তিনিও সেই বাড়ি পরিত্যাগ না করিয়া শ্যামাচরণের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। এই ছয় মাসের মধ্যে শ্যামাচরণকে মুদ্রা নির্মাণ-উপযোগী যন্ত্রাদির সহিত ধরিবার নিমিত্ত কত যত্ন ও চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য হইতে পরিলাম না। শ্যামাচরণের বাড়ির পার্শ্বেই একটি

ভদ্রলোকের বাড়ি। তখন সেই ভদ্রলোকের সহিত মিশিলাম; তিনিও আমায় যথেষ্টরূপ সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভদ্রলোকটির বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ আম্র বৃক্ষ ছিল; সেই আম্র বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলে শ্যামাচরণের গৃহের কোন কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হইত। কোন কোন দিন রাত্রে সেই আম্র বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া থাকিতাম; বসিয়া বসিয়া ভিতরস্থিত অবস্থা যতদূর দেখিতে পাইতাম দেখিতাম। ওই বাড়িতে কেবল শ্যামাচরণ ও বৃদ্ধা থাকিতেন, ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন জানিতে পারিলাম, উহা আরও কয়েকজনের আবাসস্থল; দু-একজন স্ত্রীলোকও ওতে আছে। ওই বাড়ির কেবলমাত্র একটি দরজা; ওই দরজা ছাড়া বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইবার আর কোন উপায় ছিল না। দরজা কিন্তু সর্বদাই ভিতর হইতে বন্ধ থাকিত। বাড়ির ভিতর হইতে বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি অমনি দরজা বন্ধ হইত। ওই বাড়ির কোন ব্যক্তি বাহির হইতে আসিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিত, তখন সেই দরজা-সংলগ্ন একটি 'কড়া' ধরিয়া শব্দ করিলেই অমনি ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া যাইত। কিন্তু কোন বাহিরের লোক আসিয়া সেই 'কড়া' নাড়িলে, হঠাৎ কেহ দরজা খুলিয়া দিত না; সে ব্যক্তি কে, কি কার্যে আসিয়াছে প্রভৃতি সমস্ত বিষয় ভিতর হইতে প্রথম কেহ জানিয়া লইয়া, আবশ্যক হইলে, পরিশেষে দরজা খুলিত। আমি ইহা দেখিয়া বুঝিলাম যে 'কড়া' নাড়ার ভিতরেও রহস্য আছে। আবশ্যক হইলে বাড়ির দরজা ভাঙিয়া প্রবেশ করার ক্ষমতা যদিও আমার আছে, কিন্তু সেই উপায়ে দু-দু বার ঠকিয়াছি, ওইরূপে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক হয়, তাহার ভিতরই উহারা মুদ্রা-নির্মাণ উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই কোথায় যে রাখিয়া দেয়, তাহার আর কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং দরজা ভাঙিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা এবার পরিত্যাগ করিলাম। কৌশল করিয়া সকলের অগোচরে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দরজার 'কড়া' নাড়ার রহস্য যদি কিছু অনুমান করিয়া লইতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। প্রায় একমাস কাল 'কড়া' নাড়া বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে অনুমান দ্বারা উহা একপ্রকার স্থিরও হইয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, ২৪ ঘণ্টায় ভিন্ন ভিন্ন ২৪ রকম কড়া-নাড়া উহাদিগের সঙ্কেত। কড়া নাড়ার রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটু আনন্দ হইল। কোন সময় উহারা মুদ্রা নির্মাণ করে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

একদিন রাত্রি দুটোর সময় সেই ভদ্রলোকটির সহিত আমি তাঁহার রান্না-ঘরের ছাদের উপর উঠিলাম। এই ছাদের উপর স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই উঠিত না; সেই বাড়ি স্ত্রীলোকগণের বায়ু-সেবনের নিমিত্তই এই ছাদ নির্মিত হয়। এই ছাদের চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা এরূপভাবে আবৃত ছিল যে, কোন স্থান হইতে কেহই ছাদস্থিত

কাহাকেও দেখিতে পাইত না। কিন্তু প্রাচীরের স্থানে স্থানে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্র দিয়া বাহিরের দিকে অল্প অল্প দৃষ্টি চলিত।

সেই ছাদের উপর বেড়াইতে উঠিয়া একটি ছিদ্র দিয়া আমরা দেখিলাম যে, শ্যামাচরণের উপরের ঘরের একটি জানালা অল্প খোলা রহিয়াছে এবং সেই ঘরের প্রজ্জ্বলিত দীপের আলোকে ঘরের ভিতরের অল্প অল্প অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তখন আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম; এবং পরিশেষে দেখিতে পাইলাম যে, সেই ঘরের ভিতর তিন চারি ব্যক্তি একত্র-মিলিত হইয়া ছোট একটি কলের সাহায্যে বাস্তবিকই কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছে।

ইহার পূর্বে যখন দুবার শ্যামাচরণকে ধরিবার চেষ্টা করি, সেই সময় আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া একবার লইয়া যাই, পরিশেষে বিশেষ লজ্জিত হই। সুতরাং এবার আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে কোনরূপ সংবাদ না দিয়া ওই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিব স্থির করিলাম। সেই ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে থানা অভিমুখে ছুটিলাম; এবং থানা হইতে ৪/৫ জন কনস্টেবল লইয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিলাম। কনস্টেবল কয়েকজনকে তখন সেই ভদ্রলোকটির বাড়ির ভিতর লুকাইয়া সেই রান্নাঘরের ছাদের উপর পুনরায় উঠিয়া দেখিলাম যে, তখনও মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে!

এই অবস্থা দৃষ্টে আর তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া সকলে মিলিয়া আস্তে আস্তে সেই বাড়ির দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সকলে সেই স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, আমি তখন সময়-অনুযায়ী কড়ার শব্দ করিতে লাগিলাম। শব্দ-মাত্র ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। আমরা সকলে দরজা ঠেলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি একটি প্রদীপ হস্তে আমাদিগকে দরজা খুলিয়া দিয়াছে। সে আমাদিগকে দেখিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কারা? এত রাত্রে কাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছ?' আমি বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিলাম, 'আমরা যাহার অনুসন্ধানেই আসিয়া থাকি না কেন, তুমি যদি আর কোন কথা কহিবে, তাহা হইলে এখনই তোমার মস্তক চূর্ণীকৃত করিব।' এই বলিয়া তাহাকে একজন কনস্টেবলের জিম্মা করিয়া দিলাম। অপর আর একজনকে দরজার ভার অর্পণ করিয়া, দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমাদিগকে উপরে উঠিতে দেখিয়া বৃদ্ধা ম্রিয়মান হইয়া পড়িল, ও হস্তস্থিত প্রদীপ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কহিল, 'আমি কথা কহিতে চাই না। তবে উপরে একটি লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত; তোমরা একটু আস্তে আস্তে উপরে উঠ।'

আমি বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উপরে উঠিলাম। একে অন্ধকার, তাহাতে অপরিচিত বাড়ি—কাজেই উপরে উঠিতে একটু সময়ও লাগিল। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, কেবল তিনটিমাত্র ঘর আছে; আর তার তিনটি ঘরেরই দরজা বন্ধ। কিন্তু

দরজার ফাঁক দিয়া ভিতর হইতে অল্প অল্প আলোক দেখা যাইতেছিল। আমি তিনটি ঘরের দরজাতেই লোক রাখিয়া, একটি দরজায় অল্প ধাক্কা দিলাম। আপনিই খুলিয়া গেল। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তখন দেখিলাম, সেই ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার নিকট খাটের উপর এক ব্যক্তি পুস্তক হস্তে শয়ন করিয়া কি পড়িতেছে। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই সে উঠিয়া বসিল ও আমাকে কহিল, 'আপনি কে? এত রাত্রে আপনি এখানে কাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন?' এই অবস্থা দেখিয়া আমি তো অবাক্! তখন কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, আমি কহিলাম, 'আমি শ্যামাচরণবাবুর অনুসন্ধানে আসিয়াছি।' আমার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিল, 'শ্যামাচরণবাবু এ ঘরে থাকেন না। ওই পাশের ঘরে দেখুন।' আমি আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সেই ঘর হইতে বর্হিগত হইলাম। পাশের ঘরের দরজাও একটু সামান্য ধাক্কা দিতেই উহা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সে ঘরের ভিতরেও একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে; আর চারি ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া তাস খেলা করিতেছে। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই শ্যামাচরণ আমাকে চিনিল, ও আস্তে আস্তে কহিল, 'কি! এবারও আবার কৃত্রিম-মুদ্রা ধরিতে আসিয়াছ নাকি?'

শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া আমি তো অবাক। যাই হোক বলিলাম, 'শ্যামাচরণ, এবার আর তোমার কথা শুনিব না। আমি নিজ চক্ষে এখনই তোমাকে মুদ্রা নির্মাণ করিতে দেখিয়াছি। আর আমি একাকীও নহি যে আমার ভুল হইতে পারে। যাহা হউক, এখন যদি বিশেষরূপে অপমানিত না হইতে চাহ তবে যন্ত্রাদি সমস্ত কোথায় রাখিয়াছ, বল!' আমার কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ একটু হাসিল ও কহিল, 'এখন রহস্য করিবার সময় নহে। পাশের ঘরে একটি লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহাকেই তীরস্থ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এত রাত্রি পর্যন্ত এইস্থানে বসিয়া আছি ও তাস খেলিয়া কেবল রাত্রি অতিবাহিত করিতেছি। আপনি অত জোর করিয়া কথা কহিবেন না। কারণ ওই ঘরের ভিতর যে ডাক্তার বসিয়া আছেন, তিনি এই স্থানে শব্দাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন; আমাদিগকে পর্যন্তও ওই ঘর হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে, বলুন; নতুবা সময়মত কল্য একবার আসিবেন—আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, সাধ্যমত করিয়া দিব।'

শ্যামাচরণের অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া আমি তো স্তম্ভিত! আমার মুখ দিয়া আর বাক্য নির্গত হইল না। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, 'আমার কি মতিভ্রম হইয়াছে, না বহুদিবস এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে চিন্তিত বিষয়কে সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া লইয়াছি!' যাহাই হউক, আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শ্যামাচরণ পুনরায় আমাকে কহিল, 'আমি আপনাকে যাহা বলিলাম, বোধ হয়, আপনার তাহা বিশ্বাস হইতেছে না। আপনি যাইয়া স্বচক্ষে রোগীর অবস্থা দর্শন করুন।

তাহা হইলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।' এই বলিয়া শ্যামাচরণ আমাকে লইয়া সেই তৃতীয় গৃহের দরজায় উপস্থিত হইল। দরজায় হাত দিতে না দিতেই দরজা খুলিয়া গেল। সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। দেখিলাম সেই ঘরের মধ্যস্থলে একটি সামান্য বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে, আর তাহার উপর এক ব্যক্তি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পতিত। তাহার মস্তকের নিকট একজন বিংশতি বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোক অর্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া একটি তৃতীয় বর্ষ বয়স্ক বালককে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটির দুইটি চক্ষু সেই রোগীর মুখের উপর যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার যোগে মিলিত হইয়া গিয়াছে; আর সেই পলকহীন নীল চক্ষু দিয়া জলধারা নির্গত হইয়া নাসিকা গণ্ড ও বক্ষস্থল বহিয়া পরিধেয় বসন ভিজিয়া যাইতেছে। ঘরের এক পার্শ্বে একখানি চৌকির উপর পেন্টুলাম-চাপকান্ আটিয়া, চেন ঝুলাইয়া, এক ব্যক্তি বাম-হস্ত কপালে দিয়া ও দক্ষিণ-হস্তে একটি 'থারমোমিটার' ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সেই স্ত্রীলোকটির বাম-হস্তের নিকটে কয়েকটি শিশি রহিয়াছে; তাহার কোনটিতে অর্ধেক, কোনটিতে বা সিকি পরিমাণ লাল সাদা প্রভৃতি রঙের নানাবিধ ঔষধ রহিয়াছে।

আমাকে দেখিবামাত্রই সেই পেন্টুলান-চাপকানধারী মানুষটি আস্তে আস্তে আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন ও আমাকে কহিলেন, 'মহাশয়, এখানে কোন প্রকার কথা কহিবেন না, বা কোনরূপ গোলযোগ করিবেন না। যদি আমার নিকট আপনার কোন প্রয়োজন থাকে তবে আমার বাসায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বোধ হয়, আপনি আমাকে উত্তমরূপে চেনেন না; আপনি শ্যামবাজারের ডাক্তারবাবুকে জানেন কি?' ডাক্তার মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, 'হ্যাঁ মহাশয়, আমি ক্ষেত্রবাবুর নাম বিশেষরূপে অবগত আছি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই।' আমার এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 'আমি সেই ক্ষেত্র ডাক্তার—এই আমার ঠিকানা।' এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া প্রদান করিলেন। সেই সময় সেই স্ত্রীলোকটি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহাশয়, এখন একবার দেখুন দেখি, কেমন কেমন বোধ হইতেছে।'

এই কথা শুনিয়া ডাক্তার মহাশয় পূনর্বার সেই রোগীর নিকট গমন করিলেন। হস্ত, পদ, মস্তক ও বক্ষস্থল প্রভৃতি উত্তমরূপে দেখিয়াই কহিলেন, 'আর কি দেখিব, হইয়া গিয়াছে।' এই বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষে প্রদানপূর্বক ঘর হইতে বাহির হইলেন।

তখন সেই ঘরের যে কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন। এখন তাহা বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব। সেই রমণী আপন ক্রোড়স্থিত শিশুটিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; এবং বারে বারে ভূমিতে পড়িয়া আপন

শরীরকে ব্যথিত করিয়া তুলিতে লাগিল; তাহার মস্তকের বেণী খুলিয়া গেল, শরীরের বসন খসিয়া গেল; কপালে করাঘাত করিতে করিতে তাহার কপাল দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আর তখন তাহার সেই হৃদয়ভেদী উচ্চ চিৎকারে বাড়ির সকলেই আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইল; শিশুটি উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া, হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমার চক্ষু দিয়াও জল আসিল। আমি আমার লোক কয়েকজন লইয়া নিচে নামিলাম।

নিচেয় গিয়া ভাবিলাম, 'এখন এ বাড়ির কি ভয়ানক অবস্থা! এখন যে ইহার ভিতর কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব! কিন্তু যখন নিজ চক্ষে দর্শন করিয়াছি, তখন কি করিয়াই বা উহাকে মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিয়া লই! যাহা হউক, যখন এই বাড়ির ভিতর কোনরূপে প্রবেশ করিয়াছি, তখন একবার ভাল করিয়া না দেখিয়াও যাওয়া কোন প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন ইহারা মৃতদেহ লইয়া গমন করিবে, সেই সময় একবার ঘরগুলি দেখিয়া লইব। কৃত্রিম মুদ্রা পাই আর না পাই, যন্ত্রটিও পাইলে পাইতে পারি!' এই ভাবিয়া আমি সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে সেই মৃত ব্যক্তির নিকট গিয়া গোলযোগ করিতে লাগিল। কেহ বা সেই স্ত্রীলোকটিকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় কত প্রকার বুঝাইতে লাগিল; আর কেহ বা বালকটিকে লইয়া ব্যস্ত হইল; কেহ বা মৃতদেহটিকে ঘর হইতে বাহিরে আনিবার প্রস্তাব করিল; আর কেহ বা তাহাতে নিবারণ করিয়া কহিল, 'যখন ঘরের ভিতর বিছানার উপর ইহার মৃত্যু হইয়াছে তখন বাহিরে লইয়া আর লাভ কি!—নাহোক টানাটানি করা মাত্র। যখন খাট আসিবে, তখনই একেবারে খাটের উপর উঠাইয়া লইয়া যাওয়া যাইবে। দুই একজন গমন করিয়া একখানি খাট খরিদ করিয়া আন; মৃতদেহ এখান হইতে লইয়া যাওয়াই উচিত। ঘরের ভিতর মৃতদেহ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফেলিয়া রাখা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।' এই কথা শুনিয়া দুইজন খাট আনিবার অভিপ্রায়ে বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গেল ও কিয়ৎক্ষণ পরে একখানি দড়ির খাট লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। খাটখানি উপরে লইয়া যে ঘরে মৃতদেহ ছিল, সেই ঘরের ভিতর লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই খাট-সমেত মৃতদেহ নামাইয়া আনিয়া অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমার সম্মুখেই রাখিল! দেখিলাম, মৃতদেহটি একখানি মোটা চাদর দিয়া ঢাকা রহিয়াছে; কিন্তু মস্তক খোলা রহিয়াছে। ওই মৃত ব্যক্তির চক্ষু ও মুখ দেখিয়া আমিও বুঝিলাম যে, সে নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। অতঃপর আমার সম্মুখে সেই চাদরের এক প্রান্ত দিয়া উহার মুখ ঢাকিয়া দিয়া, কয়েকজন সেই খাট-সমেত সেই মৃতদেহ উঠাইয়া আপন স্কন্দের উপর রাখিল ও মুখে 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গেল। অবশিষ্ট এক ব্যক্তি

সেই স্ত্রীলোকটিকে ও বালককে লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। স্ত্রীলোকটি সেই সময়ে আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া সকলের হৃদয়েই বিষম শোকের উদ্রেক করিয়া দিল।

সেই বাড়ির ভিতর কেবল সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ভিন্ন তখন আর কেহই রহিল না। আমি কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানেই অপেক্ষা করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সূর্যদেব আপন স্থান অধিকার করিলেন। তখন আমি সেই বাড়ির সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিচের প্রত্যেক ঘরগুলি দেখিলাম, উপরের দুইটি ঘরও দেখিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। পরিশেষে সেই মৃত ব্যক্তি যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে গমন করিলাম; এবং ঘরের সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। পরিশেষে যে মাদুরের উপর সেই মৃতদেহ ছিল, সেই মাদুরটি উঠাইয়াই আমার মন যেন কেমন হইল। সেই স্থানের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলাম, চতুর শ্যামাচরণ এবারও আমাদের সহিত চতুরতা করিয়া, আমাদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়াছে। অনুসন্ধানে সেইস্থানে আমি চিহ্ন প্রভৃতি দেখিলাম। আর দেখিলাম সেইস্থানে একখানি কাষ্ঠফলক রহিয়াছে। তখন সেই কাষ্ঠখণ্ড উঠাইলাম। দেখিলাম তাহার নিচে একটি গহ্বর—দুই ফিট প্রশস্ত তিন ফিট লম্বা ও এক ফুট গভীর। উহার ভিতর ভস্মাদি রহিয়াছে; স্থানে স্থানে গলিত ধাতুর চিহ্নও বিদ্যমান আছে। এই অবস্থা দেখিয়াই আমি তো অবাক! তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই বাড়ির বাহিরে আসিলাম। একখানি গাড়ি লইয়া আমি প্রথমে কাশী মিত্রের ঘাট পরে নিমতলার ঘাটে গমন করিলাম। সেইস্থানে মৃতদেহের কোন সন্ধান পাইলাম না; বরং ইহাই জানিতে পারিলাম যে, সেইস্থানে সেই সময়ে সেই প্রকারের কোন মৃতদেহ আইসে নাই। সেইস্থান হইতে ডাক্তার ক্ষেত্রনাথবাবুর বাড়িতে গমন করিলাম; ডাক্তারবাবুর অনুসন্ধান করিলাম; একটি বাবু বাহির হইয়া আসিলে আমি তাঁহাকে সেই ডাক্তার প্রদত্ত কার্ডখানি দেখাইয়া কহিলাম, 'আমি ডাক্তারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।' বাবুটি আমার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'এ কার্ডখানি আমারই।' আমারই নাম ক্ষেত্রনাথ ডাক্তার। ইহাতে আমি আরও আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তাঁহাকে কহিলাম, 'মহাশয়, আমার সহিত তো আপনার কাল রাত্রিতে দেখা হয় নাই। যিনি ক্ষেত্রবাবু পরিচয়ে আমাকে এই কার্ড দিয়াছেন, তিনি তো আপনি নহেন!' এই বলিয়া ডাক্তারবাবুকে সকল কথা বলিলাম। তিনিও শুনিয়া অবাক হইলেন। তাহার কার্ড কিরূপে কোন জুয়াচোরের হস্তে পড়িল, তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমিও নিতান্ত লজ্জিত মনে সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু মনে মনে শ্যামাচরণের কৌশলকে ধন্যবাদ দিলাম; তাহার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। শ্যামাচরণ সেই মৃতদেহের সহিত বাড়ি হইতে বহির্গত হইবার পর আর সেই বাড়িতে

প্রত্যাগমন করিল না। তাহার পর দুই মাস পর্যন্ত নানারূপে উহাদিগের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোনস্থানেই তাহার সন্ধান পাইলাম না।

এই ঘটনার প্রায় চার মাস পরে পুনরায় শ্যামাচরণের অনুসন্ধান পাইলাম। এবার দেখিলাম, শ্যামাচরণ শহর পরিত্যাগ করিয়া শহরতলীতে অবস্থান করিতেছে। শ্যামাচরণ আমাকে উত্তমরূপে চিনিয়াছে বলিয়া, এবার আর আমি তাহার বাড়ির নিকট গমন না করিয়া, আমার বিশ্বাসী অন্য আর একজনের নিকটে সাহায্য গ্রহণ করিলাম। যে বাড়িতে শ্যামাচরণ অবস্থান করিতেছিল, সেই বাড়ির সম্মুখেই রাস্তার উপর একটি ঘর ভাড়া লইলাম ও সেই ঘরে একটি মনিহারী দোকান খুলিয়া দিলাম। আমার বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি সেই দোকানে বসিয়া সামান্য বেচা-কেনা আরম্ভ করিলেন। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য দোকানের উন্নতিসাধন নহে, কেবল শ্যামাচরণের সহিত মেশামেশি করা। ক্রমে কার্যত ঘটিল তাহাই। সেই দোকানের নিকট দিয়া শ্যামাচরণের গমনাগমন কালে ক্রমে আমার সেই লোকের সহিত তাহার আলাপ হইল। সেই দোকানে আসিয়া, কখনও দোকানে বসিয়া শ্যামাচরণের ক্রমে ধূমপান আদিও চলিতে লাগিল।

একদিন শ্যামাচরণ সেই দোকান হইতে ৯০ আনা মূল্যের একটি সামগ্রী ক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্তে একটি সিকি প্রদান করিল। আমার লোকটি তখন দেখিলেন যে, সেটি প্রকৃত সিকি নহে—কৃত্রিম। কিন্তু শ্যামাচরণকে কিছুই না বলিয়া অবশিষ্ট ৯০ আনা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। দুই দিবস পরে পুনরায় শ্যামাচরণ আর একটি দ্রব্য লইয়া তাহার পরিবর্তে একটি কৃত্রিম টাকা প্রদান করিল। অদ্য আমার উপদেশমত শ্যামাচরণকে একটি আভাস দেওয়া হইল। সেই লোকটি শ্যামাচরণকে কহিলেন, 'সেদিন সিকিতে আমার চারি পয়সা লোকসান হইয়াছে। সুতরাং আমি এই টাকার পরিবর্তে ৪০ আনার অধিক দিতে পারিব না; আর, এই মূল্যে আপনি আমাকে যত টাকা দিবেন, ততই লইতে প্রস্তুত আছি।' এই কথা শুনিয়া শ্যামচরণ প্রথমে যেন একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইল। কিন্তু পরিশেষে ৪০ আনা মূল্যেই সেই টাকা প্রদান করিল। ইহার পরে আমার লোকের সহিত শ্যামাচরণের মনের মিল হইতে লাগিল; ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল পর্যন্ত তাঁহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে শ্যামাচরণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। একটি-দুটি হইতে আরম্ভ করিয়া করিয়া ক্রমে ৫০্ টাকা পর্যন্তও প্রদান করিতে লাগিল; তিনিও উহার পরিবর্তে নিয়মিত মূল্য প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃত্রিম-মুদ্রাসকল যাহা শ্যামাচরণ তাহাকে ৪০ আনায় বিক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহার সমস্তই আমার নিকটে জমিতে লাগিল। যখন দেখিলাম যে, আমার সেই লোকের উপর শ্যামাচরণের কোনরূপ অবিশ্বাস নাই তখন কৃত্রিম-মুদ্রা চালান-অপরাধে তাহাকে মুদ্রা-সহিত ধরাই সাব্যস্ত করিলাম। একদিন আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহিত সেই দোকনের ভিতর এক স্থানে লুকাইয়া থাকিলাম। সেইদিন

শ্যামাচরণের ৫০টি মুদ্রা আনার কথা ছিল। দেখিতে দেখিতে শ্যামাচরণ বন্দী হইল। আমাদিগের লোকজন সংগ্রহ ছিল; সুতরাং তখন মুহূর্তের মধ্যেই যে বাড়িতে শ্যামাচরণ থাকিত, সেই বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিলাম। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এই স্ত্রীলোকটিকে আমি চিনিতে পারিলাম। পূর্বে ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল; এবং ইনিই এই পুত্রটিকে লইয়া স্বামী-বিরহে রোদনপূর্বক আমার কঠিন হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়াছিলেন।

এবার শ্যামাচরণ অগ্রেই ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং বাড়ির ভিতরস্থিত দ্রব্যাদি লুকাইবার কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই অনুসন্ধানে সমস্ত দ্রব্যই বাহির হইয়া পড়িল। ঘর তল্লাস করিতে করিতে ৫ হাত উর্ধ্বে দেওয়ালের ভিতর একটি ছিদ্র পাওয়া গেল; সেই স্থান খনন করাতে প্রায় পাঁচ শত কৃত্রিম মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি কূপ ছিল, তাহার ভিতর হইতে একটি কাষ্ঠের বাক্স বহির্গত হইল। সেই বাক্সের ভিতর লৌহ ও পিতল-নির্মিত মুদ্রানির্মাণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি পাইয়া ও দলের সমস্ত লোকের নামাধামাদি অবগত হইয়া, আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদিগের এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হইল। পরিশেষে আলিপুরের সেসনে শ্যামাচরণের বিচার হয়। সেই স্থান হইতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। কিন্তু অন্যান্য সকলে সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইল।

শ্যামাচরণ কারারুদ্ধ হইল সত্য কিন্তু কি উপায়ে তিন তিন বার শ্যামাচরণ আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল কোনরূপেই নিবারিত হইল না। আমি একদিন জেলের ভিতর গমন করিয়া শ্যামাচরণকে আমার মনোভিলাষ অবগত করিলাম। তাহাতে সে কেবল এইমাত্র কহিল যে—

'প্রথম দিবস যখন আপনারা আমার বাড়িতে প্রবেশ করেন সেই সময় আমরা কৃত্রিম-মুদ্রা নির্মাণ করিতেছিলাম। যখন আপনারা দরজা ভাঙিতেছিলেন, সেই অবকাশের মধ্যে তাড়াতাড়ি সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্বক একখানি কাপড়ে উত্তমরূপে বাঁধিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে যে একখানি বাঁশ পোঁতা ছিল, সেই বাঁশের সাহায্যে, আমার বাড়ির পার্শ্বস্থিত বাড়ির ভিতর উহা রাখিয়া দিই। অন্য লোকের বাড়ি—আপনারা অনুসন্ধান করেন নাই। কাজেই কিছুই প্রাপ্ত হন নাই।

'দ্বিতীয় দিবস যখন আপনারা প্রবেশ করেন, তখন দ্রব্যাদি লুকাইবার অবকাশ পাই নাই। কিন্তু আমাদিগের ভিতরস্থিত একটি লোক পূর্ব হইতেই কনস্টেবলের পোশাকে সজ্জিত ছিল। আপনারা কনস্টেবল-সহিত যখন প্রবেশ করেন, তখন সেও আপনাদিগের সহিত মিলিত হয়। সে যে আপনাদিগের আনীত কনস্টেবল নহে, রাত্রে তাহা আপনারা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। যখন একজন কনস্টেবলকে আপনারা

বাহিরের দরজায় পাহারার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন, সেইসময় আমাদের সেই সজ্জিত কনস্টেবল পাহারা দিবার ভান করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া বাড়ির বাহিরে গমন করে এবং যন্ত্রাদি সমস্তই ক্রমে লুকাইয়া ফেলে। কিন্তু আপনারা ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

'এইরূপে তৃতীয় দিবস যেরূপে আপনাকে ফাঁকি দিয়াছিলাম, তাহা তো আপনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। খাটে করিয়া যখন মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় উহার উপর করিয়াই সমস্ত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইয়া প্রস্থান করি। সেটি মৃতদেহ ছিল না; দলস্থিত এক ব্যক্তিই মৃতদেহের মতন পড়িয়া ছিল। আর, তাহার স্ত্রী বলিয়া যে আপনাকে পরিচয় দিয়াছিল সে, ডাক্তার প্রভৃতি অপরাপর সমস্ত লোক যাহাদিগকে আপনারা দেখিয়াছিলেন, তাহারা সমস্তই আমাদিগের দলভুক্ত।'

শ্যামাচরণের এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলাম, আমি এতদিন কর্ম করিয়া যে জ্ঞান উপার্জন করিতে সমর্থ হই নাই, এক শ্যামাচরণের নিকটে তাহার অধিক জ্ঞান উপার্জন করিলাম; এবং তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে জেল হইতে বহির্গত হইলাম। সেই সময় হইতেই শ্যামাচরণের দল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, তাহার অধিকাংশই কলিকাতা পরিত্যাগ-পূর্বক, আপন আপন দেশে গমন করিল। কৃত্রিম-মুদ্রার প্রচলন ক্রমে কম হইয়া আসিল।
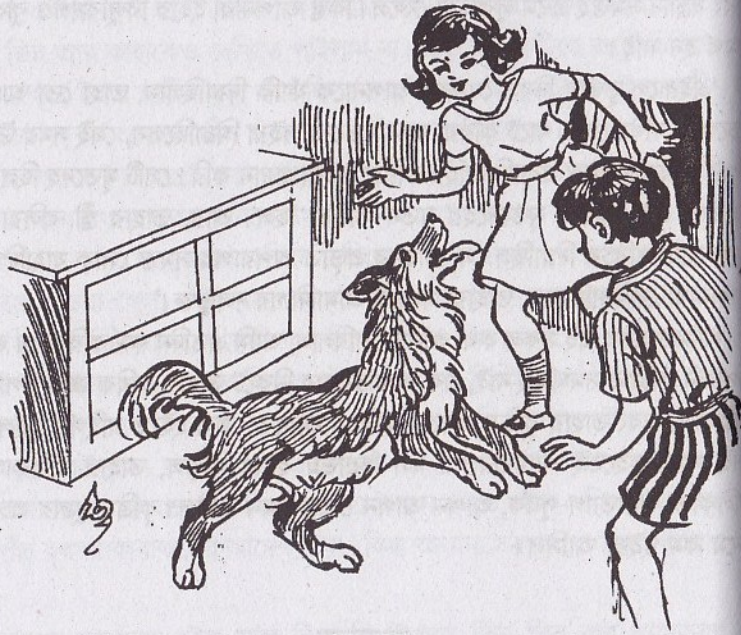
হীরে উধাও রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটোমাসির বাড়ির ছাদে দারুণ এক পিকনিক হল লক্ষ্মীপুজোর রাত্তিরে। প্রত্যে বছরই হয় এরকম, তবে এ বছর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের ছোটমামা আসায় আর জমে গিয়েছিল। ছোটমামা গল্প করতে পারেন।

ছোটমাসির বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। তার একটা কোণ তেরপল দিয়ে একটুখানি ঘি দিয়ে সেখানে পাতা হয় ইঁটের উনুন। আর ছাদের অন্যদিকে সতরঞ্চি পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে গান-বাজনা আর আড্ডা। সে রাতে কিন্তু কোনো আলো জ্বালা হ না। কোজাগরী পূর্ণিমায় এমন জ্যোৎস্না থাকে যে তখন অন্য কোনো আলো জ্বাললে বিচ্ছিরি দেখায়। আর সেইজন্যই তো ছাদে পিকনিক। প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ জ এসেছিল সেই পিকনিকে। ছোটমাসির দুই মেয়ে হাসি আর খুশির সাত আটজন বন্ধু

ওদের ভাই বাবলুর চার-পাঁচজন বন্ধু। বড় মাসি আর সেজমাসির ছেলেমেয়েরা। অর্থাৎ ছোটরাই বেশি। ছোটমাসি আর ছোটমামার চেনাশুনো কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমি চিনতাম না আগে।

দু'তিনজন কাজের লোকের সাহায্য নিয়ে রান্নার দিকটা সামলাচ্ছেন আমাদের বড়মাসি। তাঁর হাতের রান্না চিংড়িমাছের মালাইকারি যে একবার খেয়েছে সে আর জীবনে ভুলবে না।

ওদিক থেকে রান্নার চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে, আর ওপাশে জমে উঠেছে আনন্দের আড্ডা।

প্রথমে হাসি আর খুশি আর তার বন্ধুরা কয়েকখানা গান শোনাল কোরাসে। ছোটমামার এক বন্ধু সুজিতবাবু ম্যাজিক দেখালেন কয়েকটা। অদ্ভুত ম্যাজিক জানেন তিনি। একেবারে খালি হাত, কোনো যন্ত্রপাতি নেই, এক জায়গায় বসে বসে তিনি অত্যাশ্চার্য কাণ্ড দেখাতে লাগলেন। রান্নার জায়গা থেকে দুটো ডিম আনতে বলে তিনি সেই ডিম দুটো তার সামনে রেখে রুমালে ঢেকে দিলেন। একটু বাদেই রুমাল তুলে নিতেই দেখা গেল ডিমের বদলে সেখানে রয়েছে একদম বাচ্চা দুটো মুরগির ছানা। আবার সে দুটোকে রুমাল ঢেকে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, এখন এখানে কি আছে?

আমরা সবাই বললুম, মুরগির ছানা।

উনি বললেন, ঠিক? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন রুমালটা তোল।

খুশি রুমালটা তুলেই বলে উঠল, ও মা!

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম মুরগির ছানা নেই, সেখানে ডিম দুটো আবার ফিরে এসেছে।

আরও কত সব চমকানো খেলা। তার মধ্যে আর একটা খেলাতে আমি খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলুম।

একটা দশ টাকার নোট অনেকগুলো ভাঁজ করে সুজিতবাবু ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যাঃ!

নোটটা আর নিচে পড়ল না। কী যে হল আমরা কেউই বুঝতে পারলুম না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টাকাটা কোথায় গেল? একেবারে উড়িয়ে দিলেন।

সুজিতবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? তুমিই তো টাকাটা নিলে! ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখ—

সত্যিই আমার পকেটে সেই ভাঁজ করা দশ টাকার নোটটা। সবাই হাসতে লাগল আমার দিকে চেয়ে।

আমি সুজিতবাবুর থেকে অনেকটা দূরে বসেছিলাম। তবু ওই টাকাটা আমার পকেটে গেল কি করে? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?

ম্যাজিকের পর হল ধাঁধা, তারপর মেমারি গেম, তারপর আবার গান। শেষকালে ছোটমামা যেই অস্ট্রেলিয়ার গল্প শুরু করেছেন, অমনি বড় মাসিমা এসে তাড়া দিলেন, এবার খেতে বসো সবাই, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার! তাছাড়া একটু বাদে মাথায় হিম পড়বে!

খবরের কাগজ পেতে বসা আর কলাপাতায় খাওয়া। এক ব্যাচে হল না, দু' ব্যাচে। ভাত, নারকেল দিয়ে রান্না মটর ডাল, বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা, আর চিংড়িমাছের মালাইকারি। কী অপূর্ব যে খেতে লাগল কী বলব! খেতে খেতে সিদ্ধার্থ নামের একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, থ্রি চিয়ার্স ফর বড়মাসি...হিপ...হিপ...। সবাই বলল হু-র-রে! তারপর ছোটমাসির নামেও থ্রি চিয়ার্স দেওয়া হল।

প্রথম ব্যাচ খাওয়া শেষ হবার পর দ্বিতীয় ব্যাচ সবেমাত্র বসেছে, আমার ওপর পড়েছে পরিবেশন করার ভার, এই সময় একটা কাণ্ড হল।

কোথা থেকে ছাদে উঠে এল একটা কুকুর।

রাস্তার নেড়িকুত্তা নয়, বড় বড় লোমওয়ালা একটা সাদা কুকুর অনেকটা জার্মান স্পিত্‌স ধরনের। কুকুরটা ছাদে এসেই দারুণ জোরে দৌড়াতে লাগল, এদিক-ওদিক। সবাই একি একি বলে উঠে দাঁড়াল।

ছোটমাসির সাঙ্ঘাতিক কুকুরের ভয়। যত ছোট কুকুরই হোক না। ছোটমাসি একদম কুকুর সহ্য করতে পারেন না। ছোটমাসি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় নাচের মতন তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বলতে লাগলেন, ওমা, একি! একি! এটা কোথা থেকে এল রে!

ছোটমাসির মেয়েরা কিন্তু কুকুরকে ভয় করে না। হাসিই ধরে ফেলল কুকুরটাকে। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বলল, বাঃ, কী সুন্দর কুকুরটা! কাদের এটা!

এ বাড়িতে কুকুর নেই। সত্যি, কোথা থেকে এল?

ছাদের কার্নিস দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেল যে রাস্তায় একজন বুড়ো মতন লোক একটা চেন হাতে নিয়ে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। কুকুরটা নিশ্চয়ই ওঁরই। কোনোরকমে চেন ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। একজন নিচে গিয়ে কুকুরটা ফেরত দিয়ে এল।

যাক্, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কুকুরটা দুটো কলাপাতা মাড়িয়ে দিয়েছিল। সে দুটো বদলে দিয়ে আবার খেতে বসল দ্বিতীয় ব্যাচ।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ছোটরা প্রায় সবাই চলে গেল। বড়রাও গেছে অনেকে। আমরা সাত আটজন তখনও বসে ছোটমামার ক্যাঙারু ধরার গল্প শুনছি, এমন সময় হঠাৎ ছোটমাসি বলে উঠলেন, একি, আমার নাকছাবি?

ছোটমাসি সেদিন নাকে একটা সুন্দর হীরার নাকছাবি পরেছিলেন, আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। এখন সেটা নাকে নেই।

ছোটমামা বললেন, নিশ্চয়ই এখানে কোথাও খুলে পড়েছে, খুঁজে দ্যাখ্!

বড়মাসি বললেন, কুকুরটা দেখে তুই যেমন তিড়িং বিড়িং করে লাফালি তাতে নাকছাবি খুলে পড়বে, সেটা আর আশ্চর্য কি!

এবার আর জ্যোৎস্নার আলোর ওপর ভরসা করা যায় না। খুশি দৌড়ে নিচ থেকে নিয়ে এল টর্চ। ছোটমাসি যেখানে বসেছিলেন খুঁজে দেখা হল। হীরের নাকছাবি সেখানে নেই।

তখন আরও টর্চ আনা হল, জ্বেলে দেওয়া হল ছাদের আলো। সবাই মিলে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু সেটা পাওয়া গেল না।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এর মধ্যে নিচে গিয়েছিলি? মনে করে দ্যাখ তো!

ছোটমাসির স্বভাব খুব ছটফটে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। আমি যতবারই এ বাড়িতে এসেছি, ততবারই দেখেছি যে ছোটমাসি চটি পায়ে দিয়ে ফটফটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ি। ছোটমাসির দারুণ স্বাস্থ্যবাতিক। কিছু একটাতে হাত দিলেই অমনি হাত ধোওয়া চাই। তাঁর চটিও অনেকগুলো! রান্নাঘরের চটি, শোবার ঘরের চটি, ছাদের চটি—সব আলাদা আলাদা।

কিন্তু আজ ছোটমাসি অন্তত দু'ঘন্টার মধ্যে নিয়ে যাননি, সবাই বলল। হাত ধুয়েছেন মোটে তিনবার। ছাদেই একটা কল আছে, সেখানে। তবে কি হাত ধোওয়ার সময় নর্দমা দিয়ে জিনিসটা চলে গেল? সেখানটায় খোঁজা হল ভাল করে। নর্দমার ঝাঁঝরিতে শ্যাওলা জমে আছে, জল যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সেখান দিয়ে একটা নাকছাবি চলে যাবে, এমন বিশ্বাস হয় না।

ম্যাজিসিয়ান সুজিতবাবু বললেন, যখন কুকুরটাকে দেখে আপনি নাচলেন, তখন আপনার নাকে নাকছাবি ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি। আমার একটু খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু ভেবেছিলাম, আপনি নিজেই খুলে রেখেছেন।

হাসি আর খুশি বলল, কিন্তু মা, মেমারি গেমের সময় যখন তুমি হেরে গিয়ে খুব হাসছিলে, তখন তোমার নাকে ওটা চকচক করেছিল, আমরা দেখেছি। তারপর তো তুমি আর নিচে যাওনি।

ছোটমাসি হঠাৎ বড় বড় চোখ মেলে সুজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ওটা লুকিয়ে রেখেছেন, তাই না। সুজিতবাবু বললেন, আরে না, না! ওরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক আমি করি না।

সবাই মিলে সুজিতবাবুকে চেপে ধরা হল, তিনি বারবার ওই কথাই বলতে লাগলেন।

তখন ছোটমাসি বললেন, আপনি ম্যাজিক জানেন, আপনি ওটা খুঁজে বার করে দিন। জিনিসটা আমার খুব প্রিয়...।

সুজিতবাবু বললেন, সে ক্ষমতা আমার নেই। সবাই যেমন খুঁজছে আমিও খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না তো।

এঁটো কলাপাতাগুলো বাইরে ফেলা হয়নি, ছাদের এককোণে জড়ো করা ছিল, তার প্রত্যেকটি আবার উলটে-পালটে ভাল করে দেখা হল। খবরের কাগজ, সতরঞ্চি— কিছুই দেখা বাদ রইল না।

ছাদের নর্দমাটার ঝাঁঝরি খুলে, সেখানে এক বালতি জল ঢেলে নিচে যেখানে জলটা পড়ে সেখানেও দেখা হল সবাই মিলে, নাকছাবিটা নেই।

রাত বারোটার সময় ছোট মেসোমশাই বললেন, যাক, আর খোঁজবার দরকার নেই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

পরদিন সকালেই আমি এলুম আবার ছোটমাসির বাড়িতে, ছোটমাসির মুখে একটা কান্না কান্না ভাব। নাকছাবির হীরেটার দাম দু'হাজার টাকার বেশি। শুধু সেজন্য নয়, ওটা ছোটমাসিকে দিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি, সেইজন্যই ওটার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাই ছোটমাসি ওটার দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

আমি বললুম, ছোটমাসি পুলিসে খবর দেবে নাকি?

ছোটমাসি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না থাক। সবাই চেনাশুনো....

অর্থাৎ পিকনিকে যারা এসেছিল, তারা সবাই চেনাশুনো, তাদের মধ্যে যদি কেউ নিয়ে থাকে কিংবা ইচ্ছে করে লুকিয়েও রাখে, তাহলেও তাদের কাছে পুলিসে গিয়ে ঝামেলা করবে, এটা ঠিক নয়।

একটু বাদেই এসে হাজির হলেন ছোটমামা।

তিনি বললেন, আমি কাল রাত্তিরে অনেক ভাবলুম, বুঝলি? কে নিতে পারে? ছোটরা কেউ নিতে পারে না কেন? ছোটরা বুঝি সবাই সাধু?

ছোটমাসি বললেন, ছোটরা অন্য কোনো জিনিস হলেও নিতে পারত। কিন্তু একটা নাকছাবি নিয়ে কি করবে? কোনো বাচ্চা মেয়ে আজকাল নাকছাবি পরে না। আর ছোট ছেলেরা কেউ পেলে তক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে কৃতিত্ব নিত। যাই হোক, বড়দের মধ্যে রইলুম আমরা সাত আটজন। তোর সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় কাকে বল্ তো!

আমি বললুম, যাই বল, ছোটমামা, ম্যাজিসিয়ান সুজিতবাবুকেই আমার সন্দেহ হয়।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বললেন, আর ওই সুজিত আমায় সকালে টেলিফোনে কি বলল জানিস? সুজিতের সন্দেহ হয় তোকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ!

ছোটমাসি বললেন, নীলুকে সন্দেহ? তুমি কী যা তা বলছ ছোড়দা?

ছোটমামা বললেন, বাঃ, নীলুর পকেট থেকে সেই দশ টাকার নোটটা পাওয়া গিয়েছিল না।

আমি বললুম, ছোটমামা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার ওই বন্ধুকে সাবধান করে দিও! ওসব ম্যাজিসিয়ান ফ্যাজিসিয়ানদের আমি গ্রাহ্য করি না!

ছোটমামা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, তুই অত রাগছিস কেন? ও কি সত্যি তোর নামে দোষ দিয়েছে নাকি? আমি এমনি বানিয়ে বললুম! ওই সুজিত কিন্তু শুধু ম্যাজিসিয়ান নয়। ও একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিক দেখানো ওর শখ। ও কেন একটা হীরের নাকছাবি নিতে যাবে? সুজিত সত্যি সত্যি আমাকে আজ সকালে যা বলল টেলিফোনে, তা শুনবি?

—শুনি?

—তার আগে দেখা যাক, আর কে কে নিতে পারে। নীলু নেয়নি। বড়দি মেজদিদের তো কথাই ওঠে না। তোর বরই বা নেবে কেন? রতন আর প্রিয়ব্রত আগে আগে খেয়ে চলে গেছে, তারপর মেমারি গেম হয়েছিল। সুতরাং ওরাও নিতে পারে না। তাহলে বাকি রইল ওই সাদা কুকুরটা!

ছোটমাসি বলল, একটা কুকুর নাকছাবি নিয়ে যাবে? যত সব পাগলের মতন কথা।

ছোটমামা বললেন, কুকুরটা নেবে না বলছিস? তাহলে আর বাকি রইলি তুই! সুজিতও সেই কথাই বলেছে। তোর নাকছাবি তুই চুরি করেছিস।

ছোটমাসি চোখ কপালে তুলে বললেন, আমি করব আমার নিজের জিনিস চুরি? ভদ্রলোক গাঁজা খান বুঝি?

—তুই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারিস!

—আমার আর খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই? শোন ছোড়দা, তোমার ওই ম্যাজিক দেখানো বন্ধু যেন আর কোনোদিন আমাদের এ বাড়িতে না ঢোকে? তাহলে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেব!

—আহা অত চটে যাচ্ছিস কেন? তুই লুকোসনি তাহলে এই তো? তাহলে অন্য কেউ না কেউ লুকিয়েছে। দেখিস, দু'একদিনের মধ্যেই ফেরত দিয়ে যাবে।

এরপর সাতদিন কেটে গেল। কেউ সেই নাকছাবি ফেরত দিল না। দিনের আলোয় ছাদটা খুঁজে দেখা হল অনেকবার। সেটা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপরের সাতদিনেও কেউ ফেরত দিল না। তারপরের সাতদিনেও না। অনেকে ব্যাপারটা ভুলেই গেল।

মাসখানেক বাদে একদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ছোটমাসির হঠাৎ খুব রাগ হল। মনে পড়ে সেই ম্যাজিসিয়ান সুজিতবাবুর কথা। লোকটা কেন বলল, আমার জিনিস আমি নিজেই লুকিয়ে রেখেছি? ও কি বলতে চায়। মনের ভুলে ওটা খুলে আমি কোথাও রাখব?

ধড়মড় করে ওঠে পড়ে ছোটমাসি আলমারি খুললেন। যেখানে গহনা থাকে সেখানটায় খুঁজে দেখলেন আবার। আগেও অনেকবার দেখেছেন। সেখানে থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া হাসি আর খুশি জোর দিয়ে বলেছে ওটা মেমারি গেমের সময় মায়ের নাকে দেখেছিল। তারপর ছোটমাসি আর নিচে নামেন নি। তাহলে কি মনের ভুলে ছাদেই কোথাও ওটা রেখে দিয়েছেন? তাও তো অসম্ভব। সারা ছাদ কতবার দেখা হয়েছে তার ঠিক নেই!

মনটা খারাপ হয়ে গেল ছোটমাসির। আর ঘুম আসছে না। তিনি একা একা উঠে এলেন ছাদে।

আজ উঠেছে সুন্দর জ্যোৎস্না। এখন অনেক রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একা একা ছাদে ঘুরতে ছোটমাসির বেশ ভালই লাগছে।

হঠাৎ এই সময়ে ভূতে ধাক্কা মারল তাঁকে।

ওগো, মা গো বলে চিৎকার করে দড়াম শব্দে পড়ে গেলেন ছোটমাসি। ভাবলেন, বুঝি ভূতে তার গলা টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু আর কিছুই হল না। ছোটমাসির চিৎকারও কেউ শুনতে পায়নি। পা থেকে একপাটি রবারের চটি ছিটকে গেছে দূরে। আস্তে আস্তে উঠে বসতেই ঝকঝকে জিনিসে তাঁর চোখ আটকে গেল। জিনিসটা পড়ে আছে তাঁর পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই দেখলেন, সেই হীরের নাকছাবি!

তবে কি ভূত এসে একমাস বাদে এই নাকছাবিটা উপহার দিয়ে গেল?

কী করে ছোটমাসি ওইভাবে রাত্তিরবেলা হীরের নাকছাবিটা ফিরে পেলেন, সেটা যদি আমি না বলে দিই, তোমরা পাঠক-পাঠিকারা পারবে সেই রহস্যের সমাধান করতে?

একটু ভেবে দেখ।

ছোটমাসির হীরের নাকছাবিটা কোনো এক সময় খুলে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের রবারের চটিতে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য সবই খুঁজে দেখা হয়েছে, শুধু নিজের পায়ের চটি উলটে দেখা হয়নি। ছাদের চটি যেহেতু আলাদা, তাই ওটা ছাদেই সিঁড়ির পাশে রাখা থাকে, সব সময় ব্যবহার হয় না। একলা ছাদে এসে ঘুরবার সময় হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই চটির তলা থেকে হীরের নাকছাবিটা খুলে বেরিয়ে আসে।
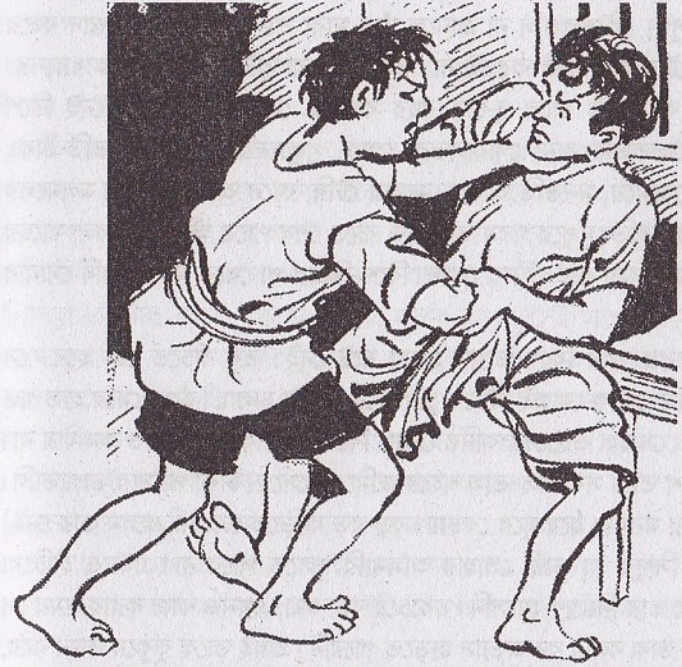
কুরুক্ষেত্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

যখনই কোনও কাজ খুব মন দিয়ে করতে যায় বজ্রকুমার, তখনই আপনমনে সে কেবল 'তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক' আওড়াতে থাকে। এটাই তার মুদ্রাদোষ। এমন নয় যে, সে একজন ডাকসাইটে, তবলচি। তবলার কিছুই সে জানে না। তবু মুখে কেন যে তেরে কেটে তাক উচ্চারণ হতে থাকে, তা সে নিজেও জানে না। বজ্রকুমার আসলে একজন শিক্ষানবিশ চোর। এ-ব্যাপারে সে একজন বড় ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিল। বিশ্বনাথ রায় পাল খুবই সিদ্ধহস্ত চোর। তার কাছে নানারকম কলাকৌশল শিখতে শুরু করেছিল। আর বছরটাক লেগে থাকতে পারলেই হত। কিন্তু বিশে পালের বুড়ো বয়সে ভীমরতি হল। কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে সে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেল। আর ফিরল না।

বিদ্যেটা পুরোপুরি শেখা না হলেও বজ্রকুমার যেটুকু শিখেছে তাতে পেট চলে যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম কৌশলগুলি না জানলে দাঁও মারা সম্ভব নয়। বিশে ওস্তাদ বছরে একটা কি দুটোর বেশি চুরি করতই না। ওই একটি বা দুটিই ছিল মারাত্মক ধরনের। হেসেখেলে বড়লোকি চালে দু-চার বছর কাটিয়ে দেওয়া যেত। কী নেই বিশে ওস্তাদের? জোতভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, বাক্স ভর্তি টাকা, ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে, মনভর্তি আনন্দ। মাথায় টেরি, কানে আতর, পরনে মলমলের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি। দুপুরে গরম ভাতে ঘি, রাতে শেষ পাতে ক্ষীর, একবেলা মাছের মুড়ো তো অন্যবেলা কচি পাঁঠার ঝোল। বিশে-গিন্নির পা থেকে মাথা অবধি সোনার গয়না।

বজ্রকুমারের আর বিশে ওস্তাদ হওয়া ঘটে নেই। তবু বাঁচতে তো হবে। সে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে রোজই ছিঁচকে চুরি করে পেটটা চালায়। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ বই তো নয়। সে হল ওস্তাদের কনিষ্ঠ চেলা। বিশের বড়-বড় চেলারাও কম যায় না। দেশে-বিদেশে তারা সব ভাল-ভাল শহরে জমিয়ে বসেছে। টাকা পয়সার ভাগাভাগি।

বজ্রকুমার মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড়-বড় বাড়িতে ঢোকার এলেম তার নেই। সে এখনও সিন্দুক বা ভারী লোহার আলমারি খুলতে পারে না। এখনও হাঁচি বা কাশির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আসেনি। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও কাজ করার সময় সে তেরে কেটে তাক বলার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। প্রায়ই তাকে কুকুরে তাড়া করে, গেরস্ত সজাগ হয়ে পড়ে। আর নানারকম গন্ডগোল বেধে যায়।

সনাতন কর্মকার একজন সোনার বেনে। তার বাড়িতে সোনাদানার আশায় হানা দিয়েছিল বজ্র। জানালার গরাদে ফাঁক করে ঢুকেও পড়েছিল। একটু এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময় সনাতন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়ল। হাঁক মেরে বলল, "অ্যাই ফটকে, খুব তবলাবাজ হয়েছিস তো! মাঝরাতে তবলার বোল আওড়াচ্ছিস!'

আর-এক ঘর থেকে ফটকে বলে উঠল, 'তুমি গান-বাজনার বোঝোটা কী বলো তো দাদা? অ্যাঁ! সোনা গালিয়ে গয়না বানাচ্ছ, তাই নিয়েই থাকো না!'

'কে বলল আমি গান বুঝি না? নিধুবাবুর টপ্পা, কেত্তন, ভজন সব বুঝি। তোর মতো বে-আক্কেলে নাকি? রাতবিরেতে তবলার বোল ফুটিয়ে পাঁচজনের ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছিস!'

ফটকে বলল, 'ইচ্ছে করে বোল তুলেছি নাকি? ঘুমোতে-ঘুমোতে শুনতে পেলুম কে যেন তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক করছে। তাই ঘুম ভাঙতে কয়েকটা বোল একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলুম মুখে-মুখে।'

'উদ্ধার করে ঘরভর্তি সোনাদানা নিয়ে এমনিতেই আমার ঘুম হয় না। যাও-

না একটু তন্দ্রা এসেছিল দিলি তার পিত্তি চটকে। যাই, নন্দীবাবুর মেয়ের নেকলেসটা রাত জেগে শেষ করে ফেলি।'

বজ্রকুমার তাড়াতাড়ি গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একখানা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি মাত্র জুটেছিল।

একদিন গণেশ সাঁতরার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল বজ্রকুমার। ঢুকতেই ভারী বিপদ। যে ঘরখানায় ঢুকেছিল সেটাতে গণেশ সাঁতরার নব্বই বছর বয়সী পিসিমা থাকেন। বাত-চড়া বলে বোধ হয় ঘুমের বালাই নেই। দরজা ফাঁক করে আঙুল ঢুকিয়ে কায়দা করে ছিটকিনি খুলে ভেতরে পা দিতেই একেবারে মুখোমুখি।

পিসিমা একগাল হেসে বললেন, 'এলি দাদা? আয়। সেই সন্ধে থেকে হাঁটুর ব্যথায় মরে যাচ্ছি। বাতের তেলটা তুই ছাড়া আর কে মালিশ করে? ওদের সব কড়া-পড়া হাত। তোর হাত দুটি যেন মখমলের মতো। তখন থেকে ডাক-খোঁজ করছি, শুনলুম নাকি পটলডাঙা গেছিস, ফিরতে রাত হবে। তা রাত বেশি হয়নি বোধ হয়। আয় দাদা, একটু মালিশটা করে দিয়ে যা, গোপাল আমার।'

নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে-দিতে বজ্রকুমারকে সে-কাজও করতে হয়েছিল। বুড়ি চোখে মোটে দেখতে পান না, তাই রক্ষে। সব কথায় কেবল হুঁ দিয়ে গিয়েছিল সে। বেরনোর সময় একখানা পেতলের ঘটি আর একখানা হ্যারিকেন সঙ্গে নিতে পেরেছিল সে।

মনটা খুব বিগড়ে আছে। বড় না হোক, ছোটখানো একখানা দাঁও না মারলেই নয়। বিশে ওস্তাদের চেলা বলে নিজের পরিচয় দিতেও লজ্জা করে তার।

আজও নিশুত রাতে বেরিয়েছে বজ্রকুমার। মনের মতো একখানা বাড়ি খুঁজছে। কোনও বাড়িই তেমন পছন্দ হচ্ছে না। ঘনঘন মাথা নাড়ছে আর তেরে কেটে তাক করে যাচ্ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আরে! এ বাড়িটা তো কখনও নজরে পড়েনি তার! রোজই এসব পথ দিয়ে যাতায়াত। তবু পড়েনি! ভারী লজ্জা হল বজ্রর। বিশে ওস্তাদ কি আর সাধে বলে, 'ওরে চোখ চাই, চোখ। তোদের চোখ থেকেও যে অন্ধ।' কথাটা অতি খাঁটি। তেমন চোখ থাকলে কি আর এতকাল বাড়িটা চোখ এড়িয়ে যেত তার? রায়চৌধুরীদের আমবাগানের পশ্চিমে একটু আবডালে চমৎকার ছোটখাটো একটি প্রাসাদ বললেই হয়।

বজ্রকুমার বাড়িটা ঘুরে একটু জরিপ করে নিল। জানালা-দরজা খুবই মজবুত। গোটা দুই জানালা খোলা ছিল। বেশ পোক্ত শিক দেওয়া। বজ্র খুব বেছেবুছে একখানা জানালা পছন্দ করে ফেলল। তারপর চাড় দেওয়া যন্ত্র বের করে অনেক মেহনতে দু'খানা শিক বাঁকিয়ে ভেতরে ঢোকার ফোকর করে নিল।

একটু জিরিয়ে ওস্তাদ আর মা কালীর উদ্দেশ্যে দুটো পেন্নাম ঠুকে ঢুকে পড়ল ঘরে।

অন্ধকারটা চোখে একটু সইয়ে নিয়ে সে চারদিকটা যা দেখল তা কহতব্য নয়। মেলাই জিনিস। ঘরে অন্তত দশখানা লোহার আলমারি। সিন্দুক আছে কাঠের বাক্স-টাক্সও আছে। পরের ঘরটা আরও সরেস। দেওয়াল-আলমারিতে কাচের আড়ালে রুপোর বাসন। আরও ঘুরেফিরে দেখতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যা পাওয়া যাচ্ছে তাও কম নয়। সে খন্তা বের করে কাচ কাটতে লেগে গেল।

হঠাৎ কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল, 'তুই কে?'

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বজ্রকুমারের। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।'

'ভুল হয়ে গেছে? মজার আর জায়গা পাসনি? তুই বেজা চোর, বিশের চেলা।'

'যে আজ্ঞে।' 'আমাকে চিনিস? আমি হলাম গুলে ওস্তাদের এক নম্বর চেলা। গোবিন্দ। বিশের মতো এলেবেলে লোকের কাছে চুরি শিখিনি। তুই চুরির জানিস কী রে হতচ্ছাড়া গবেট?'

এ-কথায় বজ্রকুমারের রাগ হল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, রাগের চোটে তা ফের গরম হল। সে বেশ তেজালো গলায় বলল, 'বিশ্বনাথ রায় পালের কাছে গুলে ওস্তাদ! হাসালে দাদা! এ যেন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ!' কে গোষ্পদ রে গবেট?' বলেই গোবিন্দ টকাস করে একটা গাঁট্টা মারল বজ্রর মাথায়। বলল, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বিশে আবার ওস্তাদ হল কবে?'

বজ্রকুমার মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে ফুঁসে উঠে বলল, 'গুলে আবার চুরির জানেটা কী? বিশের হাত-ধোয়া জলও সে নয়।'

তবে রে! বলে গোবিন্দ সাপটে ধরল বজ্রকে। বজ্রও কম যায় না। বলল, 'দেখাচ্ছি মজা!'

দেখতে-না-দেখতে দু'জনের মধ্যে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কিল, ঘুসি, চড়। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল। চেয়ার-টেবিল পড়তে লাগল উলটে। এ যে পরের বাড়ি, গেরস্ত উঠে পড়তে পারে, এসব কথা কেউ খেয়াল করল না। ভাঙা কাচে দু'জনেরই হাত-পা কেটেকুটে একশা। একখানা ঝাড়বাতি অবধি খসে শতখান হল।

ঘুসোঘুসি ছেড়ে দু'জনে দু'জনকে কুস্তির প্যাঁচে কাহিল করার চেষ্টা করতে লাগল। তাতে কুমড়ো-গড়াগড়ি হল অনেকক্ষণ।

শেষমেশ লড়াই থামল বটে। কিন্তু দু'জনের আর তখন উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। গাঁটে-গাঁটে যন্ত্রণা। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। দু'জনে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছে। আধমরা অবস্থা।

ওদিকে আকাশ ফরসা হল। জানালা দিয়ে সকালের রাঙা রোদ এসে পড়ল ঘরে।

এমন সময় একটা জাম্বুমানের মতো লোক এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পেল্লায় একখানা হাই তুলে তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরা চোর নাকি?'

বজ্র আর গোবিন্দ দু'জনেই ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে বলল, 'আর হবে না।'

লোকটা আড়মোড়া ভেঙে রাজ্যের আলিস্যি আর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'ছ্যাঃ।'

মাটিতে পড়ে থাকা কাহিল দুই চোর জুলজুল করে চেয়ে রইল।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'তোদের হবে না। ওদেরও হয়নি কিনা।'

'কাদের কথা বলছেন আজ্ঞে?'

'বিশে আর গুলে। শেখাচ্ছিলুম। মাঝপথেই হঠাৎ শেখা ছেড়ে কাজে নেমে গেল। তোদের দেখেই বুঝেছি, তোরা তোদের ওস্তাদের মতোই অপদার্থ।'

দু'জনেই ওস্তাদের নিন্দায় গরম হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টাও করল একটু, পারল না।

লোকটা তাচ্ছিল্যের চোখে চেয়ে বলল, আমার নাম কালু সারেঙ। নামটা চেনা ঠেকছে?'

দু'জনেই চমকে উঠল। কালু সারেঙের নাম কে না জানে? তবে...

বজ্র বলল, 'তিনি তো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। কিন্তু তিনি তো গত হয়েছেন।'

'গত হয়েছেন।' বলে লোকটা মুখ ভেংচে বলল, 'গত হলেই কি সুবিধে হল তোদের? চুরি ছেড়ে অন্য লাইন ধর। সারারাত তোদের যা কীর্তি দেখলাম!'

বলেই লোকটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল যেন। আর বাড়িটা হয়ে গেল বেবাক ফাঁকা, পোড়ো একখানা বাড়ি।

দুই চোর পড়ি-কি-মরি করে উঠে দৌড়তে লাগল।

চোর না গোয়েন্দা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার একবার খুব গোয়েন্দা হবার শখ হয়েছিল। হবো তো হবো একেবারে শার্লক হোমস। বড় বড় কেস ধরবো। আমার সহকারী সেই সব কেসের বিবরণ লিখবে। দেশে বিদেশে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। যখন আমি বড় হব তখন আমার ঠোঁটে পাইপ, চোখে গোল চশমা, কপালে তিনটে ভাঁজ, কাগজে, কাগজে আমার ছবি। আমার একটা ল্যাবরেটরি থাকবে। দামী একটা মাইক্রোসকোপ। সেখানে নানারকম পরীক্ষা হবে, জুতোর তলার মাটি, জামার রক্তের দাগ, সিগারেটের পোড়া টুকরো, গেলাসে আঙুলের ছাপ। আমার নামটা তেমন ভাল নয়, পঞ্চানন। এই নামে গোয়েন্দা হওয়া যায় না। নামটা পালটে ফেলবো । কি নাম নেবো এখনো ভেবে উঠতে পারিনি।

আমাদের বাড়িতে বিশাল একটা বিস্কুটের কৌটো ছিল। তাইতে ভর্তি বিস্কুট থাকত। চায়ের টেবিলে ছিল তার স্থান। রোজ সকালে বড়রা ওই টেবিলে গোল হয়ে বসে বিস্কুট খেতেন আর গল্প করতেন। পায়ের কাছে বসে থাকত আমাদের লোমওলা কুকুর রাজা। ভীষণ লক্ষ্মী। এতটুকু হ্যাংলা নয়। বড়রা ভালোবেসে তাকে বিস্কুট দিতেন। সেও কুপকুপ করে খেয়ে নিত। আমাদের চা দেওয়া হত না। এক কাপ দুধ দুখানা করে বিস্কুট। খুব বায়না করলে মা এক চামচ লিকার দিয়ে একটু রঙ করে দিতেন। ভীষণ কড়া শাসন ছিল আমাদের । মা খুব রাগী ছিলেন। মায়ের ব্যবস্থার ওপর কারো কোনো কথা চলত না। আমার বোন, সুমিতা ছিল খুব লক্ষ্মী মেয়ে। একটু ভীতু ধরনের। আমার মতো ডাকাবুকো ছিল না। আমি রেগে গেলে খুব চিৎকার করে গান গাইতুম, কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয়। সেই চিৎকারে মায়ের মুখে হাসি ফুটত। তখন যা আব্দার করতুম তাই দিয়ে দিতেন।

একদিন সকালে মা বিস্কুটের টিনের ঢাকনা খুলে বললেন, 'কি আশ্চর্য! কাল রাত্তিরে শুতে যাওয়ার আগে টিন ভর্তি করলুম এখন দেখছি প্রায় খালি। কে খেলে।'

মা সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালেন। বাড়িতে আমার একটু সুনাম ছিল। ঢাকনা খুলে সুটসাট মেরে দেওয়ার ব্যাপারে আমার বেশ প্রতিভা ছিল। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কাজ?'

—'আমার কাজ কি করে হবে মা। কাল তুমি শুতে আসার ঢের আগে আমি শুয়ে পড়েছি।'

—'মাঝ রাত্তিরে?'

—'মাঝ রাতে আমি দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসব বিস্কুট খাওয়ার জন্যে! আমার ভূতের ভয় নেই?'

—'তাহলে কে খেলে?'

মায়ের ভুরু কুঁচকে গেল। 'কে খেয়েছে বিস্কুট! ভূতে?'

আমি সন্দেহ প্রকাশ করলুম, 'তুমি ভুল করে খেয়ে ফেলো নি তো!'

—'ভরপেট ভাত খাওয়ার পর আমি আধ টিন বিস্কুট খেয়ে ফেলবো? আমার পেটে রাক্ষস আছে না কি?'

পর পর তিন দিন এই একই ঘটনা ঘটার পর কেসটা আমাকে হাতে নিতে হল। আমার সহকারী সুমিতা। গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বড় কাজ হল, সন্দেহভাজনদের একটা লিস্ট তৈরি করে সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করা। তালিকার প্রথমেই এল মায়ের নাম। গোয়েন্দারা যখন সন্দেহ করবে তখন আত্মীয়স্বজন মানবে না। যে কেউ কোনো অপরাধ করতে পারে।

সুমিতা বললে, 'তুই মাকে কেন সন্দেহ করছিস?'

—'প্রধান কারণ, মায়ের হাতেই যত বিস্কুটের স্টক। মা রোজ রাতে টিন ভর্তি করে। সেই সময় মায়ের কাছে কেউ থাকে না। সেই সময় মা যত ইচ্ছে মনের সুখে খেয়ে নিতে পারে।'

—'মায়ের হাতেই বিস্কুট। মা যত খুশি খেয়ে আবার যত খুশি ভরে রাখতে পারে। তা নিয়ে সোরগোল করবে কেন? মা কি বোকা?'

—'মা বোকা নয়, মা ভীষণ ভুলো। মনে নেই, মা ছাতের পাঁচিলে একটা একশো টাকার নোট ইট চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল। কেউ ভাবতে পারে!'

—'সেটা ভুল। তার সঙ্গে বিস্কুট খাওয়ার তুলনা চলে না। মায়ের বিস্কুট মা যে কোনো সময়েই খেতেই পারে। রাত এগারোটার সময় খেতে যাবে কেন? আর যদি খায়ও পরক্ষণেই টিন ভরে ফেলবে। তা নিয়ে সকলের সামনে হইচই করবে কেন?'

—'তা হলে সন্দেহের তালিকা থেকে মা বাদ।'

—'একেবারেই বাদ। নিজের জিনিস নিজে কেউ চুরি করে না।'

—'তাহলে দ্বিতীয় কে?'

—'তুইও হতে পারিস। তোর চুরি করা স্বভাব আছে।'

—'যে গোয়েন্দা হয়, সে কখনো চুরি করে না। সহকারী হয়ে তুই এইরকম একটা কথা বলতে পারলি?'

—'তুই তো নিজের থেকেই গোয়েন্দা হয়েছিস। মনে নেই তুই চুরি করে একবার আমার সব লজেন্‌স খেয়ে ফেলেছিলিস!'

—'সে তখন আমি চোর ছিলুম, এখন আমি গোয়েন্দা। আচ্ছা, মাকে বাদ দিলুম। বাবা?'

—'অসম্ভব! বাবার বয়ে গেছে রাত বারোটার সময় নীচে নেমে এসে বিস্কুট খেতে!'

—'জ্যাঠামশাই সম্পর্কে তোর কি মত!'

'শুনে হাসি পাচ্ছে। অফিস থেকে এসেই সরোদ বাজাতে বসেন। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন। এর মাঝে টিন খুলে বিস্কুট খাওয়ার সময়টা কোথায়!'

—'তাহলে রোজ রাতে বিস্কুটের কৌটো ফাঁক করছে কে? তুই?'

—'আমার বয়ে গেছে। আমি অত হ্যাংলা নই। গোয়েন্দার সহকারী কখনো চুরি করে শুনেছিস?'

—'তাহলে কেসটা কি দাঁড়াচ্ছে! চোর এই বাড়ির ভেতরেই আছে।'

—'বাইরে থাকাও সম্ভব।'

—'তাহলে তো তাকে দরজা জানলা ভেঙে আসতে হবে।'

—'সে অশরীরী ভূত। রোজ মাঝরাতে জানলার ফুটো দিয়ে বাতাস হয়ে ঢোকে। তারপর ছায়া শরীর নিয়ে টিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঢাকনা খুলে খেয়ে আবার চলে যায়।'

—'ভূতে তো মাছ খায়! ফ্রিজ খুলে মাছও তো খেতে পারে।'

—'এ হল সায়েব ভূত। সায়েব ভূত বিস্কুট, টোস্ট, স্যান্ডউইচ এইসব খায়। আমি ভূতবিজ্ঞানে পড়েছি।'

—'ভূত বিজ্ঞান না ভৌত বিজ্ঞান!'

'ভৌত বিজ্ঞান আলাদা, ভূত বিজ্ঞান আলাদা। ভূত বিজ্ঞানে ভূত আর তাদের অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা লেখা থাকে।'

—'মানুষ মরলে তবেই তো ভূত হয়, এ পাড়ায় তো কেউ মরেনি।'

—'মরলে যেমন ভূত হয়, অনেকে আবার ভূত হয়ে জন্মায়। সকালে মানুষ রাত্তিরে ভূত। তুই মনে করছিস মানুষ, আসলে সে ভূত।'

—'এমন কথা জীবনে শুনিনি।'

—'কেমন করে শুনবি! এসব কথা ভূত বিজ্ঞানে লেখা আছে। অনেক সময় বিস্কুটেও ভূত থাকে, রসগোল্লায় থাকে।'

—'তোর সেই বইটা আমাকে দে না।'

—'সেই বইটা আমার বন্ধু প্রতিভার বাবার লাইব্রেরিতে আছে।'

একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনে শার্লক হোমসের কায়দায় কৌটোটার আগাপাশতলা ভালভাবে পরীক্ষা করলুম। পুরনো একটা দুধের কৌটো। ঢাকনাটা চেপে বন্ধ করলে আর সহজে খোলা যায় না। চামচের পেছন দিয়ে চাড় মারতে হয়। লেনসে মরচের দাগ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনেক আঁচড়ের দাগ। অপরাধী কোনো ফিঙ্গার ফ্রিন্ট রেখে যায়নি। মনে হয় গ্লাভস পরে ঢাকনা খোলে। তাহলে এই একটা ক্লু পাওয়া গেল। এ বাড়িতে যার গ্লাভস আছে সেই চোর।

দুপুর বেলা সবাই যখন ভাত ঘুমে মজে আছে, সেই সময় দেরাজটা খুললুম। নিচের ড্রয়ারটা হাঁটকাতেই এক জোড়া গ্লাভস পাওয়া গেল। অপরাধী কি বোকা! প্রমাণ গায়েব করতে পারেনি। জানে না বাঘা ডিটেকটিভ কাজে নেমে পড়েছে। খুব বোকার মতো মুখ করে মাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মা, এই গ্লাভস দুটো কার?'

মা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওটা আবার কোত্থেকে টেনেটুনে বের করলি! তোর জ্বালায় কি কিছুই গুছিয়ে রাখার উপায় নেই। ওরে ওটা একটা মস্ত স্মৃতি। আমরা তখন শীতকালে সিমুলতলায় যেতুম। বেজায় শীত। তোর ঠাকুর্দা সকালে ওই গ্লাভস পরে বেড়াতে যেতেন। যা, যেখানে ছিল সেখানে গুছিয়ে রেখে আয়।'

'এখন এটা কে পরে মা? যবে থেকে তোমার বিস্কুট কম পড়ছে, তার মধ্যে কেউ পরেছিল?'

'এ বাড়ির কেউ এখনো পাগল হয়ে যায়নি যে ভাদ্র মাসে গ্লাভস পরবে! নিজে পাগলামি না করে যেখানে ছিল সেইখানে দয়া করে রেখে এস। হ্যাঁরে! তোর লেখাপড়া কি ডকে তুলে দিয়েছিস! দাঁড়া, বাবা আসুক বলছি।'

বাবাকে ভীষণ ভয় পাই। মায়ের সামনে থেকে পালিয়ে এলুম। জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্লাভস পরে সরোদ বাজালে কেমন হয়!'

'ভালই হয়। সরোদ আর হবে না, হবে তুলোধোনা যন্ত্র।'

'আপনি কি রাতের দিকে গ্লাভস পরেন?

'আমার মাথা এখনো অতটা খারাপ হয়নি।'

সুমিতা বললে, 'ওইরকম বোকার মতো এগোলে কোনো দিন ধরতে পারবি না। বড়রা সব সময় ধমকে তোকে থামিয়ে দেবে। আমাদের হাতেনাতে ধরতে হবে। আজ রাতে আমরা আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবো। ব্যাপারটা কি হয়!'

আলোটালো সব নিবে গেল। মা শুয়ে পড়ল। বাড়ি নিস্তব্ধ। আমাদের আগে থেকেই বলা ছিল, সঙ্কেতে কথা হবে। সুমিতা তিনবার আঙুল মটকালো। আমিও তিনবার করে উত্তর দিলুম, জেগে আছি, উঠে পড়ো। খুব সাবধানে। কেউ যেন জানতে না পারে।

পা টিপে টিপে, সাবধানে, কোনো রকম শব্দ না করে, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা দু'জনে নীচে নেমে এলুম। চেনা বাড়িটাকেই কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্ধকার কোণে কোণে কারা যেন ওঁত পেতে বসে আছে। সুমিতা ভয় পেয়েছে। আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। আমার পকেটে একটা ছোট টর্চ আছে। সেটাকে জ্বালানো যাবে না, অন্ধকারে চমকে উঠবে। ছোট একটা ছুরিও রেখেছি পকেটে। বলা যায় না, আত্মরক্ষায় প্রয়োজন হতে পারে। গোটা বাড়ি ঘুমে আচ্ছন্ন। সিঁড়ির কাছের ঘড়িটা খ্যাটাস খ্যাটাস করছে। আমরা অন্ধকারে পা ঘষে ঘষে এগোচ্ছি। সোফা, সেন্টার টেবিল, চেয়ারের পাশ দিয়ে দিয়ে। যেখানে বসে সকলে চা খায়, সেই ঘরে এসে হাজির হলুম। বড় বড় কাঁচের জানলা। বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশ, গোটা গোটা তারা। দূরে রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট। আলোর রেখা ঘরে এসে ফ্রিজটার ওপর পড়েছে। সেটা থেকে হালকা একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। বড় চায়ের টেবিল, তার মাঝখানে বিস্কুটের টিনটা। চারপাশে চারটে চেয়ার। আমি আর সুমিতা গুঁড়ি মেরে টেবিলটার তলায় ঢুকে গেলুম। অন্ধকারে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। যে-ই আসুক, সে এই বাড়িরই লোক হবে। বাইরে থেকে কেউ বিস্কুট চুরি করার জন্য আসবে না।

ঘড়িতে ঠং করে একটা বাজল। আমরা দু'জনে বসে আছি টেবিলের তলায় জড়াজড়ি করে। বাইরে ঝোড়ো বাতাস হুসহাস শব্দ করছে। সুমিতা বললে, 'দাদা, ভীষণ ভয় করছে।'

আমারও ভয় করছে। সে কথা বলি কি করে! আমি যে গোয়েন্দা।

সুমিতা বললে, 'চল দাদা, গিয়ে শুয়ে পড়ি। এতো হীরে মানিক নয় সামান্য কটা বিস্কুট!'

'কথা বলছিস কেন?'

'কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়!'

'এ-সব কাজে ভীষণ ধৈর্য চাই সুমি।'

মাথার ওপর টেবিল, টেবিলের ওপর কৌটো। হঠাৎ খুটুস খুটুস শব্দ। ভয়ে শরীর হিম হয়ে গেল। ঘরে কেউ ঢুকল না, অথচ কৌটোর ঢাকনা খোলার শব্দ। নিশ্চয় ভূত এসেছে। শরীরটা থ্যাস থ্যাসে হয়ে গেল। কোনো জোর নেই। সুমিতা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। বেশ বুঝতে পারছি, এত ভয় থাকলে গোয়েন্দা হওয়া যায় না। কৌটোর ঢাকনাটা ধরে কে জোরে জোরে টানছে। কটাস কটাস শব্দ হচ্ছে। কামড়টা হচ্ছে একেবারে আমাদের মাথার ওপর। ভূত ঢাকনা খুলছে।

মনে মনে সেই মন্ত্রটা তিনবার বললুম ঃ

ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নি আমার ঝি

বুকে আছে রামলক্ষণ ভয়টা আমার কি!

বিস্কুট খাওয়ার কুড় কুড় শব্দ হচ্ছে। কে বলেছে, ভূতের দাঁত নেই! যা থাকে বরাতে, দু'জনে এতটুকু শব্দ না করে বেরিয়ে এলুম টেবিলের তলা থেকে। ছোট্ট টর্চটা জ্বালাতেই টেবিলের ওপর আলপিনের মতো ছোট্ট দু' কুঁচি আগুন যেন ঝলসে উঠল। ইয়া বড় এক্ ধেড়ে ইঁদুর কুড়কুড় করে বিস্কুট খাচ্ছে। ভূতের চেয়ে ইঁদুর আরো সাংঘাতিক। সুমিতা আমাকে দু'হাতে, 'দাদা', বলে জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই চেয়ার ফেয়ার উল্টে দে ছুট। অন্ধকারে জড়াজড়ি। আমাদের অনেকদিনের কাজের লোক সুবলদা, নিচেই শোয়। তিনি চোর, চোর, করে লাফিয়ে উঠলেন। সবাই উঠে পড়েছেন। ফটাফট আলো জ্বলে উঠল। বাবা খিল হাতে তেড়ে এসেছেন। আমি আর সুমিতা টেবিলের ল্যাং খেয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছি।

অতি কষ্টে বললুম—'চোর নয়, গেছো ইঁদুরে বিস্কুটের টিনের ঢাকনা খুলে বিস্কুট খাচ্ছিল।'

কেউ বিশ্বাস করল না আমাদের কথা। মা বললেন, 'ছি ছি, তোদের আমি এত খাওয়াই তাও মাঝ রাতে উঠে চুরি করে বিস্কুট খাচ্ছিস, আর আমার কিছু বলার নেই। তোমরাই দেখ।'

মাঝ রাত। সারা বাড়ি আলোয় আলো। সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আরে ছি ছি!'

কৃষ্ণধাম কথা

বিমল কর

বাসটা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দিল। রাস্তা ঘেঁষে বটগাছ। একটার গায়ে গায়ে আরেকটা। বাসস্টপের নাম 'জোড়া বটতলা'। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। তবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। চেহারা দেখে মনে হয় সারা দিনেও এই বাদলা ঘুচবে না। আশপাশে গাছগাছালি, ঝোপ, জংলা, লতাপাতা। একপাশে একটা ভাঙা মন্দির। অন্যপাশে, সামান্য তফাতে, কোনও এক মিশনারিদের অনাথালয়। চারদিকে পাঁচিল তোলা। ফটকটাও দেখা যায়।

বটগাছের তলায় ছাতা হাতে যশোদাজীবন দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে ধুতি, মালকোঁচা মেরে পরেছেন যেন। গায়ে একরঙা শার্ট। পায়ে বর্ষা-জুতো, আজকাল বাজারে যা দেখা যায়।

কিকিরা দেখতে পেয়েছিলেন যশোদাকে।

"আমি আধঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি", যশোদা কয়েক পা এগিয়ে এলেন। "বাসটা তা হলে পেয়েছেন! দিনটা বড় খারাপ আজ।"

কিকিরা বললেন, "কেন, সময়েই তো পৌঁছে গেলাম। ক'টা বাজে এখন? দশটার বেশি নাকি?"

"না, না ওইরকমই হবে।...এদিককার বাস কম। গোটা তিন-চার। খারাপ হয়ে গেলে তাও কমে যায়। তার ওপর দিন বুঝে বাস চালায়। আজ দিনটা একেবারে পুরো বর্ষার মতন। আসুন—।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে। যশোদাকে বললেন, "কত দূর যেতে হবে?"

"বেশি নয়। মিনিটবিশেক হাঁটতে হবে। রাস্তা ভাল নয়, কাঁচা। কাদায় পা ডুবে যায়...."

"ঠিক আছে চলুন। তা যশোদাবাবু, বাসটা থেকে আমরা দু'জন মাত্র নামলাম এখানে। আর তো কেউ নামল না।"

"ওইরকমই। এক-আধজনই নামে এখানে। হাটের দিনে অবশ্য ভিড় হয়। ওই ওপাশে মঙ্গলঘাটা বলে একটা জায়গায় হাট বসে রবিবার। পাইকাররা আসে। অন্যদিন ভোঁ-ভাঁ।"

"অনাথালয়টা কাদের?"

"মিশনারি সাহেব বাবুদের পয়সায় তৈরি। শুনেছি কোনও এক নামকরা বিদেশি মেমসাহেব এদিকে একবার বেড়াতে এসে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরাও টাকা দেয়। ওদের নিজেদের একটা পুরনো জিপগাড়ি আছে। কাজেকর্মে বাইরে যায়।"

কিকিরারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কাঁচা রাস্তা। হাত-কয়েক চওড়া মাত্র। জল কাদায় পা রাখা দায়। মাঝে মাঝে ইটের টুকরো, ভাঙা পাথরের চাঁই ফেলা রয়েছে। দু'পাশে নিচু জমি। কোথাও কোথাও আধখাপচাভাবে চাষ হয়েছে, কোথাও সবজি বাগান, ছোট একটা নার্সারিও চোখে পড়ল।

তারাপদ তেমন খুশি হচ্ছিল না। কিকিরা দিন-দিন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। কোথাকার কে হীরালাল বলে এক ভদ্রলোক দিন চার-পাঁচ হল তাঁর বাগান থেকে উধাও। ভদ্রলোক নাকি বড়সড় কারবারি, কলকাতা শহরে তিনটে আর হাওড়ায় একটা কাপড়ের দোকান। ছোটখাটো দোকান নয়। মস্ত দোকান। বেশ নামডাক আছে দোকানগুলোর, হাজার-হাজার টাকার কারবার করেন। তা করুন কারবার, ভাল কথা। তা ওই ভদ্রলোক—হীরালালবাবু,—বছর তিন-চার আগে এদিকে অনেকটা জমি কিনে তাঁর শখের 'কৃষ্ণধাম' বলে একটা বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানবাড়ি

বলতে ঠিক যা বোঝায়—তেমন বাড়ি অবশ্য নয়। একটা ছোট বাড়ি, আর আশেপাশে বাগান—ফুলফুলুরির। লোকজন রেখেছিলেন নিজের পছন্দ মতন। প্রত্যেক হপ্তায় শুক্রবারে হীরালাল তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসতেন। থাকতেন সোমবার পর্যন্ত। ওঁর স্ত্রী বিগত। সংসারে ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের বয়েসও কম হল না। বাবার ব্যবসা ছেলেরাই দেখে। হীরালালবাবু নিজে ব্যবসাপত্র থেকে ধীরে-ধীরে সরে এসেছেন। তবু তিনি থাকা মানে মাথার ওপর ছাতা থাকা। ইদানিং ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলেন। উদাস, নিস্পৃহ। তিনি কোনও ব্যাপারেই মন বা নজর দিতে চাইতেন না। একেই বোধ হয় বলে বৃদ্ধ বয়সের সংসার বৈরাগ্য।

গত শুক্রবার হীরালাল যথারীতি তাঁর কৃষ্ণধামে চলে আসেন। সঙ্গে যশোদা। যশোদা হীরালালের নিত্যসঙ্গী। বন্ধু নয়, কর্মচারী। হীরালালের যৌবনকাল থেকে পাশে পাশে আছেন। দুঃখের দিনের সঙ্গীকে সুখের দিনেও ছাড়েনি হীরালাল। সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছিল। লোকে জানে, যশোদা হলেন হীরালালের ম্যানেজার এবং বিশ্বস্ত বান্ধব।

গত শনিবার বিকেল থেকে হীরালালকে কৃষ্ণধামে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না—সে অন্য কথা। কিন্তু হীরালালের হাতে লেখা যে তিনটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছে—সেটাই মারাত্মক।

চিরকুটগুলো পড়লে বাঁধা লেগে যায়। মনে হয় : (১) হীরালাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলেন, (২) আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নেন সম্প্রতি, (৩) সিদ্ধা নেওয়ার পর হীরালাল আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন বলে একটা চিরকুট লিখে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন।

শনিবার বেলার দিকে হীরালাল যশোদাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। কাজট মোটেই জরুরি নয়। মাইল চারেক দূরে 'বৈকুণ্ঠ নার্সারি'-তে গিয়ে খোঁজ করতে হ তারা সত্যি-সত্যি নার্সারি বিক্রি করার কথা ভাবছে কিনা। যদি বিক্রি কল্লাই ঠিক ক থাকে—তবে জমিজায়গা নার্সারি সমেত দরদাম কী পড়তে পারে!

যশোদা যেতে চাননি। কী হবে নার্সারিতে, বা জমিজায়গায়! ঈশ্বরের কৃপা বড়বাবু—মানে হীরালালের ত কম সম্পদ নেই ; তা হলে অযথা আর সম্পা বাড়ানো কেন? তা ছাড়া একটা পড়তি নার্সারি সম্পত্তি হিসেবেও কেনার কোন মানে হয় না। আপত্তি সত্ত্বেও যেতে হল যশোদাকে; হাজার হোক বড়বাবুর হুকু

মেঠো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যশোদা বৈকুণ্ঠ নার্সারিতে গিয়েছিলেন। ফির ফিরতে বিকেল। ফিরে এসে আর বড়বাবুকে দেখেননি।

আশপাশে কোথাও আছেন ভেবে যশোদাও আর হীরালালের খোঁজ করেন তখন। যশোদারও বয়েস হয়েছে; যাওয়া-আসায় আটমাইল। তাও মেঠো প

সাইকেল চালাবার ধকল সামলে যশোদা যখন খানিকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে, তখন বড়বাবুর খোঁজ করলেন। ভাদ্রমাসের বিকেল ততক্ষণে মরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই। কেরোসিনের বাতিতেই কাজ চালাতে হয়। মাঝে মাঝে বড়বাবুর খেয়ালে কৃষ্ণধামের বারান্দায় একটা ছোট পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালানো হয়। চতুর্দিক ফাঁকা, যেদিকে তাকাও মাঠ আর গাছপালা আর অন্ধকার। ওর মধ্যে পেট্রম্যাক্স বাতিটা যেন আকাশের তারার মতন দেখায়। অবশ্য জ্যোৎস্নার দিনে বাতি জ্বালানো হয় না বাইরে। তখন অঢেল জ্যোৎস্না আর জোনাকির নৃত্যই যেন কৃষ্ণধামকে ঘিরে থাকে।

সন্ধ্যের মুখেও হীরালালকে দেখতে না পেয়ে যশোদা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাজের লোক তিনজন। একজন রান্নাবান্না নিয়ে থাকে, অন্যজন ঘরদোর সাফসুফ রাখে। তৃতীয়জনের কাজ হল জল তোলা আর চৌকিদারি। বাড়তি দু'জন মালি আসে হপ্তায় তিনদিন। তারা বিকেল বিকেল চলে যায়।

কাজের লোকরা বলতে পারল না বড়বাবু কোথায় গিয়েছেন। তাঁকে বিকেলের পরে তারা দেখেছে। তারপর আর দেখেনি।

যশোদা তখন হীরালালের শোয়ার ঘরে খোঁজ করতে আসেন। এসে দেখেন বিছানার ওপর তিনটুকরো কাগজ রাখা। প্রত্যেকটি কাগজের ওপর ভারী কিছু চাপা দেওয়া—যেন না বাতাসে উড়ে যায় কাগজগুলো।

কাগজের লেখাগুলো পড়েই যশোদার মাথা ঘুরে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেও পারেননি। তারপর খোঁজ-খোঁজ পড়ে যায় আবার। এবার যশোদা নিজে বাড়ির কাজের তিনটি লোককে নিয়ে মাঠেঘাটেও খুঁজে বেড়াতে শুরু করেন বড়বাবুকে। আত্মহত্যা করুন আর না করুন, কোথাও হয়তো পড়ে আছেন মাথা ঘুরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে, সাপেখোপেও কামড়াতে পারে।

লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি খোঁজ চলল। রাত্রে আর কত খোঁজ করা যায়। এদিকে কলকাতা যাওয়ার শেষ বাস চলে গিয়েছে সোওয়া সাতটা নাগাদ। কলকাতায় যাওয়ারও উপায় নেই। রাতটা উদ্বেগে আর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে পরের দিন যশোদা ছুটলেন কলকাতায়। বড়বাবুর বাড়ি বাগবাজারে। তেতলা বাড়ি। ছেলেরা সকলেই একসঙ্গে থাকে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার।

বড়বাবুর বড় ছেলে বড়দা—মানে কানাইলাল। মেজো ছেলে শ্যামলাল। তিনি হলেন মেজদা। ছোটর নাম কুমারলাল। বড়দা এখন বেনারসে, পুজোর মরসুমে কাশীর চকপট্টি আর তাঁত মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যবসার কাজে। এখন থেকে না ব্যবস্থা করে রাখলে বিয়ের মরসুমে মনের মতন বেনারসী পাবেন না। তা ছাড়া আজকাল সুতি কাপড়েও বেনারসী ধরনের কাজ হয় কাশীতে। মালের অর্ডার দিয়ে

দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন। তাঁকে হুট করে এ-সময় একটা দুঃসংবাদ দেওয়া যায় না। আর না-জেনে না-দেখে-কেমন করে বড়দাকে খবর দেওয়া যায় যে, বাবা আত্মহত্যা করেছেন, তুমি পত্রপাঠ ফিরে এসো।

মেজো শ্যামলাল স্বভাবে ভিতু আর সাবধানী। তার মোটেই ইচ্ছে নয়, ব্যাপারটা নিয়ে হুট করে থানা-পুলিশ করা। বাবা যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন—আর থানাপুলিশ করতে ছোটে বাড়ির লোকে—তবে ভবিষ্যতে বিরাট একটা গোলমাল হবে। আত্মহত্যা করতে চলেছি—এই ব্যাপারটা পুলিশকে জানালেও সেটা বিশ্রী অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইনের কত না ফ্যাকড়া।

কুমারলাল এখন ছুটেছে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা-যেখানে যেখানে জ্ঞাতি, গোষ্ঠী আছে তাদের—সকলের কাছে গিয়ে বাবার খোঁজ নিতে। মানুষ বুড়ো হলে ভীমরতি ধরে। বাবারও যে ধরেনি কে বলবে।

শ্যামলালের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোদা এসে ধরেছিলেন কিকিরাকে। রায়বাবুর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল যশোদার। অনেককাল আগে একই পাড়ায় থাকতেন দু'জনে।

কিকিরা মন দিয়ে সব শুনেছিলেন ঘটনাটা। কৌতুক এবং কৌতূহল—দুই-ই বোধ করেছিলেন। শেষমেষ রাজিও হয়ে গেলেন।

মাথায় ছাতা। গায়ে রেনকোট। মাঠঘাট, জলকাদা ভেঙে, মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ সরিয়ে কিকিরারা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণধামে পৌঁছে গেলেন।

দূর থেকে ভাল করে বোঝা যায় না, আন্দাজ করা চলে। তার ওপর বৃষ্টির বিরাম নেই। কাছে এসে বোঝা গেল, কৃষ্ণধামের কম্পাউণ্ড-ওয়াল তেমন উঁচু নয়, হাত তিনেক হবে। তার ওপর অবশ্য ছোট ছোট লোহার খুঁটি জড়িয়ে তারকাঁটা লাগানো। গাছপালাই নজরে পড়ে বেশি, সামনের দিকে। বড় বড় গাছও রয়েছে অনেক; আম, জাম, পেয়ারা। পেছন দিকে কৃষ্ণধাম। বাড়িটা বড় নয়। ছোট। দেড়তলার মতন লাগে তফাত থেকে দেখলে। বাড়ির ছাঁদ অনেকটা মন্দিরের মতন। মানে নকশাটা মন্দির ধরনের। আশপাশে ফুলগাছ, সরু সরু পথ, মোরাম আর নুড়ি পাথর বিছানো পথ।

ভালই লাগে দেখতে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা সার, আপনি বললেন বর্ষায় একটু 'ফিশিং' করতে যাবেন। এই আপনার ফিশিং?"

কিকিরা বললেন, "দ্যাখো তারাবাবু, আমি অনেক কিছু জানি; তার চেয়েও বেশি হল যা জানি না। পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল। আমার ব্রেনেরও সেই অবস্থা, সার বস্তু পার্ট ওনলি, ফিশিংটা আমার শেখা হয়নি বাপু। ছিপ আমি দেখেছি; মাছ

ধরতেও দেখেছি বাবুদের। কিন্তু জীবনে কখনও ছিপ ধরিনি।...তা সে যাই হোক, তোমাকে আমি এই ফিশিংয়ের ব্যাপারটা বলেছি আগেই।"

"তা অবশ্য বলেছেন।"

"তবে?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে বাজে বলে মনে হচ্ছে। এই বৃষ্টিবাদলায় কেউ এমন অজ গাঁয়ে আসে। চাঁদু বেঁচে গিয়েছে।"

"বেঁচে গেল, কিন্তু মজাটা জানতে পারল না। চাঁদু কথায় কথায় বাড়ি ছোটে কেন বলতে পারো?"

"ও বোধ হয় হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে। বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে বসবে।"

"পারবে?"

"পারবে। মন বসাতে পারলে। চাঁদু দারুণ ছেলে। তবে কিকিরা, চাঁদু কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে আমি মরে যাব। ও আমার বন্ধু, ভাই, গার্জেন...."

কিকিরা হেসে বললেন, "তুমি এক কাজ করো।"

তারাপদ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "কম্পাউণ্ডারিটা শিখে নাও। চাঁদুর 'কম্প' হয়ে পাশে পাশে থাকতে পারবে।"

তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, "তা ঠিক।...তবে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছি চাঁদুর কোয়ার্টারে। কাল পরশু ফিরলেই জানতে পারবে।"

।। দুই।।

হাত-পা ধুয়ে ভিজে পোশাক পালটে কিকিরারা চা খেতে বসলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। বৃষ্টি ধরে রয়েছে, তবে আবার নামবে।

চা খেতে খেতে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "কই, সেই কাগজগুলো দিন, দেখি।"

যশোদা আগেই নিয়ে এসেছেন কাগজের চিরকুটগুলো। জামার পকেটেই ছিল। এগিয়ে দিলেন।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে নিলেন কাগজগুলো। দেখলেন একবার। একই ধরনের কাগজ। এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতা। লেখার কালি কলমও এক। হীরালালের হাতের লেখা চলনসই।

যশোদা বললেন, "পর পর গুছানো আছে। ওপরেরটা প্রথম...."

কিকিরা লেখাটা পড়লেন মনে মনে। "আমার বয়েস আটষট্টি হইয়া গিয়োছে।

দেশ ছাড়া হইয়া যখন আসি, উনিশ-কুড়ি বয়েস ছিল। লেখাপড়া ঠিকঠাক শেখা হইয়া
উঠে নাই। পাঁচ ঘাটের জল খাইয়া কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। তাহার পর
কাপড়ের গাঁঠারি পিঠে করিয়া বাড়ি বাড়ি তাঁতের শাড়ি বিক্রি করিতাম। পরিশ্রম
অনেক করিয়াছি। অবশেষে শ্যামবাজারে একটি কাপড়ের দোকান দিতে পারি।
ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সৎভাবে ব্যবসা করিয়াছি। ভাগ্যও সহায়
হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যবসা বাড়িল। তিন-তিনটি দোকান দিলাম। এখন
তো অভাব অনটন কিছুই আর নাই। ছেলেরাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে কিন্তু
সুখ নাই। অনর্থক আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে ইচ্ছা
করে।”

লেখাটা বার দুই-তিন পড়ে কাগজটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা।

দ্বিতীয় চিঠিটা ছোট্ট। তাতে লেখা ঃ “অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এবার সংসার
হইতে বিদায় লওয়াই আমার উচিত। বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কত অধর্ম অন্যায়
দেখিতে হইবে। মহাভারতে পড়িয়াছি, স্বয়ং মহাজ্ঞানী ভীষ্মও নিজের ইচ্ছামৃত্যুর জন্য
অনুতাপ করিতেন। ভাবিতেন, উহা যেন অভিশাপ। আমি সামান্য মানুষ। আমার আর
কতটুকু ক্ষমতা। আমি মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আমার যাওয়া আর কে আটকায়।”

চিঠিটা তারাপদকে পড়তে দিলেন কিকিরা। শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে যশোদাকে
বললেন, “এইটেই শেষ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

চিঠিটা খুবই ছোট। কয়েকটি মাত্র কথা। “আমি শেষ যাত্রায় চলিলাম। স্বেচ্ছায়।
আমার পরিণতির জন্য কাহাকেও আমি দায়ী করি না। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করুন।”

বার দু-তিন শেষ চিঠিটা পড়ে কিকিরা কাগজের টুকরোটা তারাপদকে এগিয়ে
দিলেন।

সামান্য চুপচাপ। পকেট থেকে কিকিরা চুরুট বার করলেন। সরু আঙুলের মতন
চুরুট। দেশলাইটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। চুরুট ধরাতে দশ-বারোটা কাঠি নষ্ট হল।

“যশোদাবাবু?”

“বলুন?”

“চিঠিটা তিনটের হাতের লেখা তো একই লোকের মনে হচ্ছে। হীরালালবাবুর
চিঠির শেষে নামও লিখেছেন, হীরালাল দাশ। আপনি কী বলেন?”

“হাতের লেখা বড়বাবুরই।”

“নকল নয় তো?”

“আজ্ঞে না।”

“কালির রং কলমও একই বলে মনে হচ্ছে।”

“ঠিকই বলেছেন। আমিও কোনও তফাত দেখিনি।”

কিকিরা এবার তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, “তারা, তুমি একটা জিনিস
নজর করে দেখেছ? চিঠিতে কাটাকুটি বোধ হয় মাত্র দু'তিন জায়গায়। হাতের লেখা
স্পষ্ট। কোথাও হাত কাঁপেনি, এলোমেলো হয়নি লেখা। দেখেছ?”

তারাপদ দেখল। মাথা হেলিয়ে বলল, “হ্যাঁ—কথাটা ঠিকই।”

কিকিরা বললেন, “একজন লোক যখন সুইসাইড নোটের মতন চিঠি লেখে—
তখন তার মাথা কতটা ঠাণ্ডা হতে পারে? তার কোথাও একটু আবেগ থাকবে না,
দুঃখ থাকবে না? তোমার কী মনে হয়?”

“থাকা বোধ হয় উচিত।”

“বেশ, উচিত বাদ দিলাম। হয়তো হীরালালবাবুর মাথা বেজায় ঠাণ্ডা ছিল। স্ট্রং
নার্ভ। তিনি বেশ গুছিয়ে নিজের কথাগুলো লিখেছেন। মনে মনে নক্‌শাও করে
থাকতে পারেন। কিন্তু আমার যে ধোঁকা লাগছে হে!” বলে কিকিরা যশোদার দিকে
তাকালেন। “যশোদাবাবু, আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। যা জানেন
বলবেন, কথা লুকোবেন না।”

“লুকবো কেন! বলুন।”

“হীরালালবাবুর সঙ্গে আপনি অনেকদিন ধরে আছেন, আমি জানি। তবু ঠিক কত
বছর রয়েছেন জানা নেই।”

“আঠাশ-তিরিশ বছর। বড়বাবু যখন শ্যামবাজারে তাঁর প্রথম দোকান করেন—
তখন থেকেই আমি তাঁর কর্মচারী বাবু। আমি আর বিনোদ বলে একটা ছেলে দোকান
দেখতাম।”

“দ্বিতীয় দোকানটা কবে হয়?”

“পাক্কা দশ বছর পরে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে।”

“তৃতীয়টা?”

“ভবানীপুরে। সেটা হয়েছিল মেজদার বিয়ের আগে।”

“আর হাওড়ার দোকান?”

“ওটা তেমন পুরনো নয়। বছর পাঁচ-সাত আগে হয়েছে।

“দোকানগুলোর মালিকানা?”

“আগে সবই বড়বাবুর ছিল। পরে তিনি ভাগ করে দেন। আদি দোকান পায়
বড়দা, কলেজ স্ট্রীটের দোকান দেওয়া হয় মেজদাকে। ভবানীপুরের দোকানের
মালিকানা ছোড়দার।”

“আর হাওড়ার দোকান?”

“ওটা বড়বাবু অন্যরকম ব্যবস্থা করেন। তাঁর শ্যালক ও শ্যালকের ছেলেদের

লিখে দেন। অবশ্য ওই দোকানটায় শ্যালকবাবুদেরও টাকা খাটত।"

"আপনার মনিবই বলুন আর বড়বাবুই বলুন—মানুষ কেমন ছিলেন?"

"বাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। সাদামাঠা, সরল। সৎ মানুষ। ব্যবসাদার হলেও তিনি শুধু লাভের দিকে চোখ রাখতেন না। বরং দশ পয়সার জায়গায় আট পয়সা লাভেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ঠাকুর দেবতায় অগাধ ভক্তি ছিল। বউ ঠাকুরণ গত হওয়ার পর পুরোপুরি নিরামিষ আহার করতেন। আর গত তিন-চার বছর দোকানের ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না বিশেষ। পুরনো লোকজন বলে শ্যামবাজারের আদি দোকানটায় সন্ধ্যের মুখে এক-আধ ঘণ্টা বসতেন। পুরনো লোকজন এলে কথাবার্তা বলতেন সুখদুঃখের।

কিকিরা চুরুট টানতে টানতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

তারাপদ হঠাৎ কিকিরাকে বললেন,"সার, ছেলেদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়নি তো? বুড়োমানুষ, কোনও ব্যাপারে মান-অভিমান হতে পারে?"

যশোদাই জবাব দিলেন। বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। তবে বড়দা শ্যামবাজারের দোকানটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। পাশের একটা ছোট হোসিয়ারি দোকান কিনে নেয়। আর আজকাল যা ফ্যাশান, দোকানটা হাল কায়দায় সাজিয়ে-ঠাণ্ডা-মেশিন চালু করে দোকানে। বড়বাবুর এটা পছন্দ হয়নি। তিনি সাবেকি মানুষ, নিজের হাতে-গড়া দোকান, অত ঝকমকি তিনি মেনে নিতে পারেননি।"

"ও! তা এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছিল?"

"না। বড়বাবু চুপ করেই থাকতেন। মুখে কিছুই বলেননি। মনে লেগেছিল।"

"দোকান সাজানোর পর বিক্রিবাটা কমেছিল, না, বেড়েছিল?"

"বেড়েছিল।"

"তবে আর কী। অন্য দোকানগুলোর বেলায় কী হয়েছিল?"

"না, সেগুলো আগের মতনই ছিল।"

"কেমন চলত?"

"খারাপ নয়। মেজদার কলেজ স্ট্রীটের দোকানে তিন-চার মাস খুব বেচাকেনা হত এই পুজোর টাইমে। ভবানীপুরের দোকানও ভাল চলত। ছোড়দা তার দোকানে রেডিমেড পোশাক রাখত। বাচ্চাদেরই বেশি।"

"আর হাওড়ার দোকান?"

"আজ্ঞে, ওটা আজকাল ভাল চলত না। তবে দোকানটা তো বড়বাবু শালাবাবুকে দান করেছিলেন। কাজেই ওটা হীরালাল দাশ অ্যান্ড সন্সের মধ্যে পড়ে না।"

বেলা হয়ে আসছিল। আবার বৃষ্টি নামল।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এখন থাক। এবার স্নান-খাওয়া সেরে নিই। দুপুরে

একটু জিরিয়ে, বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরদোর দেখা যাবে। চোখে সব দেখে নেওয়া ভাল। আজ আমরা কিন্তু রাত্তিরেও আছি এখানে। মনে আছে তো?"

যশোদা বললেন, "ও-কথা কেন বলছেন! আপনাদের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করা আছে। যতদিন খুশি থাকতে পারেন।"

চুরুট নিভে গিয়েছিল কিকিরার। সেঁতিয়ে গিয়েছে। তারাপদর কাছে একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ যশোদাকে বললেন, "আপনার বড়বাবু পান-তামাক খেতেন না।"

"আজ্ঞে না। ওঁর কোনও নেশা ছিল না। দু'বেলা দু'পেয়ালা চা খেতেন মাত্র। আর গলা খুসখুস করে কাশি আসত বলে লবঙ্গ মুখে রাখতেন বেশিরভাগ সময়। বড়বাজার থেকে বাবুর জন্যে বাছাই করা ভাল লবঙ্গ আসত। আমিই আনতাম।"

"চলুন ওঠা যাক।" কিকিরা উঠে পড়লেন।

।। তিন।।

বিকেলে কৃষ্ণধামের ঘরগুলো দেখলেন কিকিরারা। নীচের তলায় চার পাঁচটি ঘর। মাঝারি মাপের। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্য তফাতে, একপাশে। বারান্দা প্রায় চারপাশেই। বারান্দার তলায় লতাপাতা আর ফুলগাছের ঝোপ। হাসনুহানা, টগর, বেল—আরও কত। ঘরগুলো পাকাপোক্তভাবে তৈরি। তবে বাহুল্য নেই, বিলাসিতা নেই। একটা ঘরে দু' আলমারি ধর্মগ্রন্থ। দেওয়ালে দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গর পট। সরল সাধাসিদে ঘরদোর। কিন্তু বেশ লাগে।

শেষে হীরালালের শোয়ার ঘরে এলেন কিকিরারা। অবাকই হলেন ঘরটি দেখে। আসবাব যৎসামান্য। একটি পুরনো পালঙ্ক, ড্রয়ার একটি, কাঠের আলমারি, আলনা। দুটি মাত্র চেয়ার। টেবিল নেই। ঘরে চারটি জানলা। কাঠের পাল্লা, গ্রিলও রয়েছে।

যশোদা পালঙ্কটি দেখিয়ে বললেন, "চিঠির টুকরো তিনটি এই বিছানার ওপরেই ছিল।"

কিকিরা আর তারাপদ নজর করে ঘর দেখছিলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, অনেককাল আগে আপনার সঙ্গে দোকানে বেড়াতে গিয়ে একবার হীরালালবাবুকে দেখেছিলাম। চেহারাটি ঠিক মনে নেই। বেঁটে রোগা মতন ভদ্রলোক না?"

"আজ্ঞে বেঁটে ঠিক নয়, তবে মাথায় খাটো। গায়ের রং ছিল ধবধবে। মাথায় চুল অল্প। ইদানিং সবই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।"

"সাজপোশাকও সাধারণ ছিল না?"

"ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে ফতুয়া পরতেন। গেঞ্জি কখনও পরেননি। চামড়ার জুতোও পায়ে দিতে পারতেন না।"

"কেন?"

"পায়ে অনেক কড়া ছিল। ওষুধ বিষুধ করেছেন। কাটিয়েছেন। আবার গজিয়ে যেত। ক্যাম্বিসের পা-ঢাকা জুতো পরতেন।"

"একটা হারমোনিয়াম দেখছি যে মশাই?"

যশোদা বললেন, "এখানে থাকলে নিজের মনে একটু গান গাইতেন। রামপ্রসাদী গানই বেশি।"

তারাপদ বলল, "ধার্মিক মানুষ।"

"তা ঠিকই। অমন মানুষ কেন যে..."

কথা থামিয়ে কিকিরা বললেন, "চলুন, এবার ওপরে যাওয়া যাক।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে দক্ষিণ দিকে দুটি ঘর। উত্তরে ঘর নেই, ফাঁকা ছাদ। বাড়িটাকে তাই দোতলা না বলে দেড়তলা বলাই ভাল। আকাশে মেঘ রয়েছে। তবে ছেঁড়া ছেঁড়া। বৃষ্টি আপাতত বন্ধ। আলো মরে এসেছে। টুকরো মেঘগুলো জমে গেলেই আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

যশোদা বললেন, "আসুন, ঘর দুটো দেখুন।"

কিকিরা এগিয়ে গেলেন। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি একেবারে ফাঁকা। মাটিতে একপাশে একটি কার্পেট পাতা। দেওয়ালে মস্ত বড় এক শ্রীগৌরাঙ্গর পট।

যশোদা বললেন, "এটিতে বড়বাবু কখনও-কখনও কীর্তনগানের আসর বসাতেন। বরানগর থেকে বাণীবাবু আসতেন কীর্তন গাইতে। তাঁর দলবল থাকত। আর আমরা থাকতাম। আশপাশের দু'-পাঁচজন।"

কিকিরা দেখলেন ঘরটা। পরিচ্ছন্ন। হীরালাল নেই, তবু ঘরটি যে ঝাঁট পড়েছে, মোছা হয়েছে—বুঝতে কষ্ট হয় না।

পাশের ঘরটি হীরালালের ঠাকুরঘর। একপাশে উঁচু বেদি। বেদির ওপর সাদা মার্বেল পাথরের স্ল্যাব। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। কালো পাথরের। আন্দাজে মনে হয়, হাত দুই উঁচু বিগ্রহ। দেখতে সুন্দর। চিৎপুরের পাথর বাজারে যা বিক্রি হয়—সেরকম মামুলি জিনিস নয়। বিগ্রহের দু'পাশে দুটি লম্বা পেতলের বাতিদান। ঝকঝক করছে। ঘরের ঘোলাটে আলোতেও সেটা চোখে পড়ে। বেদির তিন পাশে গ্লাস ফাইবার, ধোঁয়া রঙের; সামনের দিকটা খোলা। বেদির তলায় দু'ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির ধারগুলো আলপনার নকশায় রং করা। দেওয়ালের একটি পাশে দেওয়ালতাক, কাচের পাল্লা, ভেতরে কয়েকটা রুপোর বাসন, বাটি, চন্দন কাঠ, আরতির পঞ্চপ্রদীপ—এইরকম কত কী! আর গোল গোল কাচের শিশি। শিশির মধ্যে বাতাসা, কিশমিশ,

শুকনো খেজুর, মিছরি। একটা শিশিতে লবঙ্গও রয়েছে। শিশিটা কাত হয়ে গিয়েছে একপাশে।

যশোদা বললেন, "এসব ঠাকুরের।"

"বোঝাই যায়।...আচ্ছা যশোদাবাবু, ওই ফাইবার গ্লাসগুলো লাগানো হয়েছিল কেন?"

"ঠাকুরের গায়ে ধুলোময়লা যাতে না পড়ে!"

"ও!" বলে কিকিরা মাথার ওপর তাকালেন, তারপর তারাপদকে বললেন, "দেখেছ?"

তারাপদ আগেই দেখেছে। এই ঘরের ছাদের ধাঁচটা যেন মন্দিরের চূড়োর মতন।

"চলুন বাইরে যাই", কিকিরা বললেন।

বাইরে, ঠাকুরঘরের পেছনের আর পাশের খানিকটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের রেলিং। হাতকয়েক চওড়া ফাঁকা বারান্দা। ব্যালকনি মতন। ঠাকুরঘরের পেছন দিকের ব্যালকনি থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে তার চারপাশে কলাঝোপ আর পাতকুয়ো। কলাঝোপ যথেষ্ট ঘন। তার ওপর বর্ষায় পাতাগুলো যেন বিস্তর বেড়ে উঠেছে। ঝোপ ছাড়ালেই একটা জাম গাছ। জামগাছের ওপাশে ঢালু জমি। বাঁশঝোপ। তারপর কৃষ্ণধামের পেছন দিকের পাঁচিল।

কিকিরা মন দিয়ে দেখছিলেন।

তারাপদও নজর করে দেখছিল আশপাশ।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলেই কলাঝোপ?"

"আজ্ঞে।"

"কুয়োর জল কেমন?"

"ভাল।"

"একটাই কুয়ো নাকি?"

"না, আরও একটা আছে। গোয়ালঘরের দিকে।"

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিকিরা পায়ের তলা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। কাচের টুকরো। পায়ে লাগতে পারত। টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে কিকিরার চোখে পড়ল, কয়েকটা লবঙ্গ ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে অন্যরকম দেখায়।

লবঙ্গগুলো তুলে নিলেন কিকিরা। তারপর চোখের ইশারায় তারাপদকে কিছু বললেন।

তারাপদ বুঝতে পারল।

কিকিরা যশোদাকে নিয়ে অন্যপাশে সরে গেলেন। তারাপদ লোহার সিঁড়ি বরাবর কী যেন খুঁজতে লাগল হেঁট হয়ে।

অন্যপাশে সরে গিয়ে কিকিরা যশোদাকে বললেন, "আপনি হীরালালবাবুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। উনি যে এরকম একটা কাজ করতে পারেন—আপনাকে আভাসমাত্র দেননি।"

"না।"

"আপনিও বুঝতে পরেননি?"

"না। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম উনি মনে-মনে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। কথাবার্তায় আফসোস। দুঃখ করতেন।"

"কিসের আফসোস?"

যশোদাজীবন ইতস্তত করছিলেন; শেষে বললেন, "সেভাবে সরাসরি আমায় কিছু বলেননি। বোধ হয় বলতে চাইতেন, পারতেন না। তবে বুঝতে পারতাম, তিনি যা চান না, ভাবতেও পারেন না—এমন একটা ব্যাপার বাড়ির মধ্যে কোথাও হচ্ছে।"

কিকিরা নজর করে দেখলেন যশোদাকে। মনে হল, হীরালালের এই বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কর্মচারীটি সঠিক জবাব দিলেন না। কথা লুকোলেন।

কথা পালটে নিলেন কিকিরা। সহজভাবে বললেন, "বাড়িতে তিন ছেলের মধ্যে সদ্ভাব কেমন?"

"আজ্ঞে, হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, সংসারে ভাইবোনরাও সকলে সমান হয় কি! ফারাক থাকবেই।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, বুদ্ধি-বিবেচনা, সাহস, জেদ, এইরকম আর কি! কেউ ধূর্ত হয় বেশি, লোভী; কেউ যেমন আছে তেমনই থাকতে চায়। কেউ ভিতু, সাবধানী। কেউ বা হালকা স্বভাবের। নিজেরটি নিয়ে থাকে।"

"কথাটা ঠিকই যশোদাবাবু, পাঁচ আঙুল সমান হয় না।...তা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?"

"বড়দা কানাইলাল। অতিশয় বুদ্ধিমান বলতে পারেন। সাহসী।"

"মেজো ছেলে?"

"শ্যামলাল—মানে মেজদার কথা আগেই বলেছি। ভিতু ধরনের, শখশৌখিনতাও নেই। সাদামাঠা।"

"আর ছোট ছেলে?"

"কুমারলাল এখনও ঝোঁকের মাথায় চলে। হালকা স্বভাবের, বয়েসও কম। তবে হাল কায়দায় চলতে চায়। তা সে যাই করুক, ভবানীপুরের দোকানের ব্যবসাটা মন্দ

চালায় না।"

তারাপদ ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। "চলুন, নীচে যাই।....ভাল কথা, হীরালালবাবু চলে যাওয়ার পর ওপরতলার ঠাকুরঘর, বাইরের এই জায়গাগুলো ঝাঁট পড়েনি? মোছামুছি করেছে তো?"

"মনে হয় করেনি। সকলেই বড়বাবুকে খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওদের?"

"করবেন?...আপনিও তো ব্যস্ত। চলুন যাই, চা-টা খেতে হবে।"

কিকিরা নীচে নেমে গেলেন।

।। চার ।।

কিকিরা আর তারাপদ মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে, তবে রাত নয়। তবুও, এই ফাঁকা জায়গায় সন্ধে-রাতই যেন অনেক। বাইরে বৃষ্টি নেই। ঝিঁঝি ডাকছে। বাঁশবাগান আর কলাঝোপের দিক থেকে ক্রমাগত ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "তারা, চিঠিগুলো—মানে, হীরালালবাবুর লেখাগুলো আমি বারবার পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?"

"ভদ্রলোক ব্যবসাদার হলেও সৎ সরল মানুষ। তিনি শুধু ধর্মকর্ম করতেন না, মনেমনেও অধর্ম করার কথা ভাবতেন না। তাঁর কাছে ধর্ম ভেক ছিল না। অথচ নিজের সংসারের মধ্যেই এমন কোনও অন্যায় অধর্ম হচ্ছিল যা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছিলেন না।"

"কেন?"

"এরকম হয়। বুড়োমানুষ, সংসারের সাতপাঁচে থাকতেন না। বলতে গিয়ে যদি বিপত্তি হয়। তাছাড়া আমার ধারণা, বলার মতন জোর প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল না। হয়তো সন্দেহ করেছিলেন। কানাঘুষো শুনেছিলেন...."

"হতে পারে। তবে কিসের সন্দেহ?"

"সেটাই ভাবছি। যশোদাবাবুর পেটে এখনও কথা আছে। বলতে পারছেন না।"

"তা হলে মামলা ছেড়ে দিন, সার। আমার মনে হয়, আত্মহত্যা করার কথাটা বাজে। এখানে কেউ আত্মহত্যা করলে আজ ক'দিনে তার কোনও হদিশ মিলবে না?"

"তোমার কথাটা ঠিকই। আমারও মনে হয় না, হীরালালবাবু সত্যি সত্যি

আত্মহত্যা করেছেন।...আরে, একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখন কি সে ঠাকুরঘরের লবঙ্গর শিশি থেকে একমুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে চলে যায়। অসম্ভব! তখন তার মনের সে-অবস্থা থাকে না।"

তারাপদ বলল, "আপনি ওপরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির সামনে লবঙ্গ পেয়েছেন সার, আমি সিঁড়ির নীচের ধাপেও গোটা দুয়েক পেয়েছি।"

"ভদ্রলোক যাওয়ার আগে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন। হয়তো ঠাকুর প্রণাম করতে। তারপর কাচের আলমারি থেকে একমুঠো লবঙ্গ তুলে নিয়ে সিঁড়ির পথ ধরেই কলাঝোপ আর বাঁশঝাড়ের আড়াল দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন কোথাও।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "বেশ বুদ্ধি করেই পালিয়েছেন। যশোদাবাবুকে কোনও এক নার্সারি দেখে আসতে বলে, কাজের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিলেন! কিন্তু সার, ওই বুড়োমানুষ কোথায় যেতে পারেন! এখানে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায় পাবেন? সবই তো ফাঁকা।"

কিকিরা মাথা দোলাতে লাগলেন। ভাবছিলেন। পরে বললেন, "শোনো বাপু, আমাকে একটু ভাবতে দাও। হীরালাল আত্মহত্যা করেননি বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক কেন, কিসের জন্য এই নাটক করছেন। বাড়ির গণ্ডগোল একটা কারণ হতে পারে। সেই গণ্ডগোল কেমন? কে বা কারা করেছে? কেনই বা?....তা আপাতত আমরাও আর এখানে থাকছি না। কালই ফিরে যাব কলকাতায়। আবার আসব আসছে হপ্তায়। শুক্র বা শনিবার। চাঁদও ততদিনে ফিরে আসছে। তখন একবার চেষ্টা করা যাবে।"

তারাপদ বলল, "এই ক'দিন কী করবেন?"

"দাশবাবুর পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। দোকানগুলো দেখব। আর ফন্দিফিকির খুঁজব।"

"দেখুন চেষ্টা করে।"

"তুমি একবার যশোদাবাবুকে ডেকে আনো। কথা বলব।"

তারাপদ বাইরে গেল যশোদাজীবনকে ডাকতে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই যশোদা এলেন।

কিকিরা বললেন, "যশোদাবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"বলুন।"

"আমরা কাল ফিরে যাব।...না, না, আসব আবার, আসছে হপ্তায়—শুক্র বা শনিবার। এর মধ্যে আপনি যেভাবে খবরটা চেপেচুপে আছেন সেইভাবে থাকবেন। থানা-পুলিশ করবেন না। মেজবাবু ছোটবাবুকে সামলে রাখবেন।"

"বড়দা?"

"তাঁকে আলাদা করে খবর না দিলেই ভাল। তবে তিনি যদি নিজেই ফিরে আসেন কাশী থেকে অন্য কথা।...ক'টা দিন সবুর করে থাকুন, হইচই করবেন না। একটা কথা জানবেন, আপনার বড়বাবু সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করেননি। আর যদি করেও থাকেন তবে এখানে কোথাও নয়। বুঝলেন!"

মাথা নাড়লেন যশোদাজীবন।

।। পাঁচ ।।

পরের শুক্রবারই এলেন কিকিরা। একা।

বর্ষাবাদলা নেই। ভাদ্রমাসের চড়া রোদ থাকছে দিনভর। গাছপালার সেঁতানি ভাব শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। রাত্রে হালকা জ্যোৎস্না শুক্লপক্ষ চলছে।

এসেই বললেন, "আপনাদের বড়দা ফিরেছেন নাকি?"

"না। দু-চারদিনের মধ্যেই আসছেন।"

"বাড়িতে হইচই হচ্ছে?"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। মেজদাকে আমি সামলে রেখেছি। কিন্তু ছোড়দা আর শুনতে চাইছে না। বলছে, বাবার আত্মহত্যা করার কথাটা না হয় চেপে গেলুম। হারিয়ে যাওয়ার কথাটা তো পুলিশকে জানাতে পারি।"

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, "মিসিং। তা অবশ্য জানাতে পারেন; তবে মিসিংয়ের সঙ্গে অনেক ফ্যাকড়া জড়িয়ে আছে। সুতোর জট খুলতে গেলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আপনাদের ছোড়দার জানা নেই।"

যশোদা মাথা হেলালেন। মানে, তিনি বোঝেন সবই।

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনাদের এখানে শুকনো খড় পাওয়া যাবে। খড়ের আঁটি?"

যশোদা অবাক। হকচকিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। "আজ্ঞে খড়?"

"খড়ের আঁটি। গোরু গোয়ালঘর যখন রয়েছে এখানে-আপনাদের কৃষ্ণধামে তখন খড় পাওয়া সহজ। না কি!"

"পাওয়া যাবে।"

"ধরুন একটু বেশিই লাগবে।"

"দেখি। খড়ের গাড়ি এ হপ্তায় আসেনি। জোগাড় হয়ে যাবে।"

"আপনাদের এখানে কেরোসিন তেল দিয়েই লণ্ঠন জ্বলে। চার-পাঁচ বোতল বা ধরুন দু'চার লিটার তেল পাব নিশ্চয়।"

যশোদা কিছুই বুঝলেন না। তাকিয়ে থাকলেন হাঁ করে।

কিকিরা মুচকি হাসলেন। ঠাট্টার গলায় বললেন, "ঘাবড়ে যাবেন না। ভয়ের কিছু

নেই।...শুনুন, কাল আমার জন্য দু'জন লোক লাগবে। মালি আসবে না?"

"আসতে পারে।"

"ঠিক আছে।...না এলে আপনাদের এখানে কাজের লোক আছে। দুটো ঠিকে মজুর ধরে দিতে পারবেন না?"

যশোদা কিছু না বুঝলেও মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, "তারাপদবাবু এলেন না?"

"কাল আসবে। অফিস সেরে। আমি আগে আগে এলুম কাজ খানিকটা গুছিয়ে রাখতে। একটাই শুধু আমার ভয় মশাই, হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি নেমে যায় কাল-পরশু-তবেই বিপদ।"

"আর এখন নামবে বলে মনে হয় না। ক'টা দিন একটু মাঠঘাঠ শুকুক। তবে ভাদ্রমাস, বলা যায় না কিছুই।"

পরের দিন তারাপদ এল। বিকেল-বিকেল। কাঁধে কিটব্যাগ, হাতেও একটা নাইলনের ছোট-হাত-ঝোলা।

কিকিরা বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন তারাপদর। বললেন, "সংবাদ কী?"

"ভাল।"

"চাঁদু?"

"সারের অ্যাডভাইস জানিয়ে এসেছি। হাজির থাকবে সময় মতন। আপনার কাজ কতটা এগুলো।"

কিকিরা আঙুল দিয়ে কৃষ্ণধামের কম্পাউণ্ড-ওয়ালের দিকটা দেখালেন। বললেন, "দুটো পাশ হয়ে গিয়েছে। বাকি দু'পাশ কাল দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে। যাও না, একবার দেখে এসো।"

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে দেখে এল। বলল, "সার, গর্তগুলো আগুপিছু কেন?"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। "একে-একে জিগজাগ ট্রেঞ্চ। অবশ্য এটা ট্রেঞ্চ নয়। মানে, মাটি কাটা নালা নয় হে, ফুট তিনেক অন্তর একটা করে গর্ত। তা গর্তগুলো ফুট দুই-আড়াই হবে, তলার দিকে, ডিপ আর কী! আর গোললাইনের মাপও মোটামুটি ওইরকম।...আগুপিছু—জিগজাগ করার মানে হল, তফাত থেকে দেখলে চোখের ভুল হবে। বোঝা যাবে না, একটা গর্ত থেকে আর-একটা গর্তের মধ্যে হাত কয়েক তফাত। আগুন যখন জ্বলবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটানা দাউদাউ করে জ্বলছে।"

তারাপদ হেসে বলল, "এটা কি আপনার ম্যাজিশিয়ানের টেকনিক?"

'খানিকটা তো বটেই", বলে আবার হাত তুলে একটা জায়গা দেখালেন, "ওই যে দেখছ জায়গাটা, ওখানে যত রাজ্যের গাছের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জমানো হয়েছে। আরও দু-চার ঝুড়ি কাল জমানো যাবে। খড় রেডি। কেরোসিন তেল মজুত। আর তুমি তো অন্য মালমশলাও এনেছ!" অন্য মালমশলা বলতে খানিকটা গন্ধক।

বাগান থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারাপদ বলল, "সবই না হয় হল। আপনি লঙ্কাদহন পর্বটা সারলেন, কিন্তু যার জন্য এত—সেই ভদ্রলোক যদি ধরা না দেন!"

"না দিলে করার কিছু নেই। আমরা যশোদাবাবুকে বলব, আপনারা থানা-পুলিশ করুন, আমাদের দিয়ে হল না।"

তারাপদ যশোদা জীবনকে দেখতে পেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। বলল কিকিরাকে।

কিকিরা গলা নামিয়ে বললেন, "তারাপদ, কাল তুমি যশোদাবাবুর ওপর নজর রাখবে। উনি যেন এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যেতে না পারেন। এমনিতেই ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। মগজে কিছুই ঢুকছে না ওঁর। তার ওপর কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে যখন বাড়ির চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, উনি বোধ হয় পাগলামি শুরু করবেন।"

তারাপদ সে-কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু বলল, "হীরালালবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন বলে আপনার ধারণা। যদি না থাকেন—?"

"না থাকেন? দ্যাখো তারাবাবু, আমি ফিশিং এক্সপার্ট নই, তবে শুনেছি এক-একরকম মাছের জন্যে এক-একরকম চার কাজে লাগে। বঁড়শিরও হেরফের হয়। হীরালালবাবুর এই কৃষ্ণধামই আমার টোপ। এই টোপে হয় তিনি ধরা দেবেন, না হয় আমরা হার মেনে নিয়ে ফিরে যাব।...যাক্ গে, চাঁদুকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?"

"দিয়েছি। ও জায়গাটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এদিকে একবার ওদের ক্যাম্প বসেছিল। ডাক্তারদের ক্যাম্প।...ও ঠিক সময়ে হাজির হয়ে নিজের পজিশন নেবে।" তারাপদ হাসল।

"ভাল কথা, দেখা যাক কী হয়?"

বারান্দায় উঠে এলেন কিকিরা। যশোদাজীবন দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন তারাপদকে। কিকিরা হেসে বললেন, "যশোদাবাবু, আমার চেলা এসে গিয়েছে। বলেছিলুম না, সময় মতন চলে আসবে।"

যশোদা বললেন, "দেখেছি ওঁকে। আসুন, চা তৈরি, ডাকতেই এসেছিলাম আপনাকে।"

"চলুন।"

।। ছয় ।।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সত্যি-সত্যি, কৃষ্ণধামে আগুন লেগে গিয়েছে। কম্পাউণ্ড-ওয়ালের কাছাকাছি মাটি খুঁড়ে করা গর্তগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুকনো খড়, গাছের পাতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। ভাদ্রমাসের বাতাসে দমকা নেই, তবু যেটুকু হাওয়া দিচ্ছিল ফাঁকা মাঠে তাতেই শিখা উঠেছে আগুনের, ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে আশপাশ। বোঝা যাচ্ছে না, একটা গর্তের সঙ্গে অন্য গর্তের হাত কয়েক ফাঁক আছে। এই মাঠে, দু'-পাঁচটা ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে সামান্য আগুনেই কম হলকা ছড়ায় না। আর এই সন্ধ্যেবেলার মুখেই ঝাপসা জ্যোৎস্নার মধ্যে কৃষ্ণধামের আগুন কার না নজরে পড়বে। কাছাকাছি গাঁ-গ্রাম নেই, তবু সামান্য তফাতে দু'চার ঘরের বসতি তো আছেই, আছে এক-আধটা ছোট নার্সারি-বাগান। লোকজন সাকুল্যে হয়তো দশ-পনেরোজন। প্রথমটায় হয়তো এরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর মাঠ ভেঙে ছুটে আসতে লাগল।

যশোদাজীবন হতবাক। কী যে হচ্ছে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা তাঁর। কৃষ্ণধামের কাজের লোক তো তিনটি-তারাও বোকার মতন এই অগ্নিকাণ্ড দেখছিল।

ঠিক যে কতক্ষণ সময় কাটল, বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দনের গলা পাওয়া গেল, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে, "তারা, ধরে ফেলেছি, শিগ্‌গির আয়, ধরা পড়ে গিয়েছেন।"

তারাপদ ফটকের দিকে দৌড়ে গেল। খোলাই ছিল ফটক। চন্দনকে দেখতে পেল তারাপদ, বুড়োমতন এক ভদ্রলোককে জাপটে ধরে রেখেছে চন্দন।

হীরালাল।

বারান্দায় একটা চেয়ারে বসানো হল হীরালালকে। ভদ্রলোকের যেন হুঁশ নেই। কী দেখছেন, কাদের দেখছেন—বোঝা যায় না। কাঁপছেন তখনও। কপালে ঘাম। চন্দন একবার নাড়ি দেখল ভদ্রলোকের। বলল, "আগে জল দিন ওঁকে, একটা পাখা এনে বাতাস করুন কেউ।"

যশোদা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "বড়বাবু!"

জল এল, পাখাও এল।

হীরালাল জল খেলেন, চোখেমুখে দিলেন। একজন পাখার বাতাস করতে লাগল।

আগুন ধরেছে দেখে যারা ছুটে এসেছিল তারা দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর যশোদার কথায় চলে গেল একে-একে। কৃষ্ণধামের গায়ে কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই, বাগান ছাড়িয়ে পাঁচিলের গায়ে-গায়ে যা আগুন জ্বলছে তখন, তাও নিভে

এসেছে বারোআনা।

হীরালাল কাশছিলেন। যশোদা বড়বাবুর জন্যে লবঙ্গ আনতে বললেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে হীরালাল খানিকটা সুস্থ হলেন। যশোদাকে বললেন, "এসব কী? এরা কারা?"

কিকিরাই কথা বললেন, "আমরা আপনার খোঁজেই এসেছিলাম। আমি কিঙ্করকিশোর রায়, লোকে বলে কিকিরা। এরা দু'জন আমার চেলা, তারাপদ আর চন্দন।...আমরা নিজের গরজে আসিনি মশাই, যশোদাবাবু আমার চেনা লোক, উনিই আমায় ধরে এনেছিলেন।"

"আপনারা পুলিশ?"

"না। আপনি যা করেছিলেন—তাতে থানা-পুলিশ করা যেত। করা হয়নি। আপনি বুড়োমানুষ, আপনার মতন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকার কথা। তবু এমন ভীমরতি ধরল কেন? আপনি কি জানেন না, আত্মহত্যা করার শাসানিও পুলিশ ভাল নজরে দেখে না। কেন আপনি এসব থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন! কেন?"

হীরালাল কথা বলতে পারছিলেন না। অসহায়ের মতন মুখ করে যশোদার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে আসতে লাগল। বিপন্ন, হতবুদ্ধি মানুষ।

কিকিরা বললেন, "কী হয়েছিল আপনার?...আমি আপনার লেখা কাগজের টুকরোগুলো পড়েই বুঝেছিলাম—আত্মহত্যা করার মানুষ আপনি নন। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।"

হীরালাল আধ-বোজা গলায় বললেন, "আপনারা আমায় ধরে আনলেন।"

"আমরা নিমিত্ত; আপনাকে ধরে এনেছে—আপনার কৃষ্ণধাম। আপনার এত সাধের, এমন ভক্তি-ভালবাসার বাড়ি, বিগ্রহ পুড়ে যাবে—সে কী আপনি জীবন থাকতে সইতে পারেন! দেখুন মশাই—মানুষ যা ভালবাসে অন্তর দিয়ে, ভক্তি করে, বিশ্বাস করে—তার ক্ষতি সইতে পারে না। আপনি ধার্মিক মানুষ, বিশ্বাসী মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে। সৎ সহজ ভদ্রলোক আপনি। এই কৃষ্ণধাম আপনাকে টেনে এনেছে। কিন্তু কোন আঘাতে অভিমানে আপনি চিঠিগুলো লিখেছিলেন বলুন তো?"

হীরালাল প্রথমটায় কথা বলতে পারছিলেন না। ঠোঁট কাঁপছিল।

"বলুন! সত্যি কথাই বলুন।"

"আমার বড় ছেলে—" হীরালাল বললেন। "আমার বড় ছেলে কানাই যা করতে যাচ্ছিল তার চেয়ে বড় অন্যায় অধর্ম কী হতে পারে!"

"কী করতে যাচ্ছিল?"

"আমাদের শ্যামবাজারের আদি দোকানে আগুন লাগাবার ফন্দি করেছিল। দোকানের গায়ে একটা ছোট দরজির দোকানও আছে ভাল চলে না আজকাল।

আমাদের দোকান অনেক আগেই ইনসিওর করিয়ে নিয়েছিল ছেলে। পরে আরও মোটা টাকায় ইনসিওর করায়। দোকান বেড়েছে, মালপত্র বেড়েছে, কাজেই অসুবিধে হয়নি।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন।

হীরালাল বললেন, "হঠাৎ একদিন আমার কানে গেল, কানাই দোকান থেকে তলায় তলায় দামি শাড়ি কাপড়চোপড় সরাচ্ছে। এর পর ভাড়াটে লোক দিয়ে আগুন ধরাবে। তারপর ইনসিওরেন্স থেকে টাকা নেবে। বখরার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল বোধ হয়। দোকান পুড়িয়ে সে নতুন করে সাজিয়ে পশার বসাবে। এয়ারকণ্ডিশন করবে। দরজির দোকানটাকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে।....বলুন এ অধর্ম নয়, পাপ নয়, জুয়াচুরি নয়! আমি আমার কাঁধে, মাথায় শাড়ির বোঝা বয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। অনেক রক্ত জল করে আমার ওই দোকান। প্রায় চল্লিশ বছরের....! সেই দোকান আজ ও আগুন লাগাবে!" হীরালাল কপাল চাপড়ে ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেললেন।

তারাপদ বলল, "আপনি ছেলেকে বলতে পারেননি কিছু?"

"না বাবা, পারিনি। যদি অস্বীকার করত! তাছাড়া কী জানো? সন্তানস্নেহ মানুষকে শুধু অন্ধ করে না, তার বিবেককেও বোবা করে রাখে। ধৃতরাষ্ট্রের কথাই মনে করো।"

কিকিরা বললেন, "আপনার বড় ছেলে দেখছি অতি ধূর্ত, সে নিজে গিয়ে কাশীতে বসে থাকল কাজের ছুতোয়, আর এখানে দোকান পোড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে গেল! যেন তাকে কেউ সন্দেহ না করে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি।...আমি ভেবেছিলাম চিঠিগুলো ছেলেদের হাতে পড়লে হয়তো..."

"আপনার মেজ ছেলে, ছোট ছেলে—এসব কিছু জানে না?"

"না।"

"আপনি কোত্থেকে জানলেন?"

হীরালাল মুখে বললেন না কিছুই। শুধু ঘাড় তুলে একবার যশোদার দিকে তাকালেন।

"তা কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতদিন?"

"মিশনারিদের বাড়িতে। ওখানকারবাবু আমার জানাশোনা। বন্ধুর মতন। ওঁর আশ্রয়েই ছিলাম।"

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে এবং ঋজুদা

বুদ্ধদেব গুহ

গত শনিবারে আজ্জু মহাম্মদের বিরিয়ানি পার্টির আগে যেখানে থেমেছিল ঋজুদা, সেখান থেকে এই শনিবারে শুরু হলো।

ঋজুদা বলল, টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক-এর বাড়ি থেকে যখন আমরা বেরোলাম চারজনে তখন চারটে বাজে। নাজিম সাহেবের দোয়াতে দুপুরের খাওয়াটা খুবই বেশি হয়ে গেছিল। তিত্তিরের কাবাব, হরিণের চাঁব, সীমারীয়ার পাঁঠার কলিজা ভাজা, মুরগীর কারি আর বাসমতি চাল-এর ভাত। মুসলমানেরা কখনওই টক খায় না। কেন খায় না, তা আরও বড় হবার পরে জেনেছিলাম।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। শীতের বিকেলের বন থেকে এক আশ্চর্য মিশ্র গন্ধ ওঠে। মিশ্র বলছি এই জন্যে যে, তাতে মিষ্টি, তিক্ত, কটু, কষায় সব রকমের গন্ধ

মিশে থাকে। পথের ধুলোর মিষ্টি গন্ধ তাতে যোগ হয়। আমাদের দেশের মাটির গন্ধ, ভারতবর্ষের গন্ধ, এমন গন্ধ কোনো দেশের মাটিরই নেই।

সূর্যটা ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার অদৃশ্য হাত যেন দুটি কানের পেছনে বরফের পুলটিস লাগিয়ে দেয়। মনে হয়, সেই হাত দুটি ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে যেমন করে সেদিন সকালে সেই অচেনা লোক দুটোর কান এবং নাকও কেটে নিয়েছিল, তেমনি করেই কেটে নেবে।

সীমারীয়ার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চাতরা যাবার পুরনো অব্যবহৃত পথটার সামনে এসে আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলাম। এই পথেই গতকাল দূর থেকে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকে দেখেছিলাম আমি।

সুব্রতকে নিয়েই বিপদ বেশি। কারণ তার বাবাই তখন পুরো হাজারীবাগ জেলার পুলিশ সাহেব, অর্থাৎ এস.পি.। আর তখনকার হাজারীবাগ জেলা ছিল মস্ত বড়। এখন তো কোডারমা-টোডারমা আরও কত জেলা হয়েছে। তখন ছোটনাগপুরের মধ্যে ছিল মাত্র চারটি জেলা—রাঁচী, হাজারীবাগ, সিংভূম আর পালামু্য। যে-অঞ্চলে ডাকাতি করে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে গত ছ'মাস হলো, যে-অঞ্চলে অন্তত বার চারেক সশস্ত্র পুলিশের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে পিপ্পাল পাঁড়ে ও তার দলবলের রক্তঝরা সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাতে চারজন পুলিশ নিহত হয়েছে এবং পনেরোজন আহত, পাঁচজন ডাকাতও নিহত হয়েছে, আহত কত হয়েছে জানা যায়নি কারণ তারা আহত সঙ্গীদের ফেলে যায়নি, নিয়ে গেছিল সঙ্গে করে।

চাতরার এক ডাক্তার, পুলিশের গুলিতে আহত ডাকাতদের চিকিৎসা করবেন না বলাতে তাঁকে গুলি করে মেরে দেয় পিপ্পাল পাঁড়ে। সেই এম. বি.বি.এস. ডাক্তার, নামধারী দুবে, নাকি গরীবদের উপরে খুবই অত্যাচার করত। তাই তাকে মেরে দেওয়ায় পিপ্পাল পাঁড়ের শাপে বর হয়েছে। চাতরার সব গরীবেরা পিপ্পাল পাঁড়ের দলে চলে গেছে। সরকার থেকে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের মাথার জন্যে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের দশ হাজার টাকা আজকের দশ লাখ টাকার সমান।

এই প্রকৃত গরীব-দরদী গুণটি আছে বলেই পিপ্পাল পাঁড়েকে পুলিশ সহজে কব্জা করতে পারছে না। সে ডাকাত বটে কিন্তু সে নিজের জন্যে ডাকাতি করে না। ডাকাতি করে, অত্যাচারীদের বাড়িতে, খুন করে, অন্যায়কারীদের। এবং লুটের মাল সব গরীবদের মধ্যে ১/২ বিলিয়ে দেয়, অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ও নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যে টাকা লাগে, তা রেখে। তাই স্থানীয় কোনো মানুষের কাছ থেকে পিপ্পাল পাঁড়ে বা তার দলবলকে ধরবার জন্যে পুলিশ কোনোই সাহায্য পায় না। তাছাড়া পুলিশ চিরদিনই আমাদের দেশে গরীবদের উপরে অত্যাচার করেছে আর বড়লোকদের

সেলাম ঠুকেছে।

এই অবধি একটানা বলেই ঋজুদা নিভে-যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে বলল, তোরা কি কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" পড়েছিস? না পড়ে থাকলে অবশ্যই পড়বি। আর পড়বি "আনন্দমঠ"। যে উপন্যাস থেকে আমরা 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র আর গান পেয়েছি।

তা কমলাকান্তের দপ্তরে কি আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি সেখানে এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, "আইন! সে তো তামাশামাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সময় থেকে কত বছর হয়ে গেছে কিন্তু আইন আজও তাই আছে বলতে গেলে। যার পয়সা নেই, সে বিচার পায় না। আইন নিজের হাতে নেওয়াটা বে-আইনী। এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু যেখানে আইন গরীবদের দেখে না, ভিন্ন মত ও দলের মানুষদের কাছে আইনের দরজা যখন বন্ধ, তখনই সমাজে পিপ্পাল পাঁড়েদের আবির্ভাব হয়, প্রাচীন ইংল্যান্ডের রবিনহুড-এর মতো অথবা আজকের ভারতের নকশালদের মতো। যা কিছুই ঘটে, তার পেছনে কারণ থাকেই। ক্রিয়া হলেই প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই আইনের চোখে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে জঘন্যতম অপরাধী হলেও তার সম্বন্ধে সবকিছু জানাশোনার পর তার প্রতি আমার এক দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মে গেছিল। তাকে গুলি করে মারার চেয়েও তাকে জানার এক অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল মনে।

তা তো হলো কিন্তু তোমার বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জির কথা কী যেন বলতে গিয়ে অন্য পথে চলে গেলে কেন?

ঋজুদা হাসল।

বলল, বয়স হচ্ছে যে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কথার খেই হারিয়ে যায়। তাছাড়া এই সব কথা তো আজকেরও নয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। সব কথা ঠিকমতো মনেও নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, সুব্রত যেহেতু হাজারীবাগের পুলিশ সাহেবের ছেলে, তাকে যদি পিপ্পাল পাঁড়ে একবার ধরে ফেলতে পারে তাহলে সারা পুলিস ফোর্সকে চরম বেইজ্জতি করা যাবে। তারপর সুব্রতকে খুন করার হুমকি দিয়ে তার যেসব সঙ্গী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তাদের ছেড়ে দেবার দাবিও জানাতে পারে সে। ভরসার কথা এই যে, সুব্রত, নাজিম সাহেবের খোকাবাবু যে হাজারীবাগের এস.পি. মিস্টার সত্যচরণ চ্যাটার্জির বড় ছেলে তা ইজাহারের খিদমদগারেরা আর কাড়ুয়ারা ক'ভাই ছাড়া কেউই জানে না। কিন্তু পিপ্পাল পাঁড়ের চর তো সব জায়গাতে

ছড়ানো আছে। কথাটা তার কানে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়।

হাঁকোয়া শিকারে আশেপাশের নানা গ্রামের যে সব মানুষেরা হাঁকোয়া করছে তাদের কারো কানে কথাটা গেলেই বিপদ ঘটতে পারে।

এই অবধি বলেই থেমে গিয়ে ঋজুদা রিমোট কন্ট্রোল কলিং বেল-এর সুইচটা টিপল।

কী হলো আবার?

দুঃসাহসী ভটকাই জিগগেস করল ঋজুদাকে।

গদাধরদা এসে দাঁড়াতেই ঋজুদা বলল, আরেক কাপ করে চা খাওয়াবে না গদাধরদা আমাদের?

নিশ্চয়।

বলল গদাধরদা। বলেই চলে যাচ্ছিল।

ঋজুদা বলল, শোনো, সঙ্গে একটু চিজ-স্ট্রও দিও। 'হট-ব্রেড' থেকে এনেছিলাম যে সকালে। ওদের জন্যেই তো এনেছিলাম। গদাধরদা বলল, আর চিকেন প্যাটিস?

ঋজুদা। তুমি চেপে যাচ্ছিলে।

দুঃসাহসী অসভ্য ভটকাই আবার বলল।

ঋজুদা হেসে বলল, আমার কি? আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট ভরা। তোদের জন্যে আজ গদাধরদা কি রাঁধছে জানিস ডিনারে?

কি?

তোরাই জিগগেস কর।

আমি বললাম, কি গো গদাধরদা!

খোলসা করে বলবে তো। আগে তো আমরা আসতেই নিজেই গড়গড় করে মেনু বলে দিতে।

সে তোমরা দুজনে যখন আসতে, মানে তুমি আর তিতির। এই ভটকাই দাদা তো একাই সব কথা বলে, অন্যে কী আর বলবে।

ভটকাই বলল, ছিঃ। ছিঃ। উঃ টু ব্রুটাস!

গদাধরদা বলল, চিকেনের মোমো, ভেটকি সালাড, হোয়াইট সস্ দিয়ে, আর পর্ক-এর গুলাশ।

এখানকার শুয়োর নয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার বন্ধু স্টিভ পাঠিয়েছে জাহাজে করে। গুলাশটাও হাঙ্গারীয়ান স্টাইলে রান্না। হাঙ্গারীয়ান কনসাল অমিদদার কুক-এর কাছে গিয়ে শিখে এসেছে তোদের খাওয়াবে বলে। 'গুলাশ' অবশ্য বিফ-এরই ভাল হয়। তা হিঁদুর ছেলে-মেয়েদের জাতটা গদাধরদা নিজে হাতে মারতে রাজী নয়।

কোন স্টিভ ঋজুদা? স্টিভ ওয়া?

ভটকাই বলল।

আজ্ঞে না। ওয়া নয়। স্টিভ হলেই কি ওয়া হতে হবে?

গদাধরদা চলে গেলেই আমি আর তিতির বললাম, ঋজুদা শুরু করো আর ভটকাই দয়া করে চুপ করো।

হ্যাঁ। সেই কারণেই নাজিম সাহেব সুব্রতকে নিয়ে তিতির-বটের মারার জন্যে উল্টোদিকে টাঁড় আর ঝাঁটিজঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। আমি আর গোপাল গিয়ে ঢুকলাম ওল্ড চাতরা রোড-এ, যে পথে সেদিন কাক-ভোরে পিপ্পাল পাঁড়ের দেখা পেয়েছিলাম আমরা।

ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময়ে গোপাল বলল, আমাদের ফিরতে রাত হবে। খাসির উমদা বিরিয়ানি, মধ্যে বটি কাবাব দেওয়া আর তিতিরের রোস্ট যেন রেডি থাকে নাজিম সাহেব। আমরা ডাকাত শিকারে যাচ্ছি। বহুতই পরিশ্রম করে ফিরব।

আর না ফিরলে?

আমি বললাম, শোকসভার বন্দোবস্ত করবেন। ইয়াদগারির।

বলেই, আমি আর গোপাল ঐ রাস্তাতে ঢুকে পড়লাম। গোপাল বন্দুকের ক্লাম্পে টর্চটা ফিট করে নিল। আমার টর্চটা জার্কিনের বাঁ পকেটে ছিল। ডান পকেটে ছ'টা গুলি। সবই এল. জি। দু'ব্যারেলে দুটো পোরা আছে। আমরা কিছুই শিকার করব না। বাঘই দেখি আর হরিণ কী পাখি, গুলির শব্দ করব না। আমরা পিপ্পাল পাঁড়ের খোঁজে যাচ্ছি।

তারপর? বলো ঋজুদা। আমার শুনতেই হাত ঘেমে যাচ্ছে। স্কুলের দিন থেকেই তুমি আর তোমার বন্ধুরা কীরকম ডেয়ার-ডেভিল ছিলে। ভাবলেও ভয় করে।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, কেন? তোরাই বা কি কম ডেয়ার-ডেভিল? স্কুলে পড়তে পড়তেই তো রুদ্র, তুই আর ভটকাইও আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশ কম জায়গাতে জীবন বিপন্ন করিসনি? যারা পারে, তারা পারে প্রথম থেকেই।

বলো, তারপরে।

আমি বললাম।

রাস্তাটা তো আর ব্যবহার হয় না।

গাড়ি বা বাস কিছুই চলে না।

কখনও-সখনও চোরা-শিকারীরা জীপ নিয়ে এসে ঢোকে রাতে। তাও ডাকাতের ভয়ে আজকাল তারাও আসে না। প্রাণ যাবার ভয় তো আছেই, বন্দুক-রাইফেলও বেহাত হয়ে যাবে। বন্দুক-রাইফেল বেহাত হওয়ার হ্যাপা প্রাণ যাওয়ার হ্যাপার চেয়েও অনেকই বেশি। মাঝে মাঝে ঘাস গজিয়ে গেছে। জঙ্গল দখল নিয়েছে। পথের দু'পাশ

থেকে জঙ্গল এগিয়ে আসছে পথকে গ্রাস করে। উপরেও গাছগাছালির ডালপালার চাঁদোয়া। তারই ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বিদায়ী সূর্যের আলোতে লাল হয়ে-যাওয়া আকাশের টুকরো-টাকরা দেখা যাচ্ছে। একটা কোটরা হরিণ খুব ভয় পেয়ে ডাকতে -ডাকতে ডানদিকের জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে গেল। ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া-কেঁয়া করে বুকের মধ্যে চমক তুলে। দূর থেকে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটে হুতুম প্যাঁচা দূরগুম- দূরগুম দূরগুম করে ডেকে উঠল। আস্তে আস্তে পাখ-পাখালির স্বর, কলকাকলি, স্তিমিত হয়ে আসছে। অন্ধকারও নেমে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ বাড়ছে।

টর্চ না জ্বালিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। টর্চ জ্বাললেই দূর থেকে তা দেখা যাবে। কোথায় পিপ্পাল পাঁড়ের পাহারাদার বা স্নাইপার ঘাপটি মেরে আছে তা কে জানে!

আধ মাইলটাক যেতেই মনে হলো যেন সামনে জঙ্গল কিছুটা জায়গাতে ফাঁকা হয়ে এসেছে। হয়তো কখনও বনবিভাগ কপিস্-ফেলিং করেছিল। অন্ধকার সুড়ঙ্গর মধ্যে থেকে বাইরের দিকে এগোলে যেমন আলোর আভাস চোখে পড়ে প্রথমে তারপর ক্রমশ আলো বাড়তে থাকে, সেই সুড়ঙ্গেরই মতো অন্ধকার পথের মধ্যে দিয়ে যথাসাধ্য নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে যেতে তেমনই মনে হলো আমাদের।

অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এলাকাতে পৌঁছবার আগে আমরা গাছের নিচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে ভাল করে নজর করে দেখলাম। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তবুও আমরা পথের দু'পাশে দু'জনে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ যখন দেখে না তখন কান শুনলেও শুনতে পারে।

মিনিট তিন-চার অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম যে দূরে একজন মানুষ খুব জোরে জোরে কাশছে। অনেকক্ষণ ধরে কাশল মানুষটি। এদিকে কোনো গ্রাম আছে বলে শুনিনি। দেখাও যাচ্ছে না কোনো গ্রামের চিহ্ন। পরিত্যক্ত পথের পাশে একলা মানুষ কী করতে আসতে পারে সবরকম জানোয়ার-ভরা এই গভীর জঙ্গলে?

গোপাল আর আমি ফিসফিস করে পরামর্শ করে আরও মিনিট দশেক ওখানে অপেক্ষা করব ঠিক করে পথের পাশের একটি শিলাস্তূপের পাথরের উপরে বসলাম। পাথর নয়তো বরফের চাঙড়। পেছন জমে গেল। ইতিমধ্যেই শিশির পড়তে শুরু হয়েছে।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলে কেন?

তিতির জিগগেস করল।

করলাম, কারণ তখন পশ্চিমাকাশে যদিও লাল মুছে গেছিল, অস্পষ্ট সাদাটে

ভাবটা ছিল। পিপ্পাল পাঁড়ের যদি কোনো স্কাউট কোনো গাছের উপরে মাচাতে বসে থাকেও, পুরো অন্ধকার হয়ে গেলে সে বা তারা আমাদের অত সহজে দেখতে পাবে না। আমরাও তো শিকারী। সবরকম সাবধানতা নিয়েই আমরা এগোব। যে ঝুঁকি এড়ানো যায়, তা এড়ানো গেলে, এড়ানোই ভাল। জেঠুমণি সবসময়েই বলতেন।

গাঢ় অন্ধকার নেমে এলে আমরা দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে যেদিক থেকে কাশি শুনেছিলাম সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম খুবই আস্তে আস্তে। শিশির পড়তে শুরু করেছে তাই শুকনো পাতার উপরে পা পড়ায় তখন আর মচমচানি উঠছে না।

তারপরে? তিতির বলল।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিটার এগিয়ে যাওয়ার পরে এক বিপদের সূত্রপাত হলো। একটি ল্যাপউইঙ্গ, এদিকে ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গই বেশি, অন্ধকারে তো তার ডানার রঙ চেনার উপায় ছিল না, হট্টিটি-হুট্ হট্টিটি-হুট্ করে আমাদের মাথার ওপরে ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে বা ফাঁকা জায়গাতে মানুষ বা শ্বাপদ চলাচল করলেই ওরা এমন করে ডেকে বনের প্রাণীদের সাবধান করে দেয় তা তো তোরা জানিসই। বনের প্রাণীদের সাবধান করে করুক কিন্তু পিপ্পাল পাঁড়েও যে সাবধান হয়ে যাবে, সেই ছিল বিপদ।

তারপর? তোমরা কী করলে?

আমরা থেমে গেলাম। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেলাম যেখানে যে ছিলাম।

মনে হলো, যেদিক থেকে কাশির শব্দ শুনেছিলাম সেদিক থেকে একাধিক মানুষের কথাবার্তাও ভেসে আসছে। আরও একটু এগোতেই বোঝা গেল ঐ দিকে একটি দোলা মতো জায়গা আছে। সেখানে জলও নিশ্চয়ই আছে। সেখানে আগুনও জ্বালিয়েছে কারা যেন ।

আমরা খুব সাবধানে সেদিকে এগোতে লাগলাম লেপার্ড-ক্রলিং করে। ঐ শীতেও পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় আমাদের জামা ও মাথার চুল ভিজে গেল।

আরেকটু এগোতেই দেখি পাঁচ-ছ'টি মোষ এক জায়গাতে শুয়ে-বসে জাবর কাটছে আর একজন মানুষ তাদের সামনে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। পাছে বাঘ এসে হামলা না করে। এই আগুন মোষেদের নিরাপত্তার জন্যে।

আর যাই হোক, এরা সম্ভবত ডাকাত নয়, মনে হলো আমাদের।

লোকটি জড়ো করা শুকনো ডালে আগুন জ্বালতেই সেই আগুনে সে আমাদের দুই মূর্তিমানকে দেখতে পেল। পেয়েই, ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জনাদশেক মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাদের দুজনের হাতে জ্বলন্ত কাঠ ছিল, অন্য সকলের হাতেই টাঙ্গি। মশালের মতো জ্বলন্ত কাঠ হাতে করে তারা এগিয়ে

এল। টাঙ্গির ইস্পাতের ফলাগুলো মশালের আগুনে ঝকঝক করে উঠল।

আমাদের হাতে বন্দুক দেখে তারা অবশ্য একটু ঘাবড়ে গেল। ভাবল হয়তো, বাঘের রাজ্যে এই ঘোগরা আবার কারা?

তারপর?

গোপালই তাড়াতাড়ি বলল, বুদ্ধি করে, তিতির মারতে ঢুকেছিলাম টুটিলাওয়া-সীমারীয়ার সড়ক ছেড়ে এই বনে। পথ ভুলে গেছি। টুটিলাওয়াতে যাব কোন পথে?

ওরা বলল, আইয়ে আইয়ে খোকাবাবুলোগ, জারা বৈঠকে যাইয়েগা। ঠাণ্ডা বহতই হ্যায়।

তারপর বলল, আমরা তো এখানে থাকি না। আমরা থাকি চান্দোয়াটোড়িতে। ঠিকাদার এই জঙ্গলে কাল থেকেই গাছ কাটবে। আমরা সব কাঠুরে। কাঠ কেটে টুকরো করে মোষের গাড়িতে লাদাই করে চান্দোয়া-টোড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে ঠিকাদারের কাঠ-চেরাই কল আছে। আবার ফিরে আসব! আজই আমরা এসে পৌঁছেছি। কালকে পাতার ঘর বানিয়ে নেব। আজ রাতটা আগুনের পাশে বসেই কাটাতে হবে।

তারপর বলল, আপনারা কি খাবেন কিছু?

কী খাব?

আমরা গরীব লোক বাবু। রাতে আমরা শুখা মহুয়া সেঁকে খাব একটু নুন দিয়ে।

একজন বলল, আমার কাছে একটু ছাতু আছে। চানার ছাতু।

তোমরা দিনে ক'টাকা মজুরী পাও?

তিন টাকা হুজৌর। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কাজ। যাদের মোষের গাড়ি আছে তারা গাড়ি ভাড়া পাবে চব্বিশ ঘণ্টাতে পাঁচ টাকা—তাদের গাড়ি চালানো ও কাঠ লাদাই করার মজুরীও তারই মধ্যে।

তোমাদের এই ঠিকাদারের নাম কি?

তাঁর নাম মালদেও পাণ্ডে। তিনি মস্ত বড়লোক হুজৌর। চান্দোয়া-রাঁচী-ডালটনগঞ্জ লাইনে তাঁর বাস চলে। ঘোড়া আছে। রংদার দোতলা মোকান।

এখানে যে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের রাজত্ব তা কি তোমরা জানো?

তা জেনেই তো আসা! যদি পাঁড়েজীর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে যায় তো আমাদের কপাল ফিরে যাবে।

কেন?

পাঁড়েজীর বড় দয়া গরীবদের উপরে। নিজেও তো গরীবেরই ছেলে। অত্যাচারিত। দেখা হলেই উনি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা দেবেন। আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনবেন।

তোমাদের ঠিকাদার মালদেও পাণ্ডে পিপ্পাল পাঁড়ের কথা জানে কি?

জানে বৈকি। জানে, বলেই তো নিজে না এসে আমাদের লাগিয়েছে। জানে বলেই তো জান-এর ভয়।

তোমরাও তো ডাকু বনে যেতে পারো। ভাল খাবে, ভাল পরবে।

আমি বললাম।

ওদের মধ্যে বয়স্ক যে নেতা গোছের মানুষটি, সে হাসল। বলল, হাঃ! আমাদের কি সেই হিম্মৎ আছে বাবু! ডাকু কি ইচ্ছে করলেই কেউ হতে পারে! ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বয়স মাত্র বাইশ। এইরকম মালদেও পাণ্ডেরই মতো এক জঙ্গলের ঠিকাদার তার বাপকে খুন করেছিল, দিদিকে আর মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তারপরই না পালিয়ে-বাঁচা পিপ্পাল পাঁড়ে ডাকু হয়ে যায়। তার মাথার উপরে দশ হাজার টাকা ইনাম। তবু সরকার তাকে ধরতে পারছে না। তবে একদিন তো ধরা সে পড়বেই। জ্যান্ত আর মৃত। কতদিন লড়বে সরকারের বিরুদ্ধে?

ধরাই যদি পড়বে তবে ডাকু হলো কেন?

হলো, আমাদের মতো জন্ম-দুখী মানুষদের চোখে একটু স্বপ্ন জাগাতে, যুগ যুগ ধরে এই সব অত্যাচারী জমিদার আর পয়সাওয়ালাদের এই গোলামি-করা যে ঠিক নয়, সেই কথা বোঝাতে।

আরেকজন বলল, আমরা তো মানুষ নয় হুজৌর। আমরা জানোয়ার। নইলে এতো কষ্ট সয় আমাদের! পিপ্পাল পাঁড়ে কী করে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচা উচিত তাই শিখিয়ে দিল আমাদের। আমরা যদি নাও পারি এই দাসত্বর বাঁধন ছিঁড়তে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা হয়তো ভবিষ্যতে পারবে। এই বা কম কী!

তোমরা পিপ্পাল পাঁড়েকে দেখেছ?

দেখব না কেন? সে তো আমাদেরই ছেলে। বাচ্চা ছেলে। কিন্তু আমাদের প্রণম্য। আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে যে আমাদের ঘরে ঘরে একজন করে পিপ্পাল জন্মাক।

তারপর ওদের মধ্যে একজন বলল, আপনারাও তো ছেলেমানুষ, খোকাবাবু, আপনারাও দেখছি বহত হিম্মৎদার। এই বয়সী ছেলেদের এমন জঙ্গলে রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতে দেখিনি কখনও, যদিও আমরা জঙ্গলেরই মানুষ। অবশ্য আমাদের কাছে তো বন্দুক থাকে না।

গোপাল বলল, অত্যাচারের নানা রকম হয় চাচা। শহরেও আমাদের উপরে অত্যাচার করার লোকের অভাব নেই। গরীব বড়লোক শব্দগুলোর মানেও এক এক জায়গাতে একেক রকম। অত্যাচার, অন্যায়, সব জায়গাতেই আছে, থাকে, তবে তাদের চেহারা আলাদা আলাদা এই যা।

আমি বললাম, তবুও হিম্মৎ ব্যাপারটা তো আমাদের পিপ্পাল পাঁড়ের কাছ থেকে শেখবারই। আপনারা তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন আমাদের?

ওরা একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

তারপর সেই সর্দার-মতো মানুষটি বলল, তার রাহান-সাহান সে যে নিজেই জানে না। খোঁজ লাগাতে হবে। আপনারা কোথায় আছেন?

আমরা উঠেছি ইজাহারুল হক-এর বাড়ি টুটিলাওয়াতে।

ওরা এবার চনমনে হয়ে উঠল।

একজন বলল, তাঁরাও তো বহতই অত্যাচারী।

আরেকজন বলল, ইজাহার সাহেব মানুষ ভাল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা খারাপ ছিলেন।

তারপর বলল, ওখানেই নাকি হাজারীবাগের পুলিশ সাহেবের ছেলে এসে উঠেছেন। আপনারা, মানে আপনাদের মধ্যে কি...।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। আমার এই বন্ধুর বাবার বাড়ি আছে হাজারীবাগ শহরে, গয়া রোডে। পুলিশ সাহেবের ছেলে এসেছিল ঠিকই তবে সে তো আজই বিকেলে চলে গেছে ফিরে।

এই সরল মানুষগুলোর কাছে মিথ্যেকথা বলতে ভারী ছোট লাগছিল নিজেকে। কিন্তু কী করা যাবে। সুব্রতকে তো বাঁচাতে হবে।

যদি চলে গিয়ে থাকেন তো বেঁচে গেছেন হুজৌর। আমরা শুনেছি যে পিপ্পাল পাঁড়ে পুলিশ সাহেবকে "শিখলাবার" জন্যে তাঁর ছেলেকে গুম করে দেবে বলে ঠিক করেছিল। তা করলে, আমাদের সকলেরই বিপদ হতো হুজৌর। পিপ্পালের তো কিছু হবে না।

কেন? তোমাদের কিসের বিপদ?

তার কাছে ঘেঁষা তো পুলিশের কর্ম নয়। পুলিশ পড়বে হাতিয়ারহীন, গরীব, অসহায় আমাদেরই উপরে। কত রকম অত্যাচার যে হবে। পিপ্পাল আর কতজনকে বাঁচাবে? তাই আমরা সেই কথাই আলোচনা করছিলাম। পুলিশ সাহেবের বেটা যত তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবের বাংলোতে ফিরে যায় ততই তারও মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল।

গোপাল বলল, সে চলে গেছে।

তারপর বলল, কালকে আমরা আবার আসব দিনের বেলাতেই। পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে দেখা কি হবে?

কাল এলে কি করে হবে? খোঁজ তো লাগাতে হবে। সে তো কখনই দু'রাত কোনো এক জায়গাতে থাকে না।

কাল ছেড়ে পরশু আসুন বরং দিনের বেলাতে। তবে খালি হাতে আসবেন।

বন্দুক-টন্দুক নিয়ে আসবেন না। আর এ কথা কারোকে বলবেন না। কারোকেই। তাহলে কিন্তু পিপ্পাল আমাদেরই খতম করে দেবে।

আমি বললাম, আমরা অত নীচ নই। তাই আসব আমরা পরশু, দিনের বেলাতে।

গোপাল ন্যাকামি করে বলল, এখন পথ চিনে ফিরে যাই কী ভাবে?

সেই সর্দার একজনকে বলল, এই গাঙ্গোয়া, একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে খোকাবাবুদের পথটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।

বারবার খোকাবাবু বলাতে আমাদের রাগ হয়ে যাচ্ছিল।

লোকটার গায়ে একটা ছেঁড়া ফতুয়া, পরনে খেটো মোটা ধুতি। পায়ে টায়ার-সোলের চটি। একবেলা খেতে পায়। এই আমার দেশের গড়পড়তা মানুষ। আর আমাদের ফুটানির শেষ নেই, তাও আমাদের আরও চাই, আরও চাই।

ভাবছিলাম, আমি।

তারপরে?

ভটকাই আর তিতির সমস্বরে বলল।

আর কী? পথ তো আমরা জানতামই। গাঙ্গোয়া আমাদের সঙ্গে কিছুটা আসার পরই আমরা বললাম, বুঝতে পেরেছি। আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে, ঠিক চলে যাব। তোমার কাঠ নিভে গেলে এই বাঘের জঙ্গলে তোমার অসুবিধে হবে। তুমি ফিরে যাও।

ও বলল, পররনাম হুজৌর।

আমি আমার মানিব্যাগ খুলে, জন্মদিনে জেঠুমণির দেওয়া যে একশ টাকার নোটটি সযতনে ইনস্যুরেন্স-এর মতো রেখে দিয়েছিলাম গত ন'মাস ধরে, সেটা গাঙ্গোয়ার হাতে দিয়ে...

দিতেই সে ভীষণ প্রতিবাদ করে উঠল।

আমি বললাম, আগামী কাল তোমরা সকলে ডাল আর ভাত খেও।

গাঙ্গোয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে।

বলল, সকালে ফরেস্ট গার্ড আসবে মার্কা-মারা গাছ দেখিয়ে দিতে। তারপরই কাজ শুরু হবে। সকালে নয়, আমরা রাতে খাব। মাটির হাঁড়িতে ডাল-ভাত ফুটিয়ে নেব। শুধু ডাল-ভাতই নয় মহুয়াও খাব, নাচব, গাইব। আপনারা কি আসবেন?

গোপাল বলল, দেখি।

গাঙ্গোয়া ফিরে গেলে আমরা টর্চ জ্বেলেই চাতরার পুরনো পথ দিয়ে ফিরে যেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কোনো কথা সরল না আমাদের মুখে।

আমি বললাম, ওরা কি রোজ ভাত খায় না?

রোজ? কী বলো তুমি! বিয়ে-চুড়োতে খায়।

আর ডাল?

ডালও তো বিলাসিতা। বাজরা বা মকাই-এর রুটি খায়। সরগুজার তেল দিয়ে কখনও কিছু তরকারি রাঁধে। বনের মূল ও ফল খায়। শুকনো মহুয়া। পশুর জীবনের সঙ্গে ওদের জীবনের বিশেষ তফাৎ নেই ঋজু।

আমি চুপ করে পথ চলতে লাগলাম।

ফিরে গিয়ে কী কী উমদা খাবার খাব আমরা, তাই ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, একশ টাকা দিয়ে একদিন ডাল-ভাত খাওয়ালেই এদের সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না যেদিন আমার দেশের সব মানুষ দু'বেলাই ডাল-ভাত খেতে পারবে সেদিন যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই ভাল। এদের জন্যে অশিক্ষিত ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েও যেমন ভাবছে, আমাদের সকলেরই ভাবতে হবে। আমরা দেশের কতজন? এরাই তো আসল দেশ, আসল ভারতবর্ষ। যতদিন এদের অবস্থা না ফিরছে ততদিন দেশ এগোতে পারবে না।

গোপাল বলল, সুব্রতকে আজ রাতারাতিই হাজারীবাগে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

আর আমরা?

আমরা থেকে যাব। দেবদর্শন করে দেবতাকে প্রণাম করে তারপরই ফিরব।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। জেঠুমণি প্রায়ই বলতেন এই লাইন দুটি, গায়ত্রী মন্ত্রেরই মতো।

মুখোশ

শক্তিপদ রাজগুরু

সেদিন কুলেপাড়া ক্লাব-এর সঙ্গে চন্দ্রভানু শীল্ড ফাইনালের খেলায় আমরা গোহারান হেরে গেলাম। এমনভাবে হারতে হবে তা আমরা কোনওদিনই ভাবিনি।

ক্লাবের জামতলার ঘাসে চুপচাপ পড়ে আছে পটলা। সে ক্লাবের গোলকিপার, তিন তিনখানা গোল খেয়ে লটকে পড়েছে।

হোঁৎকা গজরাচ্ছে। ও ব্যাকে খেলে। দারুণ স্টাডি প্লেয়ার। প্রথম দিকেই তাই ওকে যুৎসই মেরে বাইরে পাঠিয়েছিল কুলেপাড়া ক্লাবের এক ভাড়াটে মারকুটে প্লেয়ার।

পটলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—খেলার বিভাগই তুলে দেব। এত ব-বড় অপমান সইতে হবে ওই নিতু মিত্তিরদের কাছে? এর চেয়ে ডে-ডেথই ভাল।

পটলার 'ডেথ' মানে আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবেরই 'ডেথ'। সুতরাং ওটা মেনে নিতে পারি না।

হোঁৎকা চোট খেয়ে গজরাতে গজরাতে বলে—এর শোধ লমুই। তুই চুপ কইরা দ্যাখ পটলা, ওই নিতু মিত্তিরের খুব ফাঁট্ হইছে, দুইটা পইসা কামাইয়া—

ফটিক বলে—নিতু মিত্তিরই এবার এখানের সবাইকে হটাতে চায় টাকার জোরে। ইস্কুলের ভোটেও নাকি দাঁড়াচ্ছে।

—ইস্কুলের ভোটের কথা পরে। এখন নিতু মিত্তির তার ছেলে চিতুকে দিয়ে আমাদের ক্লাব লাটে তুলতে চায়।

পটলার অবস্থা তখন শক্তিশেল খাওয়া লক্ষ্মণের মতো। আমরা কোনওরকমে ওকে ধরে নিয়ে চলেছি।

ওদিকে তখন ব্যান্ডপার্টি, তাসাপার্টি নিয়ে পেল্লায় শীল্ডটাকে মালা পরিয়ে ঠ্যালাগাড়িতে তুলে নিতু মিত্তির পাড়া প্রদক্ষিণ করছে। সঙ্গে তস্য পুত্র চিতু।

আমাদের দেখে ওদের নীচের বহর বেড়ে গেছে। সিটি বাজিয়ে তুমুল নাচছে ক্যাবলা, মদন, নটবর ও আরও অনেকে। আর নিতু মিত্তির গাড়িতে বসে দেখছে তার অনুচরদের এই বিজয় উৎসব।

কয়েক বছরের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে এই নিতু মিত্তিরের। কলকাতার লাগোয়া অঞ্চল। নিতু মিত্তির বসিরহাট অঞ্চলের লোক। এখানে এসে প্রথম প্রথম আবাদ অঞ্চলের কাঠ, গোলপাতা এসব নিয়ে ব্যবসা করতো। দেখতে দেখতে এখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বিরাট শেড তুলে, সেখানে নানা মালপত্র রেখে, ট্রাকযোগে আবাদের বিভিন্ন মোকামে সাপ্লাই দেয়।

আগেকার খোলার চালের বাড়ির বদলে এখন নিতু মিত্তিরের তিনমহলা প্রাসাদ। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল।

ইদানীং পাড়ার বেশ কিছু ছেলেদেরও সে কাজে লাগায়। বলে—বেকার সমস্যা দূর করতেই হবে। খাটো, রোজগার করো আর আনন্দ করো।

তারই পক্ষচ্ছায়ায় গজিয়ে উঠেছে ওই কুলেপাড়া ক্লাব। দু'হাতে সেখানে টাকা খরচা করে চিতু। ফলে সেখানেই ভিড় বাড়ছে ছেলেদের। এতে নিতু মিত্তিরের প্রভাবই শুধু বাড়ছে না, ব্যবসাও চলছে রমরম করে।

পরদিন ক্লাবে আলোচনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে নাইট স্কুল চালাবার ব্যাপার নিয়ে। এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ির চড়া হর্ন শুনে চেয়ে দেখি, স্বয়ং নিতু মিত্তির গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে একগাল হাসি। সঙ্গে মদনা আর ক্যাবলা। ক্যাবলার এপাড়ায় অনেক বদনাম। ক্যাবলা দেখছে আমাদের। কারণ ওকে আমরাই সেবার এক ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার করার জন্য চাঁদা করে মেরেছিলাম।

নিতু মিত্তির অমায়িক ভদ্রলোকের মতো বলে—সব ভাল আছো তো?

পটলা বলে—ভালই।

নিতু মিত্তির বলে—সমাজের মঙ্গল করতে চাই। দেশসেবা। তাই তোমাদের সাহায্য আমার দরকার। তোমরা ইয়ংম্যান। আমি চাই, ভেদাভেদ ভুলে দুনিয়ার ইয়ংম্যান এক হও। আর আমি তোমাদের সেবা করে ধন্য হই।

ওর চামচেদের দল হাততালি দেয়।

আমরা হতবাক। যেন ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি। নিতু মিত্তির বলে—তাহলে একদিন বাড়িতে এসো তোমরা। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

নিতু মিত্তির সদলে বিদায় নেবার পর বলি—কিছু বুঝলি মতলবটা!

হোঁৎকা বলে—বুঝছি। ওরেও বুঝাইমু।

সকালের দিকে বহু ছেলেরাই আসে নিতু মিত্তিরের দরবারে। কাজকর্মের সন্ধানে। হোঁৎকা পাড়ার মাতব্বর গোছের। একদিন সকালে তাই প্রতিপক্ষ দলের হোঁৎকাকে নিতু মিত্তির তার কাছে আসতে দেখে, মনে মনে খুশিই হয়। হোঁৎকাকে হাতে আনতে পারলে তার সুবিধাই হবে।

হোঁৎকা বলে—আপনার কাছেই আইলাম ছার। কাজকাম কিছু নাই। হক্কলেই কয় আপনি দয়ালু সজ্জন।

বিনয়ের সঙ্গে নিতু মিত্তির বলে—সাধ্যমতো সকলেরই উপকার করতে চাই।

চিতুও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। হোঁৎকার মতো ছেলেকে তার পিতৃদেবের সামনে বশ্যতা স্বীকার করতে দেখে খুশিই হয়। হোঁৎকা কুলেপাড়ার তাবড় ক্লাবকে ডকে তুলে দেওয়া হবে। তাই চিতুও বলে—বিপদে পড়ে এসেছে হোঁৎকা, ওকে একটু হেল্প করা উচিত বাবা।

হোঁৎকা তার কাতরতার মাত্রা আর এক ডিগ্রি বাড়িয়ে বলে—একটু দ্যাখেন ছার, তালি পড়াশুনাটা করতি পারি।

নিতু মিত্তির এবার বরাভয় দেবার ভঙ্গিতে বলে—ঠিক আছে, দেখি যদি কিছু রোজগারের পথ করে দিতে পারি।

গালকাটা ক্যাবলা আশপাশেই ছিল। প্রভুর ডাকে পোষা বুলডগের মতো এসে দাঁড়ায়। ইয়া জুলপি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে রঙ-ওঠা নীলচে টাইট জিনস্।

নিতু মিত্তির বলে—বিকাশ বাবাজী এসেছে। ওর খুব বিপদ। ওকে একটু কাগজপত্তর দিতে হবে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি। খুব ভাল ছেলে বিকাশ বাবাজী।

বিকাশ হোঁৎকারই ভাল নাম।

নিতু মিত্তির তারপরই ব্যবসার কাজে ডুবে যায়।

ম্যানেজার বলে—কাল আমাদের গাড়ি আটকেছিল পথে।

চমকে ওঠে নিতু মিত্তির। তার ট্রাকে নানা ধরনের মাল দেওয়া-নেওয়া হয়।

হঠাৎ ক্যাবলাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে। নিতু মিত্তির জানে ক্যাবলাই তার বিশ্বস্ত অধিনায়ক। ওর গুণের শেষ নেই। আগে ওয়াগন ভেঙে মাল পাচারকারী দলের নেতা ছিল সে।

ক্যাবলা বলে—আজও কিছু মাল আসবে।

খুশি হয় নিতু ওর কথায়। বলে—সাবধানে আনবি। আমিও লাইন কিলিয়ার করে রাখবো।

আর—ক্যাবলা আরও কিছু বলতে চায় ঃ ওই হোঁৎকাকে নিলেন?

নিতু মিত্তিরও কথাটা ভেবেছে। বলে—একটু নজরে রাখবি। ওকে আসল ব্যাপার না জানিয়ে মাঝে মাঝে ট্রাকে মালের সঙ্গে পাহারা দিতে পাঠাবি।

যদি কিছু জানতে পারে?—ক্যাবলা শুধোয়।

নিতু মিত্তির গভীর জলের মাছ। হোঁৎকাকে দলে আনতে চায়। বলে—একবার এখানে পা দিলে সহজে বেরুতে পারবে নারে! আর বেগড়বাঁই করলে, ফাঁদে ফেলে দিবি। যাক পুলিশের খপ্পরে। হোঁৎকাও নজর রেখেছিল চারিদিকে। ক্যাবলা ও ঘরে ঢুকতে, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। ওদের কথাগুলো শুনেছে হোঁৎকা।

—অ্যাই! নিতুদা বলেছে কাল একবার বসিরহাটে গিয়ে এক ট্রাক পাট আসবে, নে আসবি। ধর্, পঞ্চাশ টাকা খোরাকি।

হোঁৎকা জানে তাকে দু'-একটা কাজে পাঠানো হবে। সে-ও তাই চায়। টাকাটা পকেটে পুরে ক্যাবলাকে শুধোয়—কখন যাওন লাগবে ক্যাবলাদা?

ক্যাবলার প্রথম থেকেই হোঁৎকাকে ভাল লাগেনি। তবু নিতুদার কথার উপর কথা চলে না। তাই ক্যাবলা বলে—কাল সকালেই ট্রাক যাবে। ওতে গিয়ে রাতে মাল নে গুদামে ফিরবি?

এর আগে বসিরহাটে দু'একবার এসেছে হোঁৎকা। এইদিকে পটলাদের আদি বাড়ি। কিন্তু এখন ওদের ওখানে যাওয়া যাবে না। হোঁৎকাকে অবশ্য একা পাঠায়নি ক্যাবলা। সঙ্গে দলের মদনাকেও পাঠিয়েছে।

ওরা ট্রাক নিয়ে এসেছে।

নদীর ধারে একটা পোড়ো বাড়ি। পাশে আমবাগান আর বাঁশবনের জটলা।

মদনা বলে—খেয়েদেয়ে দুপুরে শুয়ে পড় হোঁৎকা, রাতে মাল বোঝাই হলে বেরুবো।

গুদামের চেহারা দেখে। একটু ঘাবড়ে গেছে হোঁৎকা।

কয়েকখানা ঘরকে কোনওরকমে মেরামত করে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ছাদটা ভেঙে ঘাড়ে না পড়ে।

হোঁৎকা মনে মনে জায়গাটার একটা ছবি এঁকে নেয়।

এক সময় পায়ে পায়ে আগাছার বন পার হয়ে বাড়ির বাইরে আসে। দেখা যায় একজন লোককে। সে এগিয়ে এসে বলে—বাইরে যাবে না।

অর্থাৎ তার বাইরে যাওয়ারও হুকুম নেই।

রাত্রি নামতে দেরি হয় না। হোঁৎকা বেশ বুঝতে পারে এদের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে ওঠে। অন্ধকারে তারাজ্বলা আলোয় আবছা দেখা যায়; নদীতে দু'একটা নৌকা এসে থেমেছে। ছায়ামূর্তির দল অন্ধকার কি সব মালপত্র নামাচ্ছে আর ট্রাকে তুলছে।

মদনা সারাদিন কোথায় ছিল কে জানে, এবার তার গলা শোনা যায়।

হোঁৎকা ব্যাপারটা দেখেছে দোতলার জানালা থেকে। শুনেছে ইছামতী নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। এই জায়গাটা সীমান্তের কাছেই। রাতের অন্ধকারে আসা নৌকাগুলোয় নিশ্চয়ই ওদেশ থেকে আনা বেআইনী মালপত্র থাকে।

ট্রাকটা ফিরছে কলকাতার দিকে। ট্রাকে চাপানো আছে পাটের গাঁট। নিশ্চয়ই এই গাঁটের মধ্যে কৌশল করে মূল্যবান বিদেশী জিনিস পাচার করা হচ্ছে।

নিতু মিত্তিরের আসল ব্যবসার খবর পেয়েছে এবার হোঁৎকা। লুকিয়ে সস্তায় বিদেশী জিনিস এনে নিতু মিত্তির তার লাভের পুঁজি বাড়াচ্ছে আর মুখে দেশপ্রেমের বুকনি দিচ্ছে।

নিরাপদে এত মালপত্র এসে পৌঁছতে দেখে খুশি হয়ে নিতু মিত্তির বলে—তুই তো বেশ পয়মন্ত রে। কাজের ছেলে। নে পঞ্চাশ টাকা রাখ। মিষ্টি খাবি। আর শোন, মন দিয়ে দেশের ইয়ংম্যানরা সবাই কর্মবীর হোক। তবেই তো দেশের, সমাজের উন্নতি হবে।

ক্যাবলাও দেখেছে নিতু মিত্তির হোঁৎকাকে খাতির করে দশ টাকা দিতে ক্যাবলাও খুশি হয়। বলে—আবার পাঠাবো তোকে। আর শোন, ব্যাটা মদনার দিকেও নজর রাখবি। ও মাল সরায়-টরায় কিনা দেখবি।

হোঁৎকা এবার তাক মতো বলে—মদনা তো তোমাকেই আউট করতে চায় ক্যাবলাদা।

ক্যাবলা অবশ্য সেটা অনুমান করেছে। এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যেন একপাল হিংস্র কুকুরের দল, এক টুকরো মাংসের জন্য যখন তখন যার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নিতু মিত্তিরের মতো লোক দেশের যুবশক্তিকে এমনি করে অন্ধকার পথে নামিয়েছে নিজের রোজগারের স্বার্থে। হোঁৎকা সমাজের এই অন্ধকার রূপটাকে দেখে শিউরে উঠেছে। এই নিতু মিত্তিরের মতো কসাইদের মুখোশ খুলে

দেবে হোঁৎকা। তার জন্যই সে সাবধানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

ক্লাবের মাঠে আমরা চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি। কেউ কেউ ঘাস চিবুচ্ছে।

পটলা হতাশাভাবে বলে—কা-ক্লাব তুলে দেব! গোবরা বাধা দিয়ে বলে—হোঁৎকা গেছে যাক। তাই বলে হেরে যাবো? নেভার। নতুন কত মেম্বার আসবে!

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ক্লাব ঝিমিয়ে পড়েছে। যে কোনওদিন ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হবে। সব ছেলেরা এখন নিতুদার নামে অজ্ঞান।

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কাকে আসতে দেখে সবাই মিলে একসঙ্গে তাকালাম। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না। হোঁৎকা এসেছে।

অবাক হই—তুই!

পটলা বলে—আর কেন এলি? ক্যাবলা, নিতু মিত্তির আমাদের ক্লাব তুলে দেবে।

হোঁৎকা বলে—ছাড়, ছাড়। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব তুলবে নিতু মিত্তির?

হোঁৎকার কথা শুনে অবাক হই। হোঁৎকা তাহলে আমাদের ছেড়ে যায়নি।

সব শুনে-টুনে গোবরা বলে—এত বড় শয়তান ঐ নিতু মিত্তির? এ আমরা স্বপ্নে ভাবিনি।

পটলা মন্তব্য করে—ওর প-পরিচয়টা প্রকাশ ক-করতেই হবে।

হোঁৎকা শোনায়—ক্যাবলা আর মদনাকে লড়ায়ে দিচ্ছি। ওরা দুজনে ফাইটে লাইগা গেছে। ওদের দিয়া কাজ হাসিল করুম। তগোর একটু হেল্প করন লাগবে। আর আমি তো আছিই।

আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ জল্পনা-টল্পনা করে হোঁৎকা আরো বলে—তরা ঐ প্ল্যান মতো কাজ কর গিয়া, আমারে দেখলেও চিনবি না। আমিও ওগোর কারো সামনে তগোর সাথে কথাই কইমু না। শুধু সিগন্যাল দিমু দু' আঙুলে নাড়াইয়া।

ক'দিন ছুটি বাকি আছে সামারের, আমরা চারজন চলেছি বসিরহাট পটলাদের দেশের বাড়িতে। হোঁৎকা সঙ্গে নেই। মনে মনে তার অভাব অনুভব করছি। ও থাকলে খাবার খরচা কিছু হয় সত্যি, কিন্তু সাহস বাড়ে।

পটলাদের বাড়িতে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করি। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়িটা, সাবেককালের দোতলা বাড়ি। পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাজানো আম, লিচু, কাঁঠাল, নারকেল বাগান।

পটলার খুড়তুতো ভাই ভজুও খুশি হয় আমাদের দেখে। এর আগেও দু-একবার আমের সময়ে এসেছি। তাই ভজু বলে—কই হোঁৎকাকে দেখছি না? পঞ্চপাণ্ডবের চারজন এলি, সেটি কই?

সব কথা শুনে ভজুদা বলে, তাই নাকি, এত সব! দূরের বাগান ঘেরা ওই বাড়িটার দিকে। ভজুদা নিজেদের নৌকা নিয়ে চলেছে, ওতে নদীটাও দেখা যাবে।

ভজুদা বলে, ওপারে একটু গেলেই বাংলাদেশ। এ গাং-এ কোন্‌টা আসল জেলেদের নৌকা আর কোন্‌টা নয়, তা বোঝার উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে এখানে বিদেশী মালপত্রের লেনদেন হয় প্রচুর।

একটু পরে বাগানের মধ্যে একটা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে ভজুদা বলে—খুব সম্ভবত এই বাড়িটা। নদীর ভাঙনে কিছুটা এলাকা ভেসে যেতে, এ বাড়ি ছেড়ে পালায় সকলে।

বুঝতে পারি এই বাড়িটার কথাই বলছিল হোঁৎকা।

ডিঙি থেকে কিছুদূরে নেমে, আমরা এগিয়ে আসি বাড়িটার দিকে। দেখা যায়, একটা ট্রাক আসছে ধুলো উড়িয়ে। আর ঐ ট্রাকে ক্যাবলা ও আরও একজনের সঙ্গে বসে আছে হোঁৎকা। ওরা তিনজনে বসে গল্প করছে।

আমাদের মধ্যে চোখাচোখি হয়ে যায়। অর্থাৎ অঙ্ক ঠিকই মিলছে। সব প্ল্যানও ঠিকমতো চলছে। হোঁৎকা সেটা জানাবার জন্য একনজর আমাদের চোখে, বাইরে হাত বার করে সংকেত দেয়।

এবার আমাদেরও প্ল্যান মতো এগোতে হবে।

ভজুদা বলে—কিছু ভাবিস না। ঠিক মতো ব্যবস্থাই করছি। একবার প্রদীপদার কাছে চল।

প্রদীপ বোস এখানে নতুন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ভজুদার চেনা। ওঁর কাছেই সবাই চললাম আমরা।

এদিকে হোঁৎকা এখন নিতু মিত্তিরের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠেছে। আবার নিতু মিত্তিরের ক্যাবলাকেও দরকার। ও দুঃসাহসী। বোমা, ছুরি, পিস্তল চালাতে পারে। রাতের অন্ধকারে লাখ লাখ টাকার বিদেশী মালের আমদানির কাজে এসব লোকেরও দরকার। তার ওপর এ সপ্তাহে প্রচুর মাল আসছে। তাই ক্যাবলাকেও মদনের সঙ্গে দিয়েছে, হোঁৎকা তো আছেই।

এই ব্যবস্থাতেই মদনের সন্দেহটা ঘনীভূত হয়। নিতু মিত্তিরকে বোধহয় ক্যাবলাই ওর সম্বন্ধে কিছু খবর দিয়েছে। আর ক্যাবলাও হোঁৎকার কাছে শুনেছে মদনার মনোভাবের কথা। তাকে টপকাতে চায়। নিজেই নাকি এই ব্যবসাতে নামবে।

হোঁৎকা নীরবে দেখছে দু'জনকে। দুটো যেন রাগে ফুলে ওঠা হুলোবিড়াল, কখন যে কে কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে।

ইতিমধ্যে গুদামবাড়িটায় এসে উঠেছে ওরা। আজ রাতেই সেই বড় চালানটা আসবে।

সবাই ব্যস্ত, গুদামে রাশ রাশ পাটের বান্ডিল খোলা হচ্ছে, মাল এলে প্যাক করা

হবে পাটের বান্ডিলের মধ্যে!

হোঁৎকা এর মধ্যে নিচে নেমে এসেছে। নাহ্, এদিকে বিশেষ কেউ নেই। এই ফাঁকে সে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে।

পটলাদের বাড়ির বাইরের মহলে তখন পুকুরের মাছ ভাজা দিয়ে চা পর্ব চলছে। হোঁৎকাকে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে বলল,—আয়, আয়! বোস!

খানকয়েক মাছ ভাজা দ্রুত মুখে পুরে দিয়ে হোঁৎকা বলে—বসার সময় নাই রে। তরা রেডি থাক্, অ্যাকশন শুরু করন লাগবে। আজই ফাইনাল গেম। জেতা চাই-ই।

রাত্রি নেমেছে। ক্যাবলা, মদনা, হোঁৎকা এসেছে নৌকায়।

রাতের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দল নৌকা থেকে সাইকেলের টায়ারের বান্ডিল, বিড়ির পাতার বস্তা, কাপড়ের গাঁটরি নামাচ্ছে নদীর ওপারে। আর নৌকায় তুলেছে বিদেশী দামী যন্ত্রপাতি আর আরো অনেক কিছু।

নিরাপদে মাল বোঝাই হবার পর এরা অপেক্ষা করে এদিকের অন্ধকারে। একটা টর্চের জ্বলা-নেভা সংকেতের জন্য। সেই সংকেত পেলেই এদিকের তীর নিরাপদ মনে করে এরা পাড়ি দেবে।

ব্যাপারটা আগে থেকেই জানা ছিল আমাদের। হোঁৎকাই ওদের সব প্ল্যানের ছকটা দিয়েছিল। সেইমতো আমরাও বের হয়েছি। গোবরা, পটলা, আমি, ফটিক ছাড়া রয়েছে ভজুদা। পিছনে দূরে রয়েছেন প্রদীপবাবু। দরকার মতো তিনি এসে পড়বেন।

আমরা চুপিসাড়ে এসে হাজির হয়েছি পোড়ো সেই ভুতুড়ে বাড়ির এদিকে, নদীর ধারে। দূরে ওপারে দেখা যায় কালো বিন্দুর মতো নৌকাগুলোকে। ঐ যে দূরে বাংলাদেশের সীমান্ত। সেখান থেকে দু'-একটা কথার টুকরো ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

আলোর সংকেত পেয়ে ওপার থেকেও আলো জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়। তারপরই শোনা যায় নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ। ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় বেয়ে বিচিত্র মালবোঝাই নৌকা এপারের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ গোবর্ধনের হাতের প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়ে একটা লোক আর তার হাতের টর্চটা। বুঝতে পারি, এই আলোর সংকেত দিচ্ছিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তার ছিটকে পড়া দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরই গামছা দিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে ফেলি।

লোকটা ভাবতেও পারেনি, এমনিভাবে কেউ তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

এমন সময় ওদিকের মাটির সড়কে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। পথটা এসেছে গুদামবাড়ি অবধি।

ওই পথের মুখে আমাদের পাহারা রয়েছে। আজ রাতে নিতু মিত্তির স্বয়ং আসছে।

কারণ চালানটা খুবই বড়, তাই নিজেও আশপাশে থাকবে।

পটলা চাপা স্বরে বলে—নি-নিতু মিত্তিরও এসে গ্যাছে!

আমি জানাই—ওটাকেও জালে জড়াতে হবে।

নদীটা বেশ চওড়া এখানে। ভাঁটার টান, তাই স্রোতও বেশি। নৌকাদুটো ভেসে ভেসে নিচের দিকেই গেছে একটু। সেখান থেকে বেয়ে এই ঘাটে এসে লাগবে।

ওদিকে মদনা, ক্যাবলারা চেয়ে আছে তীরের দিকে। তারা আশা করছে আর একটা আলোর সংকেতের। কিন্তু সেই সংকেত আসে না। কানে আসে, নিতু মিত্তিরের গাড়ির শব্দটা ক্যাবলার চেনা।

ক্যাবলা বলে—নিতুদাও এসে গেছে, তাহলে লাইন কিলিয়ার। নৌকা ধারে লাগা।

প্রতিবাদ করে মদনা—না। ইশারা না পেলে নৌকা নিয়ে যাবো না, ওদিকে।

ক্যাবলা বলে—চুপ কর্ তুই। মাঝি, ধারে নে চল!

মদনা তবুও বলে—ক্যাবলাদা!

ক্যাবলা গর্জে ওঠে,—তুই চুপ থাক। যেভাবে হোক তাড়াতাড়ি মাল নামাতে হবে। তোর মতলব বুঝেছি।

সঙ্গে সঙ্গে চটে ওঠে মদনা,—আন্সান্ বলবে না।

হোঁৎকা দেখছে ওদের দু'জনকে। ওরা যখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তবু ক্যাবলাই দলনেতা, তার কথামতো নৌকা দুটো ধারে এসে ভিড়েছে।

আমরা একটু দূরে বাঁশবন আর ঘেঁটুঝোপের মধ্যে বসে আছি গা ঢাকা দিয়ে। ওদিকে তখন নৌকা থেকে মাল খালাসের কাজ শুরু হয়েছে, নিতু মিত্তিরও এসে হাজির।

ক্যাবলা বলে—ওই মদনার মতলব সুবিধার নয়, কত্তা, ও মাল নে কেটে পড়ার তালেই ছিল!

নিতু মিত্তির গর্জে ওঠে,—ওটাকেই কেটে গ্যাং-এর জলে ভাসিয়ে দেব আজ।

মদনও গর্জে ওঠে বিপদের গুরুত্ব বুঝে,—যাতা বলবি না ক্যাবলা, তোর লাশই গিরিয়ে দেব।

নেহাৎ দু'জন ধরে ফেলে নাহলে মদনা বোধহয় তখনই ক্যাবলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো

এবার খেয়াল হয় ওদের। এপারের সংকেতকারী সেই লোকটা নেই।

নিতু গর্জে ওঠে,—এই সব কাঁচা কাজ করিস?

ক্যাবলা বলে,—ছিল তো। ওই মদনার দলের লোক সেটা। তাই সরে গ্যাছে।

মদনা!—নিতু মিত্তিরের গর্জন শুনতে পাই।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে কাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠেছি। আমাদের খবর পেয়ে ওরা বোধহয় এবার আমাদেরই আক্রমণ করতে চায়।

চাপা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। ওদের লড়াই জমার ফাঁকতালে হোঁৎকা এসে সেঁদিয়েছে আমাদের দলে।

হোঁৎকা চাপা স্বরে বলে—চুপ কইরা থাক। ওগোর মধ্যি, দ্যাখ্ হালায় একখান লাশ পড়বো। তর ভজুদার অ্যাকশন কখন শুরু হইবো? চারে সব মাছ আইনা দিচ্ছি, এহন জাল ফ্যালবি আর তোলবি।

হঠাৎ অন্ধকারে নদীর বুকে কয়েকটা সার্চলাইটের তীব্র আলো ঝলসে ওঠে। দু'তিনটে জিপ। হেড-লাইটের আলোয় অন্ধকার মুছে গেছে। দেখা যায়, মালপত্র ফেলে লোকজন দৌড়চ্ছে। কিন্তু ভজুদার ক্লাবের ছেলেরাও অন্ধকারে বাঁশবন, আমবাগানে ছড়িয়ে ছিল। লাফ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে ওদের।

ক্যাবলাও এই গোলমালে তার বোমার থলিটা বের করে। আলোয় দেখা যায় আর নাই, আমি আসল বোম ফেইলা ওতে পাটের গোল্লা পুইরা রাখছি। কচু হইব ওতে।

নিতু মিত্তির বেগতিক দেখে পালাবার চেষ্টা করে। আর ঠিক সেই সময়েই প্রদীপদার টর্চের আলো পড়ে মুখের ওপর। থমকে দাঁড়ায় নিতু মিত্তির। মরিয়া হয়ে রিভলবার বার করে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপদার নিরেট পুলিশি ঘুষিতে একেবারে ধরাশায়ী নিতু মিত্তির।

আধঘণ্টার মধ্যে সারা শহরের লোকজন জুটে যায়। কয়েকটা হ্যাজাকের আলোয় ওই বিরাট বিদেশী মালের চোরাচালান গ্যাং সমেত ধরা পড়ে।

কুলেখাড়া অঞ্চলে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। হঠাৎ জেগে ওঠা ক্যাবল—মদনাদের মতো যুবকর্মী, নিতু মিত্তিরের মতো দেশসেবক এখন সরকারের জেলে। উঠে গেছে ওদের ক্লাবও।

রহস্যের সন্ধানে

আশাপূর্ণা দেবী

বাবার নতুন কেনা এই পুরনো বাড়িটায় এসে বাসুর ভারী স্ফূর্তি। এটা মোটেই তাদের রেলকোয়ার্টারের বাড়ীর মতো ঝাড়াঝাপটা হাল্কা-পাতলা নয়। বেশ কেমন ভারীভুরি, আর আলো-অন্ধকারে মেশানো। জায়গায় জায়গায় কেমন লুকোচুরি খেলার মত হঠাৎ একটা সরু প্যাসেজ, হঠাৎ তার গা দিয়ে ছোট্ট একটা কোনাচে ঘর, সিঁড়ির চাতাল দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আচমকা একটা বারান্দা, আর সব থেকে মজা-ঘরে দালান এখানে—সেখানে এক একটা দেওয়াল আলমারি। ছোট বড় নানান মাপের।

পুরনো পুরনো সেই আলমারিগুলো খুললেই কেমন একটা চাপা চাপা ভ্যাপসা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বাসুর দারুণ ভালো লাগে। যেন এর মধ্যে কি একটা রহস্য লুকিয়ে ছিল, আগের মালিকরা সেটা নিয়ে চলে গেছে। ভিতরের দেওয়াল গুলো তাই

বোবা মুখ করে ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছে।

একটা আলমারির তাকের মধ্যে খানিকটা কালির ছিটে, কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। তার মানে এটায় ওরা সবকিছু রাখত। দালানের তাকগুলোয় যে বই রাখতো সেটা তার মেঝের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে নির্ঘাৎ কোনো ঠাকুরের মূর্তি থাকতো। তা নইলে কুলুঙ্গির মাথায় ধূপের ধোঁয়ার দাগ কেন?

বাসু এইসব ঘুরে ঘুরে দেখে আর বলে, বাসুর দিদি হাসে। আর কিনা মাকে ডেকে ডেকে বলে, 'মা, তোমার পুত্তুরটি ভবিষ্যতে ডিটেকটিভ্ হবে যা অবজারভেশান! আর যা অনুমানশক্তি।'

বাসু অবশ্য তাতে দমে না, চিরদিনই তো বাসুকে 'ডাউন' করাই দিদির জীবনের মূল লক্ষ্য। তাই দিদির কথায় কান না দিয়ে বাসু অভিযান চালিয়ে যায়। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দু'দিকে দেয়াল দেওয়া সিঁড়ি, তাই সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। মা বলেন, 'আগের দিনে লোকে এই ঘরটাকে চোরা-কুঠুরি বলত।'

বাসু বলল, 'আগের দিনে যদি বলতো—তা'হলে এখন বললেই বা দোষ কি?'

মা হেসে ফেলে বললেন, 'চোরা-কুঠুরি, চিলেকোঠা, কথাগুলো যেন বড্ড সেকেলে। আমার ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন।'

বাসু গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমা তাঁরও ঠাকুমা তো ভাতকে ভাত বলতেন, তুমিও তাই বল কেন?'

কিছুই হাসির কথা বলেনি বাসু, তবু বাসুর কথা নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ সকলের সে কী হাসির ধুম। 'ওরে বাবা ছেলের কি লজিকের জ্ঞান।—ওঃ বাসু কালে উকিল হবে।' এইসব বাজে বাজে কথা থাক, কথাকে বাসু কেয়ার করে না। তার বাংলার মাস্টারমশাই বলেন, 'কারো সমালোচনায় লজ্জা পেয়ে কোনো কাজে পিছিয়ে যাওয়া ভীরুর লক্ষণ। লোকের কথায় ভয় পেলে মহৎ কাজ হবে না।'

কাজেই বাসু ওইসব ঠাট্টা ফাট্টায় লজ্জা না পেয়ে এই বাড়িটার রহস্য আবিষ্কারের মহৎ ব্রত নিয়ে খেটে যাচ্ছে। বাসু 'ছোটদের গোয়েন্দা গোকুল সেন' বইটা পড়েছে। একটা ভীষণ পুরনো জমিদার বাড়ী ভাঙা হতে দেখা গেল, তার কড়িকাঠের খাঁজে খাঁজে চোরা কুলুঙ্গি, আর তার মধ্যে রাশি রাশি সোনা।

এই বাড়িটার কড়িকাঠগুলোও ভারী ভারী আর যেন ঝুলে পড়া ঝুলে পড়া। কে বলতে পারে ওর অন্তরালে তেমন চোরা কুলুঙ্গি আছে কি না। ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাসু কোনোখানে সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে কি না।—কিন্তু দেখা গেলেই বা কি? বাসু নিজে তো আর মইয়ে উঠে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না। আর বড়দের বললে? তারা তো হাসির তোড়েই বাসুকে উড়িয়ে দেবেন—

কিন্তু এখন?

এখন কি হলো?

এখন সকলের মুখ হাঁ, চোখ ছানাবড়া, আর নাক রসপুলির মত হয়ে গেল কি না?

সিঁড়ির তলার ওই চোরা-কুঠুরির দেওয়ালে একটা চোরা আলমারি আবিষ্কার করে ফেলেনি বাসু?

এখানে যে আগের লোকেরা ডাঁই করে কয়লা ঢেলে রাখতো তার স্মৃতিচিহ্ন এখনো জ্বলজ্বলাট, এমন কি কয়লার চাঁইও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু বাসুর মত অবজারভেশন শক্তি না থাকলে কি কেউ ধরতে পারত ওই কয়লা-মাখা ময়লা দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট কাটা খাঁজ আছে। আর তার মধ্যে একটা ক্যাশবাক্স বসানো আছে। কয়লা ঢালা জায়গায় এমনিতে কারোর চোখই পড়ত না, বাসু কয়লার চাঁইগুলো সরিয়ে দেখেছিল বলেই না—হঠাৎ বাক্স দেখেই বাসুর হাত-পা ঠাণ্ডা।

অথচ উল্লাসও আছে।

তাই কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে সেই দিদিকেই ডেকে ওঠে-যে দিদির জীবনের লক্ষ্য বাসুকে ডাউন করা।—কিন্তু উপায় কি? দিদি ছাড়া বাসুর সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে আসছে কে?

বাসুর 'দিদি' ডাক শুনেই দিদি দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে বললো, 'হলোটা কি? বিছে কামড়েছে নিশ্চয়। কামড়াবেই তো। খেলবার আর জায়গা পায়নি।'

কিন্তু দিদি এসে থমকে দাঁড়ালো। বাসু দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে, তবে বাসুর চোখ দুটো গোল আলুর মত। আর মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো।

দিদি আসতেই বাসু নীরবে শুধু আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

'কি ও?'

'দেখ্ না।'

'বাক্স!'

'হু!'

'কিসের বাক্স?'

'ভগবান জানেন।'

'এই জায়গায় বাক্স কেন?'

দিদি ভয় ভয় গলায় বলে, 'টাকাকড়ি লুকানো নেই তো? যারা ছিল, যাবার সময় হয়তো ভুলে গেছে।

বাসু গম্ভীরভাবে বলল, 'টাকাকড়ি কেউ ভুলে যায়? হয়তো বাড়িতে আগুন লেগেছিল, তাই তাড়াতাড়ি—'

'দূর, আগুন লাগলে তো পরে আবার ফিরে আসবে। তা ছাড়া কই, কোথায় আগুন লেগেছিল, বাড়িতে তো দাগ নেই।'

'দিদি, তাহলে বোধহয় ভূমিকম্প।'

'মোটেই না, তাতেও পরে চলে আসবে লোকে।'

'তবে বোধহয় ডাকাত পড়েছিল দিদি। ওরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর কখনো আসেনি।'

দিদি বলে, 'তা হতে পারে। কিন্তু ডাকাতরা কি তন্ন তন্ন করে না দেখে ছাড়তো? ওরা তো শুনেছি বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার করে দেখে—'

'দিদি ঠিক বলেছিস। যে রেখেছিল, সে বোধ হয় হঠাৎ মরে গেছে কাউকে বলে যেতে পারেনি।'

দিদি মহোল্লাসে বলে, 'ঠিক, ঠিক বলেছিস, তোর বুদ্ধি আছে।'

এই প্রথম দিদি বাসুর বুদ্ধির তারিফ করলো।

কিন্তু বাক্সটা টানা যায় কি করে?

খাঁজের মধ্যে যা আঁটা। বাসুর অসাধ্য।

'দিদি, তুই পারবি'? 'উহুঁ আমার বাবা ভয় করছে যদি পিছনে সাপ টাপ থাকে'। 'তবে? তবে কি বৃন্দাবনকে ডেকে আনবো? ওর গায়ে তো খুব জোর।'

দিদি আস্তে বলে—'এই, চুপ। চেঁচাস না। যদি অনেক সোনাটোনা থাকে, বৃন্দাবন সবাইকে বলে বেড়াবে'—'তাহলে মাকে ডাকি?' বললো বাসু।

দিদি হেসে ওঠে, 'আহা রে মার গায়ে কী জোর!'

'তাহলে ছোটকা ছাড়া কোন গতি নেই।'

ছোটকা। ছোটকা মানেই তো সব চাঁটি খাওয়া, তবু উপায় কি?

বাক্সটাকে তো টেনে বার করতে হবে।

ছুটির দুপুরে বাবা নিদ্রামগ্ন, কাকা বইমগ্ন, বাসু গিয়ে বলে,—'ছোটকা, আবিষ্কার'।

'আবিষ্কার তো'।

ছোটকা হেসে উঠে বলে, 'কি? সব বাজে কথা।'

'আঃ কেবল বাজে কথা, দেখাব চলো চোরা কুঠুরিতে বাক্স আছে।'

'বাক্স? কার বাক্স?'

'বাড়িটা যাদের ছিল তাদের নিশ্চয়ই'।

'কিসের বাক্স?'

'আঃ! তুমি চলোই না', কাকার হাত ধরে টান মারে বাসু।

অগত্যাই যেতে হয় কাকাকে।

গিয়েই কাকার মুখ গম্ভীর। 'খবরদার কেউ হাত দিও না। বাবাকে ডাকো।' দিদি

ভয় পেয়ে ছুটে যায় বাবাকে ডাকতে। কিরে বাবা, ভৌতিক বাক্স? না কি সাপ খোপ আছে?

বাবা আসেন, মা আসেন এবং তারা বিজবিজ করে যা বলাবলি করতে থাকেন, তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারে বাসু এই বাক্সয় কারো হাত দেওয়া হবে না, পুলিশকে খবর দিতে হবে। তারা নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে।

শুনে বাসু প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলে। এত কষ্ট হয়ে বাসুর, পুলিশ এসে নিয়ে যাবে, থানায় জমা দেবে? বাসুরা নিজে মজা করে খুলে দেখতে পাবে না? 'কেন? আমরা কি চোর?'

কাকা বলল, 'এখন চোর নই, কিন্তু এই পরের বাক্সর মালটি নিতে গেলেই চোর হয়ে যাবো, আইন হচ্ছে এ রকম—গুপ্তধন-টন পেলে তা পুলিশের হাতে তুলে দিতে হয়।'

আর কী করা।

বাবা থানায় ফোন করেন। পুলিশ আসে জনা তিনেক। তারা অন্ধকারে হেঁট হয়ে টর্চ জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নেয়, তারপর জেরা করতে থাকে। 'কবে কেনা হয়েছে এ বাড়ী? কার কাছে থেকে? তারা কোথায় থাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে বাসু পুরানো বাড়ীওয়ালা মাদ্রাজে চলে গেছে শুনে নাক কুঁচকে হ্যাঁচ করে এক টান মেরে বাক্সটাকে বার করে আলোয় নিয়ে এল। টানের চোটে দেয়ালের বাসি চাপড়া খসে পড়ল খানিকটা।

দিদি ফিসফিস করে বলল, 'এই বাসু বাবাকে বলনা—ওরা নিয়ে যাবার আগে একবার অন্ততঃ আমাদের দেখিয়ে যাক।'

বাসু বেজার মুখ করে বলল, 'দেখিয়ে আর কি হবে, যা আছে তা তো নিয়েই চলে যাবে। আশ্চর্য! ছোটকার এই নিষ্ঠুরতার কোনো মানে হয়।'

তা বাসুকে আর বলতে হল না, দেখা যায় ওরা খোলবারই চেষ্টা করছে।...এমনি খুলতে না পেরে বলে, 'চাবি আছে?' 'চাবি? আমরা চাবি কোথায় পাবো?'

ছোটকা বেশ রাগের গলায় বলে, 'বাক্সের হিস্ট্রি জানায়নি আপনাদের? 'হুঁ, তা একটা ইয়ে-টিয়ে কিছু দিন, চাড় দিয়ে খুলে ফেলার মতো—'

শুনে সকলেই উত্তেজিত। এতক্ষণে যেন একটা ঘোরালো রহস্যের সূচনা দেখা দিয়েছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে 'ইয়ে-টিয়ে' খুঁজতে ছোটে।

মা নিয়ে আসেন একখানা লম্বা খুন্তি, ছোটকা একখানা ক্ষুদে বাটালে, দিদি একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আর বাসু একখানা পুরানো ব্লেড।

পুলিশ ইনস্পেক্টর ওগুলোর দিকে একটু অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে নিজেই সংগ্রহ করে নেন একখানা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি। ঠাই করে বসিয়ে দেন ডালার ওপরে। চমকে ওঠে সবাই।

মা বলেন, 'ঠিক জানিনা বাবা, ভেতরে ঠাকুর-টাকুর নেই তো।' বাবা বললেন, 'মাথা খারাপ ওইখানে লোকে ঠাকুর রাখতে আসে?' চোরাই মাল বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় বাড়ির কোনো চাকর-টাকর নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর আর সরাতে সুবিধে পায় নি।' দিদি বলে, 'আমার মনে হচ্ছে কোনো গুপ্তধনের ব্যাপারে ম্যাপট্যাপ আছে। সেই যে গল্পটা মা একদিন বলেছিল, মনে আছে? একটা ছোট্ট ছড়ার মধ্যে গুপ্তধনের ঠিকানা। এ-মা মনে নেই? সেই যে—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা
শেষে দিল রা
পাগোল ছাড়ো পা।

তার মানে এর মধ্যে রয়েছে। ধারাগোল! এও হয়তো তেমনি কোনো—'

আর বলতে হলো না, আবার হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়লো ঠাঁই ঠাঁই...সঙ্গে বাক্সের ডালা ছিটকে উঠে পড়লো।

আর তারপর?

তারপর পুলিশ সাহেব নিজেই লাফিয়ে ছিটকে উঠলেন।...ঘাড়ে পড়ে?

সকলের মুখে একই কথা 'এই এই এইরে বাবা! আরে আরে কি সর্বনাশ' লম্ফঝম্ফর ব্যাপার শুরু হয়ে যায়।

বাক্স খোলামাত্র ডজন ডজন নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে, এর পায়ের ওপর দিয়ে ওর পায়ের ওপর দিয়ে।

কে জানে কতকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি সমেত রাজ্য বিস্তার করে ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু খাচ্ছিল কি? না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। আর বংশের এতো বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না। তাছাড়া হাওয়া বাতাসেরও দরকার।...তা দেখা গেল সে ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে। ইঁদুর হলেও ওরা মানুষের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের মধ্যেও ছুতোর আছে, মিস্ত্রী আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, বাক্সের দেওয়ালে দিব্যি দোর, জানালা বানিয়ে নিয়েছে।

আর খাওয়া? দেখা গেল বাক্সের মালিক এদের সাতপুরুষের 'বসে খাওয়ার' ব্যবস্থা করে গেছেন।...এতোকাল ধরে খেয়ে-দেয়েও এখনো যা রয়েছে তা কম নয়...কে জানে ওই কুচি কাগজের রাশি কোনো উইলের অথবা দলিলের না কি কোনো গুপ্তধন আবিষ্কারের নকশা...পুলিশ যদি নিয়ে গিয়ে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দিতো, তা হলে, রহস্য উদ্‌ঘাটন হতো...কিন্তু পুলিশ প্রভুরা সে দিক গেলেন না। বেজায় বিরক্ত মুখে সকলের দিকে একটু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

———

প্রাপ্তিযোগ

লীলা মজুমদার

গুপির ছোটমামা বললেন, 'গোপালপুর বহরমপুর এ-সব জায়গায় গেছিস্ কখনো? একবার—' পানু বলল, 'হ্যাঁ, সেবার দাদুরা মুর্শিদাবাদ বহরম'—ছোটমামা হাসলেন, 'কীসে আর কীসে। এ সে বহরমপুর নয়। দক্ষিণ ভারতের রেল ধরে গঞ্জামের দিকে যেতে হয়। শেষ রাতে বাঁয়ে চিল্কার হ্রদ পেরিয়ে বহরমপুরে যেতে হয়। চারদিক ভোঁ ভোঁ। ট্রেনটা ছেড়ে গেলে মনে হবে গোবি মরুভূমির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছিস। যদি কপাল ভালো থাকে এক-আধটা মেছো ট্রাক্ পেলেও পেতে পারিস। নয়তো সেই ভোরের বাস্ ছাড়া গতি নেই। আগে চল্ সেখানে, তারপর বাকিটা বলব।'

এতো মহা গেরো। গুপি পানুকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে দেখে, ছোটমামা

আরো বললেন, 'কবে আমার কোন কথাটা শুনে, কার এতটুকু ক্ষতি হয়েছে তাই বল্। বরং আমার অনেক সুবিধাই হয়ে গেছে। জানিস্-ই তো ছেলেবেলায় অন্ধকার রাতে বাদুড়ের ডানার ঝাপটানি খেয়ে অবধি আমি আর সে-আমি নেই। তাই তোদের ডাকা! নইলে নিজেই তো পরম সুখে জীবন কাটাতে পারতাম। যাক্ গে, যার যেমন কপাল!' এই বলে ছোটমামা এত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপরকার কাগজচাপাটা সরে গেল। পানু বলল, 'কোথায় থাকা হবে?' ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'ওমা, তোদের বুঝি আসল কথাটাই বলা হয়নি? গোপালপুরের শহরতলিতে আমার মায়ের জ্যাঠামশাইয়ের একটা টিলার মাথায় বাড়ি আছে। সেখানে আমার প্রাপ্তিযোগ আছে।' শুনে গুপি-পানু অবাক। প্রাপ্তিযোগ আবার কি?

'কীসের প্রাপ্তি?' ছোটমামা রেগে গেলেন, 'কীসের প্রাপ্তি কী করে বলব? সেটা কিছু একটা সমস্যাই নয়—' গুপি বলল, 'এক যদি না পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়।' ছোটমামা কটমট করে একবার তাকিয়ে বলে যেতে লাগলেন, 'এখন মুশকিল হয়েছে যে বড়দাদু আমার মাসতুতো ভাই নাদুকেও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে আগে গিয়ে জিনিসটা খুঁজে বের করবে, প্রাপ্তিযোগটা তারই হবে। অতএব আর সময় নষ্ট করা নয়, আমরা আজই রাতের গাড়িতে রওনা হচ্ছি।' হল-ও তাই। পরদিন থেকেই পুজোর ছুটি, কাজেই কারো বাড়ি থেকে কোনো আপত্তির কথা উঠল না। বরং এত কম খরচে এত দিনের জন্য ছেলে দুটো বাড়ি ছাড়া হচ্ছে জেনে বাড়ির সকলে যেন একটু খুশিই হল।

থার্ড ক্লাসে যাওয়া হল। যেখানে শত্রুপক্ষের প্রতিযোগিতার ভয় আছে, সেখানে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকাই ভালো। ছোটমামা বললেন, আর শুধু নাদু কেন আরো কতজনকে ঐ কথা বলেছেন কে জানে। এককালে সারা পৃথিবী জাহাজে করে চষে বেড়িয়েছেন, নানান জায়গা থেকে নানান জিনিস সংগ্রহ করেছেন। মাঝে মাঝে দেশে ফিরে, আমার মার কাছে পরম আদরে দু-তিন মাস কাটিয়ে আবার একদিন কাকেও কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গেছেন। তা মা আদর করবেন নাই বা কেন? ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি বড়দাদুকে বেচলে ওঁর নিজের ওজনের সোনা পাওয়া যাবে। বুড়ো হয়ে অবধি গোপালপুরের ঐ টিলার মাথায় দূরবীন হাতে দিন কাটিয়েছেন, নাকি সমুদ্রের গন্ধ না পেলে ওঁর ঘুম হয় না!'

পানু বলল, 'এখন তিনি কোথায় আছেন? নাকি মরে গেছেন?' ছোটমামা চটে কাঁই। 'মরবেন কেন? পঁচাশি বছর বয়স হলেই মরতে হবে, এমন কোনো আইনের কথা তো শুনিনি। আছেন আমার মায়ের কাছেই। নাদুর মা-ও কম চেষ্টা করেন নি ভাঙ্গিয়ে নিতে। তা মা ছাড়লে তবে তো যাবেন। রোজ মাসী গিয়ে তাই

বড়দাদুর পায়ের কাছে বসে থাকেন, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!' পানু বলল, 'পায়ের কাছে কেন?' 'আহা, মাথার কাছটি আমার মা ছাড়লে তবে তো সেখানে বসবেন। সে যাই হোক, নাদুর আগেই হয়তো আমরা গিয়ে পৌঁছব। কারণ মা কাকে দিয়ে ওর বড় সায়েবকে ধরিয়ে ওকে ট্যুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।' এই বলে ছোটমামা একটু হেসে চুপ করলেন। গুপি একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রকাশ্যে এত কথা বলা তোমার ঠিক হয়নি, ছোটমামা।' ছোটমামা বললেন, 'আরে তাতে হয়েছেটা কী? সে ব্যাটা এতক্ষণে হয়তো পাণ্ডুয়ার জন-পরিসংখ্যান করছে!' শেষ রাতে ওরা বহরমপুরে নামল। সেখান থেকে মাইল পনেরো ষোল দূরে সেই টিলার উপরে বাড়ি। ভাগ্য ভালো একটা মেছো লরি সত্যিই পাওয়া গেল। মাথা পিছু এক টাকা দিয়ে তাতে চেপে ওরা রওনা দিল। নামল যখন পুব আকাশ তখন ফিকে হয়ে এসেছে। কানে এল একটা শোঁ শোঁ শব্দ। এই শব্দ না শুনলে হয়তো ছোটমামার বড়দাদুর মন খারাপ হয়। ছোটমামা কেবলি তাড়া দেন, 'চল্, চল্, সবার আগে পৌঁছনো দরকার। গিয়েই খোঁজা শুরু করে দেব। একটা ইংরিজি বইও এনেছি, তাতে গুপ্তধন পাবার একশো একান্নটা উপায় লেখা আছে। তবে একটা অসুবিধা হল যে সদর দরজার চাবি নাদুর কাছে, বড়দাদুর শোবার ঘরের চাবি আমার কাছে। এই রকম ভাগাভাগি করেছে বুড়ো। এখন ঢুকবটা কী করে তাই ভাবছি।'

গুপি বলল, 'সে আবার একটা কথা হল ছোটমামা? আমি ঢুকিয়ে দেব।' যতই তাড়াতাড়ি করার দরকার হোক না কেন, এইখানে একটা শেয়ালের বাচ্চা হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে নাক ফুলিয়ে ছোটমামার দিকে শুঁকতে থাকাতে, তিনি অমনি আঁউ শব্দ করে হাত পা এলিয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। পানুর জলের বোতল থেকে মাথায় জল ছিটিয়ে মুখে রেলের টাইমটেবলের হাওয়া দিয়েও কিছুতেই তাঁকে খাড়া করা যেত না যদি না গুপি হঠাৎ বলে বসত, 'এইরে আমাদের আগেই কেউ এ পথে এসেছে! গেটটা দেখছি খোলা!'

বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছোটমামা হাঁচড় পাঁচড় করে, খোলা গেট দিয়ে ঢুকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে, ওপর দিকে দৌড়তে লাগলেন। গুপি-পানুও পেছন পেছন ছুটল। ছোট টিলা, কিন্তু বড় বড় ঝাউ গাছে ঢাকা থাকাতে ওপরের দোতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল না। ওপরে উঠে ওদের চক্ষু স্থির! দরজা জানলা সব খোলা। ঘরের আসবাবপত্র তছনছ। তারি মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেরাজ টেনে, টেবিলের টানা উল্টে দেয়ালের ছবি নামিয়ে রান্নাঘরের বাসনপত্র বাইরে এনে ছড়াছড়ি করে দুটো লোক সে যা কান্ড বাধিয়েছে তা আর কহতব্য নয়। তার ওপর লোক দুটো সমানে পরস্পরকে যা-নয় তাই বলে যাচ্ছে। পানু তো অবাক। আর ছোটমামা থপ্

করে সিঁড়ির ধাপে চোখ উল্টে বসে পড়লেন। গুপি বলল, 'এ কী নাদুমামা হাঁদুমামা, এ কী কান্ড?' তারা তখ্নি ঝগড়া থামিয়ে উঠে এল। 'বুড়ো বুঝি তোদেরও পাঠিয়েছে? চাঁদুমাস্টারেরও কি প্রাপ্তিযোগ আছে নাকি? ভালো চাস্ তো উপরের ঘরের চাবি বের কর চাঁদু।' ছোটমামা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে ছুঁড়ে দিতেই, গুপি সেটা ধরে ফেলে, দোতলায় চলল। ছোটমামা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। নাদু হাঁদু চটে কাঁই। 'বুড়োর চালাকি দেখে বলিহারি! আমাদের দিয়ে সারা বাড়ি খুঁজিয়ে, পেয়ারের নাতি চাঁদুমাস্টারকে শোবার ঘরের চাবি দিয়েছে।' দোতলায় একটি মাত্র ঘর। গুপি তার দরজা খুলে, চারটে জানলাও খুলে দিল। ভোরের ফিকে আলোয় অমনি ঘর ভরে গেল। নাকে এল সোঁদা সোঁদা সাগরের গন্ধ, কানে এল সমুদ্রের গর্জন। ঘরে কিন্তু একটি তক্তাপোষ কাগজপত্রে বোঝাই, একটি লেখার টেবিল তাকের উপর, একটি লম্ফ আর একটি হাতবাক্স, খাটের পাশে একটি মোড়া আর খাটের তলায় সমুদ্রের শামুক ঝিনুক ভরা ডালাশূন্য একটা পুরনো তোরঙ্গ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর সব জায়গায় রাশি রাশি বালি।

বালি দেখেই ছোটমামার হাঁচি উঠল। নাকে রুমাল চেপে তিনি তক্তাপোষে বসে পড়লেন। নাদু টেবিলের কাগজপত্র মাটিতে নামিয়ে, আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। হাঁদু একটা তার দিয়ে হাত বাক্সটা খুলে ফেলেই 'পেয়েছি, পেয়েছি বড়দাদুর ভল্টের চাবি! ইউরেকা!' এই বলে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে, ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

নাদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরো কতকগুলো কাগজ একপাশে সরিয়ে বলল, 'পেয়েছে না আরো কিছু! ভল্টের গয়না-গাঁটি কোন্‌কালে বুড়ো একে ওকে দান করেছে না! কিন্তু—কিন্তু এটার কথা আলাদা।' এই বলে নাদুমামা একটা ছোট হলদে কাগজের কুচি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'এই লটারির টিকিটেই আমার প্রাপ্তিযোগ! ঘরদোর গুছিয়ে রাখিস্ চাঁদু, বুড়ো নইলে চটে গিয়ে, উইল ছিঁড়ে ফেলে দেবে, তা হলে তুই আর বাড়িটা পাবি না!' এই বলে ধীরে সুস্থে নাদুমামাও ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে থুপথুপ করে নেমে চলে গেল। ছোটমামার হাতে-পায়ে খিল ধরে থাকবে, তাই, তক্তাপোষে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন, 'যা হয় কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে, তোরা দু'জন ঘরদোর গুছিয়ে ফেলিস্। আমার বেজায় দুর্বল লাগছে।' গুপি রেগেমেগে ভাঙা তোরঙ্গটাকে উল্টে ফেলল। হুড়মুড় করে শামুক-ঝিনুক আর আঁসটে গন্ধে ঘর ভরে গেল। শামুকের ভিতর মরা পোকার গন্ধ। পানু সঙ্গে আনা পুঁটলি খুলে লুচি, বেগুন ভাজা, মাংসের বড়া, সন্দেশ আর ক্ষীরের বরফি বের করল। ছোটমামা অমনি উঠে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাই তুলে বললেন, 'নিদেন বাড়িটা যখন আমিই পাব, নাদু

যখন বলছে, তখন এটাকে তো এভাবে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। তোরা উঠে সব গুছিয়ে ফেল। আমি শামুক-ঝিনুকগুলো তুলে রাখি।' গুপি-পানুর এখানে ক'দিন থাকার মতলব। তারা তাই ছোটমামাকে চটাতে চাইল না। খুব বেশী জিনিসও ছিল না। সব যথাস্থানে তুলতে ঘন্টা দুই লাগল। স্টোভ ছিল, তেল ছিল, চাল-ডাল ছিল, মসলা ছিল, একটা কালো রোগা লোক মাত্র এক টাকায় এই বড় একটা চিংড়িমাছ নিয়ে এসে, কেটেকুটে দিয়ে গেল। টিলার নিচে একটু দূরে ছোট্ট দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ কেনা হল। তখন ছোটমামা উঠে বললেন, 'যা, তোরা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আয়, আমি চিংড়ি দিয়ে খিঁচুড়ি রাঁধব।

সমুদ্রের ধারটা উঁচু-নিচু, ঢেউগুলোও তখন অনেক শান্ত। গুপি একটা খুদে সমুদ্রের ঘোড়া পেল। কুড়িয়ে নিতেই সেটা কিলবিল করে উঠল। অমনি গুপি সেটাকে ছুঁড়ে ভাটার জলে ফেলে দিয়ে, ধপ করে বালির উপর বসে পড়ল, 'ছোটমামার কপালটাই মন্দ। নাকের ডগা দিয়ে নাদুমামার প্রাপ্তি-যোগ ঘটে গেল আর ও বেচারা কিচ্ছু পেল না!' পানু বলল, 'কিচ্ছু পেল না আবার কী? ও বাড়িতে একটা কাঁঠাল গাছ, ঝাউ গাছের শব্দ আর সমুদ্রের গন্ধ আছে।' গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আর আছে এক বাক্স বোঝাই শামুক-ঝিনুক।' তাই শুনে পানু হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, 'গুপি, চল্, ছোটমামার প্রাপ্তিযোগটা বোধহয় হয়ে গেল!' আর কিছু না বলে পানু হনহনিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িময় ভুরভুর খিচুড়ি আর চিংড়ি মাছের গন্ধ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পানু সটাং দোতলার ঘরে ঢুকে, শামুক-ঝিনুকের বাক্স আবার উল্টে ফেলল। আবার এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে এল। পানু বড় বড় গোল গোল কালোপানা ঝিনুকগুলোকে আলাদা করতে লাগল। গুপি অবাক হয়ে দেখল ঝিনুকগুলো আস্ত রয়েছে। ভিতরে নিশ্চয় পোকা মরে ঘুঁটে হয়ে আছে, তারই দুর্গন্ধ। পকেট থেকে সাত ফলা ছুরি বের করে পানু ঝিনুক খুলে ফেলল। কালো পচা পোকা শুকিয়ে ঘুঁটে। তারই বুকে নিটোল মুক্তো জ্বলজ্বল করছে। চল্লিশটা ঝিনুক খুলে সাঁইত্রিশটা মুক্তো পাওয়া গেল। কোনটা বড়, কোনটা সাদা, কোনটাতে একটু গোলাপী ভাব। গুপী আর পানু পা ছড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখতে লাগল। নিচে থেকে ছোটমামার হাঁকডাকে কেউ কোনো সাড়া দিল না দেখে, শেষ পর্যন্ত ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ওপর এসে দরজার কাছ থেকে ঝিনুকের খোলার স্তূপ আর মুক্তোর খুদে ঢিপি দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে সত্যি করে মুচ্ছো গেলেন। গুপির ধমকেও উঠলেন না। শেষটা নিচে গিয়ে পানু স্টোভ থেকে তৈরি খিচুড়ি নামাল, আর এক ঘটি জল এনে ছোটমামার মাথায় ঢালতে বাধ্য হল। ছোটমামা চোখ খুলতে গুপি বলল, তোমার প্রাপ্তিযোগ হয়েছে, এই কি মূচ্ছা যাবার সময় নাকি?'

———

কুয়াশায় ঢাকা মুখ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পারিজাত বক্সি সবে দরজার বাইরে পা দিয়েছেন, এমন সময় ফোনের শব্দ।

এ সময়ে আবার কে ফোন করছে। অবশ্য পারিজাত বক্সির কাছে ফোন করার কোন সময় অসময় নেই। থাকতে পারে না। মানুষের বিপদ তো আর দিনক্ষণ বুঝে আসে না। পারিজাত বক্সি ফিরে গেলেন।

ক্র্যাডল থেকে ফোনটা তুলে কানের কাছাকাছি নিয়ে যেতেই বাজ খাঁই কণ্ঠ শুনতে পেলেন, পারিজাত বাবু আছেন?

চেনা কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠ কানের ভিতর দিয়ে মরমে যেতে দেরী হয় না।

আছি এবং কথা বলছি—পারিজাত বক্সির মোলায়েম স্বর। কোথায় থাকেন মশাই! আধঘণ্টা ধরে ফোন বেজে যাচ্ছে।

যাঁর কণ্ঠ তিনি ভবানীপুর থানার অফিসার-ইনচার্জ মহিম রুদ্র। এমন সার্থক-পদবী লোক সচরাচর দেখা যায় না।

প্রশ্নটা এড়িয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, কি ব্যাপার বলুন? ব্যাপার গুরুতর। আসতে পারবেন একবার?

একটু দেরী হবে। কত দেরী?

একবার ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট-এ যাব। অসিতবাবু তলব করেছেন। কতক্ষণ লাগবে জানি না।

যতক্ষণই লাগুক, আমি অপেক্ষায় থাকব। চলে আসবেন।

পারিজাত বক্সি জানেন, ফোনে মহিম রুদ্র এর বেশী একটি কথাও বলবেন না। কেসের সম্বন্ধে তিনি সামনা-সামনি ছাড়া কিছু বলেন না। ফোন নামিয়ে রেখে পারিজাত বক্সি বেরিয়ে পড়লেন।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে পারিজাত বক্সি ছাড়া পেলেন বারোটা নাগাদ। সেখান থেকে সোজা ভবানীপুর থানা।

ঢুকতেই কল্যাণ সোমের সঙ্গে দেখা হল। চালের চোরাকারবারীদের নিয়ে ব্যস্ত।

কল্যাণ সোম মহিম রুদ্রের সহকারী। কিন্তু স্বভাবে একেবারে বিপরীত।

পারিজাত বক্সিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আপনার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

একেবারে ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখল, মহিম রুদ্র অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। হাতদুটো পিছনে।

আমি এসে গেছি মিঃ রুদ্র। বলার অপেক্ষা না করে পারিজাত বক্সি নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

উদ্ধার করেছেন। বলেই মহিম রুদ্র নিজেকে সামলে নিলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, একেবারে বেলা কাবার করে এলেন! পারিজাত বক্সি কোন উত্তর দিলেন না।

মহিম রুদ্র নিজের চেয়ারে বসলেন। সামনে টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে বললেন—আর তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি মশাই। আমার আর এক্সটেনশনে দরকার নেই। কি হল?

কি হল না তাই বলুন। রায় বাহাদুর অতুল সিংহের মেয়ে মারা গেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, বিষ ক্রিয়ায় মৃত্যু কিন্তু বিষ এল কোথা থেকে, কে দিল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটির বয়স কত? বছর বারো।

তাহলে ব্যর্থ প্রেমের প্রসঙ্গটা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। অবশ্য আজকালকার মেয়েরা বারোতেই ঝানু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ মেয়েটি খুবই ক্ষীণজীবি। সে রকম কিছু

বলে মনে হচ্ছে না।

মাত্র পরশু ব্যাপারটা ঘটেছে, এর মধ্যে সহকারী কমিশনারের তিনবার ফোন এসেছে কেসটার সম্বন্ধে। অতুল সিংহের সঙ্গে কমিশনারের আবার খুব দহরম মহরম। আচ্ছা ঝামেলা। কেসটা গোড়া থেকে আমাকে বলুন তো।

পারিজাত বক্সি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

শুনুন তাহলে, মহিম রুদ্র র‍্যাক থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, অতুল সিংহের বাড়ী টার্ফ রোডে। এক সময়ে অভ্রপতি ছিলেন। লোকে বলে মাইকা কিং। নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বিলাতে স্কেটিং করতে গিয়ে বরফ ফেটে মারা গেল। সেই শোকে, এক মাসের মধ্যে অতুল সিংহের স্ত্রী মারা গেলেন। অতুল সিং বাতে পঙ্গু হলেন। কারবার এক গুজরাটিকে বিক্রি করে বাড়ীতেই বসে রইলেন, সম্বল ওই মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখবার জন্য নবদ্বীপ থেকে দূর সম্পর্কের এক বোনকে নিয়ে এলেন। বিধবা বোন।

একটা কথা, মেয়েটি লেখাপড়া করত না? না, স্কুলে যেত না, বাড়ীতে এক দিদিমণি পড়িয়ে যেত। তারপর?

তারপর রোজ সকালে অতুল সিংহ দু পায়ে বাঘের চর্বি মাখতেন বাতের জন্য। সেই সময়ে মেয়ে রোজ কাছে বসে থাকে, সেদিন মেয়েকে দেখতে পেলেন না। বোনকে ডাকলেন, নীহার মলিকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘুমচ্ছে।

এখনও ঘুমচ্ছে।—অতুল সিংহ দেয়াল ঘড়ির দিকে দেখল। ন'টা বেজে গেছে।

ন'টা বেজে গেছে, এখনও ঘুমচ্ছে? শরীর খারাপ হ'ল নাকি?

চেয়ারের পাশ থেকে মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে অতুল সিংহ বোনের সঙ্গে মেয়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বললেন মলি, মলি, অনেক বেলা হয়ে গেছে মা। উঠে পড়।

কোন সাড়া নেই।

নীহার মলির পাশের ঘরে শুত। দু ঘরের মধ্যে যাওয়া আসার দরজা আছে। অতুল সিংহ সেই দরজা দিয়ে মেয়ের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

মলি বিছানায় শুয়ে। তার শোয়ার ভঙ্গীটা অতুল সিংহের ভাল মনে হল না। তিনি মেয়ের কাছে এসে একটু ঝুঁকেই চীৎকার করে উঠলেন।

ডাক্তার এল। পাড়ার ডাক্তার। জানিয়ে দিল, মলি আর বেঁচে নেই। তারপর থানায় খবর এল। আমরা গেলাম। আমাদের করণীয় সব করলাম।

এখানে পারিজাত বক্সি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, অতুল সিংহের বাড়ীতে কে কে

থাকে।

অতুল সিংহ, মেয়ে মলি, বোন নীহার। বাইরের লোকের মধ্যে একজন রান্নার লোক, একটি ঝি, একজন ড্রাইভার। ড্রাইভার নেপালী। নাম জং বাহাদুর। সে আউট হাউসে থাকে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখতে পারি।

এই তো ফাইলেই আছে। মহিম রুদ্র গোটা ফাইলটা পারিজাত বক্সির দিকে এগিয়ে দিলেন।

পারিজাত বক্সি মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

শুধু পোস্টমর্টেম রিপোর্টই নয়, সকলের জবানবন্দী।

এই সময়ে মহিম বেরিয়ে গেলেন। ওপরেই তাঁর কোয়ার্টার। সেখানে উঠে গেলেন। একটু পরে যখন নেমে এলেন, তখন পারিজাত বক্সির ফাইল পড়া শেষ। তিনি দু হাত কপালে চেপে চুপচাপ বসে আছেন।

মহিম রুদ্রের পিছনে হাতে ট্রে নিয়ে একজন চাকর ঢুকল। ট্রের ওপর প্লেটে লুচি তরকারি, ধুমায়মান চায়ের কাপ।

পায়ের আওয়াজে পারিজাত বক্সি মুখ তুলে দেখলেন।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন? আরে অসময়ে একি করেছেন?

মহিম রুদ্র হাসলেন। আমাদের আবার সময় অসময়। নিন, মুখে তুলে দিন।

খেতে খেতে পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ওই মেয়েই তো অতুল সিংহের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী ছিল তাই না?

মহিম রুদ্র ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ তাই।

সব হত্যাকাণ্ডের পিছনে একটা মোটিভ থাকে। এক্ষেত্রে মলির মৃত্যুতে লাভবান কে হবে?

মানে? মানে মলি না থাকলে অতুল সিংহের সম্পত্তি কার পাবার সম্ভাবনা?

মহিম রুদ্র প্রশান্ত হাসলেন।

সেদিকটা যে আমি ভাবি নি তা মনে করবেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম অতুল সিংহের ভাইপো সম্পত্তি পেতে পারে। কিন্তু সে থাকে পাটনায়। ব্যবসা করে। আজ দু বছর এদিকে আসেনি।

ঠিক আছে, খাওয়া শেষ করে পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন, আজ বিকেলে একবার অতুল সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চাই; সুবিধা হবে? মহিম রুদ্র বললেন, আলবৎ হবে। কটা নাগাদ? ধরুন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা।

ঠিক আছে আপনি সাড়ে চারটে নাগাদ এখানে চলে আসুন। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি বলে দিয়েছি, আমার হুকুম ছাড়া ও বাড়ীর কেউ শহর ছেড়ে যেতে

পারবে না। পারিজাত বক্সি চলে এলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের লাইব্রেরীতে বসে 'টক্সিন' সম্বন্ধে মোটা মোটা গোটা চারেক বইয়ের পাতা ওল্টালেন। গোটা তিনেক ফোন করলেন। যখন ভবানীপুর থানায় পৌঁছলেন তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে।

মহিম রুদ্র তৈরী হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। পারিজাত বক্সির মোটরে এসে উঠলেন।

মোটর যখন সিংহ লজ-এর সামনে এসে থামল, তখন প্রায় পাঁচটা, সাদা রংয়ের আধুনিক ডিজাইনের বাড়ী। সামনে বাগান। বড় লোহার গেট। মোটর গেট পার হয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কলিং বেল টিপতেই একটা লোক এসে দাঁড়াল।

মহিম রুদ্রকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। বোঝা গেল এর আগে জেরায় জেরবার হয়েছে। বাবু আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর দাও, আমরা একটু দেখা করতে চাই।

চাকর ভিতরে গিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এল। আসুন। চাকরের পিছন পিছন দুজন বসবার ঘরে এল।

মেঝের ওপর দামী কার্পেট, বৃহৎ আকারের সোফা সেট, সুদৃশ্য পেলমেট শুধু গৃহস্বামীর অবস্থা নয়, তাঁর রুচিরও নিদর্শন।

একটু পরেই অতুল সিংহ ঘরে ঢুকলেন। মাথায় কাঁচায় পাকায় মেশানো চুল, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, হাতে লাঠি। বিষণ্ণ মুখের চেহারা। ভদ্রলোক যেন বিধ্বস্ত।

মহিম রুদ্র পারিজাত বক্সির পরিচয় দিতেই অতুল সিংহ এগিয়ে এসে পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনি আমার মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটার একটা কিনারা করে দিন। ফুলের মতন মেয়ে। তার এ সর্বনাশ কে করবে? মেয়েকে আর ফিরে পাব না জানি, কিন্তু তবু আততায়ীকে আমি চিনতে চাই।

অতুল সিংহ যে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, সেটা তার কথাবার্তাতেই বোঝা গেল।

পারিজাত বক্সি চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

আমার? কাকে সন্দেহ হবে? নিজের কপাল ছাড়া আমি কাউকে দায়ী করি না।

আপনার ভাইপোর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

ভাইপো? মানে সুনীল, যে পাটনায় থাকে? তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই

নেই। এমন কি চিঠিপত্রেও নয়।

তিনি তো ব্যবসা করেন? হ্যাঁ, শুনেছি ঠিকেদারি ব্যবসা।

আপনাকে একটা নির্মল প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। এখন যা অবস্থা, আপনার অবর্তমানে আপনার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক তো সুনীলবাবুই হবেন?

তখনই অতুল সিংহ কোন উত্তর দিলেন না। লাঠির ওপর মুখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আইন অনুসারে অবশ্য তাই হবার কথা, কিন্তু তা হবে না। আমি স্থির করেছি আমার সব কিছু আমি এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করে যাব। ভাইপোকে বঞ্চিত করবেন? পারিজাত বক্সির এ প্রশ্নের উত্তরে অতুল সিংহ নিজের দুটো হাত জোড় করল, মাপ করবেন। এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। পারিজাত বক্সি আর মহিম রুদ্র দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর পারিজাত বক্সি বললেন, একবার নীহার দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অতুল সিংহ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, ভুবন, ভুবন। ভুবন বোধ হয় কাছাকাছিই ছিল। শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল। বাবু। পিসিমাকে একবার আসতে বল।

মিনিট পনের পরই নীহার এসে দাঁড়াল। বয়সের তুলনায় অনেক শক্ত সমর্থ চেহারা। ফিনফিনে ধুতি সরু কাল পাড়। ধবধবে সাদা ব্লাউজ। শোকার্ত কিন্তু একেবারে মুষড়ে পড়া নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার মহিম রুদ্রের দিকে আর একবার পারিজাত বক্সির দিকে দেখল।

কোণের একটা চেয়ার দেখিয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, বসুন।

নীহার বসল। কোলের ওপর দুটি হাত রেখে। পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আপনি তো মলির পাশের ঘরেই থাকতেন।

পাশের ঘর কেন বলছেন, বলুন একই ঘর। মাঝখানে শুধু একটা কাঠের পার্টিশন।

ভাল। মলি কি ভাবে মারা গেল, তা আপনি কিছু টের পান নি? একেবারেই না।

সেদিন মলির কাছে কে কে এসেছিল মনে আছে? হ্যাঁ, মনে আছে বই কি। দাদা আর আমি তো গেছিই। ভুবন আর জং বাহাদুরও একবার গেছে। বাইরের কেউ? না, বাইরের কেউ আসে নি। ভুবন কেন গিয়েছিল?

ওভালটিন দিতে। মলি ঘুমচ্ছে দেখে ওভালটিন ফিরিয়ে নিতে গিয়েছিল। আর জং বাহাদুর?

জং বাহাদুর মোটরে করে অপেক্ষা করছিল। ভোরবেলা মলি বেড়াতে যায়। তবে দেরী দেখে খোঁজ করতে এসেছিল।

আচ্ছা, নীহার দেবী, শুনেছিলাম মলির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, এরা ভিতরে গেল কি করে?

আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে। আমি খুব ভোরে উঠে ঠাকুর ঘরে যাই। আমার দরজা খোলাই থাকে।

আপনি তো শুনেছেন মলির বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। দাদার কাছে শুনলাম। এদের ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

মোটেই না। এরা প্রায় বাড়ীর লোকের মতন। ভুবন বহু বছর রান্নার কাজ করছে, ড্রাইভার জং বাহাদুরও খুব বিশ্বাসী।

মহিম রুদ্রের দিকে ফিরে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করল, একজন ঝি আছে না এ বাড়ীতে? নীহার উত্তর দিল, শোভার মা। ঠিকে ঝি। সে দুবেলা বাসন মেজে, ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে যায়। তাকে এখন পাওয়া যাবে না।

পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন, আজ তাহলে চলি। দরকার হলে পরে একদিন আসবো।

মহিম রুদ্র জিজ্ঞাসা করল, ভুবন আর জং বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলবেন না। আজ থাক। অন্য একটা কাজ আছে।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে এলেন। পিছন পিছন মহিম রুদ্র।

দরজা পার হতে গিয়েই পারিজাত বক্সি সামলে নিলেন। আর একটু হলেই হোঁচট খেতেন?

ছোট আকারের কুকুর চৌকাঠের পাশে শুয়ে। কুচকুচে কালো কুন্ডলি পাকানো লোম। ঠিক যেন কালো তুলোর বস্তা। এত বড় বড় লোম যে চোখগুলোও ঢাকা পড়ে গেছে। বেশ কুকুরটি তো! পারিজাত বক্সি কুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

অতুল সিংহ বললেন, রুবি মলির খুব ফেবারিট ছিল। ওর কাছেই থাকত। ওই এর দেখাশোনা করত। মলি চলে যাবার পর থেকে বেচারি কি রকম নিঃঝুম হয়ে গেছে।

পারিজাত বক্সি রুবির লোমে হাত বোলাতে বোলাতে একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তারপর বললেন, মনে হচ্ছে খুব শক্ত হয়েছে। চলুন যাই।

পারিজাত বক্সি বাড়ি গেলেন না। ভবানীপুর থানায় এসে নামলেন। মহিম রুদ্রকে বললেন, মিষ্টার রুদ্র, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। কি? কাল অতুল সিংহ আর নীহার দেবীকে কোন ছুতোয় থানায় ডেকে এনে ঘন্টা দুয়েক কথাবার্তায় আটকে রাখতে হবে! কারণ?

কারণ আমি একবার ওদের ঘরগুলো সার্চ করতে চাই। সে তো সোজা ভাবেই হতে পারে।

তা হয়তো পারে কিন্তু এটা আমি এদের জানতে দিতে চাই না। পারবেন তো? না পারার কি আছে? কিন্তু বাড়ীতে তো আরও লোক থাকবে। ভুবন আর জং বাহাদুর তো? হ্যাঁ।

অতুল সিংহ আর নীহার দেবী মোটরে আসবেন। জং বাহাদুর সঙ্গেই থাকবে। ভুবনকে আমি ম্যানেজ করে নেব।

তাই ঠিক হ'ল।

পরের দিন মহিম রুদ্র অতুল সিংহকে ফোন করল, নীহার দেবীকে নিয়ে দুপুরের দিকে একবার আসতে হবে।

আবার কি হ'ল? এলে জানতে পারবেন। জং বাহাদুরকেও আনবেন।

মোটরে যখন যাব, তখন জং বাহাদুর তো সঙ্গে থাকবেই। ঠিক আছে বারোটা নাগাদ যাব।

খবরটা মহিম রুদ্র পারিজাত বক্সিকেও ফোনে জানিয়ে দিল।

ঠিক সাড়ে বারোটা।

পুলিশের পোশাক পরা, পাকানো গোঁফ, চোখে কালো চশমা এক ভদ্রলোক অতুল সিংহের বাড়ীতে ঢুকলেন।

কে? ভুবনের প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বললেন, আমি থানা থেকে আসছি। অতুল বাবু তাঁর শোবার ঘরের টেবিলে একটা কাগজ ফেলে গেছেন, সেটা নিতে এসেছি। আসুন। ভুবন লোকটিকে নিয়ে অতুল বাবুর শোবার ঘরে ঢুকল।

কোন্ কাগজ?

ভুবন আর কথা বলতে পারল না। লোকটা তার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরল। শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। দুচোখে অন্ধকার দেখে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

লোকটা দ্রুতপায়ে নীহারের শোবার ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে দুটো সুটকেশ টেনে বের করলেন। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে একটার পর একটা লাগিয়ে দুটো সুটকেশই খুলে ফেললেন। খুঁজে খুঁজে কাগজ পত্রগুলো পড়তে লাগলেন, তারপর একসময়ে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন। বিকালের দিকে অতুল সিংহ আর নীহার থানা থেকে ছাড়া পেলেন। কেন যে ডেকেছিল বুঝতেই পারলেন না। মামুলি কতকগুলো প্রশ্ন।

বাড়ী ফিরতেই ভুবন হাঁউমাউ করে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু। ডাকাতি হয়ে গেছে।

সে কিরে? ভুবন সব বলল। কি হারিয়েছে খোঁজাখুঁজি শুরু হ'ল। অতুল সিংহের একটা ঘড়ি পাওয়া গেল না। আর সব ঠিক আছে। আশ্চর্য কান্ড, তুচ্ছ দামের একটা ঘড়ির জন্য এত কান্ড!

নীহার নিজের আলমারি সুটকেশ সব খুঁজে দেখল। না, কিছু হারায় নি, সব ঠিক আছে। দিন চারেক পর—

নীহারই বলল, দাদা, মলি যাবার পর থেকে রুবিটা কেমন মনমরা হয়ে আছে। ভাল করে খায় না। কেবল খাবার ওপর মুখ রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে। অতুল সিংহ উত্তর দিলেন, রুবি মলিকে খুবই ভালবাসত। কুকুরটা বাঁচলে হয়।

তুমি একবার ডেকে আদর কর।

ডাকব? অতুল সিংহ বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে ডাকলেন, রুবি রুবি এদিকে আয়।

রুবি চৌকাঠের কাছেই শুয়ে ছিল! প্রভুর ডাকে প্রথমে মুখ তুলে দেখল তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

আয়, আয়। অতুল সিংহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

রুবি আরো এগিয়ে এল। মুখ তুলে আবার দেখল তারপর লাফিয়ে অতুল সিংহের কোলে উঠে পড়ল।

তার লোমের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে অতুল সিংহ চমকে উঠলেন, এ কিরে, কি হয়েছে?

লোমগুলো সরাতে গিয়েই অতুল সিংহ থেমে গেলেন। বাইরের জানলায় পারিজাত বক্সিকে দেখা গেল।

অতুল বাবু, সাবধান। অতুল সিংহ চমকে উঠতেই রুবি তার কোল থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে নীহারের আর্তনাদ।

অতুল সিংহ ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন, মহিম রুদ্র দাঁড়িয়ে। দুজন পুলিশ নীহারের দু পাশে।

কি হ'ল? অতুল সিংহ চেঁচিয়ে উঠলেন। এদিকে আসুন, আমি বলছি।

অতুল সিংহ ফিরে দেখলেন, পারিজাত বক্সির কোলে রুবি।

মহিম রুদ্র নীহারকে নিয়ে জীপে উঠলেন।

অতুল সিংহ পারিজাত বক্সিকে নিয়ে বসবার ঘরে এলেন।

প্রথমে একটা জিনিস আপনাকে দেখাই।

পারিজাত বক্সি রুবির লোমগুলো ফাঁক করে দেখাল। খুব সরু একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা কাঠের বাক্স।

এই বাক্সের মধ্যে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস ভরা। যেই রুবিকে কোলে নেবে, সেই কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে বাক্সের ডালাটা খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবে। এই ভাবেই আপনার মেয়ে মলির মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু কে এ কাজ করলে?

যে করেছে মহিমবাবু তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেছেন।

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।

শুনুন, আমি তাহলে বুঝিয়ে বলছি। নীহারদেবী আপনার দূর সম্পর্কের বোন। তার অতীত জীবন খুব কলঙ্ক মুক্ত নয়। তাঁর সঙ্গে আপনার ভাইপো সুনীলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেলাইয়ের ক্লাসে যাবার নাম করে নীহারদেবী যে বাইরে যেতেন, তা শুধু সুনীলবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

ডাকাত সেজে একবার এ বাড়ীতে হানা দিয়েছিলাম। নীহারদেবীর বাক্স তল্লাসী করে দুটো চিঠি উদ্ধার করেছি। অবশ্য পাছে নীহারদেবী সন্দেহ করেন বলে সে চিঠিদুটো আমি নিয়ে যাইনি। শুধু ফোটোস্ট্যাট কপি করে নিয়েছি। এই হাইড্রোসায়ানিক গ্যাসের জোগানটা সুনীলবাবুই দিয়েছিলেন প্রয়োগ পদ্ধতিও তাঁর।

অতুল সিংহ প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এর আগে পুলিশ তো সব কিছু সার্চ করে গেছে, তখন তারা এ চিঠি দুটোর সন্ধান পায় নি?

তখন নীহারদেবী চিঠি দুটো সরিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর পুলিশের হাঙ্গামা মিটে যেতে চিঠি দুটো আবার বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। এ চিঠি দুটোই তাঁর পরম অস্ত্র। এ দুটো চিঠির ভয়ে সুনীলবাবু তাঁর প্রতিশ্রুত টাকা নীহারদেবীকে দেবেন।

তারপর যখন সুনীলবাবুর কাছে খবর পেল আপনি সম্পত্তি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবেন, তখন আপনাকে সরাবার প্রয়োজন হল। দানপত্র করার আগে আপনার মৃত্যু হ'লে উত্তরাধিকার আইন মাফিক সম্পত্তি সুনীলবাবুর পাবার পথে কোন বাধা থাকবে না। সেইজন্য রুবিকে আপনার কোলে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্কাউন্ড্রেল। তার কি ব্যবস্থা করছেন আপনারা?

আজ সকালে বিহারের পুলিশ সুনীলবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। এতক্ষণ বাংলার দিকে রওনা হয়ে গেছে।

অতুল সিংহ পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনি এক গভীর ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

পারিজাত বক্সি মুচকি হাসলেন।

চলি অতুলবাবু, একবার থানায় যেতে হবে। মহিম রুদ্র অপেক্ষা করছেন।

———

কী ভয়ঙ্কর রাত!

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৫০ সালের কথা। আমরা তিন বন্ধুতে জুনপুট বেড়াতে গেছি। তখন এখনকার মতো এমন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। কাঁথি থেকে গরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে জুনপুট যেতে হোত। আমরা তিনজনে খুব ভোর ভোর রওনা হলাম কাঁথি থেকে। ইচ্ছেটা জুনপুটের নির্জন সমুদ্রতীরে ঝাউবনের শোভা দেখব। জেলেদের মাছ ধরা দেখব। আর দুদিনের ছুটি উপভোগ করে ফিরে আসব কোলকাতায়।

জুনপুট এখনও ভালো করে গড়ে ওঠে নি। তখনকার অবস্থা তাহলে বোঝ। না ছিল হোটেল, না ছিল থাকার ব্যবস্থা, না কোন কিছু। জঙ্গলময় একটি গ্রাম ছিল জুনপুট। গ্রাম থেকে সমুদ্রতীরের দূরত্বও ছিল প্রায় এক মাইল। আমরা কাঁথি

থেকে মাইল পাঁচেক পায়ে হেঁটে যাবার পর জুনপুটের সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম।

আমাদের তিনজনেরই ছিল সেই প্রথম সমুদ্র দর্শন। সমুদ্রের বিশাল আকার দেখে আমাদের সে কী আনন্দ। তখন গ্রীষ্মকাল। এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ের সে কী নাচুনি। তাই দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র তীরের চনচনে রোদের উত্তাপ এড়াতে আমরা তট সংলগ্ন ঝাউবনে বসে নানা রকম আলোচনা করতে লাগলাম।

আমাদের সমস্যা হ'ল থাকার ব্যাপার নিয়ে। একটা রাত্রি অন্তত এখানে না থাকলে ঠিক মন ভরবে না। কিন্তু থাকব কোথায়? কাছে পিঠে থাকার মতো তো কোন আশ্রয় স্থানই দেখতে পেলাম না। কয়েকজন মাঝি মাল্লা সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। তাদের জিজ্ঞেস করতে কেউ কথার উত্তরই দিল না আমাদের। একজন শুধু বলল—এখানে কেউ থাকে না বাবু। এখানে থাকার সেরকম ব্যবস্থা নেই। আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান।

আমার সঙ্গে যে দুজন বন্ধু ছিল তাদের একজনের নাম বিমান, অপরজনের নাম প্রশান্ত।

বিমান বলল,—দেখুন, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি সমুদ্র দেখব বলে। তা আপনাদের নৌকোতেই আমাদের একটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিন না।

মাঝি বলল—আমরা সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে চলে যাব, তাছাড়া বিশ্বাস করুন, এ জায়গা ভালো নয়।

—কেন চুরি ডাকাতি হয়?

—না না। কার কী আছে যে চুরি ডাকাতি হবে? অন্য উপদ্রব হয় এখানে। আপনারা থাকতে পারবেন না। কেউ থাকে না এখানে।

বিমান বলল—অন্য উপদ্রব মানে ভূতের উপদ্রব তো? তাহলে শুনুন, ভূতে আমরা বিশ্বাস করি না। আর ভূত বলে যদি কিছু থাকেও তাহলে আমাদের উপদ্রবে তারাই পালাবে এখান থেকে।

মাঝিটা এবার গম্ভীর মুখে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর বেশ রাগত স্বরে বলল—বাবু, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। আপনারা এখনো ছেলেমানুষ। অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোককে দেখলুম আমি। ওনাদের সম্বন্ধে একটু ভেবে চিন্তে মন্তব্য করবেন। বুঝতে পারছি আপনাদের নিয়তিই আপনাদের মুখ দিয়ে এই সব বলাচ্ছে। তবু বলছি শহর বাজারে যা করেন এখানে কোনরকম গোঁয়ারতুমি করবার চেষ্টা করবেন না। এ বড় খারাপ জায়গা।

বিমান বলল—বেশ তো পরীক্ষা হোক। আপনাদের কুসংস্কার বড়, না আমাদের সাহস।

—যা ইচ্ছে করুন। আমি এখানকার ব্যাপার জানি বলেই সাবধান করে দিলুম আপনাদের। আর একটু পরেই পাড়ি দেবো আমরা সাগর দ্বীপে। কেউ থাকব না এখানে, তখন মরবেন।

প্রশান্ত বলল—সাগর দ্বীপ এখান থেকে কতদূর?

—তা দূর আছে বৈকি। বরং চলুন আপনারা আমাদের গ্রামে।

—তাই কী পারি? এই ঝাউবনে আজ রাত্রে ভূতের সঙ্গে ডান্স না করে কী করে যাই বলুন?

মাঝি আর আমাদের সঙ্গে কোন কথা না বলে পাশের একটি নৌকোর পাটাতনে উঠে ভাত খেতে বসে গেল।

আমরা তখন নিজেদের মনে সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে দীঘা মুখী হয়ে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাবার পর ঘন ঝাউবনের ভেতর হঠাৎ একটি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা হাল আমলের নয়। বহু পুরনো। দেখে কোন রাজবাড়ি বলে মনে হ'ল।

আমি বিমানকে বললাম—ঐ দেখ বিমান।

বিমান বলল—তাই তো রে বাড়ি এখানে কোত্থেকে এলো?

প্রশান্ত বলল—এগিয়ে চল তো দেখি। যদি এখানেই কোথাও একটু থাকবার ব্যবস্থা ম্যানেজ করতে পারি।

এমন সময় আমাদের পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—ওটা ভূতের বাড়ি।

আমরা পিছু ফিরে দেখলাম বারো তেরো বছরের একটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। পরনে হাফ প্যান্ট। সাদা সাদা দাঁত বার করে হাসছে।

বিমান বলল—তুমি কে বাবা ঝাউবনের কেলেমাণিক? তুমি নিজেই একটি ভূত নও তো?

ছেলেটি বলল—আমার নাম কেলেমাণিক নাকী? আমার নাম তো বিশু।

—তা বিশুই হও আর শিশুই হও, ঐ বাড়িটা কাদের?

—রাজাদের। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। ওটাকে সবাই ভূতের বাড়ি বলে। রাত্রে ওখানে কুকুর ডাকে। বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। নাচ গান হয়।

—বলিস কিরে! এত কিছুই হয় এখানে।

—হ্যাঁ গো। মিথ্যে কথা বলছি?

প্রশান্ত বললো—আমরা ঐ বাড়িতে এক রাত্রি থাকতে চাই।

বিশু বললো—কেউ পারে না তো তোমরা। সখ মন্দ নয়। এঃ। কি বলে।

আমার বাবা ঐ বাড়ির বাগানের মালী ছিলো, বাবাই থাকতে পারে না!

—তুই কখনো থেকেছিস ঐ বাড়িতে?

—আগে বাবার সঙ্গে থেকেছি। এখন নয়।

আমি বললাম—আমরা যদি এক রাত ঐ বাড়িতে থাকি, তোর বাবাকে বলে একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবি আমাদের?

—পারব। তবে এখানে কেউ থাকে না। যারা থাকে ভূতে তাদের গলা টিপে মেরে ফেলে।

বিমান বলল—গুল মারবার জায়গা পাসনি ব্যাটা? কেউ যদি থাকেই না তো ভূতে গলাটা টেপে কার? তোর?

বিশু এ কথার উত্তর দিতে পারল না।

প্রশান্ত বলল—এই বাড়িতে থেকে তুই কাউকে মরতে দেখেছিস?

—না।

—তবে চল তোর বাবার কাছে নিয়ে চল আমাদের। তোর বাবা ব্যবস্থা করে দিলে এই বাড়িতেই আমরা রাত্রিবাস করব আজ।

বিশু আমাদের ওর পিছু পিছু আসতে বলে ঝাউবনের বাইরে এলো তারপর ডানদিকের পথ ধরে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একটা বুড়ো মতন লোক জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে থলির বস্তায় পুরছে। বিশু বুড়োর কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল।

বুড়ো তাড়াতাড়ি বস্তা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী ঐ রাজবাড়ির বাগানের মালী ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরা জুনপুট বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছি না। আপনি কী পারেন ঐ বাড়িটাতে আমাদের এক রাত্রি থাকার ব্যবস্থা করে দিতে?

—কেন পারব না? বাড়ির চাবি তো আমার কাছে। তবে কী জানেন? ও বাড়িতে থাকা উচিত নয়। ওটা ভূতের বাড়ি। ও বাড়িতে এক রাত কেউ থাকলে সে পাগল হয়ে যায়।

—ঐ বাড়িতে থেকে পাগল হয়ে গেছে এমন কাউকে আপনি দেখাতে পারবেন?

—না।

—তবে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

বুড়ো বলল—তা আমি বলি কী বাবু আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান। এখানে রাত্রিবাস করবেন না।

প্রশান্ত বলল—কেন, ওখানে কোন দলের গোপন আড্ডা হয় বোধহয়?

—না বাবু। গভীর রাতে ও বাড়িতে আলো জ্বলে। নাচ গান হয়। বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।

আমি বললাম—তবে হ্যাঁ, তুমি চাবি দিলে আজ রাত্রে ও বাড়িতে সত্যি সত্যিই আলো জ্বলবে। নাচ গান হবে। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য শোনাতে পারব না। আর এও দেখে রেখো এই শেষ রাত। আমরা তিনজনে আজ সারারাত ধরে এমন ভূতের নাচ নাচব যে আর কখনো ঐ বাড়িতে ভূতের উপদ্রবই হবে না।

বুড়ো বলল—এক মিনিট দাঁড়ান আপনারা। বলে হন হন করে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল—এই নিন চাবি। কাল কখন ফিরবেন আপনারা?

—তা ধরুন ভোরবেলা।

—ঠিক আছে। আমি এখানেই থাকব। না থাকি বিশু থাকবে। চাবিগুলো ফেরত দিয়ে যাবেন। আর একটা কথা, ঘরের জিনিসপত্তরে দয়া করে হাত দেবেন না, বাগানের ফুল ছিঁড়বেন না।

আমি বললাম—না না, ওসব কিছু করব না আমরা। তারপর বললাম, আচ্ছা এখন তো বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। এখানে খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়?

—যান না, গ্রামে যান আপনারা। কোন বাড়িতেই টাকা পয়সা দিয়ে দেবেন ওরাই রেঁধে দেবে। ফেরার সময় কারো কাছ থেকে একটা হারিকেন চেয়ে আনবেন।

—আমাদের কাছে মোমবাতি আছে।

—তাহলে তো খুব ভালো।

আমরা চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই চলে গেলাম জুনপুট গ্রামে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং রাতের আহার সংগ্রহ করতে। যাবার সময় দেখলাম সেই মাঝিরা তখন নোঙর খুলে সাগরদ্বীপে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমরা তাদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকলেও তারা কিন্তু ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে।

গ্রামে গিয়ে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতের জন্য কিছু মুড়ি আর রসগোল্লা নিয়ে আবার সমুদ্র সৈকতে ফিরে এলাম। সমুদ্র এখন আরো অশান্ত। আরো উত্তাল। যত জোরে হাওয়া বইছে সমুদ্র ততই ফুলছে। আমরা বালুচরের গা ঘেঁষে ঝাউবনে ঢুকলাম।

বিশু আমাদের দেখেই ছুটে এলো। তারপর আমাদের আগে আগে চলতে লাগলো সে।

আমি বললাম—কিরে ব্যাটা, বেশ তো মনের আনন্দে নাচতে নাচতে যাচ্ছিস। ভয় করছে না?

বিশু বলল—ভয় করবে না? আপনারা তো আছেন। তাছাড়া দিনের বেলা ওখানে কিছু হয় না। ভূত আসে রাত্রিবেলা।

—তোরা দিনের বেলা ঢুকিস ওখানে?

—আমরা কোন সময়েই ঢুকি না।

যাইহোক। আমরা সেই পুরনো রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত দোতলা বাড়ি। গেটের তালাটার অবস্থা দেখে মনে হ'ল বেশ কয়েক বছর খোলা হয়নি এর দরজা। আমরা বহু কষ্টে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঘন ঘাস ও আগাছায় ভরে আছে চারদিক। আর চাঁপা, গন্ধরাজ ও ম্যাগনোলিয়ার গন্ধে ম ম করছে। আমরা ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়িটা বাইরে যেমন পোড়ো বলে মনে হয় ভেতরে কিন্তু তা নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হ'ল দিনকতক আগেও বুঝি কেউ এসে এখানে থেকে গেছে।

আমরা নিচের তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। নিচে ওপরে মিলে মোট দশখানা ঘর রয়েছে এ বাড়িতে। বড় বড় ঘর। মাঝখানে একটি হল ঘর।

বিশু বলল—এটা রাজাবাবুদের জলসাঘর।

আমি বললাম—এই ঘর থেকেই তাহলে গান বাজনার আওয়াজ শোনা যায়?

—হ্যাঁ।

এই ঘরটি ছাড়া প্রায় সব ঘরই খাট আলমারী এবং নানা রকমের দামি জিনিস দিয়ে সাজান। খাটের ওপর পুরু গদী। দুধ-সাদা বেডসিট দিয়ে ঢাকা। যেন এইমাত্র পেতে রেখেছে কেউ। কোথাও এতটুকু ধূলোর আস্তরণ নেই।

বিমান বলল—রহস্যটা বুঝতে পারছিস? আসলে ভূতটুত কিছু নয়। এই বাড়ি রীতিমতো গোপনে ব্যবহার করা হয়। আর গ্রামের লোকেরা মনে করে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে।

বিশু বলল—আপনারা বিশ্বাস করছ না তো? থাকো না রাত্রিবেলা, তার পর বুঝবে।

প্রশান্ত বলল—ভূত যদি থাকে তাহলে আমাদের দেখা দেবে নিশ্চয়ই? আমরা আজ সারা রাত ধরে ভূতেদের সঙ্গে এই জলসাঘরে নাচ গান করব। তারপর কাল সকাল হলেই ভূতগুলোকে ধরে সোজা নিয়ে যাব তোদের গ্রামে।

আমি বললাম—তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি বিশু? তাহলে দেখবি ভূতগুলোকে কী রকম জব্দ করব আজ।

বিশু বলল—না বাবা। দরকার নেই।

বিমান বলল—তুই থাকলে হোত কি তোকে দেখেই ভূত পালাত। যা কালো তুই। ভূতেরা বোধহয় তোর চেয়ে ফর্সা। ভূত এলেই আমরা তোকে দেখিয়ে বলতাম, এই দেখ তোদের বাচ্চাকে আমরা ধরে রেখেছি।

বিশু বলল—না। আমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।

আমরা খাবারগুলো ঘরের ভেতর রেখে ওয়াটার বটলটা দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে আবার চললাম সমুদ্রতীরে। কেননা সন্ধ্যে হতে এখনো অনেক দেরী। কী করব অতক্ষণ ঐ বাড়িতে চুপচাপ বসে থেকে। বিশেষ করে সারাটা রাত যখন ঐ বাড়িতে থাকতেই হবে আমাদের। তার চেয়ে সী-বীচে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালে সমুদ্রের অনেক নতুন নতুন রূপ দেখতে পাবো। ঝাউবনে ঝাউয়ের হাহাকার শুনতে পাবো। আসলে সমুদ্র দর্শনের জন্যই তো আমাদের আসা।

সমুদ্রে এখন ভাটার টান। জল যত সরে যাচ্ছে ততই বিভিন্ন রকমের ঝিনুকের খোলার বহর দেখা যাচ্ছে। আমরা কাড়াকাড়ি করে সেই সব ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম। এমন সময় দেখি আমাদের অদূরেই সেই নির্জন বালুচরে এক সুন্দরী মহিলা নিজের মনেই ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছেন। দেখে বেশ বড় ঘরের বউ বলেই মনে হ'ল। এ মহিলা এখানে এলেন কোত্থেকে?

হঠাৎ ঝাউবনের ভেতর থেকে এক স্মার্ট যুবককে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি আমাদের দেখে দূর থেকেই বললেন—এই যে ভায়ারা, শুনছেন?

যাক। মহিলা তাহলে একা নন। আমরা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম।

যুবক আমাদের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন—আপনারা কী তারাই নাকী মশাই?

—কারা!

—মানে যারা নাকী ঐ ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে চান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারা কী সত্যিই ও বাড়িতে থাকবেন?

—তাছাড়া উপায় কী বলুন? এখানে সমুদ্রের ধারে ঐ বাড়িটা ছাড়া আর তো রাত্রিবাসের উপযোগী কিছুই দেখছি না। এখন গ্রীষ্মকাল। ইচ্ছে করলে আমরা এই ঝাউবনে বা বালুর চড়াতেই রাত কাটাতে পারতাম। তবে ভয়টাতো ভূতের নয়। ধরুন যদি সাপে কামড়ায়। সাপকে ভয় করি। তাই সাহসে ভর করে ঐ বাড়িতেই রাত কাটাব আমরা। তাছাড়া এও একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার। ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু ভূতকে তো চাক্ষুস দেখিনি। তাই জেদের বসে থাকছি ঐ বাড়িতে। ভূত যদি থাকেও এই সুযোগে তার দেখাটা পেয়ে যাবো।

যুবক উৎসাহিত হয়ে বললেন—তাহলে ভাই একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আজ রাত্রে ঐ বাড়িতে আমাদেরকেও আপনাদের সঙ্গী করে নেবেন?

—সেকী! ভয় করবে না আপনাদের?

—আমরা দুজনে হলে ভয় করত। কিন্তু আপনারা যখন আছেন তখন ভয় কী?

আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম—দেখুন যতই সাহসে ভর করে থাকি না কেন তবু আমরা তিনজন। আপনাদের পেয়ে আমাদেরও বুকে বল এলো। আর কিছু না হোক সারারাত গল্প করেও তো কাটাতে পারব।

যুবক অদূরে ঝিনুক কুড়োতে ব্যস্ত থাকা মহিলাকে ডাকলেন—স্বাতী, একবার শুনে যাও।

মহিলা এক কোঁচর ঝিনুক নিয়ে এগিয়ে এলেন।

—এঁরাই সেই তিনজন। যাঁরা ঐ বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছেন। আমি এঁদের রাজি করিয়েছি আমাদের সঙ্গে নিতে।

মহিলা খুব খুশি হয়ে বললেন—অজস্র ধন্যবাদ।

আমি বললাম—আপনার ভয় করবে না?

—না ভাই। অত আমার ভূতের ভয় নেই। বিশেষ করে আপনাদের মতো ভাইদের সঙ্গে পেলে আমি একরাত কেন দশরাত ও বাড়িতে কাটাতে পারি।

আমি বললাম—খুব ভালো হ'ল। আমরা অবশ্য কাল সকালেই কাঁথি চলে যাব। কিন্তু আমরাও যে ও-বাড়িত রাত্রিবাস করতে যাচ্ছি এ কথা কে বলল আপনাদের?

—সবাই বলছে। সবাই জেনে গেছে আপনারা আজ ঐ বাড়ির অতিথি।

এমন সময় বিশু এলো ছুটতে ছুটতে—আমি বলেছি গো।

অদূরে মালীবুড়োকেও দেখা গেল। মালীবুড়ো ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে কাছে এসে বলল—এই তো, এনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে দেখছি। তা ভালোই হয়েছে। দল বেঁধে থাকুন। তবে আমি এখনো বলছি যা করছেন ঠিক করছেন না।

সূর্য তখন অস্ত গেল।

মালীবুড়ো বলল—যান। একান্তই যাবেন যখন তখন এইবেলা চলে যান। আর দেরী করবেন না।

বিশু হঠাৎ বলল—বাবা আমি যাব ওদের সঙ্গে?

মালীবুড়ো লাফিয়ে উঠলো—খবরদার। ঐ বাড়িতে কেউ যায়? তুই যদি যাস তো আমার যেতে আপত্তি কী?

বিমান হঠাৎ ধরে বসল—আচ্ছা, কেন আপনারা অহেতুক ভয় পেয়ে এত ভীত

হচ্ছেন? কবে কী হয়েছে না হয়েছে তা কে জানে? আমরা এতজনে যখন আছি তখন ভয় কী? আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন না, আর আপনি ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন? আপনি নিজে একা থেকেই দেখুন না। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ভূত আছে কী নেই।

—কিন্তু বাবু, ঐ বাড়ির ভেতর থেকে গান বাজনার আওয়াজ আমি নিজে কানে শুনেছি। বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেছি। একটা কুকুর কী সাংঘাতিক রকমের চীৎকার করে ডেকে ওঠে। রাতের অন্ধকারে ঐ বাড়ির ভেতর আলো জ্বলে।

—সেই জন্যই তো বলছি আজ রাত্তিরে আমাদের সঙ্গে থেকে আপনি নিজের চোখেই দেখে আসবেন ওখানে কী হয় না হয়।

মালীবুড়ো একটু ভেবে বলল—আবার ঐ বাড়িতে আপনারা আমাদের ঢোকাবেন? ঠিক আছে। আপনারা যান। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে শোবার সময় যাবো।

—যাক। পথে এসেছেন দেখছি। ভূত থাকলেও ভূত আপনার কী করবেটা শুনি? গলা টিপে মেরে ফেলবে এই তো? যদি মেরেই ফেলে, তাতেই বা হয়েছেটা কী? বলি, বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে। আর কতদিন বাঁচবেন?

মালীবুড়ো বলল—যান। তাড়াতাড়ি যান। ফটকটা খোলা রাখবেন। আমরা সময় মতো যাবো।

মালীবুড়োকে বিদায় দিয়ে আমরা পাঁচজনে ঝাউবনের ভেতরে সেই পোড়ো বাড়িতে এসে ঢুকলাম। সঙ্গে টর্চ ছিলো। টর্চের আলোয় পথ দেখে দোতলায় উঠে পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়ে নিলাম আমরা। বাতি জ্বালালাম।

মহিলা তো ঘর দেখে দারুণ খুশি—অ্যাঁ! এমন চমৎকার ঘর। খাট বিছানা। রাজবাড়ি একটা। এরা বলে কিনা ভূতের বাড়ি! আমার তো মনে হচ্ছে সারাজীবন এইখানে থেকে যাই।

আমি বললাম—সত্যি! কি কুসংস্কার বলুন তো মানুষের?

এরপর আমরা গোটা বাড়িটাকে দাপিয়ে বেড়ালাম প্রায়। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে সবাই মিলে ছাদে উঠলাম। আঃ। কী শান্তি। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ।

আমি রাতের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম—ভূত বাবাজী, আমরা আজ রাত্রে আপনাদের অতিথি। আপনারা কোথায়?

মহিলা খিল খিল করে হেসে জোরে উত্তর দিলেন—সাড়া দেবো না।

আমি হাসতে হাসতেই চেঁচিয়ে বললাম—তা বললে কী হয়? বলুন না কোথায়?

মহিলা হেসে লুটোপুটি খেতে খেতেই উত্তর দিলেন—আমি এইখানে। আপনাদের

সামনে।

—আপনার নামটা আমাদের জানাবেন দয়া করে।

—হ্যাঁ। আমার নাম স্বাতী।

যুবকও অমনি হাসতে হাসতে বললেন—আমার নামটাও জেনে নিন। আমার নাম অরুণকুমার।

এবার আমরা সকলেই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমি বললাম—যাক। আজ রাত্রে আমরাই তাহলে ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করব।

যুবক অর্থাৎ অরুণকুমার বললেন—সত্যি, আপনাদের পেয়ে যে কী ভালো লাগছে আমাদের। নাহলে আমরা দুজনে তো হাফিয়ে উঠছিলাম।

স্বাতীদি বললেন—চলুন। বেশী রাত করে লাভ নেই। খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আমাদের টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি লুচি আর মাংস আছে।

—আমরাও মুড়ি মিষ্টি নিয়ে এসেছি।

স্বাতীদি ঠোঁট উল্টে বললেন—এ রাম। মুড়ি কে খাবে? মুড়ি আমি খেতে পারি না। তার চেয়ে মিষ্টিগুলো বরং কাজে লাগান। আপনারা বসুন। আমি টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে আসছি।

আমি বললাম—না না, স্বাতীদি। একলা যাবেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান। প্রশান্ত তুই বরং যা।

—কোন দরকার নেই। অত ভূতের ভয় করি না আমি। তা বলছিলাম কী আপনাদের সঙ্গে খাবার জল আছে?

—আছে। আমাদের ঘরে দেওয়ালের হুকে ওয়াটার বটলটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।

স্বাতীদি সিঁড়ির দরজার কাছে যেতেই আমি আবার বাধা দিলাম—শুনুন, একলা যাবেন না কিন্তু।

স্বাতীদি হেসে বললেন—আমি একলাই যাবো।

আমি অরুণবাবুকে বললাম—দাদা, ওনার কথা শুনবেন না। আপনি বরং ওনার সঙ্গে যান। বলা যায় না তো, যদি কিছু দেখে ভয়-টয় পান।

অরুণবাবু বললেন—ঠিক। বলে স্বাতীদির সঙ্গে গেলেন।

একটু পরেই সব কিছু নিয়ে ওপরে উঠে এলেন ওরা। তারপর ছাদে বসে বেশ জুত করে লুচি মাংস আর রসগোল্লা খেলাম। তারপর জলটল খেয়ে ঘড়ি দেখলাম, রাত বারোটা।

স্বাতীদি বললেন—আর ছাদে নয়। এবার নিচে চলুন। ওঃ কী আনন্দের দিন আজ। আমার চোখে তো একটুও ঘুম আসছে না। চলুন, এবার আমরাই সারারাত

ধরে গান গেয়ে চেঁচিয়ে হল্লা করে ভূতের উপদ্রব করি। এমন উপদ্রব করব যে ভূত বলে যদি কিছু থাকেও, তারাও ভয়ে পালাবে।

বিমান বলল—ঠিক কথা।

আমরা যেই উঠতে যাবো অমনি কোথা থেকে একটা কেঁদো কুকুর এসে হাজির হ'ল সেখানে।

স্বাতীদি লাফিয়ে উঠলেন—ওমা! একি একি! এখানে কুকুর এলো কোথা থেকে?

কুকুরটা তখন স্বাতীদির পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

প্রশান্ত বলল—এই হচ্ছে তাহলে পোড়ো বাড়ির ভূত। রাত্রিবেলা চেঁচাবে আর লোকে ভাববে ভূতে ডাকছে।

কুকুরটা এবার স্বাতীদিকে ছেড়ে আমাদের এঁটো পাতাগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর কড়মড় করে মাংসের হাড়গুলো খেতে লাগল চিবিয়ে। আমরা কুকুরটাকে ছাদে রেখেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে এলাম।

নেমে এসেই দেখি আমাদের ঘরের পাশে মালী বুড়ো আর বিশু চুপচাপ বসে আছে।

স্বাতীদি বললেন—এই তোমরা এখানে কেন? যাও নিচের ঘরে যাও। এখানে আমরা শোবো, হল্লা করবো। সারারাত ঘুমোতে পারবে না তোমরা।

আমি মালীবুড়োকে বললাম—হ্যাঁ, স্বাতীদি ঠিকই বলেছেন। তোমরা নিচের ঘরেই যাও। নইলে আমাদের দাপাদাপিতে তোমরা অস্থির হয়ে উঠবে। তারপর বিশুকে বললাম—কিরে ব্যাটা, কেমন বুঝছিস?

বিশু হেসে বলল—আপনারা শহরের লোক। সাহস আছে আপনাদের।

—যা এবার নিচের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোগে যা। ভয় পেলে ডাকিস।

মালীবুড়ো হঠাৎ বলল—জলসাঘরের দরজা খুলল কে?

—আমরা খুলেছি।

ওটা এখুনি বন্ধ করে দিন।

স্বাতীদি বললেন—থাক না খোলা। আজ রাত্রে আমরাই যদি এখানে গান বাজনা করি?

মালীবুড়ো স্বাতীদির কথার উত্তর না দিয়ে বলল—এই ঘর অভিশপ্ত। এ ঘরের দরজা খুলবেন না। কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে চলে যান এখান থেকে।

আমি বললাম—না। আজ আর কোন ঘরই বন্ধ নয়। সব ঘরের দরজাই খুলে দেবো আমরা। এই বাড়ির অভিশাপ আজ আমরা কাটাবোই।

—আপনাদের এখানে থাকতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। ঠিক আছে,

যা ভালো বোঝেন করুন। বলে মালীবুড়ো বিশুকে নিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে কেউ আর শোবার ঘরে না ঢুকে জলসাঘরেই ঢুকলাম। বিমান রসিকতা করে বলল—এই তাহলে জলসাঘর। এই ঘরেই এক সময় নাচ গানের ফোয়ারা ছুটতো। তা যারা সে সব করতো তারা কোথায় লুকোল বাবারা? শোনাও না একটু তোমাদের গান বাজনা?

স্বাতীদি বললেন—হ্যাঁ, ঠিক কথা। এই পোড়ো বাড়িতে আমরা যাদের অতিথি হয়ে এসেছি তারা কেন আমাদের সঙ্গে এই রকম করছে? যা হোক কিছু শোনানো উচিৎ।

প্রশান্ত বলল—যদি অশরীরী কেউ থাকো এই বাড়িতে তাহলে আমি এক-দুই-তিন বলছি। তিন বলার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেবে। নইলে জানবো এখানে কেউ নেই। সব ভাঁওতা। বলেই প্রশান্ত হাঁক দিল—এক-দুই-তিন।

কিন্তু না। কোন সাড়া শব্দই কোথাও থেকে এলো না।

প্রশান্ত বলল—তাহলে আমরাই শুরু করি। আজ রাতে জলসাঘর আবার ভরে উঠুক গানে গানে।

একটা বাংলা সিনেমার গান দিয়ে শুরু হ'ল। প্রথম লাইনটা প্রশান্ত ধরতেই সুরে সুরে মিলিয়ে আমি কণ্ঠ দিলাম। তারপর বিমান। বিমানের দেখাদেখি স্বাতীদিও সুরেলা গলায় গান ধরল। অরুণবাবুও চুপ করে রইলেন না। সব ক'টা কণ্ঠ একত্রিত হয়ে জলসাঘর ভরিয়ে তুলল একেবারে।

গান শেষ হলে আমরা হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়লাম।

রাত তখন একটা। প্রশান্ত বলল—আর কি! এবার শুয়ে পড়া যাক।

স্বাতীদি অবাক হয়ে বললেন—ওমা, শোবে কি! শোবার পরে যদি চুপি চুপি ভূতেরা আসে? আজ কোন শোয়া-টোয়া নয়। আজ শুধু রাত জেগে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করা।

বিমান বলল—ঠিক। শুলেই গোলমাল। তার চেয়ে আমি বলি কি স্বাতীদি আপনি একটা গান ধরুন। খুব ভালো গলা আপনার।

স্বাতীদি বললেন—একা একা শুধু গলায় কি গান হয়? বেশ হোত যদি একটা হারমোনিয়াম থাকত।

অরুণবাবু বললেন—ঐ তো ঘরের কোণে একটা হারমোনিয়াম রয়েছে দেখছি।

স্বাতীদি বললেন—কবেকার পুরনো। ওতে আওয়াজ বেরোবে? বলে হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে রিডগুলো টিপে দেখতেই সুরে সুরে ঘর ভরে গেল। হঠাৎ বিছে কামড়ালে যেমন হয় ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে উঠলেন স্বাতীদি—একি একি! আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে কেন? আমার যেন কিরকম হচ্ছে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।

অরুণবাবু উঠে গিয়ে স্বাতীদিকে ধরলেন—না না ও কিছু নয়। কি কষ্ট হচ্ছে? আসলে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ। রাত জেগে হৈ-হল্লা করছ। একটু শুয়ে থাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বললেই কি হয়? স্বাতীদির গলা থেকে একটা চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো—আ-আ-আঃ।

সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভে গেল। গোটা ঘর ভরে গেল অন্ধকারে। বাইরে চাঁপা গাছের ডালে একটা নিশাচর পাখি ডাকল। হঠাৎ ফুলের গন্ধে ভরা এক ঝলক মিষ্টি বাতাস বয়ে গেল আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে।

পরক্ষণেই আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

কিন্তু একি! একি দেখছি আমরা!

দেখলাম জলসাঘরের মাঝখানে শলমা চুমকির পোশাক পরে রাজনর্তকীর সাজে সজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বাতীদি। আমাদের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনের আলোর বন্যা বইছে। একপাশে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজপোশাক পরে সুরাপাত্র হাতে অরুণকুমার। যেন রূপালি পর্দায় কোন ছায়াছবির দৃশ্য দেখছি আমরা! স্বাতীদি আমাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে হাতে তাল দিলেন—তা থেই তা তা থেই। অমনি নেপথ্যে এক সুরেলা হারমোনিয়াম দ্রুত লয়ে বেজে উঠল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ওস্তাদি গানের সঙ্গে বেজে উঠল তবলার লহরা। তারপর ত্রিতাল ঠেকার তালে তালে শুরু হ'ল নাচের ঘূর্ণি।

আমরা বিস্মিত বিমূঢ় এবং স্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নাচ গানের মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠলেন অরুণকুমার—একি! তুমি! তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে? বন্ধ করো এই গান। নাচ থামাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি ঘরের বউ হয়ে...।

স্বাতীদি বললেন—না! শুনতেই হবে তোমাকে। আজ আমি সারারাত ধরে নাচব গাইব। আমাকে নাচতে দাও। আমাকে গাইতে দাও।

—খবরদার বলছি। আমার কথা অমান্য করার পরিণাম কি তা তুমি জান?

—জানি। তুমি আমাকে গুলি করে মারবে, এই তো? মারো—মারো আমাকে। দেখব তোমার বন্দুকে কত গুলি আছে। এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অরুণকুমার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দেওয়ালে আটকানো বন্দুকটা নিয়ে এসেই উঁচিয়ে ধরলেন স্বাতীদির দিকে।

আমরা চীৎকার করে উঠলাম—আরে আরে একি করছেন? আপনি কি সত্যি

সত্যিই গুলি করে মারবেন নাকি অরুণবাবু!

—সরে যাও। সরে যাও তোমরা। ওকে আমি শেষ করে দেবো।

ততক্ষণে বন্দুকের গুলি ছুটে গেছে।

স্বাতীদির বুক রক্তে ভেসে গেল। স্বাতীদি—আ-আ-আঃ করে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

বন্দুকের শব্দ শোনা মাত্র ছাদের ওপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। হঠাৎ দেখা গেল কুকুরটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাতীদির ওপর। এ কি করে সম্ভব। এ তো সেই কুকুরটা। যেটাকে আমরা ছাদে রেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে এসেছি।

আবার গর্জে উঠল বন্দুক।

কুকুরটা আঁ-আঁ-আঁউ করে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে স্থির হয়ে গেল।

অরুণকুমার হঠাৎ স্বাতীদির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—একি! একি করলাম আমি। আমি কী সত্যিই মেরে ফেললাম তোমাকে? একি! স্বাতী তুমি কথা বলছ না কেন?

এইসব চেঁচামেচি আর বন্দুকের শব্দ শুনে মালীবুড়ো ও বিশু ছুটে এসেছে ওপরে। ভয়ে বিবর্ণ মুখে দরজার এক পাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মেঝেয় পড়ে থাকা রক্তাক্ত স্বাতীদির দিকে চেয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলো যেন।

অরুণকুমার চোখ লাল করে বললেন—তোরা এখানে কেন? কী চাই তোদের? মজা দেখতে এসেছিস?

আতঙ্কে থম থম করছে ওদের মুখ। মালীবুড়ো কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—একি করলেন দাদাবাবু! আপনি সত্যি সত্যিই মেরে ফেললেন বৌদিমণিকে?

—স্টপ ইয়োর ওয়ার্ড। ন্যুইসেন্স। তোদেরকেও আমি গুলি করে মারব। এই বাড়ির একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখব না আমি। যেমন করে স্বাতীকে মেরেছি, যেমন করে কুকুরটাকে মেরেছি, ঠিক সেই ভাবেই তোদেরকেও মারব।

মালীবুড়ো আর বিশু তখন চোখের পলকে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

অরুণকুমার বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করলেন ওদের—কোথায় পালাবি বাছাধন?

আমরা বিস্মিত বিমূঢ়। কী যে হচ্ছে, কেন হচ্ছে; মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না তার। তবুও আমরা ছুটলাম ওদের পিছু পিছু। যে করেই হোক এই হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে।

বিমান বলল—কী হচ্ছে অরুণবাবু? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনি কী জানেন খেয়ালের বশে কী কাণ্ড করছেন আপনি? আমরা সবাই যে একধার থেকে অ্যারেস্ট হয়ে যাবো।

অরুণকুমার তখন বারান্দার কাছে ছুটে গেছেন। বিশু এক লাফে গেট পার হয়ে গেল। কিন্তু মালীবুড়ো পারল না। যেই না গেটের কাছে আসা অমনি ওপর থেকে শব্দ হ'ল 'গুড়ুম'। মালীবুড়োর দেহটা ছিটকে পড়ল একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের কাছে। কে জানে হয়তো এই গাছটা মালীবুড়োই একদিন যত্ন করে বসিয়েছিলো নিজের হাতে। অরুণকুমার এবার তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। আমরাও নামলাম ওনার পিছু পিছু।

অরুণকুমার গেট পেরিয়ে ছুটে চললেন ঝাউবনের দিকে।

আমরাও ছুটছি।

ঐ তো বিশু, ও ছুটছে প্রাণের দায়ে।

ওকে বাঁচাতেই হবে।

অরুণকুমারের বন্দুক আবার গর্জে উঠল।

অসহায় বিশুর কাতর আর্তনাদ শোনা গেল—আ-আ-আঃ।

অরুণবাবু ছুটে বিশুর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একবার দেখলেন ওকে। তারপর ওর বুকে একটা পা রেখে অল্প একটু চাপ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—শেষ হয়ে গেছে। আর একটিই মাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে। সেটা আমি নিজের জন্য রাখলাম। আপনারা ছেলেমানুষ। তার ওপর আমাদের অতিথি। সেজন্যই কিছু বললাম না। তবে ভবিষ্যতে এই বাড়িতে আর কখনো রাত্রিবাস করবার চেষ্টা করবেন না। যান চলে যান।

আমরা অতিকষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। ভোরবেলা গ্রামে পৌঁছে শুনলাম গতকাল আমরা বিশু, মালীবুড়ো, স্বাতীলেখা ও অরুণকুমার নামে যাদের দেখেছি তারা কেউই জীবিত নয়। ১৯৩০ সালের এক ভয়ঙ্কর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে ওরা নাকি ঐ ভাবেই মারা গিয়েছিল।
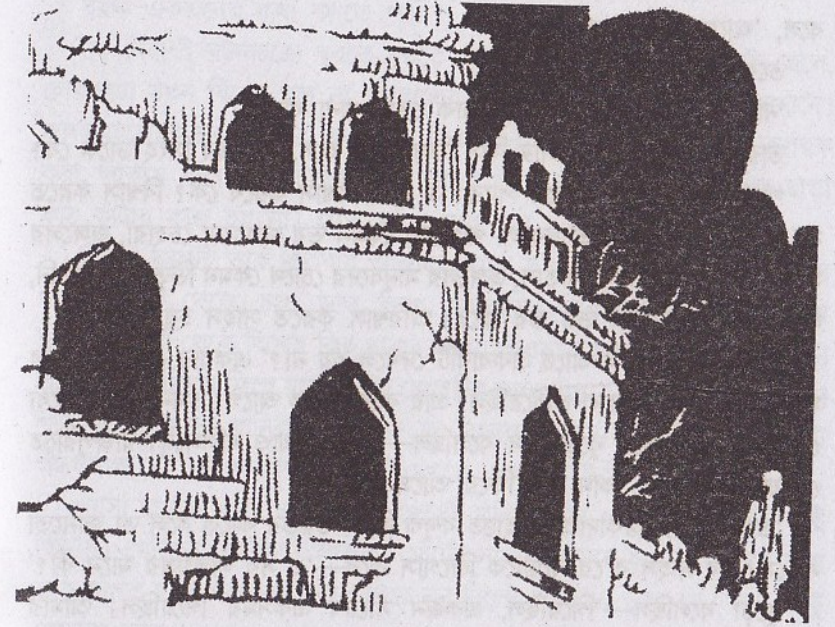
রাজপুরীর রহস্য

মহাশ্বেতা দেবী

এক হারিয়ে যাওয়া দেশের নাম-না-জানা রাজা, আর তাঁর হারিয়ে যাওয়া রাজপুরী।

এখন পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে অনেক ঠাহর করে দেখলেও কিছুই চোখে পড়ে না। দক্ষিণ দিকে চাইলে চোখে পড়ে দুধের মতো সাদা নর্মদার জল আর উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে শুধুই শ্যাওলাঝোলা বড় বন পাথর, বনে ঢাকা পাহাড় আর ঘন নিবিড় জঙ্গল।

সেখানে বর্ষায় আর শরতে বুনো ছাতিম ফুল ফোটে, ময়ূর নেচে বেড়ায়, হরিণ এসে শ্যাওলা খায়। জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছে সব ছোট ছোট গাঁ। সেখানকার মানুষেরা এসে খট্-খট্ ক'রে কাঠ কাটে, মাটি খুঁড়ে এই মোটা-মোটা কন্দ না

শেকড়—কী সব তুলে নিয়ে পুড়িয়ে খায়।

তাদের যদি শুধোও, এই অজগর জঙ্গলে আবার রাজপুরী কোথায় রে? তারা বলে, 'আছে, ঐখানে আছে।'

তবে দেখা যায় না কেন?

'নাই বা গেল দেখা, সিংহের ডাক তো শোনা যায়।'

তারা ভয় পেয়ে নীচু গলায় ফিস ফিস ক'রে বলে, পাথরের সিংহ ডাকে যে?

পাথরের সিংহ কি ডাকতে পারে? এ কথা বিশ্বাস করবে কে? বিশ্বাস করতে মন চায় না, আবার শ্যাওলাঝোলা পাথরের কেমন ভয় জাগানো চেহারা, জঙ্গলের মধ্যে কেমন থমকে থাকা বাতাস, জঙ্গলের মানুষদের চোখে কেমন ভিতু-ভিতু চাউনি, সব শুদ্ধ কেমন যেন ভয় ভয় করে। অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

'জঙ্গলের মধ্যে কী আছে একবারটি দেখলে হয় না?' একবার একজন জঙ্গল মহলের ঠিকাদার এ কথা শুধিয়েছিল। প্রায় বছর দশেক আগে। তখন গাঁয়ের মধ্যে যে লোকটা সবচেয়ে বুড়ো, সে বলেছিল—'এমন কথাও বলিসনে। রাজপুরীতে যে যায়, সে আর কোন দিন ফিরে আসে না।'

'তার মানে?' ঠিকাদারটির হাতে বন্দুক ছিল। ভয়ডর কাকে বলে তা জানতো না সে। খুব সাহস ক'রে বুড়োকে জিগ্যেস করে—'এ সব গালগপ্পর মানে কী?'

বুড়ো বলেছিল—'গিয়েছিল, একজন সায়েব একসময় গিয়েছিল। আমার নাতিটাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পাহাড়ে উঠেছিল।'

বুড়ো চুপ ক'রে কী যেন ভেবেছিল। ঠিকাদারটি ভারি অসোয়াস্তি অনুভব করে। বলে—'তারপর? কী দেখল তারা?'

বুড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—'তারা কি আর ফিরে এসেছিল রে? যেদিন তারা গেল সেদিন রাতে আমরা সিংহের ডাক শুনলাম। পর দিন যখন দল বেঁধে খুঁজতে গেলাম, দেখি তাদের চিহ্নও নেই। খালি সিংহটার পায়ের কাছে খানিকটা রক্ত পড়ে আছে।'

তারপর একটু গলা নামিয়ে বলেছিল, 'কেউ দেখতে পায় কেউ দেখে না।'

'তার মানে?

'বলব না। তুই বুঝবি না।'

সে বুড়োও এখন নেই আর এ সব কথা শোনবার পর ঠিকাদারটি তবু সাহস ক'রে গিয়েছিল কিনা সে কথাও কেউ বলতে পারে না।

এই গভীর জঙ্গলে সিংহ আছে কি না খোঁজ করবার জন্যে মাঝে মাঝে শিকারী-টিকারী এসেছে। গল্পগাছা শুনে উৎসাহভরে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছে তারা। কোথায় যে সেই রাজপুরী আর কোথায় যে সেই পাথরের সিংহ

তা তাদের চোখেই পড়েনি।

বরঞ্চ একজনের কথা বলতে পারি।

সে নেহাৎই ঘটনাচক্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে। এই বাংলাদেশেরই ছেলে, লেখাপড়া যখন বিশেষ হল না, খেয়ালের মাথায় দুম্ ক'রে চলে এল এখানে। জঙ্গলমহলেরই চাকরি। ওর কাজ হ'ল ঠিকাদাররা যখন গাছ কাটে তার তদারক করা, লুকিয়ে যারা হরিণ-টরিণ মারে তাদের উপর নজর রাখা। শীতকাল ছাড়া কাঠ কাটার কাজ হয় না। হাতে থাকে সারাবছর ধরে অফুরন্ত সময়।

গাঁয়ের কাছেই তার থাকবার আস্তানা। মাসে দু'বার ক'রে একটা লরী আসে মহকুমা শহর থেকে। চাল, ডাল, লবণ, কেরোসিন আর যা-যা দরকার নামিয়ে দিয়ে যায়। গাঁ থেকে বিশেষ কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় না। শুধু যেদিন লরীটা এসে ধোঁয়া উড়িয়ে ফিরে যায় সেদিন ছেলেটির কাছে দাঁড়ায় এসে লোকগুলি, কাঁচা শালপাতায় মোড়া খানিকটা খরগোস বা সজারুর মাংস, কাঁচা দুধের ধোঁয়াটে গন্ধওয়ালা দই বা পানফলের মতন দেখতে একরকম টক ফল নিয়ে।

পয়সা চায় না ওরা, একটু লবণ পেলেই খুশি। নুনটা ওদের কাছে ভারী দামী জিনিস। এমনিতে ওরা ভারি লাজুক। মোটেই সামনে আসতে চায় না। ওদের সঙ্গে ভাব করতে হলে একঢেলা শক্ত পাথুরে নুন দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। বরং একটু গল্প-সল্প করে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে গল্প করে তো আর সময় কাটে না তাই ছেলেটি মাঝে-মাঝে বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে বেরোয়। পাখির অভাব নেই, যত ইচ্ছে মার আর খাও।

শিকার খুঁজতে খুঁজতে একদিন ঐ পাহাড়ে উঠবার গোপন একটি পথ দেখতে পায়। পাথরের উপর পাথর বসিয়ে কারা যেন সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে।

সেই পথ বেয়ে উপরে উঠতে অনেক সময় লাগে ছেলেটির। তারপর অবাক হয়ে দেখে কখন যেন সে অজান্তে একেবারে উপরে উঠে গেছে। অনেক অনেক নীচে ঐ জঙ্গল, গ্রাম আর ঐ বুঝি নদীর জল দেখা যায়।

সেখানেই সে কালো পাথরে গড়া একটা পাঁচিল দেখে। কিন্তু একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে বোঝে চারিদিক যেন বড্ড বেশী চুপ-চাপ। এমন ফাঁকা জায়গা, তবু বাতাস লেগে গাছের পাতা নড়ছে না। এতো বুনো ফলের ছড়াছড়ি তবু যেন একটি পাখিও ডাকছে না। ভয় পেয়ে, কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগে ছেলেটি তাড়াতাড়ি নেমে আসে।

নেমে আসার সময় সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। কিছুতেই আর নেমে যাবার পথ খুঁজে পায় না ছেলেটি। যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে পাথর। উঁকি দিয়ে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। পাথরের নীচে শুধু ফাঁকা হাওয়া। খাড়া নেমে গেছে পাহাড়।

এই উপর থেকে নীচে পড়লে কি ও বাঁচবে?

প্রায় তিনঘন্টা চেষ্টা করার পর গলদঘর্ম হয়ে ছেলেটি ভাবে এবার বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে গ্রামের লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। হঠাৎ দেখতে পায়—এই তো, তার পায়ের কাছেই সিঁড়ি। এইখানেই সে দাঁড়িয়েছিল অথচ পথ দেখতে পায়নি? তাও কি কখনো হয়! ছেলেটি হলফ ক'রে বলতে পারে এই লতা ঝোপটার পাশে দাঁড়িয়ে সে একটু আগেও কপালের ঘাম মুছছিল। কৈ তখন তো এ সিঁড়ি দেখেনি। এমন ছোট ছোট নীলফুল ফোটা লতাঝোপও আর দেখেনি বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল, তা বেশ মনে আছে। অথচ সিঁড়িটা তখন চোখে পড়েনি? সবশুদ্ধ কেমন যেন একটা অবিশ্বাস্য অবস্থা। যা হোক খানিকটা ভয় পেয়েই ছেলেটি কোনমতে সিঁড়ি ধরে নেমে আসে।

সেই যে নেমে এল, তারপর আরো কতবার সে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সিঁড়িটা খুঁজেছে। কোনদিন খুঁজে পায়নি। তারপর তার যে কী হ'ল, রাত নেই, দিন নেই, শুধু পথ খুঁজে বেড়ায়। সময়ে নাওয়া খাওয়া নেই, ধূলোমাখা রুক্ষ চুল, সব সময় জঙ্গলে ঘুরছে তো ঘুরছেই!

যতদূর জানা যায়, একদিন নাকি ছেলেটিকে সেই জঙ্গলেই পাওয়া যায়, অজ্ঞান অবস্থায়, হাত-পা কেটেকুটে একশা।

ছেলেটি বলেছিল হঠাৎ নাকি সে দেখতে পেল সেই পাথরের সিঁড়ি আর সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে একটি ছোট ছেলে। তার পেছনে উঠতে উঠতে সে নাকি দেখতে পেল জংলা লতায় ঢাকা একটা মস্ত পাথরের সিংহ। ছোট ছেলেটি যেমনি কাছে গেল অমনি পাথরের সিংহটা ডেকে ওঠে। তাই শুনেই নাকি ও অজ্ঞান হয়ে যায়। আর কিছু মনে নেই।

যে লরী মাঝে মাঝে আসত—তাতেই ওকে নিয়ে গেল ওরা। লরীতে চড়ে যে ভদ্রলোক পরে এসে ছেলেটির জামা-কাপড় নিয়ে গেলেন তাঁকে গাঁয়ের বুড়োটি শুধাল—'হ্যাঁ রে, ছেলেটাকে তবে পাথরের সিংহই মারলে?'

ভদ্রলোক বলেন—'তার তো ভারি জ্বরবিকার হয়েছিল। সে মারা গেছে তা তোরা জানালি কেমন করে?'

বুড়োটি বলল—'কাল সন্ধ্যেবেলা যে আমরা সিংহের ডাক শুনেছি।'

ভদ্রলোকটি খুব হাসলেন। বললেন,—'তোরা কি পাগল হয়েছিস? সিংহ এ তল্লাটে নেই। জানিস কত যত্ন ক'রে এখন এক একটা সিংহ পোষা হয়?'

বুড়োটি হাসল—'তুই আর কতটুকু বা জানবি!'

'সিংহের ডাক তোরা চিনবি কী ক'রে! তোরা কি সিংহের গর্জন কেমন হয় তা জানিস?'

'জানি বই কি! অমন মেঘের মতো ডাক!'

ওদের চোখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক কেমন অস্বস্তি অনুভব করলেন। আর কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন।

বুড়োটি বলল—'দেখিস, এই লোকটি আবার আসবে।'

'কেন?' সবাই এক সঙ্গে শুধাল।

বুড়ো সামনের অর্জুন গাছের তলায় একখানা চ্যাটালো পাথরে বসল। বেশ আরাম ক'রে হেলান দিয়ে ব'সে বলল—'আমি জানি যে। আমার বয়সটা কি কম হ'ল? এই পাথরটার মতো আমার বয়স, এই গাছটার মতো আমি বুড়ো। আমি জানি, মাঝে-মাঝে এক একজন আসবে, আর ঐ সিঁড়ি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে।'

'খুঁজে পাবে?'

'হয়তো পাবে। রাজার অত অত ধনরত্ন, গুহার ভেতরে অত অত সোনা, একদিন একজন বিদেশী এসে ঠিক তার সন্ধান পেয়ে যাবে।'

'কেন বিদেশী কেন?'

'ওরে এইটি হ'ল আদ্যিকালের কথা। আমাকে বলেছিল আমার বাপ, আবার তাকে বলেছিল তার বাপ।'

'আমরা খোঁজ পাব না সে ধনরত্নের?'

'না।'

'কেন?'

'আমরা যে পাপ করেছিলাম রে। আমাদের লোভেই নাকি রাজপুরীতে সর্বনাশ হয়েছিল।'

'তা কখনো হয়?'

'কে জানে! আমিই কি সব জানি? এই পাথরটার মতো আমার বয়স, এই গাছটার মতো আমি বুড়ো হয়েছি। আমার বাবা বুঝি এই মন্দিরটার চেয়েও বুড়ো ছিল রে, তার বাবা না জানি কত বুড়ো ছিল। আমাদের তিন জনের বয়স মেলালে সে কত হবে রে, মাথার চুলের মতো এত-এত বয়স, বটের পাতার মতো এত-এত বয়স!'

'তোর বয়সের সঙ্গে সে ধনরত্নের সম্পর্ক কি!'

'আছে রে, সে একটা কথা আছে। এতদিন ধ'রে আমরা জেনে আসছি আমাদের মনে পাপ লেগেছিল। তাই অমন সোনার রাজত্ব ছারখার হয়ে গেল। এটি হ'ল আদ্যিকালের কথা। বল, সে কথা মিথ্যে হতে পারে?'

'না, বুড়ো না।'

'আমাদের লোভ করতে নেই, পাপ করতে নেই। দেখ, দেবতা আমাদের এমন জঙ্গল দিয়েছে, কাঠ কুড়িয়ে রান্না করি, কাঠ দিয়ে লতাপাতা দিয়ে ঘর বাঁধি। পাতা জ্বেলে গা গরম করি শীতের সময়, আবার কত ফলমূল, কত ওষুধের গাছ পাই। শিকার ক'রে পশু পাখির মাংস খাই, আবার দেখ, কাঠ পুড়িয়ে কয়লা ক'রে বেচি। আমাদের লোভে দরকার কি?'

'হ্যাঁ বুড়ো, তা ঠিক।'

আবার অনেকদিন কাটল। একদিন একটি লোক এল। অনেক বয়স হয়ে গেছে তার, মুখের রং তামাটে। দেখে বুঝতে কষ্ট হয়, এ সেই লোকটি, যার সম্পর্কে বুড়ো বলেছিল—'ও ঠিক একদিন আসবে।'

লোকটি এসে যখন বুড়োর সামনে দাঁড়াল, বুড়ো বলল—'তুই এত দেরী ক'রে এলি কেন রে?'

লোকটি অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখল। তারপর বলল—'তখন জানতাম না, এখন জেনেছি এখানে যে রাজার বাড়ি আছে, তা আমারই পূর্বপুরুষের।'

'তোরাই তবে এখানে একদিন আমাদের রাজা ছিলি?'

'হ্যাঁ, বুড়ো।'

'এখন আমাদের কাছে থাকবি?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ, মিথ্যে কথা বলছিস না তো?'

'না।'

বুড়োটি নিঃশ্বাস ফেলল। বলল—দেখ, পথ যদি খুঁজে পাস! ধনরত্নের খবর তো একদিন এক বিদেশীই পাবে, এটি হ'ল আদ্যিকালের কথা। তবে হ্যাঁ, মিছে ছলনা করিস না। তবে তুই-ই শাস্তি পাবি।'

লতা দিয়ে বোনা নীচু খাটিয়ায় পাতার বিছানায় পাশ ফিরে শুতে শুতে বুড়ো বলল—'গাঁয়ে একটা ঘর তোকে ওরা বানিয়ে দেবে। অসুবিধে হবে না তোর।'

লোকটি মনে মনে হাসল। অসুবিধের জন্যে ও ভারী চিন্তিত কি না! এই আধা-জঙ্গলীগুলির ভরসায় ও এসেছে না কি! সব আছে তার। ছোট জীপ গাড়ি, তাঁবু, স্টোভ, কেরোসিনের টিন, চাল-ডাল, তেল, লবণ, টর্চ। ওষুধ-বিষুধ, বন্দুক, গুলি, ক্যামেরা। গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। চুপ-চাপ। নিরিবিলি, একদিন সে ঐ পাহাড়ের উপরে কী আছে না আছে সব রহস্য ভেদ ক'রে ফেলবে।

লোভ তারও আছে। অতি ভয়ঙ্কর লোভ। তবে ধনরত্ন, রূপোর টাকা, সোনার মোহরের লোভ নয়। জানবার লোভ, অজানার বুকের সব রহস্য ভেদ করার লোভ।

কিন্তু পথ আর খুঁজে পায় না।

ঘুরে ঘুরে বৃথা পরিশ্রমে লোকটি যখন হয়রান হয়ে পড়েছে তখন একদিন সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হয়রান হয়ে লোকটি বসে পড়েছিল একটা পাথরের ছায়ায়। বসে বসে কখন কে জানে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশ আঁধার, টিপটিপে বৃষ্টি। তখন যদিও নেহাৎই ঝিরঝিরে, কখন ঝম-ঝমিয়ে নামবে তা বলা যায় না। তা নামবে নামুক, তা বলে ত এই জঙ্গলে বসে রাত কাটানো চলে না! পাঁচ মাইল হেঁটে ফিরতেই হবে যেমন ক'রে হোক।

ঠিক সেই সময়ে লোকটি দেখল সন্ন্যাসীকে। লতা দিয়ে বাঁধা এক বোঝা ডাল-পালা টানতে টানতে তিনি দণ্ডী ঠুকে উপরে উঠে যাচ্ছেন। আশ্চর্য, এই ত' সিঁড়ি! দিনের আলোয় চোখে পড়েনি বটে, তবে এখন আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। লোকটি আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল—ঐ উনি উঠে যাচ্ছেন, এই পাথরের সিঁড়ি যেন কত দিনের চেনা ওঁর, ঐ ওঁকে আর দেখা যায় না, 'আবার বুঝি হারিয়ে ফেললাম'—ভয় পেয়ে লোকটি ছুটতে ছুটতে সিঁড়িতে উঠে ওঁকে ডাকল।

অনেক রাত হয়েছে। পুরনো একটা ঘর, ঢোকবার মুখটি জঙ্গলে ঢাকা, অথচ ভিতরটা পরিষ্কার। চামচিকের গন্ধে বাতাসটা ভ্যাপসা হ'য়ে ছিল, কাঠকুটোর আগুন জ্বালাবার পর এখন যেন নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে। মাথার উপর চাইলে দেখা যায় অনেক উপরে পাথরের গায়ে কী সব লতাপাতা খোদাই করা। ভিতর দিকে চাইতে ভয় ভয় করে। ভিতরটা যেন অনেকটা গুহার মতন।

'ওখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে সুড়ঙ্গে।' সন্ন্যাসীটি বললেন।

'সুড়ঙ্গ! সুড়ঙ্গ কিসের?'

'বাইরে যাবার।'

'সাপখোপে বোঝাই নিশ্চয়।'

'না-না। এই পাহাড়ের উপর কোন জ্যান্ত প্রাণী দেখেছ?'

লোকটি মাথা নাড়ল। ধুনীতে আর ক'খানা কাঠ ফেলে সন্ন্যাসী বললেন—'দেখতে পাবে না। পাখি, সাপ, পোকামাকড় কিছু থাকতে পারে না এখানে।'

একটু থেমে চোখ তুলে বললেন—'অভিশপ্ত জায়গা।'

লোকটির মনে হ'ল সন্ন্যাসী বয়সে তরুণ হ'লে কি হয়, চোখের দৃষ্টি যেন বড্ড প্রাচীন, বড়ই ক্লান্ত।

'এখন এ ঘর দেখে বুঝবে না, একসময়ে এটি কত যত্ন ক'রে রাখা হ'ত। ঐ দেওয়ালে লোহার আংটাগুলো বোধ হয় এখনো আছে। ওতে বড় বড় ধনুক টাঙানো থাকত।'

লোকটির দিকে একটা কম্বল ঠেলে দিয়ে বললেন—'তখন রাজামশায় বেঁচে আছেন। রাজপুরী আর ছোট রাজধানী বেশ জমজমাট। নীচের গাঁ গুলোর অবস্থাও এমন হতশ্রী নয়। এই এতটুকু রাজত্ব হ'লে কি হয় সবাই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু একদিন শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে...'

সন্ন্যাসী হাত তুলে সামনে দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'ঐ পাথরের সিংহটা ডাকল!'

ভয়ানক চমকে ওঠে লোকটি। ঢোকবার সময়ে স্পষ্ট দেখতে পেল গুহার মুখ লতাপাতায় ঢাকা। এখন দেখছে সব পরিষ্কার।

গুহার মুখে শ্বেত-আকন্দ গাছের আড়ালে মস্ত একটা পাথরের থাম। তার উপর থাবা পেতে বসে আছে সিংহটা। একসময়ে বোধহয় সাদা। পাথর দিয়ে গড়া হয়েছিল, রোদে পুড়ে জলে ভিজে এখন সবজে দেখাচ্ছে।

কিন্তু আগে চোখে পড়েনি কেন? এতবড় সিংহমূর্তিটা যদি ঢোকবার পথেই থাকবে তাহ'লে তো আগেই চোখে পড়বে। লোকটির ইচ্ছে হ'ল সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা কইতে পারছে না। চোখের সামনে একটা ধুনীর আগুন দশখানা হয়ে চমকাচ্ছে। কম্বলটা জড়িয়ে সে গুটিসুটি হয়ে বসল।

—'দেখুন, আমার বোধহয় জ্বর এসেছে—'

সন্ন্যাসী তার কথা শুনলেন না। একবার তাকালেন না পর্যন্ত। কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল একটা পাথরের বাটিতে ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন—'এক শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে—!

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে সত্যিই এখানে একটি রাজ্য ছিল। শোনা যায় মহাভারতের যুদ্ধে যখন কৌরবরা হেরে গেলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যেসব ছোট রাজারা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েন। তেমনিই কেউ এসে বোধহয় নর্মদার তীরে এই ছোট্ট রাজধানীটি গড়েছিলেন। যারা বলে—হুঃ, মহাভারতের যুদ্ধ তো গল্প কথা, তা আবার সত্যিই হয়েছিল না কি? তাদের জেনে রাখা উচিত এ সব গল্প-কাহিনীর পেছনে সত্যিকারের কোন ঘটনা সর্বদাই থাকে। এমন কি, আজ জানা যাচ্ছে বাইবেলে নোয়ার মহাপ্লাবনের কথাও মিথ্যে নয়। ইস্রায়েলের মরুর বুক খুঁড়ে প্রাচীন এক ভয়ঙ্কর বন্যার সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

তেমনি উত্তর ভারতে একদিন সত্যিই এক মস্ত যুদ্ধ বেধেছিল। তাতে সব রাজরাজড়ারাই ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটা যদি সত্যি হয়. তবে ছোট ছোট রাজারা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট রাজ্য গড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি! জায়গাটি রাজামশায় বেশ ভালই বেছেছিলেন বলতে হবে।

বড় বড় রাজ্যের রাজারা পরস্পর দড়ি কষাকষি ক'রে যে হট্টগোল বাধান, এখানে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছতে পারে না। যেমন বনে ঢাকা, তেমনিই নিরিবিলি।

মস্ত পাহাড়ের কোলে দুর্গ, আর তারই মধ্যে ছোট্ট রাজপুরী। বাসিন্দা মোটে পাঁচ জন। রাজা, রাণী, দুটি ছেলে আর রাণীর বাপের বাড়ির দাসী গঙ্গা। হাতিশাল নেই। নিম গাছের কাছে একটা হাতি বাঁধা থাকে বটে, পালা-পার্বণে সেজেগুজে বেরোয়। পাহাড়ে চলাফেরা করবার মতো শক্ত-পোক্ত টাট্টুঘোড়া কয়েকটা আছে। এ রাজ্যের আয় হয় সপ্তেশ্বর সিদ্ধশিবের মন্দির থেকে। মন্দির সাতটি নর্মদারই তীরে। সেখানে শিবচতুর্দশীর দিন একটা হাটও বসে। টাট্টুঘোড়া ধরে ধরে পোষ মানিয়ে সেখানে বেচা হয়। হয় মোগলবাদশারা দক্ষিণে যাচ্ছেন, নয় দিল্লীর সুবেদাররা আজ পুণা কাল বেরার যাচ্ছেন। মাল বইতে আর রসদ টানতে টাট্টু ঘোড়ার জুড়ি নেই। ঘোড়া বেচেও রাজার কম রোজগার হয় না।

সত্যি বলতে কি, রাজপুরীর চেয়ে বরং ঐ সিদ্ধশিবের মন্দিরটি বেশী জমজমাট। ওখানেই হাট-গঞ্জ, দোকান-পসার। গাঁয়ের লোকেরা একেবারে এই পাহাড়ের, এই জঙ্গলের আদি বাসিন্দা।

যেদিন আর্যরা ভারতে আসেনি সেদিন থেকেই ওরা শিবপুজো করে আসছে। এই সিদ্ধশিবের হাটতলায় ওরা আসে মাংস, মধু, চামড়া আর হরিণের শিং বেচতে। কাপড়-চোপড়, লবণ আর তীরের ফলা কিনে নিয়ে যায়। এখানে রাণীমা মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে আসেন। উৎসবের দিনে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে হাটতলায় ঘুরতে কুশল আর সৌম্য দুজনেই ভালবাসে।

ছেলেদের মধ্যে ভালবাসায় হয়তো বাছ বিচার করতে নেই। তবু রাণীমা কেন যেন কুশলকেই একটু বেশী ভালবাসেন। কুশলের আবার বেশী টান ছোট ভাইয়ের উপর। গঙ্গাবুড়ী বলে—'মা যখন কৃষ্ণের পুজো করতেন তখন কুশল, তুই হলি। তাই তোর রঙ ময়লা, বড় বড় চোখ। আর সেবার রাজামশায়ের অসুখের পর যখন এক বছর ধরে সূর্যঠাকুরের পুজো করলেন, তখন তুই কোলে এলি সৌম্য। ঐ টক্‌টকে রঙ আর আগুনের মতো তেজ নিয়ে।'

'দাদা কালো আমি ফর্সা'—সৌম্য ঘুম ঘুম গলায় বলে।

'কালো জগতের আলো' মা বলেন—কুশল জবাব দেয়। গঙ্গা মোটা মোটা সোনার বালা পরা হাত ঘুরিয়ে পিদিমের সামনে বসে সলতে পাকায় আর বলে—'রূপ দিয়ে কী হবে? তোরা হলি রাজার ছেলে। লেখাপড়া, যুদ্ধ, লড়াই সব শিখবি তবে তো সবাই ভাল বলবে। সব দিকে চৌকশ না হ'লে চলবে কেন?'

কথা কইতে কইতে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ে। মস্ত ঘরের এককোণে ছোট্ট রুপোর পিদিমে একফোঁটা আলো জ্বল-জ্বল করে। জানালা দিয়ে দেখা যায় আঁধার দিয়ে

আঁকা বনের উপরে চাঁদ উঠেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে চন্দনকাঠের পালঙ্কে রেশমের ঢাকনী কাঁপে। দেউড়ীতে ঘন্টা বাজে ঢং ঢং, রাণীমার পোষা পাখিগুলো খাঁচায় ডানা ঝাপটায়। ঘোড়ায় ডাক ভেসে আসে। দুর্গের বুরুজের নীচে বসে শান্ত্রীরা গান গেয়ে-গেয়ে রাত জাগে। অনেক রাত জাগে। অনেক রাতে চেলির খস-খস, গয়নার রুনুঝুনু নিয়ে বাতাসে চন্দনের গন্ধ ছড়িয়ে রাণীমা আসেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে, হাত দিয়ে আলতো ছুঁয়ে চলে যান নিজের ঘরে। তারপর গঙ্গা একসময়ে ভারী দরজাটা চেপে বন্ধ ক'রে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে গালচেয়।

এমনি ক'রে দিন কাটে। কখনো কুশল আর সৌম্য ঐ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে চলে যায় গাঁয়ের মধ্যে। গাঁয়ের বুড়ো ওদের পাখি ধরতে শেখায় ফাঁদ পেতে, তীর ধনুক বানিয়ে দেয়।

বেশ চলছিল সব। কিন্তু আর চলল না। একদিন এক শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন, রাজবংশের গুরুদেব এলেন।

সন্ন্যাসী থামলেন। ধুনীর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে ভারতে গোটাকয় কাঠ ঠেলে দিলেন। আগুনটা দগদগিয়ে উঠল। লোকটি দেখতে পেল, আশ্চর্য, এতক্ষণ যা যা দেখছিল সব মিথ্যে? ঐ পাথরের সিংহের মূর্তির কাছে আর শ্বেত আকন্দের গাছ-টাছ নেই। দিব্যি পরিষ্কার। গুহার দেওয়ালের গায়ে এখন দেখা যাচ্ছে বড় বড় সাদা আঁচড়ে বেশ লতা-পাতা, বানর, হাতী, মানুষ আঁকা। এক কোণে একটা লোহার ঘন্টা আর একটা ডাণ্ডা ঝুলছে। গুহাটাও যেন দিব্যি পরিষ্কার, খট-খটে লাগছে। এ সব কি আগে থেকেই এরকম ছিল? না তার জ্বর আসছে, আর জ্বরের ঝোঁকে অন্যরকম লাগছে?

'ভয় পাচ্ছ?'—সন্ন্যাসী হঠাৎ শুধোলেন।

'ভয় আমার নেই।'—লোকটি বলল, আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল সত্যি ভয় করছে না ত? বরঞ্চ ভারী উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে।

'একটু জল খাও।'

লোকটি ঢকঢক ক'রে জল খেল। সন্ন্যাসী একটু হাসলেন। বললেন—'ভাবতেও পারবে না। সেকালে রাজরাজড়ারা এই সব সাধু সন্ন্যাসীদের কি রকম মানতেন। শিবাজী রামদাসের কথায় উঠতেন বসতেন। বাজীরাও-এর ছিলেন ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী।'

'তখন সাধুসন্ন্যাসীরাও খাঁটি হতেন।'—লোকটির গলায় ব্যঙ্গ।

'হ্যাঁ, তা হতেন বটে। টাকা-পয়সায় লোভ থাকত না তাদের।'

লোকটি একটু হাসল। এই সন্ন্যাসীটিকে আর ভয় হচ্ছে না তার। চিনে ফেলেছে সে। নিশ্চয় এই গুহাতে আসা-যাওয়া করবার কোন গোপন কারণ আছে এঁর। বেশীদিনের কথা তো নয়। তার বেশ মনে আছে এমনি একটি সাধু পাঁচশো বছরের

এক পুরনো কেল্লার মধ্যে বেশ চোরাই সোনার কারবার ফেঁদেছিলেন। পকেটে হাত দিল সে। অস্ত্রটি সঙ্গে না নিয়ে সে কোথাও বেরোয় না। এখন গল্প বলে সাধুটি তাকে অন্যমনস্ক রাখছে বটে, তবে সে অসতর্ক হবে না। প্রথমটা যেমন আশ্চর্য লাগছিল, ভয় ভয় করছিল, এখন আর সে ভয়টা নেই।

'বলুন, এক শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে?'

'হ্যাঁ, এক শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে—'

'গুরুদেব আসবেন বলে সকাল থেকেই ভারী ধুমধাম। দাসীরা বড় বড় পাথরের ঘর ধুয়ে মুছে তক্-তকে করেছে, মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, দেউড়ীতে সানাই। শুধু তো গুরুদেব আসবেন বলে নয়, এই সঙ্গে কুশলের তিলক উৎসবও সেরে নেওয়া হচ্ছে, যাকে বলে অভিষেক। আজ বাদে কাল তিলক, গুরুদেব এলেন দুপুর বেলা। এই লম্বা পাতলা শরীর। আগুনের মত রং, সাদা চুলে জটা পড়েছে। কাঁধে কম্বলের ঝোলা, পরনে খসখসে হলদে রেশমের ধুতি। এসেই তিনি কুশলের জন্মপত্রিকা নিয়ে রাজা ও পুরোহিতের সঙ্গে পুজোর ঘরে গেলেন।

সন্ধ্যে নাগাদ রাজবাড়িতে আলো জ্বলল। দেউড়ীর সামনে এসে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ঢোলক বাজিয়ে নাচতে থাকল। উঠোনে অনেক মশাল জ্বেলে দু'জন সেপাই লাঠিখেলা দেখাতে থাকল, ছোটরা ভিড় করল অন্দরের উঠোনে। সেখানে হালুইকরেরা ভিয়েন বসিয়েছে। আজ থেকে ভোজ শুরু, চলবে কাল পর্যন্ত। শান্ত্রীরা লব-কুশ নামে দু'টো কালো টাট্টুর পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে লেগে গেল। লব-কুশ একটু পরে ঢোলকের বাদ্যির সঙ্গে ঝুমঝুম ক'রে নাচবে, ভালুক যেমন নাচে। আর মাহুতরা মহুয়া তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে হাতীর শুঁড় মেজে মেজে কালো করে তুলবে, বুড়ো মাহুত সাদা রঙ দিয়ে শুঁড় চিত্র-বিচিত্র করবে। দেখেশুনে বড় আনন্দে সিদ্ধশিবের ভাট পেতলের ফুল বসানো লাল চাদর দু'কাঁধের উপর দুলিয়ে হেসে হেসে জুড়ে দিল দেবী নর্মদাকে বিয়ে করতে এসে শোণনদ কেমন জব্দ হয়েছিল সেই আদ্যিকালের গান। এই হট্টগোলে তাদের বাজনা শোনা যায় না। ব'লে সানাইওয়ালারাও দু'গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকল।

হঠাৎ, সব শব্দ ডুবিয়ে ঢং-ঢং-ঢং ক'রে ঘন্টা বাজল।

বিপদের ঘন্টা! সিংহমুখ গুহাতে এই ঘন্টা থাকে, আর খুব বিপদ ছাড়া এ ঘন্টা বাজে না। এমন করে ঢালাই এর ঘন্টা বাজার শব্দের রেশটা অনেকক্ষণ অবধি গমগম করে। এ গুহাতে সহজে কেউ যায় না। ওখানে শুধু থাকে রাজার পুরনো শান্ত্রী ভীম। এ তল্লাটে ওর মত শক্তিশালী লোক আর কেউ নেই। গুহার দেওয়ালে বড় বড় ধনুক টাঙ্গানো। ও ঐ সিংহমূর্তির নীচে বসে থাকে। কারুকে ঢুকতে দেয় না গুহাতে।

কিন্তু এ ঘণ্টা কেন বাজল? বিশেষ ক'রে এই শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে?

আজ বাদে কাল কুশলের তিলক, আজ গুরুদেব এসেছেন, এমন দিনে বিপদের ঘণ্টা! একবার যখন নর্মদায় বান ডেকেছিল তখন এই ঘণ্টা বেজেছিল। বর্ষায় ফুলে ফেঁপে সেদিন নর্মদা সিদ্ধশিবের মন্দিরটাই ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর বেজেছিল কুড়ি বছর আগে। যখন বুড়োরাজার বুকে বর্শাখানা বিঁধিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি যুবরাজকে মারতে ছুটেছিল। আজ কেন এই ঘণ্টা বাজল?

যেমন ঘণ্টা বাজল অমনি রাণীমার হাত থেকে পূজোর থালাখানা ঝনঝন ক'রে পড়ে গেল। যেমন ঘণ্টা থামল, অমনি সবাই 'কি হ'ল, কি হ'ল' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ডেকে উঠল একসঙ্গে আর পায়ে শেকল বাঁধা হাতী শুঁড় তুলে চেঁচিয়ে মাথা দুলিয়ে গলার ঘণ্টা বাজাতে থাকল ঢঙ-ঢঙিয়ে।

'সর্বনাশ হ'য়েছে', গঙ্গা ছুটতে-ছুটতে এল। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, সাদা চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। হাতের বালা কপালে ঠুকে সে চেঁচিয়ে বলল—'শুনতে পাসনি তোরা! ঐ শোন।'

মেঘের মত গর্জন। রাণীমা ভয়ে সাদা হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন পাথরের সিংহ ডাকছে। রাজপুরীতে সর্বনাশ এসেছে।

পাথরের সিংহের ডাক যখন থেমে গেল তখন বাইরে ভিতরে ভীষণ কোলাহল উঠল। কি হয়েছে কেউ জানে না, অজানা আতঙ্কে সবাই মশাল নিয়ে ছুটোছুটি করতে লেগে গেল। মেয়েরা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আর পাথরের চওড়া চত্বরে ঘোড়াগুলো লাগিয়ে দিল ছুটোছুটি।

ছেলেদের টেনে নিয়ে গঙ্গা যখন ঘরে চলে যাচ্ছে তখন রাজামশায় টলতে-টলতে পুজোর ঘর থেকে বেরুলেন। দেওয়ানজী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন, রাজগুরু দু'হাতে একটা মস্ত পিদিম তুলে ধরে চলেছেন সামনে, এইটুকু দেখা গেল, তারপরই গঙ্গা ঘরে ঢুকে দোর দিল বন্ধ ক'রে।

কুশল আর সৌম্য অবাক হয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইল। পিদিমে তেল ঢালতে ঢালতে গঙ্গা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'জানি, তখনই জানি কি একটা কাণ্ড হবে।'

সৌম্য বলল—'কি কাণ্ড রে গঙ্গা?'

'চুপ কর।' গঙ্গা ওদের বুকের কাছে টেনে নিল।

একটু উসখুস ক'রে সৌম্য বলল—'গঙ্গা ভারী বকবক করে। দাদা, তুই যখন রাজা হবি গঙ্গাকে বকবক করতে দিবি না।'

কুশল কিছু বলল না।

'আমি হব তোর সেনাপতি। গঙ্গার চোখের সামনে রোদে তরোয়াল ঘোরাব

বনবন ক'রে। চোখে রোদ পড়বে আর গঙ্গা চেঁচাবে। নইলে ও জব্দ হবে না।'

গঙ্গা বিড়বিড় ক'রে বলল—'মা গো, পাথরের সিংহকে আমি কখনো ডাকতে শুনি নি।'

তারপর বাইরে সব শব্দ আস্তে আস্তে থেমে গেল।

ছেলেদের কেউ খেতে ডাকলো না। একটা ভীষণ ভয় যেন ছেলেদের বুকে চেপে বসতে লাগল। গঙ্গার কোলে মাথা রেখে এক সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাতে দরজায় টোকা পড়ল। গঙ্গা দরজা খুলে দিল।

দেওয়ানজী কুশলকে ডেকে নিলেন। হাত ধরে টেনে ঘরের পর ঘর পেরিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন একটি ছোট্ট ঘরে। কুশলের চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। সে দেখল তার মা একলা দাঁড়িয়ে আছেন। কেঁদে কেঁদে যেন চোখের জল সব ফুরিয়ে ফেলেছেন। লাল মুখ, রাঙা চাহনি, মাথায় ঘোমটা নেই। কুশলকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর বললেন—'বাবা কুশল, একটা মস্ত বিপদ হয়েছে। কি হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। তোকে এখনি পালাতে হবে।'

'সে কি, মা?'

'মা ব'লে ডাকিস নে কুশল।' তিনি কানে হাত চাপা দিলেন।

দেওয়ানজী দাঁড়িয়েছিলেন যেন পাথরের মূর্তি। এখন আস্তে বললেন—'আর সময় নেই।'

রাণীমা বলতে লাগলেন—'দেওয়ানজী আমার বাপের বাড়ির লোক। তোকে উনি বিশ্বনাথের কাছে নিয়ে যাবেন। বিশ্বনাথ তোকে অনেক দক্ষিণে সাতরায় নিয়ে যাবে বাবা। সেখানে আমার ভাই আছেন। তন্ননী তোকে মানুষ করবেন বাবা।'

রাণীমা তাকে জড়িয়ে ধরে চলতে লাগলেন। কত দরজা, কত সুড়ঙ্গ পেরিয়ে তাঁরা এলেন সেই গুহাতে, যার মুখে সিংহ বসে আছে পাথরের থাবায় ভর দিয়ে।

গুহার ভেতরে সুড়ঙ্গ দিয়ে নামতে লাগলো তাঁরা। কত সিঁড়ি, কত গলিপথ, কত পাথরের চাতাল পেরিয়ে তবে একসময় তাঁরা এসে দাঁড়ালেন আকাশের নীচে।

মস্তবড় একটা কালো ঘোড়া ছটফট করছিল। বিশ্বনাথ দাঁড়িয়েছিল কৃপাণ হাতে। অবাক হয়ে কুশল বলল—'বাবা, সৌম্য, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাচ্ছি মা?'

রাণীমা বললেন—'কোন কথা শুধোসনা বাবা, এই থলিটি যত্ন ক'রে রাখ। কুশল, আমি তীর্থে যাবার নাম ক'রে ঠিক একদিন তোকে দেখে আসব। তন্ননী তোকে বুকে ক'রে রাখবেন। সৌম্য যেদিন বড় হবে তোকে ডেকে আনবে।'

হাত থেকে হীরের বালা খুলে বিশ্বনাথকে দিলেন। কুশলকে একবার জড়িয়ে

ধরে তারপরই জোর ক'রে ঠেলে দিলেন সামনে।

বিশ্বনাথ তাকে তুলে নিল ঘোড়ার উপর। ঘোড়ায় চাবুক কষাল। তখন কুশল চীৎকার করে কেঁদে উঠল—'মা রে! ভাই রে।'

তার কান্না পাথরে বেজে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সকাল যখন হল, তখনও বিশ্বনাথ ঘোড়া ছোটাচ্ছে। অনেক দূরে, গভীর জঙ্গলে এসে সে ঘোড়া থামাল। মস্ত একটা অর্জুন গাছের নিচে একখানা চ্যাটালো পাথরে কুশলকে বসাল। ঝর্ণা থেকে জল এনে কুশলকে খাওয়াল। বলল—'আমাদের জঙ্গল যে পাহারা দেয় তার ঘর এখানেই। তুমি একটু বস। আমি একটু দুধ নিয়ে আসি।'

কুশল পাথরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে। এমন সময় দেখে তাদেরই একজন শান্ত্রী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতেই সে ছুটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'তুমি আমাকে নিতে এসেছ? কে তোমায় পাঠাল? বাবা না মা? তুমি জান সৌম্য আমায় না দেখে কাঁদছিল কি না?'

তারপর অবাক হয়ে বলল—'তুমি তো শঙ্কর! সিদ্ধশিবের মেলায় তোমার বর্শা খেলা দেখে তোমাকেই তো আমি সোনার হার দিয়েছিলাম। তুমি একদিন আমাদের হাতিতে চড়িয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ, আমিই শঙ্কর।' লোকটি ঘোড়া থেকে নামল।

বিশ্বনাথ দুধ নিয়ে আসছিল। শঙ্করকে দেখেই সে কেন তরোয়াল নিয়ে তাড়া করে এল, কেনই বা তারা অমন যুদ্ধ করল আর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বিশ্বনাথের বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে কেন যে শঙ্কর টলতে টলতে উঠে এসে কুশলের হাত দু'খানা ধরে কাঁদতে লাগল, কুশল তা বুঝল না। সে একটু কাঁদলও না। সে বুঝতে পারছিল কেমন করে যেন সব কিছুই উলটে পালটে গেছে। কাল রাত থেকে সব বাঁধা নিয়ম হারিয়ে গেছে, আর নতুন অপরিচিত সব ঘটনা ঘটছে। সে বলল—'এবার কি তুমি আমাকেও মারবে? বেশ, মার। আমি কিচ্ছু বলব না।'

শঙ্কর তার দিকে চাইল। তারপর বলল—'না বড় কুমার, তোমাকে মারতেই আমায় পাঠিয়েছিলেন মহারাজ। কিন্তু আমি তোমায় মারব না।'

তার কথাগুলো কুশলকে আবার বোবা করে দিল। তাকে মারতে শঙ্করকে পাঠিয়েছেন তারই বাবা!

শঙ্কর একটু হাসল। বলল—'তুমি না কি তোমার বাবার মৃত্যু ঘটাবে। তুমি না কি এই রাজ্যকে ধ্বংস করবে। তাই তোমায় মেরে ফেলতে হুকুম দিয়েছেন গুরুদেব। রাজা আমায় আদেশ দিয়েই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। রাণীমা মাটিতে পড়ে আছেন। আর দেওয়ানজী বিষ খেয়েছেন।'

'কেন?'

'তোমাকে বাঁচিয়েছেন, তাতে রাজাকে অমান্য করা হয়েছে, সেই জন্য বিষ খেয়েছেন।'

'তবে তুমি আমায় মার, শঙ্কর!' কুশল যেন অনেক কথা বুঝতে পারছে।—'তুমি আমায় মার। দেওয়ানজী এত ভাল লোক, তিনি তো আমার জন্যেই মরলেন। আমাকে তুমি মার।'

শঙ্কর মাথা নাড়ল। বলল—'না। তা আমি পারব না। তুমি পালিয়ে যাও। না হয়, এ রাজ্যে আর ফিরো না।'

কুশল অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—'তাই যাব। শঙ্কর, তুমি মা-কে এই আংটিটি দিও। ব'লো কুশল বলেছে এতে তার দরকার হবে না। আর মা-কে বলো, সৌম্যকে যেন আমার সাদা ঘোড়াটি দিয়ে দেন।'

তার ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপতে লাগল। শঙ্কর তখন অনেক দুঃখে হাসল। আপন মনে বলল—'যাবার আগে ওর সব বাঁধনগুলোই কেটে দিই। নইলে ও কষ্ট পাবে। সব বাঁধন মন থেকে খসে গেলে ও হয়তো স্বস্তি পাবে। পরে আঘাত পাবার চেয়ে এখন আঘাত পাওয়াই ভাল। নইলে এতটুকু ছেলে, কেমন ক'রে ও বাঁচবে? এতদিন ছিল রাজপ্রাসাদে। এখন থেকে যে ওর সামনের পথ বড় কঠিন, এখন থেকে যে ওকে একলা থাকতে হবে।'

সে কুশলকে কাছে ডাকল। বলল—'বড়কুমার, তুমি বোধ হয় জান না, সৌম্য তোমার নিজের ভাই নয়। রাণীমা তোমায় বুকের দুধে মানুষ করেছেন মাত্র। তুমি ওঁর ছেলে নও। বড়রাণীর ছেলে।'

এবার কুশল পাথরের মতো চেয়েই রইল। সে যেন কাঁদতেও পারল না। মাথায় হাত রেখে সে পাষাণ হয়ে বসে রইল। অনেক পরে চোখ তুলে দেখল শঙ্কর ঘোড়াটার লাগাম ধরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। একটু হাসল। 'মা আমার নিজের মা নন। সৌম্য আমার ভাই নয়। বাবা আমাকে মেরে ফেলতে লোক পাঠিয়েছিলেন। ভাল!'

সে বিশ্বনাথের দিকে চাইল। বলল—'কার জন্যে তুমি প্রাণটা দিলে বিশ্বনাথ?'

সে গলার হার, হাতের বালা, কানের কুণ্ডল ঝর্ণার জলে ফেলে দিল। রাণীমা-র দেওয়া আংটিটা ফেলে দিল। তারপর আস্তে ঘোড়াটার বাঁধন খুলে দিল। তার গলায় হাত বুলিয়ে বলল—'যা, তুই যা।'

কুশল জঙ্গলের পথে হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ তার ছোট মাথাটি পাকদণ্ডীর পথে দেখা গেল তারপর আর দেখা গেল না।

নর্মদার তীরে কুশল চুপ করে বসেছিল। অনেক পথ হেঁটে সে এখানে এসেছে।

নিচে নর্মদার খরস্রোত বইছিল, সে পাথরে বসে দেখছিল। পথে পথে ঘুরে তার শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। সে বাড়ির কথা ভাবতে চাইছিল না তবু বাড়ির কথা মনে হচ্ছিল। গ্রামে গ্রামে, মেয়েরা তাকে ডেকে নিয়ে যত্ন ক'রে খাইয়েছে। একজন মেয়ে বলেছিল, 'তুমি আমাদের কাছে থাক বাবা। এই বয়সে কি এমন ক'রে পথে বেরোয়।' সে তার কথার জবাব দেয় নি।

এখন সে ভাবছিল সে আর বাঁচতে চায় না। আজ রাতে যখন আঁধার হবে, নদীর ঘাটে লোক চলাচল কমে যাবে, তখন নর্মদার জলে ঝাঁপ দেবে। সে তার নিজের মা-র কাছে চলে যাবে। কেন যেন ওর মনে হচ্ছিল, এমন ক'রে একলাটি সে চলতে পারবে না। এর চেয়ে বিশ্বনাথকে না মেরে শঙ্কর যদি তাকেই মারত, ভাল হতো। কেন যে শঙ্কর তাকে মারল না। তার মা কোন্ রাজ্যের মেয়ে ছিলেন কে জানে! হয়তো সে সেই রাজ্যেই চলে যেতে পারত। কিন্তু গিয়ে কী হতো? সেখানেও হয়তো ভীষণ ভীষণ কাণ্ড ঘটে। কাউকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হয়, কাউকে বর্শার মুখে প্রাণ দিতে হয়। সে মনে মনে বলল—'এর চেয়ে যদি আমি সর্দারদের ঘরের ছেলে হতাম, বেশ হতো! কেমন মোষ চরাতাম, শিকার করতাম, কাঠ কাটতাম। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে মোটামোটা রুটি আর শাক ভাজা খেয়ে খাটিয়াখানা উঠোনে নিয়ে তারা গুণতে গুণতে ঘুমিয়ে পড়তাম!'

তারপর সে দেখল আঁধার হয়েছে।

তারপর সে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে জলে নামল।

তারপর সে চোখ বুজে বলল—'নর্মদা, মা গো, আমাকে তুমি পরের জন্মে কখনো রাজার ঘরে পাঠিও না। আমাকে একজন মা দিও, যে আমার নিজের মা হবে। আমাকে তুমি সৌম্যের মতো একটি ভাই দিও। আমরা পাতার ঘরে গরীব হয়ে থাকব।'

সে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় সে শুনল—'থাম!'

সে চমকে উঠল। পিছনে চাইল।

অন্ধকারে কাউকে দেখা যায় না। শুধু একখানা হাত তাকে চেপে ধরল।

একজন সন্ন্যাসী। একজন অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি শুনছেন। কুশল বলে যাচ্ছে। তিনি সব শুনলেন। তারপর একটু হেসে বললেন—'বাবা, এখন তো তুমি মরতে পারবে না। তোমাকে যে অনেকদিন বাঁচতে হবে। আমিই সেই সন্ন্যাসী, আমিই তোমার বাবাকে সব বলেছিলাম।'

কুশল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন—'আমি তোমাকে হত্যা করতে বলিনি। তবে তোমার বাবা যখন বিধান চাইল, আমি বললাম এখন জাতককে হত্যা করলে

তবে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। তবে সে ক'দিনের জন্যই বা! রাজা, তোমার নিয়তি যদি ঐ হয়, তবে ওকে হত্যা করলেও তুমি নিয়তি এড়াতে পারবে না। হয়তো একদিন শুনবে তুমি, আমি গণনা ক'রে কী বললাম?'

কুশল মাথা নাড়ল।

সন্ন্যাসী বললেন—'আমি দেখতে পেলাম, তোমাকে হত্যা করা হলো। তোমার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা হলো। তারপর তোমার নিজের মাতুলবংশ যখন ছেলের অভাবে রাজ্য হারাতে বসেছে, তখন অমরাবতী থেকে একদিন তারা তোমার খোঁজে এল। সব কথা জেনে তারা রেগে গুপ্তঘাতক দিয়ে তোমার বাবাকে হত্যা করাল। তারপর দুই রাজ্যের বিরোধে তোমাদের ছোট্ট রাজ্যটি দিয়ে সর্বনাশের ঝড় বয়ে গেল। তোমার হত্যার দশ বছর বাদেই এ সব হলো।'

তিনি একটু থামলেন।

তারপর বললেন—'আমি বললাম নিয়তিকে এড়ানো যায় না। রাজা, তুমি বৃথা চেষ্টা ক'রোনা। তোমার এ রাজ্য থাকবে না। একদিন মহারাষ্ট্র থেকে এক নতুন জাতি আসবে, তারা গ্রাস করতে পারে এই রাজ্য। একদিন দিল্লীর সুলতানের নজর এই ছোট্ট অখ্যাত রাজ্যের উপর পড়তে পারে। যে ভাবে যখনই রাজ্য ধ্বংস হোক, যে ভাবে যখনই তোমার মৃত্যু হোক, তার মূলে কোন না কোনভাবে কুশল থাকবে, থাকবেই।'

তিনি বললেন—'তোমার বাবা শুনল না। সে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। তার ফল ফলতে শুরু করেছে। বিশ্বাসী দেওয়ানকে হারাতে হয়েছে।'

তিনি বললেন—'কুশল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'অনেক দূরে, নির্জনে। তুমি আমার কাছে শাস্ত্র শিখবে। তুমি আমার কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিখবে।'

'তাতে কি আমি ভাগ্যকে জয় করতে পারব?'

'না।'

'ভাগ্যই কি সবচেয়ে বড়? মানুষের চেষ্টার কোন দাম নেই?'

'নিশ্চয় আছে। মানুষকে চেষ্টা করতে হয়, মানুষের মতো মানুষ হয়।'

'তবু যে ভাগ্যকে জয় করা যায় না?'

'সেই জন্যে তো ভাগ্য গণনা করতে নেই। কবে, তুমি কীভাবে মরবে তা জেনে যদি বসে থাক, তাহলে সে তো মস্তবড় কাপুরুষতা। মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে ভাগ্যকে এড়াতে পারুক বা না পারুক, তবু সে মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে।'

তিনি কুশলকে তাঁর কমণ্ডলু থেকে দুধ খেতে দিলেন। বললেন—'এবার তুমি ঘুমোও।'

পরদিন সকালে দেখা গেল, এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর একটি বালক তরুণ সন্ন্যাসী নর্মদার তীর ধরে চলেছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটির শরীর ঋজু। মুখে চোখে দীপ্তি। তরুণ সন্ন্যাসীটিকে তিনি কী যেন বলছিলেন, বোঝাচ্ছিলেন।

তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে।

সেই ছোট্ট সীমান্তে, একটি নদীর ধারে একদিন একজন সন্ন্যাসী এসে বসলেন। তাঁর বয়স নবীন। কালো চুল জটা বেঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর শরীর ভস্মে ঢাকা। তিনি বসে কাঠিতে শুধু দাগ কেটে কী গণনা করেন। তিনি কারো দ্বারে যান না। কিছু চান না। মেয়েরা তাঁর সামনে ফলমূল রেখে যায়, দুধ রেখে যায়। তিনি সে সব নেন না। মাঝে মাঝে বন থেকে কলা বা ফলমূল সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাই আহার করেন। প্রথমে তাঁকে দেখে সবাই ভীড় করে আসত। আস্তে আস্তে তাঁর সম্পর্কে সকলে কৌতূহল হারাল। মাঝে মাঝে তিনি বৃদ্ধদের ডেকে শুধু নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। এ নদী কতদূর গেছে। এই ছোট্ট নদীটির উৎস কোথায় তা কেউ জানে কি না।

তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতেন, চারিপাশের মানুষদের চেহারা যেন শীর্ণ, কঙ্কালসার। ক্ষেতে শস্য নেই। পশুগুলি রুগ্ন এবং দুর্বল। তাঁর কাছে বসে বৃদ্ধরা বলে যায়—'এমন ছিল না। আমরা বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু কোথায় দক্ষিণে যেন এক শিবাজী মহারাজ মারা গেলেন। তারপর দিল্লীর বাদশাহ এলেন বিজাপুরে। তাঁর সঙ্গে এল কত মানুষ, হাতী, ঘোড়া হাজার হাজার সেপাই শান্ত্রী। আমাদের ক্ষেত ওরা লুট করে নিল। ক্ষেতে শস্য থাকতে দেয় না। জোয়ানগুলোকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায়। কাজ করায়। আমাদের দুঃখের শেষ নাই।'

শুনতে শুনতে সন্ন্যাসী যেন অস্থির হ'য়ে ওঠেন। বলেন—'তোমাদের রাজা কী করেন?'

'রাজা? রাজা যদি মানুষ হতেন তাহলে কি আমাদের এত দুঃখ থাকত? রাজা রাজ্য দেখেন না, ছোট কুমার আছেন শিকার আর আমোদ-প্রমোদ নিয়ে।'

'কেউ দেখে না তোমাদের?'

'দেখে, একজন দেখে।'

'কে সে?'

'সে আমাদের মধ্যে এসেছিল পনেরো বছর আগে। ওর কোন শত্রু যেন চোখদুটো উপড়ে নিয়েছিল, অন্ধ হয়ে তবে ও আমাদের মধ্যে আসে।'

'সে তোমাদের কে?'

'দুঃখে কষ্টে ওই তো আমাদের ভরসা দেয়।'

'কী বলে?'

বুড়োরা চুপ ক'রে রইল। একজন আস্তে আস্তে বলল—'বলে, অমন রাজাকে মেরে ফেললে দোষ নেই। রাজাকে মেরে, ছোট কুমারকে মেরে ধনরত্ন লুটে নিতে বলে।'

শুনে সন্ন্যাসী কানে হাত দেন। বলেন—'আমি আর শুনতে চাই না।'

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার আর মোটে দু'দিন বাকি। একদিন সন্ন্যাসীকে আর দেখা গেল না।

তিনি এলেন দু'দিন বাদে, সেদিন সিদ্ধশিবের মন্দিরের সামনে হাট বসবে। সবাই হাটে যাবে ব'লে তৈরী হয়েছে। এমন সময়ে সন্ন্যাসী এলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই অবাক। কৌপীন কাদামাখা। জটাগুলি ভিজে। একহাতে একটি লোহার খন্তা। তিনি এসে সকলের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন—'তোমাদের আমি একটি কথা বলব।'

সবাই আগ্রহে তার কাছে এল।

তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়ালেন। লোহার খন্তাটি ধ'রে একটু হেলে, একহাতে রোদ থেকে চোখ আড়াল ক'রে। লোকেরা কলরব করতে থাকল। কেউ বলল—'উনি আর নতুন কথা কী বলবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা নিজেদের কাজে যেতে চাই।'

'ব্যাপারীরা এসে অন্যদের কাছ থেকে বেসাতি কিনে নিয়ে যাবে।'

'চাল, মধু, গমের খই, ঘোড়ার দানা, তীরের ফলা সব ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের।'

সকলের সব কোলাহল থামিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী যখন বলতে লাগলেন তখন কিন্তু আস্তে আস্তে সব কোলাহল থেমে গেল। তাঁর গলার স্বরটি বড় মধুর, কথা বলবার ধরনটি বেশ শান্ত। আস্তে আস্তে কথাগুলি শোনবার জন্যে সবাই তার কাছে ভিড় ক'রে এল।

'কী ক'রে তোমাদের এই দুঃখ কষ্ট দূর হ'তে পারে, একমাস ধ'রে আমি শুধু তাই ভেবেছি।'

'এই কথা বলবার জন্যে এত সোরগোল ক'রে ডাকা হ'ল নাকি?—একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু তার দিকে তাকালেন না সন্ন্যাসী। বললেন—'একমাস গণনার পর এই কাল রাতে উপায় জানতে পারলাম সোনা পেলে যদি দুঃখ কষ্ট দূর হয় তোমাদের, তবে দেব সোনার সন্ধান।'

'কৈ, কৈ সোনা?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। আর তাদের সেই অধীর আগ্রহ দেখে সন্ন্যাসীর মুখটা বেদনায় করুণ হ'য়ে গেল। আস্তে বললেন—'তোমরা সবাই যাকে মানো, এমন একটি লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার কাছে আমি দিয়ে দেব সোনার সন্ধান। কিন্তু তোমরা সকলে এক কথায় মেনে নাও যাকে, এমন কোন লোক কি সত্যিই আছে?'

'আছে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল একটি বৃদ্ধ। চুলগুলো সত্যিই শণের নুড়ির মতো সাদা, নুয়ে পড়া শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—'ঠাকুর, তেমন লোক সত্যিই আছে।'

ভিড়ের দিকে চেয়ে বলল—'আমি শঙ্করের কথা বলছি।' সন্ন্যাসীকে বলল—'এই জঙ্গলের শেষে আমাদের রাজার রাজ্যের সীমা যেখানে সেখানে সে থাকে।'

'অর্জুন গাছের তলায়?' সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে শুধালেন। 'হ্যাঁ। তুমি সন্ন্যেসী, সব জানতে পার। একটা মস্ত চ্যাটালো পাথরের উপর থাকে সে। যেমন শরীরে শক্তি তার, তেমনিই বুদ্ধি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, চোখে যে দৃষ্টি নেই তার?'

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—'চল, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব।'

'দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে?'

'হয়তো গুরুদেবের তাই-ই ইচ্ছা। নইলে এমন বিদ্যা আমাকে দিলেন কেন, যাতে আমি একটি, শুধু একটি লোককে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারি? ভেবেছিলাম এমন একটি লোককে খুঁজে বের করব, যে তোমাদের মঙ্গল চায়, এ-রাজ্যকে ভালবাসে। খোঁড়া হ'লে পা ফিরিয়ে দেব, কানা হ'লে চোখে দৃষ্টি এনে দেব। ভগবানের মনে হয়তো এই-ই ইচ্ছে ছিল।'

সন্ন্যাসীর কথাগুলো শুনে মনে হল, যেন তাঁর বড্ড কষ্ট হচ্ছে কথা কইতে। কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল যেন তিনি এদের মতো মানুষ নন, কোন অন্য জগতের লোক। পাতলা শরীরটি শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা। সকালের আলোয় দেখা যায় দু'পাশে কানের চুলে পাক ধরেছে। চোখের পাতা, ভুরু সব যেন সাদাটে, যারা অনেকদিন আঁধার ঘরে থাকে, রোদে মোটে বেরোয় না, তাদের এমন দেখায় বটে।

অর্জুন গাছের নিচে একখানা চ্যাটালো পাথরে সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর

পায়ের কাছে শুকনো পাতায় মাথা রেখে পড়ে আছে এক প্রৌঢ়। বিশাল শরীর তার, দেখলে মনে হয় ঐ অর্জুন গাছের গুঁড়ির মতো শক্ত সমর্থ, একটু আগে বোধহয় খুব কেঁদেছে সে। এখনো গলার স্বর ভিজে, ভাঙা ভাঙা। সে বলেছে—'পনেরো বছর আগে রাজা বললে 'যাও, বড় কুমারকে মেরে এস।' বিশ্বনাথকে আমি সহজেই মারলাম, কিন্তু কুমারকে মারতে হাত উঠল না। অথচ, বিশ্বনাথ আমাকে হাতে ধ'রে বর্শা খেলতে শিখিয়েছিল।'

'তোমার কষ্ট হ'ল না?'

'না ঠাকুর, হাতে বর্শা বা তলোয়ার পড়লে আমার আর জ্ঞানগম্যি থাকত না। ঐ রকম কথায় কথায় মারতে পারতাম বলেই তো রাজা আমায় অমন দায়িত্বের কাজে রেখেছিলেন।'

'কী কাজ?'

'আমার একটি ছোট্ট দল ছিল। আমি ছিলাম রাজার ডান হাত। যাকেই দরকার হ'ত, লুকিয়ে নিকেশ করতাম। আড়ালে থেকে পাহারা দিতাম রাজাকে।

'কেউ জানত না?'

'হয়তো দেওয়ানজী জানতেন। আর কেউ না। আমি তো লোকের চোখের সামনে কমই আসতাম। ঐ বছরে একবার শুধু সিদ্ধশিবের মেলায় যেতাম। নিজেরও মেলা দেখা হ'ত, আর রাজকুমারদেরও পাহারা দিতাম।'

'শুনেছি যে রাজকুমারদের কোন রক্ষী থাকত না?'

'কে বললে? সদাসর্বদা নজরে থাকত তারা, জানতেও পারত না। নইলে আমারই বা চোখে পড়বে কেন যে বিশ্বনাথ বড় কুমারকে নিয়ে পালাচ্ছে?'

'এ-সব কথা আমায় ব'লনা।'

'না না, তোমায় এত কথা শুনতে বলি না, তুমি সন্ন্যেসী মানুষ, রাজপুরীর এ সব কথা তোমার ভাল লাগবে না। সেখানে যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, দিনরাত্তির পাহারা দিয়ে বাপ ছেলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে...'

'ছোটবেলা এতকথা বোঝা যায় না তাই বোধহয় শৈশব এমন মধুর।'

'তা যা বলেছ ঠাকুর, এই দেখ না, রাজকুমাররা কি স্বপ্নেও জানতে পেরেছে যে কেমন ক'রে তাদের উপর নজর রাখতাম আমি?'

সন্ন্যাসী কথা কইলেন না।

প্রৌঢ়টি এবার তাঁর পা চেপে ধরে মুখটা তুলল মাটি থেকে। বলল—'ঠাকুর, তুমি যখন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে তখন আমি কি শুধু তুমি যা বলে দেবে সেই কাজটুকুই করব?'

'হ্যাঁ, শঙ্কর।'

'আমার নাম তুমি জান?'

'গাঁয়ের লোকেরাই বলল।'

'সত্যিই আমি আবার সব দেখতে পাব?'

'হ্যাঁ। দেখতে পাবে, আর আমি তোমায় বলে দেব সেই স্বর্ণভাণ্ডারের ঠিকানা।'

'বটে। রাজার যে অনেক ধনরত্ন আজও লুকোন আছে, সে তবে নেহাৎ শোনা কথা নয়?'

'না না, রাজাও বোধহয় সব জানেন না। এ তো তাঁর লুকোন সোনা নয়, এ যে মাটির বুক থেকে নদীর বয়ে আনা সোনা।'

'তুমি কেমন ক'রে জানলে?'

'গণনায় জায়গাটির খোঁজ পেয়েছিলাম, তারপর খন্তা নিয়ে খুঁড়ে নিজচোখে দেখে এলাম সব কথা সত্যি। মাটির বুকে কোথায় লুকোন ছিল সোনার রেণু, নর্মদার একটি শাখানদী....'

'জানি-জানি, এখন তো শুকিয়ে গিয়েছে।'

'ঠিক শুকিয়ে যায়নি, পথটি বদলে বেঁকে চলে গিয়েছে। তারই জলের সঙ্গে বয়ে এসে জমা হয়েছে সোনা।'

'কত সোনা? বল ঠাকুর বল, আজ আর আমার একটুও লোভ নেই মনে। একদিন অবশ্য সোনার লোভে সব কাজই করতে পারতাম।'

'সত্যিই তুমি বদলে গিয়েছ তো শঙ্কর?'

'সত্যি ঠাকুর, সত্যি সত্যি সত্যি, এই তিন-সত্যি করলাম। শুধু জানতে ইচ্ছে করে কি এত সোনা পাব যাতে এ দেশের লোকগুলোর সব অভাব ঘুচিয়ে দেওয়া যায়?'

'পাবে শঙ্কর। এদের কথা তুমি ভাব বলেই তোমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু রেখ। অন্য লোক আর কোথায় খুঁজে পাব? আমার এ ক্ষমতাটুকুও আজকের দিনের মধ্যেই কাজে লাগাতে হবে, এমন গুরুদেবের নির্দেশ।'

সন্ন্যাসী একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—'একটি কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। অতি গভীর খাদ, বড় দুর্গম জায়গা। আলগা পাথরে পা পড়লে কোথায় তলিয়ে যাবে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া....'

'কী ঠাকুর?'

'দেখে এসেছি পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাতলা হয়েছে। তার উপরে নদীর শুকনো খাতে জল এসেছে। পাথরের দেওয়াল যদি টলে যায় তবে সর্বনাশ হবে। একটি একটি ক'রে লোক নামবে, সন্তর্পণে খসিয়ে নেবে সোনার চাঙড়া। যদি কোলাহল

ক'রে হাঙ্গামা বাধাও তাহলে রাজপুরী থেকে সৈন্যসামন্ত এসে পড়বে সেটাও মনে রেখ।'

'তা যা বলেছ।' প্রৌঢ়টির কপাল কুঁচকে গেল। সে বলল—'ছোট কুমার সৌম্যই এখন সৈন্যসামন্ত চালায়। ওর মুখের কথার আগে হাতের তলোয়ারটা ছুটে যায়।'

'তোমাদের ছোট কুমারের নাম সৌম্য?' সন্ন্যাসীর কণ্ঠ মৃদু।

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, দেরী করছ কেন?'

'অধীর হয়োনা। আমি সময়ের অপেক্ষা করছি।'

সন্ন্যাসীর গলা শুনে চমকে উঠল প্রৌঢ়টি। সন্ন্যাসী সূর্যের গতি দেখতে দেখতে বললেন—'একটা কথা তো জিজ্ঞেস করলে না?'

'কী?'

'সোনার সন্ধান আমি জানি, তবু আমিই যাচ্ছিনা কেন ওদের নিয়ে?'

'ঠাকুর, এ যে ঘোরাল প্রশ্ন। সাধু-সন্ন্যেসীর মতো কথা তো নয়?'

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন—'মন্দ বলনি। আমি হাত দিলে হবে না, আরেকজনের হাত দিয়ে করাতে হবে কাজটি। এ-ও গুরুরই নির্দেশ। তোমায় আগে ভাগে বলে নিলাম, পাছে পরে মনে সন্দেহ আসে। কিন্তু আর কথা নয়। এস শঙ্কর, কাছে এস।'

লোকটি কাছে এল। উত্তেজনায়, বিস্ময়ে তার শরীর কাঁপছে।

সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত রেখে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। বহুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে রইলেন তিনি, পাতলা ও শুকনো ঠোঁট দুটি অল্প অল্প নড়তে লাগল, তারপর একসময় মন্ত্র পড়া হ'য়ে গেল। বুনোজন্তু যেমন শব্দ করে তেমনি আর্তনাদ ক'রে প্রৌঢ় বলল—'ঠাকুর, আমার চাইতে ভয় করছে।'

'চাও, আমাকে দেখ।'

ভাল করে চাইল শঙ্কর। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন কৃশদেহ তরুণ সন্ন্যাসী। পরনে কৌপীন, তার উপর জড়ানো কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার কটিবস্ত্র। রোদে পোড়া ফর্সা শরীরটির চামড়া এত পাতলা যে হাড় দেখা যায়। কোঁকড়া চুলে জটা পড়েছে, কানের পাশে চুল সাদা। চোখের চাহনি বড় আশ্চর্য, যেন ভেতর থেকে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে কেউ, অথচ দৃষ্টি দেখে মনে হয় কতদিনের দুঃখ, কত রাতের কান্না যেন জমে আছে ওখানে।

'যাও শঙ্কর, নিজের কাজে যাও। আমার কথা মনে রেখ, নইলে...'

'কী করবে ঠাকুর, দৃষ্টি কেড়ে নেবে?'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। বেদনায় করুণ সে হাসি। বললেন—'নইলে আমি যে

দায়ী হব ভগবানের কাছে। অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে আমায়, যতদিন না এমন কেউ আসে যে এই সম্পদের যোগ্য অধিকারী। যেখানেই থাকি ঘুরে ঘুরে আসতে হবে। গুরুদেব আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন।'

শঙ্কর তাঁর পায়ের উপর মাথাটি রাখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। একলাফে সে পাথর থেকে নামল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—'এই যে এইখানে আমার গুরু বিশ্বনাথকে মেরেছিলাম ঠাকুর, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছিলাম বড় কুমারকে। সব মনে আছে আমার, সব দেখতে পাচ্ছি।'

হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে কথা কইতে কইতে সে লাফিয়ে নেমে গেল পাথরের গা দিয়ে। বলে গেল—'এইখানে বসে থেক ঠাকুর, কাজ হাসিল ক'রে তবে আসব তোমায় জানাতে।'

সন্ন্যাসী পাথরে বসলেন। অর্জুন গাছের গায়ে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী যা চেয়েছিলেন তা কি হ'ল?

অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি। এক সময়ে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। পাথরটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমে ডুবে গেছে সূর্য। আকাশ এখনো লালচে আলোয় মাখামাখি তবু সেই সিঁদুরে লালের উপর একটি তারা ঝিকমিক করছে যেন কোন রাণীর আঁচলের সোনার বুটি। যত আলো সব আকাশে, আর বনের উপর দিয়ে পৃথিবীতে ঘনিয়ে এসেছে আঁধার। আঁধার পাতলা হ'লে কি হয়, তবু দেখা যাচ্ছে দূরের গাঁয়ে আলো জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু উত্তর দিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে না? চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। একবার মনে হ'ল শীতের সময়ে ক্ষুধার্ত হায়েনাগুলো শিকারের পেছনে যেমন হাঁক্ হাঁক্ ডাকতে ডাকতে ধাওয়া করে এ চীৎকারও যেন তেমনি। তারপরই আর বুঝতে ভুল হ'ল না। দেখতে পেলেন জ্বলন্ত মশালের নাচানাচি, বিপদে নরনারীর চীৎকার।

দেখতে পেলেন যেদিকে রাজপুরী সেদিকের আকাশে রাঙা আগুনের হল্কা। আকাশের রাঙা মিলিয়ে যেতে থাকল নিবিড় কালোয় আর কালো পাথরের রাজপুরীর উপরের আকাশটা রাঙা হ'তে থাকল আগুনের আভায়।

সন্ন্যাসীর বুকটা যেন চিরে গেল। 'ভগবান!' ভয়ার্ত আর্তনাদ করে তিনি ছুটে চললেন সামনের দিকে।

নদীর সেই মরা খাদের কিনারায় সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যারা খাদে নেমেছিল তারা লোভে অধীর হয়ে নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করে।

তারা উঠতে না উঠতে উপর থেকে আরো মানুষ নামতে চেষ্টা করে।

'তারপর?' সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে ওঠেন—'শঙ্কর কোথায়? সে ছিল না!'

'শঙ্কর?' গাঁয়ের বৃদ্ধটি কপালে করাঘাত করল। বলল—'যখন এখানে হানাহানি চলছে তখন রাজপুরী থেকে এল সৈন্যরা। কোনদিকে না তাকিয়ে চালাতে লাগল বর্শা।'

'তোমরা কী করছিলে?'

'হা ভগবান্! আমাদের ছেলেরাও বের করলো তীর ধনুক। এদিকে হানাহানি করতে সবাই যখন ব্যস্ত তখন কোথা দিয়ে যে পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে জলের স্রোত নামল তা কে দেখল?'

'বলেছিলাম, শঙ্করকে বলেছিলাম!'

'তখন শঙ্কর আমাদের ছেলেদের আর যারা ছিল তাদের নিয়ে একজন সৈন্যের ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীতে ধাওয়া করলে তলোয়ার হাতে।'

'সে কি!'

'রাজাকে মেরে ও শোধ নিয়েছে, তারপর কি হয়েছে তাও কি বলে দিতে হবে ঠাকুর। দেখতে পাচ্ছনা আগুন? শুনতে পাচ্ছনা গোলমাল? লোভে অধীর হয়ে সবাই যে এখন রাজার প্রাসাদ লুট করতে ছুটেছে।'

'তাই বুঝি?....ও কি?'

সভয়ে চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। ডাকছে, আবার ডাকছে সিংহ। রাজপ্রাসাদের দিক থেকে ভেসে আসছে গভীর সিংহ-গর্জন। নিয়তির ইচ্ছেয় আজ আবার এক সর্বনাশের সন্ধ্যা এসেছে, তাই ডাকছে পাথরের সিংহ। সন্ন্যাসী শুনতে লাগলেন সিংহ-গর্জন কেমন ক'রে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে দৈবকে অতিক্রম করতে চাইলে কি হয়। এ রাজ্যের মঙ্গল চেয়েছিলেন না তিনি? সিংহ গর্জনে গর্জনে জানিয়ে দিচ্ছে তা হয় না, নিয়তিকে জয় করা যায় না।

বৃদ্ধের হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন সন্ন্যাসী। কাতর অনুনয়ে বললেন—'ক্ষমা করো আমায়। বিশ্বাস করো এ আমি চাইনি। আমি প্রাণ থেকে তোমাদের মঙ্গল চেয়েছিলাম।'

তারপর ছুটে চলে গেলেন সামনের দিকে। তাঁর দিকে চেয়ে বৃদ্ধটি অবাক হয়ে একবার শুধু বলল—'ও যে প্রাসাদে সোজা যাবার লুকোন পাকদণ্ডীর রাস্তা রে, সন্ন্যাসী কেমন ক'রে জানল?'

রাজপ্রাসাদে সন্ন্যাসী ঢুকলেন একা। দেউড়ীর ফটক খোলা, উঠোনে দগ্ধ মশাল পড়ে পড়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। মানুষ নেই, জন নেই, দরজার পর দরজা খোলা, শুধু মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে আংটায় আটকানো মশালগুলো জ্বলছে। চওড়া

এ-বারান্দা দেখে মনেও হয় না এখানে একদিন তিলক উৎসব উপলক্ষে কত আলোর মালা সাজানো হয়েছিল, সানাই-এর বাজনা এই বারান্দার খিলানে গম্বুজে কেমন সুন্দর প্রতিধ্বনি তুলেছিল। সন্ন্যাসী এলেন পুজোর ধরে। নিবু নিবু পিদীমের আলোয় দেবমূর্তির পাথরের চোখ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের দিকে যেখানে পাঁজরে বর্শা নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন রাজা। ঘন রক্ত শ্বেতপাথরের বেদীর সামনে চাপ বেঁধে কালো হয়ে আছে।

মাথা নেড়ে অস্ফুটে কী বললেন সন্ন্যাসী, তারপর চলতে লাগলেন তাড়াতাড়ি। দরজার পরে দরজা খোলা, কোথায় যেন পিঁজরায় পাখি ভয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে, কারা যেন ত্রস্তে ছুটে চলে গেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। ঈষৎ নিচু একটি মস্ত লম্বা ঘর দিয়ে ভিতরে চলে এলেন সন্ন্যাসী, যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটি নীরব নিশ্চুপ। একদিন এ ঘরে বসে দুটি ভাই পিদীমের আলোয় যেন কার গল্প শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ত, কে যেন মায়ের স্নেহে এ ঘরটিকে সব হানাহানি হিংসে বিদ্বেষ থেকে আড়াল করে রাখত! দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী, আজো কি সব তেমনি আছে? না ওখানেও সব উলটে পালটে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে? শুনতে পেলেন অস্ফুট কান্না, বিলাপের স্বর—'আমাকে একবারটি যেতে দে, দেখতে দে তাকে, সৌম্য। আমাকে ও নিজে মুখে বলুক এতদিন বাদে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল।'

প্রতিশোধ নিতে এসেছিল? সন্ন্যাসী কপালটি পাথরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে যেন কিসের তাপ জুড়োতে চাইলেন।

'কারো কথা আমি বিশ্বাস করি না সৌম্য, একবারটি তার কাছে যেতে দে আমায়, আমি তাকে দেখি।'

'না।'

সন্ন্যাসী দরজার দু'পাশে দু'হাত রেখে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল মাটিতে, বর্শা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সৌম্য—'কে? কী চাও তুমি?'

'কুশল!'

রাণীমা-র চীৎকার হাত দিয়ে চাপা দিল সৌম্য, টেনে নিয়ে চলল তাঁকে ভিতরের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডান হাতে সজোরে ছুঁড়ে মারল সোনার চাবি—'এই নাও, সব নাও।'

সন্ন্যাসীর কপালে এসে লাগল চাবি। মাটিতে পড়ল। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন রক্ত। হাত চেপে সরে এলেন পিছনে। কানে বাজতে লাগল আর্ত কান্না—'ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে।'

মুখ ফিরিয়ে চলে এলেন সন্ন্যাসী, নিঃশব্দে ছুটে চললেন গলি দিয়ে। গলির পর গলি, তারপর ঘর। সরু সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন পিছনে, পুরানো মহলের দেউড়ীর কাছে। তারপর আর কিছু নেই। শুধু সেই গুহা, শুধু এক পাথরের সিংহ। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধা। আস্তে হাতটি রাখল সন্ন্যাসীর বুকে। বলল—'গঙ্গার সাথে একটা কথাও না বলে চলে যাচ্ছিস কুশল!'

'কুশল! এ নামে আজ কেন ডাকলি গঙ্গা? এ নাম যে পনেরো বছর আগে ফেলে গেছি রাজপ্রাসাদে, যেদিন মাঝরাতে দেওয়ান এসে একটা দশ বছরের ছেলেকে ডেকে নিয়েছিল? এ নাম যে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম নর্মদার জলে। যেদিন জেনেছিলাম যে যে-বাপকে দেখলে ছেলের বুক দশ হাত হ'ত, সে-ই ছেলেকে মারতে লোক পাঠাতে পারে, যে মা-কে ছাড়া আর কিছু জানিনি, সেই মা-ও আপন নয়, এ কথা যেদিন জানলাম সেদিনই যে এ-নাম ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম নর্মদার জলে।'

'তবে আজ তোর গলার স্বরে এত ব্যথা কেন রে কুশল? মায়া-মমতা এখনো লেগে আছে? আচ্ছা, সন্ন্যাসী তুই হ'তে পারিসনি!'

জবাব দিলেন না সন্ন্যাসী। অবসন্ন শরীরটা আজ কেবলই ঢলে পড়তে চাইছে। কিন্তু আর এখানে নয়।

'আর না গঙ্গা, এবার আমি যাই।'

'যাবি? তুই যাবি কুশল?' দু'হাত সন্ন্যাসীর মুখে মাথায় বুলোতে বুলোতে গঙ্গা কাঁপাকাঁপা গলায় বলল—'তপস্যার সবটুকু ফল দিয়ে শঙ্করের দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিয়ে যদি আমার চোখ দুটো ফিরিয়ে দিতিস কুশল, তবে আমি আর কিছু চাইতাম না। শুধু তোকে দেখতাম দু'চোখ ভরে।'

'এই ভাল গঙ্গা, এই ভাল হ'ল।'

'যদি আর একটু থাকতিস্ রে কুশল....'

'না গঙ্গা। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম সব যদি বা পালটে যায় তবু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা সব এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে কি না!'

গঙ্গা ফিসফিস ক'রে বলল—'ওদের দোষ নেই, ওরা ভয় পেয়েছে।'

'শুধু তুই একরকম আছিস গঙ্গা'...গঙ্গাকে একবার জাপটে ধ'রে তারপর চলে গেলেন সন্ন্যাসী সুড়ঙ্গের দিকে। এই পথ দিয়ে পনেরো বছর আগে একরাতে...

'কুশল, ওপথে যাস্ না।'

সিঁড়ির পর সিঁড়ি, কী রকম শক্তি হারিয়ে ফেলছেন আজ, নামতে পারবেন তো। শরীর থেকে যেন জীবনীশক্তি চলে যাচ্ছে—কপাল থেকে রক্ত পড়ছে বলে?

'কুশল, আমার কথা শোন্। ও পথ কবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন রাজামশায়।'

গঙ্গার কথা কিছুতেই শুনবেন না সন্ন্যাসী। এই সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেই নিশ্চয় পথ পাওয়া যাবে।

'কুশল, রাজকোষের সব ধনরত্ন ওখানে রেখে...রোস।'

গঙ্গার কথা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। একটু কানে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এতক্ষণ ধরে নামছেন, তবু সিঁড়ি শেষ হতে চায়না কেন?

'...কেউ যাতে সন্ধান না পায় তাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যাবার পথ দিলেন বন্ধ করে।...কুশল!'

গঙ্গার শেষ কথাটা হারিয়ে গেল হাহাকারে। সে কান্না বুঝি গুহার বুকে গমগম করে উঠল এমন ক'রে যে অস্ফুট আর্তনাদ, পড়ে যাবার শব্দ, কিছুই শোনা গেল না। শুধু ক্ষীণ শোনা গেল একটা মর্মর শব্দ, যেন পাথর উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ছে একটার পর একটা ।

'তারপর?'

'আর কিছু নেই।'

'তবে এ শুধু মিছে কথা নয়? সত্যিই আজও লুকোন আছে ধনরত্ন সেই সুড়ঙ্গে?'

সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

'বলুন?'

লোকটি হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে বলল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল ধুনীর নিবন্ত আগুন বড় বেশী হেঁয়ালি রচনা করছে। কোথায় গেল গুহার গায়ের সেই বড় বড় ছবি; তীর ধনুক, লোহার ঘণ্টা, এ কি?

ঝটপট ঝটপট শব্দ। চামচিকে আর বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। ভিতরে ঢুকল কখন?

'তুমি মিথ্যাকথা বলেছিলে।'

চমকে উঠল লোকটি। হাঁটুর উপর চিবুক রেখে সন্ন্যাসী তার দিকে চেয়ে আছেন।

'কে, কে বলেছে?'

'এ বংশের কেউ বেঁচে নেই। যদি কোনদিন এমন কেউ আসে...কিন্তু তুমি এত করলে কেন? লোভ? গুপ্তধনের সন্ধান চেয়েছিলে? বল!' সন্ন্যাসীর কণ্ঠ গমগম ক'রে উঠল।

'আমি...আমি চলে যেতে চাই...।'

'চলে যেতে চাও! সকলেই চলে যেতে চায়...তোমার আগে একজন সাহেব

এসেছিল সে-ও চলে যেতে চেয়েছিল...তার আগে একজন।'

গুহার মুখ লতাপাতায় ঢেকে যাচ্ছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা শেকড় নেমে আসছে ধীরে ধীরে। লাফিয়ে উঠে পড়ল লোকটি। দেখতে পেয়েছে সে, কানের পাশে সাদা চুল, শীর্ণ শরীর, সন্ন্যাসী মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

আর্তনাদ করে বেরিয়ে এল লোকটি, সিংহ-স্তম্ভের পাথরটা ধরে হাঁপাতে থাকল, অন্ধকার, অন্ধকার সব। শুধু তারার আলোয় অন্ধকারটা স্বচ্ছ মনে হয়।

সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে, তার চোখের সামনে স্তম্ভ থেকে ক্রুদ্ধ সিংহ ঘাড় নামাল। তার চোখে চোখ রেখে গর্জন করে উঠল হাঁ ক'রে।

সকাল বেলা গ্রামের লোকরা তার মৃতদেহ পেল গুহার মুখে। আশ্চর্য, মৃতদেহে কোথাও আঘাতের চিহ্নমাত্র ছিল না, বিস্ফারিত প্রাণহীন দুই চোখে শুধু ছিল ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

সে দুর্গপ্রাসাদ আর বিস্মৃত সে-রত্নভাণ্ডারের সন্ধান নিতে আর কেউ কোনদিন যায়নি সেখানে।

অগাধ জলের রুই-কাতলা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

টেলিফোনের রিসিভার ধরে বিমল বললে, হ্যালো! কে? সুন্দরবাবু? নমস্কার মশাই, নমস্কার! কি বলছেন? আমাদের দরকার? কেন বলুন দেখি? পরামর্শ করবেন? কিসের পরামর্শ ? রহস্যময় হত্যাকাণ্ড, আসামী নিরুদ্দেশ? কিন্তু সে জন্যে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে বলুন আমরা তো ডিটেকটিভ নই। আপনার ডিটেকটিভ বন্ধু জয়ন্তবাবুর কাছে যান না। তিনি অন্য একটা মামলা নিয়ে বাইরে গিয়েছেন? ও! আচ্ছা আসতে ইচ্ছে করেন, আসুন—কিন্তু আমরা বোধ হয় আপনার কোন কাজেই লাগব না, কারণ গোয়েন্দাগিরিতে আমরা হচ্ছি নিতান্ত গোলা ব্যক্তি, কিছুই জানি না বললেও চলে। কি বলছেন? আমাদের ওপরে আপনার গভীর বিশ্বাস? ধন্যবাদ...।

এখানে এসে চা খাবেন? বেশ তো! গোটা-দুয়েক এগ-পোচ পেলেও খুশি

হবেন? চারটে 'পোচ্' পেলেও আপত্তি করবেন না? তথাস্তু ! রিসিভারটি রেখে দিয়ে বিমল ফিরে বললে, 'বাঘা, রামহরিকে ডেকে আন তো!'

বাঘা তখন উপর দিকে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ভাবছিল, দেওয়ালের গা থেকে ওই টিকটিকিটাকে কি উপায় টেনে নিচে নামানো যায়। বিমলের ফরমাশ শুনে সে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মানুষের ছোট ছোট কোন কোন কথা কুকুর হলেও বাঘা বুঝতে পারত। যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁরাই এ কথা জানেন।

একটু পরেই বাইরে থেকে রামহরির গলা পাওয়া গেল—'ছাড়, ছাড়। ওরে হতচ্ছাড়া, কাপড় যে ছিঁড়ে যাবে, এমন ছিনেজোঁক ধড়িবাজ কুকুর তো কখনো দেখিনি!' তারপরেই দেখা গেল, রামহরির কোঁচার খুঁট কামড়ে ধরে বাঘা তাকে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে এনে হাজির করলে। রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমিই বুঝি বাঘাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ?

বিমল হেসে বললে, 'লেলিয়ে দিইনি, তোমাকে ডেকে আনতে বলেছি। শোন রামহরি, মিনিট দশেকের মধ্যেই ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু এখানে এসে পড়বেন, তিনি তোমার হাতে তৈরি চা আর এগ্‌পোচের পরম ভক্ত! অতএব বুঝেছ?' রামহরি ঘাড় নেড়ে বললে, 'সব' 'সব বুঝেছি?' কুমার ঘরের এক কোণে বসে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। মুখ তুলে বললে, 'আর বুঝেছ রামহরি, আমাদেরও পেটে যে খিদে নেই এমন কথা জোর করে বলতে পারি না।' রামহরি বললে, 'সব বুঝেছি। তোমরা দুটিতেই যে বাঘার মতই পেটুক আমি তা খুব জানি। খাবারের নাম শুনলেই তোমাদের খিদে পায়।' কুমার বললে, 'খাবারে নাম তো দূরের কথা রামহরি, তোমার নাম শুনলেই আমাদের খিদেয় ঘুম ভেঙে যায় বুঝেছ?' 'সব বুঝেছি। ভয় হয় এইবারে কোনদিন হয়তো আমাকেই গপ করে গিলে ফেলতে চাইবে—' বলতে বলতে রামহরি বেরিয়ে গেল।

বিমল বললে, 'কুমার, সেই ড্রাগনের দুঃস্বপ্নের মামলার পর থেকেই আমাদের উপর সুন্দরবাবুর বিশ্বাস খুব প্রবল হয়ে উঠেছে দেখছি। কি একটা হত্যাকাণ্ড তদ্বির করার ভার পড়েছে তাঁর উপর, তাই নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছেন।' কুমার বললে, 'হত্যাকাণ্ডটা নিশ্চয়ই রহস্যময়, নইলে পরামর্শের দরকার হত না।

অল্পক্ষণ পরেই মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ শুনে বিমল পথের ধারের জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, গাড়ির ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছে সুন্দরবাবুর কাঁসার রেকাবির মত তেলা টাক এবং ধামার মত মস্ত ভুঁড়ি। বিমল হাঁকলে, 'রামহরি অতিথি দ্বারদেশে, তুমি প্রস্তুত হও।' টেবিলের উপরে তখনও চা এবং খাবারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল। বিমল সোফার উপরে ভাল করে বসে বললে, 'সুন্দরবাবু'

এইবার আপনার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা শুরু করুন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম তাহলে শুনুন। যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম মোহনলাল বিশ্বাস। লোকটি খুব ধনী আর তাঁর বয়স ষাটের কম নয়। তিনি নিজের বাড়িতে একলাই বাস করতেন, কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্র কেউ আর বেঁচে নেই। আত্মীয়ের মধ্যে কেবল এক ভাগিনেয়, তিনিই বর্তমানে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী, তাঁর নাম ভূপতিবাবু। বেড়াতে আর শিকার করতে ভালবাসেন বলে আজ তিন বৎসর ধরে ভারতের নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কলকাতায় ভূপতিবাবুরও নিজের বাড়ি আছে। মোহনবাবু বাড়ির পিছনেই একটি ষাট-পয়ষট্টি গজ লম্বা বাগান, তারপরেই ছোট রাস্তার উপরে ভূপতিবাবুর বাড়ি।

মাসখানেক আগে মোহনবাবু নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ে যে, ভূপতিবাবুও খবর পেয়ে বিদেশ থেকে চলে আসেন। তিনি তখন রেঙ্গুনে ছিলেন।

তারপর কিন্তু মোহনবাবুর অবস্থা আবার ভালোর দিকে ফিরতে থাকে। ডাক্তারদের মতে, ভূপতিবাবুর আশ্চর্য সেবা-শুশ্রূষার গুণেই মোহনবাবুর অবস্থা হয় আবার উন্নত। কিন্তু তাঁর যম তাঁকে ছাড়লে না, তাঁর কাল ফুরিয়েছিল। পরশুদিন দুপুর বেলায় মোহনবাবু দোতলার ঘরে বিছানার উপরে আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘরের ভিতরে আর কেউ ছিল না।

পাশের ঘরে ছিল নার্স। মোহনবাবুর ঘরে ঢোকবার দরজা আছে একটি মাত্র। সেই দরজার সামনেই বারান্দার উপরে মাদুর বিছিয়ে বিশ্রাম করছিল বাড়ির পুরোন চাকর চন্দর। তাকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে কোন লোকের ঘরের ভিতরে ঢোকবার উপায় ছিল না। সে ছেলেবেলা থেকে এই বাড়িতেই কাজ করছে। চন্দর এত বিশ্বাসী লোক যে, সকল সন্দেহের অতীত।

ভূপতিবাবু তখন আহার ও বিশ্রাম করবার জন্যে নিজেদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় ছিল দ্বারবান। সে বলে, বাইরে থেকে কোন লোক বাড়ির ভিতরে ঢোকেনি। চন্দর বলে সে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল, বারান্দা দিয়ে কোন লোক তাকে পেরিয়ে ঘরের ভিতরে যায়নি।

বেলা তখন দেড়টা। ঘরের ভিতর থেকে মোহনবাবু হঠাৎ উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন।

সেই চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে নার্স ছুটে এল। চন্দরও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে দরজা ঠেলে মোহনবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। মোহনবাবুর মুখ দিয়ে তখন ফেণা উঠছে আর গাল দিয়ে বেরুচ্ছে গোঁ-গোঁ আওয়াজ। দেখতে দেখতে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

নার্স ও চন্দন দুজনেই নিশ্চিতভাবে বলেছে, ঘরের ভিতরে মোহনবাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

খবর পেয়ে ভূপতিবাবু ও-বাড়ি থেকে ছুটে এলেন। তখনি ডাক্তারও এসে পড়লেন। কিন্তু তাঁর সামনেই অল্পক্ষণ পরে মোহনবাবুর মৃত্যু হল। ডাক্তারের মতে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, কোন রকম তীব্র বিষ। অকারণে বিষের সৃষ্টি হয় নি। মোহনবাবুর কাঁধের উপর বিদ্ধ হয়েছিল অদ্ভুত একটি অস্ত্র। এমন অস্ত্র আমি জীবনে দেখিনি। এটা যে বিষাক্ত তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এই দেখুন—' বলে সুন্দরবাবু মোড়কের ভিতর থেকে সন্তর্পণে কাঠির মতন একটি জিনিস বের করলেন।

বিমল সাগ্রহে সেটিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। লম্বায় সেটি এক বিঘত। চওড়ায় নরুণের চেয়ে মোটা নয়। তার মুখটা তীক্ষ্ণ আর একদিকে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটি সোলার চোঙা বা নল বসানো। বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, এই কাঠিটি কোন্ কাঠ দিয়ে তৈরি, বুঝতে পেরেছেন?'

'হুম, না!' 'সাগু কাঠ দিয়ে।' 'কাঠ-ফাঠ নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমাদের এখন জানা দরকার ওই বিষাক্ত কাঠের সূচ দিয়ে মোহনবাবুকে আঘাত করলে কে? অস্ত্রটা তো আর আকাশ থেকে খসে পড়েনি?' কুমার বললে, 'কার উপরে আপনার সন্দেহ হয়?'

'কপাল দোষে সন্দেহ করবার কোন লোকই পাচ্ছি না। ঘরের আশেপাশে হাজির ছিল কেবল দুজন লোক—নার্স আর চন্দর। কিন্তু মোহনবাবুকে খুন করবে তারা কোন্ উদ্দেশ্যে? মোহনবাবুর ঘরের ভিতর থেকে টাকা বা কোন দামী জিনিসও চুরি যায়নি। তাঁর মৃত্যুতে তাদের কোনই লাভ নেই বরং লোকসান আছে। মোহনবাবুর মৃত্যুর জন্যে লাভ হবে খালি ভূপতিবাবুর। কারণ তিনিই তাঁর বিশ লাখ টাকা দামের সম্পত্তির মালিক হবেন। কিন্তু তাঁর উপরেও সন্দেহ করবার উপায় নেই। কারণ প্রথমত, ঘটনার সময় তিনি যে নিজের বাড়িতে ছিলেন, এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, দ্বারবানের চোখ এড়িয়ে এ-বাড়িতে, আর চন্দরের চোখ এড়িয়ে মোহনবাবুর ঘরে ঢোকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয়ত, তিনি যদি মোহনবাবুর মৃত্যু চাইতেন, তবে সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে নিউমোনিয়ার কবল থেকে উদ্ধার করতেন না। চতুর্থত, মোহনবাবুর মৃত্যুতে তিনি এমন কাতর হয়ে পড়েছেন যে তার আর বলা যায় না। হুম, ভাল কথা। একটা কথা আপনাকে এখনও বলা হয়নি। ভূপতিবাবু অঙ্গীকার করেছেন, মোহনবাবুর হত্যাকারীকে যে ধরে দিতে পারবে, তাকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন!'

বিমল বললে, 'বলেন কি, বি-শ-হা-জা-র টা-কা?' 'হ্যাঁ। সেই জন্যই তো

মামলাটা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাচ্ছি! কিন্তু হায় রে, ব্যাপার যা দেখছি, হত্যাকারীর নাগাল পাওয়া একরকম অসম্ভব বললেও চলে। হুম, আমার কপাল বড় মন্দ!'

বিমল খানিকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সাগুকাঠের সেই কাঠিটির দিকে। তারপর সে বললে, 'বিশ হাজার টাকা পুরস্কার! এ লোভ সামলানো শক্ত। আচ্ছা সুন্দরবাবু, এ বিষয় নিয়ে আমি ভূপতিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চাই!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ তো এখনি আমার সঙ্গে চলুন না!' ভূপতিবাবুর বাড়িখানি বড় নয় কিন্তু দিব্যি সাজানো-গুছানো।'

তিনি বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন। সুন্দরবাবু তাঁর সঙ্গে বিমল ও কুমারের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভূপতিবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, চেহারা লম্বা-চওড়া, রং ফর্সা, মুখশ্রী সুন্দর।

বিমল হাসিমুখে বললে, "আপনার বিশ হাজার টাকার গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।'

ভূপতিবাবু বললেন, হ্যাঁ, হত্যাকারীকে কেউ ধরতে পারলেই ওই টাকা আমি উপহার দেব। এর মধ্যেই আমি বিশ হাজার টাকার একখানি চেক আমার এটর্নির কাছে জমা রেখেছি।

বিমল নীরবে কৌতূহলী চোখে ঘরের সাজ-সজ্জা লক্ষ্য করতে লাগল। এ ঘরের ভিতরে এলেই বোঝা যায়, এই মালিক খুব শিকার-ভক্ত লোক। মেঝের উপরে বাঘ-ভাল্লুকের ছাল পাতা এবং দেয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে বুনো মোষ আর হরিণের মাথা বা শিং এবং হরেক রকম ধনুক, তরবারি বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। বিমল বললে, 'আপনি কি শিকার করতে খুব ভালবাসেন?'

ভূপতিবাবু বললেন, 'খুব—খুব বেশি ভালবাসি। শিকারের লোভে আমি কোথায় না গিয়েছি। আফ্রিকা, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলোন, বর্মা কিছুই আর বাকি নেই। ওই যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেখছেন, ওগুলি আমি নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।' সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম আমিও শিকার করতে ভালবাসি। তবে আপনি করেন জন্তু শিকার, আর আমি করি মানুষ শিকার।' বিমল বললে, 'মোহনবাবুর বাড়ি এখান থেকে কোন দিকে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উত্তর দিকে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখুন না, ওই যে বাগানের ওপারে ওই লাল বাড়িখানা। দোতলার ডানপাশে সব-শেষে যে ঘরখানা দেখছেন, ওই ঘরেই হতভাগ্য মোহনবাবুর মৃত্যু হয়েছে। মাঝখানের

জানলার দিকে চেয়ে দেখুন, যে খাটে তিনি শুতেন, তারও খানিক অংশ এখান থেকে দেখতে পাবেন।' ভূপতিবাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, 'ও-ঘরের দিকে তাকালেও আমার বুকটা হু-হু করে ওঠে।' বিমল সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক ভূপতিবাবু। আপনি কি এই বাগান পেরিয়েই ওই বাড়িতেই যেতেন?' 'না, ওর ভেতর দিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। একে তো চারদিকেই উঁচু পাঁচিল তার উপরে ওটা হচ্ছে পরের বাগান! বাগানের ওপার থেকে ও-বাড়িতে ঢোকবার কোন দরজাও নেই।' সুন্দরবাবু বিমলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে এসে বিশ হাজার টাকার পাকা খবরটা পেলেন তো? এখন চলুন, আমার হাতে অনেক কাজ আছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ যাচ্ছি। ভূপতিবাবুর এই ঘরখানি আমার ভারি ভাল লাগছে—' বলতে বলতে ও চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই বর্শাটা কোন্ দেশের ভূপতিবাবু?'

'বোর্নিওর।' বিমল হাত বাড়িয়ে বর্শাটা নামাতে গেল, কিন্তু ভূপতিবাবু শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'হাঁ হাঁ, করেন কি করেন কি! ওর ফলায় বিষ আছে!' কিন্তু বিমল ততক্ষণ বর্শাটা নামিয়ে নিয়েছে। সে শান্তভাবে বললে, 'ভয় নেই, আমি খুব সাবধানেই এটা নাড়াচাড়া করব। কিন্তু এর ফলায় কী বিষ আছে? ইপো-গাছের বিষ?'

ভূপতিবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বললে, 'বর্শার ডান্ডিটা তো দেখছি জাজাং-কাঠে তৈরি।' সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এর ডান্ডিটা আবার ফাঁপা। এর কারণ কি বিমল বাবু?' 'কারণ এর দ্বারা বর্শার কাজ চালানো গেলেও আসলে এটি বর্শা নয়, বোর্নিওয় একে কি বলে ডাকা হয় ভূপতিবাবু?' 'আমার মনে নেই।' 'আমার মনে আছে। এর নাম হচ্ছে সুম্পিটান।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা কি বিচ্ছিরি নাম! কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? আপনিও কি বোর্নিওয় গিয়েছিলেন?' 'গিয়েছিলুম। সুম্পিটান ব্যবহার করতেও শিখেছিলুম। এটা একবার ধরুন না, আপনাকেও এর ব্যবহার হাতে-নাতে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি ভুঁড়ি দুলিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম। আমি ওর ব্যবহার-ট্যবহার শিখতে চাই না। শেষটা কি বিষ-টিষ লেগে খুন-টুন হব? আপনি ও আপদ রেখে দিয়ে আসবেন তো আসুন! আমার হাতে ছেলেখেলা করবার সময় নেই।' 'আর একটু সবুর করুন সুন্দরবাবু, আপনাকে সুম্পিটানের

বাহাদুরিটা না দেখিয়ে আমি এখান থেকে এক পা নড়ছি না! হ্যাঁ, সাগু-কাঠের কাঠিটা আমাকে একবার দিন তো!'

সুন্দরবাবু কাঠিটা বিমলের হাতে দিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'আপনার মতলবটা কি?'

বিমল জবাব না দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সাগুকাঠের কাঠিটা আগে বর্শার ফাঁপা ডান্ডির গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর জানলা গলিয়ে ডান্ডিটাকে দুই হাতে তলার দিকে ধরে উঁচু করে ফেললে। তারপর ডান্ডির তলার দিক মুখে পুরে দুই গাল ফুলিয়ে খুব জোরে দিলে বিষম এক ফুঁ। বাগানের ওপারে মোহনবাবুর বাড়ির ছাদের উপর একটা চিল চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ সে ঘুরতে ঘুরতে ধুপ্ করে মাটির উপরে পড়ে গেল। সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কোথাও কিচ্ছু নেই, খামোকা চিলটা পড়ে গেল কেন?'

বিমল বর্শাটা নামিয়ে সহজভাবেই বললে, 'আপনার সাগু-কাঠের কাঠিটা তার পায়ে গিয়ে বিঁধেছে। সুন্দরবাবু, সুম্পিটানের ইংরেজি নাম কি জানেন? 'ব্লো-পাইপ।' বোর্নিওর লোকেরা 'ব্লো-পাইপে' বিষাক্ত কাঠি ঢুকিয়ে এইভাবে জন্তু বা শত্রু নিপাত করে। এই তীরকাঠির গতি বড় কম নয়, সত্তর গজ দূরেও সে মারাত্মক। বোর্নিওর কাঠিতে ইপো গাছের বিষ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কাঠিতে অন্য কোন রকম বেশি-তীব্র বিষ মাখানো হয়েছে। আরে, আরে ভূপতিবাবু! পায়ে পায়ে পিছু হটে কোথায় যাচ্ছেন? আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইছি বটে, কিন্তু ওই আরশিখানার দিকে চেয়ে আপনার ওপরেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। পালাবার চেষ্টা করবেন না, আমি বর্শা ছুঁড়লে আপনি মারা পড়তে পারেন। আপনার মত দুরাত্মা ছুঁচোকে মেরে আমি হাত গন্ধ করতে চাই না! আসল ব্যাপার কি জানেন সুন্দরবাবু? এই ভূপতি মোহনবাবুর লোক-দেখানো সেবা করেছিল, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি এ-যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পাবেন না। কিন্তু মোহনবাবু যখন আবার সামলে উঠে ভূপতির বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার যোগাড় করলেন, ভূপতি তখন মরিয়া হয়ে 'ব্লো-পাইপের' আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সে বোর্নিওয় গিয়ে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শিখেছিল। এখান থেকে খাটের উপর শয্যাশায়ী মোহনবাবুকে দেখা যায়। এখান থেকে পথের কাঁটা সরালে ভূপতিকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ বাংলাদেশের পুলিশ ওই সাগুকাঠের আসল রহস্য চিনবে কি করে? অতএব সে নির্ভাবনায় করে বসল বিশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা। ভূপতি হচ্ছে অগাধ জলের রুই-কাতলা।

কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ দৈবগতিকে ডেকে এনেছে জল-স্থল-শূন্যের পরিব্রাজক বিমল আর কুমারকে! কাজে কাজেই ভূপতির পুরস্কারের ঘোষণা ব্যর্থ

হল না, সে যখন ফাঁসিকাঠে দোললীলার সুখ উপভোগ করবে, তখন আপনি আর আমি করব বিশ হাজার টাকা আধাআধি ভাগ করে নেবার সাধু চেষ্টা! কি বলেন?'

সুন্দরবাবু পকেট থেকে হাতকড়া বার করে ভূপতির দিকে এগুতে এগুতে কেবল বললেন, 'হুম!'

সুন্দরবাবুর এই বিখ্যাত 'হুম' হচ্ছে আশ্চর্য শব্দ। এর দ্বারা তিনি হাস্য, করুণ, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্ত প্রভৃতির শাস্ত্রোক্ত নয় রকম রসেরই ভাব প্রকাশ করতে পারেন।

সর্প অঙ্গুরীয়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কয়েকদিন থেকেই দেখছিলাম কিরীটী একটা জাল দলিলের রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্যস্ত আছে। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই আকাশটা মেঘলা করে আছে।

একটা থমথমে গুমোট গরম, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে।

একটা চেয়ারের উপরে বসে সামনের একটা টিপয়ের উপরে একটা দলিল নিয়ে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কিরীটী আত্মসমাহিত হয়ে আছে।

আমি আনমনে একটা ইংরেজী সাময়িক পত্রের পাতাগুলো বার বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টোচ্ছিলাম। সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটী দলিলটা থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'শ্রীমান জংলী বাহাদুর অত দ্রুত পদবিক্ষেপে আসছেন কেন?'

জংলী এসে ঘরে প্রবেশ করল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'কি রে! অত হাঁপাচ্ছিস কেন?'—কিরীটী পূর্ববৎ দলিলটার দিকে নজর রেখেই প্রশ্ন করল।

'বললাম, বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না—তা আমাকে মুখ খিঁচিয়ে মারতে এল'—হাঁপাতে হাঁপাতে জংলী বলল।

'মারতে এল! বলিস কি রে! কে মারতে এল?'

'কে আবার...নীচে যে লোকটা এসেছে! একটা বড় গাড়িতে করে এসেছে ত একেবারে মাথা যেন কিনে নিয়েছে—'

'সত্যিই ত! দেখ ত সুব্রত, কে এমন অভদ্র ব্যক্তি এলেন'—হাসতে হাসতে কিরীটী আমাকে বলল।

অগত্যা সোফা ছেড়ে উঠতেই হ'ল।

নীচে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ! এ যে নবীপুর স্টেটের রাজা বাহাদুর স্বয়ং।

'মহারাজ, আপনি!'

'হ্যাঁ। আচ্ছা অভদ্র চাকর ত আপনাদের—বলছি, বিশেষ জরুরী কাজ আছে—মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তা বলল, বাবু ব্যস্ত—দেখা হবে না।'

'আসুন আপনি। ওর কোন দোষ নেই—ওর উপরে ঐরকমই আদেশ ছিল।'

রাজা বাহাদুরকে নিয়ে উপরে চললাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই কিরীটী সাদর আহ্বান জানাল, 'কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন—'!

রাজা বাহাদুর কিরীটীর আহ্বানে আসন গ্রহণ করলেন।

'আপনার সঙ্গে private কথা ছিল, মিঃ রায়!—'

কিরীটী কাগজটা সরিয়ে রেখে সহাস্যমুখে বলল, 'বলুন। সুব্রত আমার দক্ষিণ হস্ত, আপনি তো জানেন। নির্ভয়ে বলুন।'

'সে-বারে আমার উইলের ব্যাপারে বুঝেছি, আপনার বুদ্ধিটা বেশ প্রখর, তাই আপনার কাছেই এলাম। আমার সেই ঝানু নায়েবটাকে আপনার মনে আছে ত! That imp of a Satan! ষড়যন্ত্র করে সে আমার বোকা ছেলেটার সঙ্গে তার মেয়েটির বিবাহ দিয়ে আমার সমস্ত সম্পত্তিটা বাগাবার চেষ্টায় ছিল—'

'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি!' কিরীটী মৃদু হাস্যের সঙ্গে জবাব দিল।

'এটাও সেই শয়তানের কীর্তি! I am sure! আমাদের বংশে একটা পাঁচ-পুরুষের সম্পত্তি আঙটি ছিল—সাপ আঙটি। সাপের দুটো চোখে দুটো হীরা বসানো। মূল্য তার অবশ্য এমন কিছু হবে না, কিন্তু ওটাই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। এক কাপালিক আমাদের পূর্বপুরুষকে দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ঐ আঙটি যতকাল আমাদের ঘরে থাকবে, আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও ততকাল আমাদের

ঘরে অচলা থাকবেন। বুঝতেই পারছেন—'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'সেই আঙটিটা ঐ শয়তান চুরি করেছে।—'

'চুরি করেছে! আঙটিটা কোথায় ছিল?'

'কোথায় আবার থাকবে—আমার ডান হাতের অনামিকাতেই ছিল—'

সহসা কিরীটী রাজা বাহাদুরের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার হাতে যে আঙটিটা দেখছি—'

'এটা একটা imitation! নকল আঙটি—কাল রাত্রেই প্রথম টের পেলাম। ওকে আমি খুনই করে ফেলতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাঁদা গঙ্গারামটার জন্যই পারিনি—ও বেটা একেবারে বেঁকে বসেছে, ঐ মেয়েটাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই করবে না।'

'তা বুঝলেন কি করে যে, আঙটিটা আসল নয়—নকল?'

কিরীটীর কথায় রাজা বাহাদুর যেন একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিরিক্ষি ভাবে বললেন, 'আসল আঙটি আমি চিনি না? আজ চব্বিশ বছর ধরে সে আঙটিটা ব্যবহার করছি দেখুন না!'—বলতে বলতে আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে কিরীটীর সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সাপের চোখের পাথর দুটো কি হীরা? ও ত কাচ। সামান্য কাচ।'

কিরীটী আঙটিটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

আমিও আঙটিটা ভাল করে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম।

আসল কি নকল জানি না। আঙটিটা কিন্তু সত্যিই অপূর্ব। দুটি সাপ পরস্পর পরস্পরকে পেঁচিয়ে উঠেছে, একটি সাপের মাথা আর-একটি সাপের মাথার পাশাপাশি—দুটি সাপের বাইরের দিকের একটি করে চোখে পাথর বসানো।

'এটা নকল?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—বললাম ত আপনাকে। তাছাড়া, দেখুন না—আঙটিটা দেখলেই বোঝা যায়—একেবারে নতুন—ভিতরের দিকে একটুও ক্ষয় হয়নি।'

সত্যি, রাজা বাহাদুরের কথাই ঠিক।

'শয়তানটাকে আমি ছাড়িনি। প্রাসাদেই আটকে রেখেছি। আমি স্থিরনিশ্চিত, ও ছাড়া আঙটি আর কেউ নেয়নি। নিতে পারে না। ওর গহ্বর থেকে আঙটিটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। যত টাকা আপনি চান, আমি দেব।'

'কিন্তু—'

'না-না, মিঃ রায়, আপনি আর 'কিন্তু' করবেন না। আঙটিটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতেই হবে।'

'ধরুন, আপনার অনুমান যদি সত্যিই হয়, নায়েবজীই যদি আঙটিটা চুরি করে থাকেন, সেটা কি আর তিনি কাছে রেখেছেন? তাঁর বাড়ি ঘরদোর সার্চ করলেন না কেন?'

'বাড়ি-ঘর চাল-চুলো আছে নাকি কিছু ওর? আমার প্রাসাদেই ত থাকে family নিয়ে!'

'ও। তা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'করিনি! ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছি। বেটা ঝানু। কেবলই বলে, জানি না।'

'এমনও ত হতে পারে, সত্যি-সত্যিই উনি আঙটিটা নেননি—'

'নেননি মানে! ও-ই নিশ্চয়ই নিয়েছে! তাছাড়া আর কার এত বড় বুকের পাটা হবে?—আপনি আমার সঙ্গে চলুন—আপনার কাছে নিশ্চয়ই ওর জারিজুরি খাটবে না—আঙটি বের করে দিতে পথ পাবে না।'

'এখন ত ঠিক সময় করে উঠতে পারছি না, রাজা বাহাদুর। কাল সকালের দিকে যাব।'

'কাল সকালে?'

'হ্যাঁ, যদি সত্যিই আঙটি তিনি নিয়ে থাকেন এবং আপনার এখানেই তিনি থাকেন, তাহলে আঙটি ঐ প্রাসাদের মধ্যেই আছে—অন্য কোথাও যায়নি। আর আঙটি ওঁর কাছে থাকলে খুঁজে বের করে নিতে এমন কিছুই কষ্ট হবে না।—হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি যে আমার কাছে এসেছেন, উনি তা জানেন কি?'

'না। ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিইনি সে-কথা।'

'বেশ। তবে সেই কথাই রইল। আপনি এখন যান, কাল সকালে আমি যাব।'

।। দুই।।

পরের দিন প্রত্যুষেই আমরা নবীপুর স্টেটের দিকে রওনা হলাম।

বুঝে উঠতে ঠিক পারছিলাম না, আঙটিটা যদি সত্যিই সেই ভদ্রলোক চুরি করে থাকেন, তবে সেটা কিরীটী খুঁজে বের করবে কেমন করে? ছোট্ট একটা আঙটি খুঁজে বের করা কি সহজ? অত বড় একটা প্রাসাদের মধ্যে—এ যে খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বেড়াবার মত। কিন্তু কিরীটী যেন একান্ত নির্বিকার। কোন দুশ্চিন্তা যেন তার ও-ব্যাপারে নেই।

গাড়ি চালাচ্ছিল হীরা সিং। আমরা দুজনে পশ্চাতের সীটে বসে পাশাপাশি।

হঠাৎ আমিই প্রশ্ন করলাম, 'যাচ্ছিস ত, আঙটি খুঁজে বের করতে পারবি ত?'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? রাজা বাহাদুর যা বলে গেলেন, যদি আসলে ব্যাপারটা তাই হয়, তবে রামগতি মুখুজ্জের হাত থেকে আঙটিটা উদ্ধার করতে খুব

বেশী বেগ পেতে হয়ত হবে না।'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুই যখন সেখানে যাচ্ছিস, তখন নিশ্চয়ই line of action একটা মনে মনে এঁকে নিয়েছিস।'

'না রে, না। আসল কথা কি জানিস? ঐ বদ্ধ পাগল রাজা বাহাদুরকে আমার বড্ড ভাল লাগে। গত বারের সেই উইল-চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারের পর থেকেই কেমন যেন ওঁর উপরে আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছে। স্রেফ্ সেই দুর্বলতাই আমাকে আজকে নবীপুরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আরো একটা কথা আছে, রাজা বাহাদুর যে সর্প-অঙ্গুরীয়ের কথা বললেন, সেই অঙ্গুরীয়টার কথা বহুদিন পূর্বে একবার আমি আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম।'

'কি রকম?'

'চার পুরুষ আগে চৌধুরী-বংশের সনাতন চৌধুরী নবাবের দরবারে সামান্য টাকা মাইনের চাকরি করতেন। লোকটার দান-ধ্যানে প্রচুর হাত ছিল। একবার এক কাপালিককে নদীর স্রোত থেকে সনাতন চৌধুরী বাঁচান। কথিত আছে, সেই কাপালিকই নাকি সন্তুষ্ট হয়ে সনাতন চৌধুরীকে ঐ মন্ত্রপূত সর্প-অঙ্গুরীয়টি দেন। এবং সেই থেকেই চৌধুরী বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়েছে। এবং কালক্রমে নবাব-দরবার থেকে উনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। ঐ সঙ্গে নবীপুরের জমিদারীও চাকরাণ হিসাবে লাভ করেন। তুই ত জানিস, মন্ত্র-তন্ত্র আমি মানি না—বিশ্বাসও করি না। শুনেছি, নাকি আঙটিটা মন্ত্রপূত এবং অদ্ভুত ক্ষমতাও আছে আঙটিটার। তাইত যদি আঙটিটা খুঁজে পাওয়া যায়, একবার দেখবার ইচ্ছা আছে।—'

হুঁ, এতক্ষণে কিছুটা বোঝা গেল।'

।। তিন ।।

নবীপুরে স্টেটে যখন এসে আমরা পৌঁছোলাম, বেলা তখন অপরাহ্ণ। প্রায় সে-আমলের তৈরী প্রকাণ্ড প্রাসাদ অতীত স্থাপত্য-শিল্পের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কাছারি-বাড়িতেই রাজা বাহাদুর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন তিনি। বাইরে কাছারি ঘরে কর্মচারীরা সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, রাজা বাহাদুর আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে একেবারে তাঁর খাস-কামরায় উপস্থিত হলেন।

দু-চারটে কথাবার্তার পর রাজা বাহাদুর হঠাৎ এক সময় বললেন, 'আমি বলিনি কাল আপনাকে, মিঃ রায়,—ঐ শয়তানটাই আমার আঙটিটা চুরি করেছে, Idiot রণুটা আজ সকালে সে কথা স্বীকার করেছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ. ডাকাচ্ছি সেই গদর্ভটাকে—আপনি নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।'

ভৃত্যকে দিয়ে রাজা বাহাদুর তখুনি তাঁর একমাত্র পুত্র রণেন চৌধুরীকে ডেকে পাঠালেন। রণেন চৌধুরীর বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে না। অত্যন্ত সুশ্রী চেহারা, তবে চোখে-মুখে কেমন যেন একটা বোকা-বোকা ভাব। দেখলেই অত্যন্ত গো-বেচারী টাইপের বলে মনে হয়।

'বসুন রণেনবাবু!' কিরীটী রণেন চৌধুরীকে বসবার জন্য আহ্বান জানাল।

রণেনবাবু একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

অতঃপর কিরীটী রাজা বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, রাজা বাহাদুর, আমি ওঁকে আপনার অনুপস্থিতিতে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—'

'বেশ, করুন।' বলতে বলতে হঠাৎ ছেলের দিকে তাকিয়ে রাজা বাহাদুর বললেন, 'Now listen! যদি মিঃ রায়ের কাছে কোন কথা গোপন করবি ত একসঙ্গে তোকে এবং তোর ঐ শ্বশুরকে গুলী করে মারব, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। মনে থাকে যেন—'

অতঃপর রাজা বাহাদুর প্রস্থান করলেন।

কিরীটী দু-চারটে অন্য কথার পর কুমার বাহাদুরকে সোজা একেবারে বলল, 'আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন, কুমার, আপনাদের বংশের সমস্ত সৌভাগ্যের মূল সর্প অঙ্গুরীয়টি আপনার বাবার আঙুল থেকে কিছুদিন আগে চুরি গেছে?'

'জানি'—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন কুমার।

'এও নিশ্চয়ই জানেন, আপনাদের বংশের অনেকখানি প্রেস্টিজও ঐ সর্প অঙ্গুরীয়টি সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে?'

'জানি'—আবার সেই পূর্বের মত ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব।

'আপনার বাবা, মানে রাজা বাহাদুরের ধারণা, আপনাদের নায়েব রামগতিবাবুই নাকি—'

'জানি।'

'কিন্তু সে-সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, সেইটুকু কেবল আপনার কাছে আমি জানতে চাই।'

'আঙটিটা তিনিই নিয়েছেন, তবে এটা বুঝতে পারছি না, কি করে তিনি নিলেন বাবার হাত থেকে আঙটিটা।'

'আপনার বাবার শয়ন-কক্ষে কি ওঁর যাতায়াত ছিল?'

'হ্যাঁ, তা কখন-কখন যান বৈকি! তবে যে সময়ে আঙটিটা চুরি গেছে বলে বাবার ধারণা, তার মাসখানেক আগে থাকতেই ত তিনি ডান পাটা ভেঙে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।'

'শয্যাশায়ী হয়ে আছে? ডান পা ভেঙে?' কিরীটী হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, মাস দেড়েক হবে, হঠাৎ একদিন দোতলার সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা স্লিপ্ করে পায়ের হাড় ভেঙে যায়। সেই থেকেই তিনি পা প্লাস্টার করে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।'

'হুঁ কোথায় তিনি থাকেন? শুনেছি, আপনাদের এই প্রাসাদের মধ্যে নাকি তিনি—'

হ্যাঁ, প্রাসাদের উত্তর মহলে তিনি থাকেন।'

'একটা কথা, কুমার বাহাদুর, আপনি জানলেন কি করে যে আঙটিটা তিনিই নিয়েছেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায় আমি বাবার সন্দেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় বললেন, আঙটিটা নাকি তাঁর কাছেই আছে, আমাদের বিবাহের দিন তিনি আমাকে সেটা আবার ফিরিয়ে দেবেন।'

'আর একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন, কুমার বাহাদুর, ত জিজ্ঞাসা করি—'

'করুন।'

'রামগতিবাবুর মেয়েটিকে কি সত্যিই আপনি বিবাহ করতে চান?'

'হ্যাঁ, মীনুকে আমি ভালবাসি। কিন্তু বাবা মত দিচ্ছেন না কিছুতেই—'

'তার অমতের কোন কারণ আছে বলে আপনার মনে হয়?'

'বাবা বলেন, বংশে ওরা আমাদের থেকে ছোট। কিন্তু আজকাল ওসব ব্যাপার কেউ মানে নাকি!'

'আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন।'

কুমার রণেন এর পর নমস্কার জানিয়ে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। রাজা বাহাদুরের সাহায্যেই পথ চিনে আমরা উত্তর মহলে রামগতিবাবুর কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরখানি বেশ প্রশস্ত এবং মূল্যবান সাজসজ্জায় সজ্জিত।

একটা পালঙ্কের উপরে রামগতিবাবু শুয়েছিলেন এবং তাঁর মাথার ধারে বসে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী একটি কিশোরী তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

বুঝলাম, ঐ কিশোরীই রামগতিবাবুর কন্যা এবং কুমার বাহাদুর ঐ কিশোরীকেই বিবাহ করতে চান। আমরা ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী নিঃশব্দে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

রামগতি কিরীটীকে চিনতে পেরেছিলেন এবং বারেক মাত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিরীটীবাবু! আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য! শেষ পর্যন্ত রাজা বাহাদুর আঙটির ব্যাপারে আপনাকে টেনে নিয়ে এলেন। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল, বলুন ত? রুণাকে ত আমি বলেছিই কাল—আঙটি আমার কাছেই আছে—বিবাহের

দিনই সেটা ফেরত দেব।'

'কিন্তু এটা কি আপনার নিছক জুলুম হচ্ছেনা, রামগতিবাবু?'

'জুলুম? বলুন, শঠে শাঠ্যং। বুড়োকে এবারে বাগে এনেছি। বিয়ে দাও, আঙটি নাও। বলছেন, আমি জুলুম করছি, কিন্তু জুলুম আমি করিনি—করছেন উনিই। এতকাল সকলে জেনে এসেছে মীনুর সঙ্গেই কুমারের বিবাহ হবে, আজ হঠাৎ উনি বেঁকে বসেছেন। এত কাণ্ডের পর এই বিবাহ না হলে আমার মেয়েটির কি দশা হবে, সে কথা একবারও উনি ভাবছেন না।'

আঙটিটা আপনি ফেরত দিয়ে দিন, রামগতিবাবু।—আমি-কিরীটী, কথা দিচ্ছি, এ বিবাহ যাতে হয়, আমি তা করব।'

'বিশ্বাস করি না, মশাই। ও বাস্তুঘুঘুকে একবার হাতের মুঠোর মধ্যে যখন এনেছি, তখন কার্যোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আর সে-বস্তু আমি ফেরত দেব না।'

'আমি বলছি, তাতেও না?'

'না। স্বয়ং ভগবান এসে বললেও না।'

'এই আপনার শেষ কথা?' সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন কঠিন হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ।'

'রামগতিবাবু!'

'মশাই, এ আপনার উইল খুঁজে বের করা নয়!' কঠিন ব্যঙ্গের সঙ্গে কথা কয়টি বললেন রামগতিবাবু।

'এবং আমারও সংকল্প শুনুন,—আঙটি না নিয়ে এ-ঘর থেকে আমি বের হচ্ছি না।' বজ্রকঠোর কণ্ঠে কিরীটী বললে।

'বটে! বেশ, চেষ্টা করে দেখুন তাহলে।'

কিরীটী রামগতির কথার আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে সোজা গিয়ে ঘরের একধারে যে খালি চেয়ারটা ছিল, সেটার উপরে উপবেশন করল এবং একান্ত নির্বিকারভাবেই পকেট হতে চামড়ার সিগারকেসটা বের করে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগে তৎপর হ'ল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন কটু ও তিক্ত মনে হল।

ঘরের আবহাওয়াটাও যেন হঠাৎ কেমন থম্‌থমে ভারী হয়ে উঠেছে।

কিরীটী একান্ত নির্বিকারভাবে বসে সিগারেট থেকে ধূমোদ্গীরণ করছে। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। আমি যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এবং বলতে লজ্জা নেই, বোকার মতই ফ্যালফ্যাল করে ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তাকাতে লাগলাম।

পূর্বেই বলেছি, ঘরটি বেশ সুন্দরভাবেই বহু মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত—দু'খানি দামী কাউচ, একটা আয়না-বসান আলমারি, একটা দেরাজ, একটা লোহার

সিন্দুক। ভাবতে লাগলাম নিজের অজ্ঞাতেই রামগতি কোথায় সেই মূল্যবান অঙ্গরীয়টি গোপন করে রাখতে পারে—কোথায় সেটা রাখা সম্ভব?

হঠাৎ এমন সময় সেই কিশোরী মেয়েটি এক কাপ দুধ নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং বরাবর বাপের শয্যার সামনে এসে ধীর-শান্তকণ্ঠে বলল, 'বাবা, আপনার দুধ।'

'এখন থাক্, মা। ক্ষিদে নেই।'

'সেই কখন খেয়েছেন—এখনো খিদে হয়নি, বাবা?'

'না, মা, থাক্, তুই বরং পানের ডিবেটা দিয়ে যা।'

কিশোরী দুধের কাপটা সামনের টিপয়ে নামিয়ে রেখে অদূরে দেরাজের উপরে রক্ষিত পানের ডিবেটা বাপের হাতে এনে তুলে দিল।

দেখলাম, রামগতির পান খাওয়ার অভ্যাসটা বেশ ভালই আছে। দাঁত, মাড়ি ও ওষ্ঠের অবস্থাটা দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি একজন পাক্কা পানখোর। ডিবে থেকে গোটা পাঁচেক পান মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে, বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে উঠে বসে, বালিশের তলা থেকে হাতড়িয়ে একটা হাতির দাঁতের চৌকো জর্দার কৌটাই হবে বোধ হয় বের করলেন।

আয়েসের সঙ্গে পান চিবুতে চিবুতে জর্দার কৌটা থেকে জর্দা খানিকটা বের করে আলগোছে মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন।

কিরীটীর দিকে তাকালাম—দেখি, কিরীটী আড়চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রামগতির দিকে।

'মিথ্যে কষ্ট করছেন, রায়মশাই—'

হঠাৎ রামগতির কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকালাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গ ও কৌতুক মিশ্রিত চাপা হাসির গর্বোচ্ছ্বাস যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রামগতির।

রামগতির আবার বলতে লাগিলেন, 'তার চাইতে ঐ রাজা বাহাদুরকে গিয়ে বলুন, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকিয়ে দিক—আঙটি তিনি পেয়ে যাবেন।'

রামগতির কথার কোন জবাব না দিয়ে কিরীটী এবারে কিশোরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিকে এস তো।'

কিশোরী এগিয়ে গেল কিরীটীর দিকে।

'কি নাম তোমার?'

'মীনুরানী!'

'তোমাদের মহলটা আমাকে একবার ঘুরিয়ে দেখাবে, মীনুরানী?' মীনু বাপের মুখের দিকে তাকাল!

'যা মা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আয়'—রামগতি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি দিলেন।

'চলুন।'

'এস সুব্রত, মহলটা একবার ঘুরে দেখে আসা যাক্!'

মীনুকে অনুসরণ করে আমরা দু'জনে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ পিছন হতে রামগতির গলা শোনা গেলঃ 'বেড-প্যানটা ঠিক আছে তো মা, বাথরুমে?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে যাস, মা।'

তিনজনে বাইরে বের হয়ে এলাম। মীনু দরজার কপাট দুটো টেনে দিল।

হঠাৎ এমন সময় কিরীটী বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই এগো সুব্রত, আমি উপরে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসছি।'

সহসা কিরীটীকে মত পরিবর্তন করতে দেখে বুঝতে পারলাম, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কিরীটী আমাদের ঐ জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

বিনা বাক্যব্যয়ে দু'জনে অগ্রসর হলাম।

আগে আগে চলেছে মীনু, পশ্চাতে আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি। চকিতে পিছন দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, রামগতির ঘরের ভেজান দ্বারের ফাঁকে চোখ দিয়ে কিরীটী কি-যেন দেখবার চেষ্টা করছে।

।। চার ।।

মিনিট কুড়ি বাদে যখন ঘরের মধ্যে ফিরে এলাম আমি একা, দেখি ঘরের মধ্যে কিরীটী একেবারে রামগতির শয্যা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রামগতির দিকে তাকিয়ে। রামগতি শয্যার উপরে ঠিক পূর্ববৎ বসে এবং তাকিয়ে আছেন কিরীটীর মুখের দিকে। এমন সময় রাজা বাহাদুর এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গে রাজবাড়ির গৃহ-চিকিৎসক।

'এই যে রাজা বাহাদুর আসুন।—ইনিই আপনার পারিবারিক চিকিৎসক বুঝি?'

'হ্যাঁ—ডাঃ অধিকারী।' রাজা বাহাদুর জবাব দিলেন।

'নমস্কার। আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম, ডাঃ অধিকারী ।' কিরীটী বলল।

'না-না, কষ্ট কি!' ডাক্তার প্রত্যুত্তর দেন।

'আপনিই ওঁর পায়ে প্লাস্টার করেছেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'প্লাস্টার দেখে মনে হচ্ছে দু-একদিন আগে বোধহয় প্লাস্টারটা বদলান হয়েছে।'

ডাক্তার যেন কিরীটীর প্রশ্নে কেমন বিব্রত বোধ করেন। একটা ঢোঁক গিলে

মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনদিন আগে প্লাস্টারটা বদলে দিয়েছি।'

'পায়ের ফ্রাকচার সেট্ হয়ে গিয়েছে?'

'না। এখনো—'

'কিন্তু প্লাস্টারটাও আপনার ঠিক perfect হয়নি।'

লক্ষ্য করলাম, সহসা ডাক্তারের মুখখানা যেন কেমন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে ডাক্তার বললেন, 'কেন বলুন ত?'

'অত ঢিলে কখনো প্লাস্টার হয়? তাতে করে প্লাস্টারিং করবার effect-ই ত পাওয়া যায় না।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিক বলছি। কয়েক বছর আগে আমার এক বন্ধুর ডান পায়ের একটা হাড় ফ্রাকচার হয়েছিল। তাকে দু-মাস হাসপাতালে প্লাস্টার করা অবস্থায় থাকতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে আমার কিছু কিছু জ্ঞান আছে। তাছাড়া প্লাস্টারের ডান দিকটা কেমন একটু সুপুরির মত উঁচু হয়ে আছে।'

নির্বাক বিস্ময়ে স্থির দাঁড়িয়ে আমরা কিরীটীর কথাগুলো শুনছিলাম। কিরীটীর শেষকথায় ডাক্তার যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছেন। বলে বোধ হ'ল।

সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বর যাদুমন্ত্রে যেন তীব্র-কঠোর হয়ে উঠল, 'ডাক্তার, এখুনি আমাদের সামনে রামগতিবাবুর পায়ের প্লাস্টারটা আপনাকে কাটতে হবে।'

কিরীটীর কথায় সহসা ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হ'ল। কয়েকটা মুহূর্ত কঠিন পাথরের মত স্তব্ধতা।

'প্লাস্টারটা কাটতে হবে?'

'হ্যাঁ। কারণ ওঁর ঐ প্লাসটারের মধ্যেই রাজা বাহাদুরের আঙটিটা লুকান আছে এবং আপনার সাহায্যেই উনি আঙটিটা ওর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন।'

রাজা বাহাদুর গর্জন করে উঠলেন, 'You treacherous fellow! I shall shoot you. রামদেও, হামারা রাইফেল লাও!'

সত্যিই-স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ফিরতি-পথে কিরীটীকে প্রশ্ন করতেই সে বলল, 'প্রথমটা আমিও ভাবতে পারিনি যে প্লাস্টারের মধ্যে আঙটিটা লুকান আছে। ঘর হতে বের হয়ে আসবার সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, রামগতি বলছেন বাথরুমে যাবেন, তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল—পায়ে প্লাস্টার করা অবস্থায় কখনো কোন পেসেন্ট পায়ে হেঁটে বাথরুমে যেতে পারে না, আর ডাক্তারও তা allow করেন না। তাই তোদের সঙ্গে না গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম রামগতি অনায়াসেই হেঁটে বাথরুমে গেলেন। হঠাৎ আমার মনে পায়ের প্লাস্টারের কথাই উদয় হ'ল। অতি প্রকৃষ্ট স্থান আঙটিটা গোপন করে রাখবার। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে এও মনে হ'ল, প্লাস্টারের মধ্যে রাখতে হলে তাঁকে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে। স্টেটের একজন সামান্য ডাক্তারকে কিছু অর্থ দিয়ে তার সাহায্য নেওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়! সর্বোপরি, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রামগতির পায়ের প্লাস্টার ঢিলা দেখে ও নজর দিয়ে একটা জায়গায় উঁচু দেখতে পেয়ে প্লাস্টারের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল। অবিলম্বে রাজা বাহাদুরকে ডাকিয়ে ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালাম। এবং স্থির করলাম, সোজা একেবারে ডাক্তারকে চার্জ করব। সত্যি সে যদি অপরাধী হয়ই, তবে সে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তারপর ত তুই দেখলিই, কেমন দুয়ে-দুয়ে চার মিলে গেল।'

'অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি তোর, কিরীটী!'

'কিছু না—কেমন common sense! একটু ভাবলে তুইও পারবি।

শেষ কথাটা না বললে অন্যায় হবে।

শেষ পর্যন্ত কিরীটীর বিশেষ অনুরোধে রাজা বাহাদুর মীনুরানীকে পুত্রবধূ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। তবে রামগতিকে ক্ষমা করেন নি। তাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

খুনি কে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অমল ও সুরেশ দুই বন্ধু। সুরেশ থাকতো পেশোয়ারে। এসেছে কলকাতায় বেড়াতে। উঠেছে অমলের বাড়ি।

বাড়িতে অমল থাকে একা। দোতলা বাড়ি। অমল অনেক টাকার মালিক। পৈতৃক সম্পত্তি তো পেয়েইছে; মাতৃক অর্থাৎ দাদামশায়ের খানদুই বাড়িও মাস-কতক হলো তার হাতে এসেছে। এক মামা। সেও আবার পাতানো। টাকা-পয়সা পেলেও অমলের মাথা ঠিক আছে। সে বাবুগিরি করে না। সখের মধ্যে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে বই কেনা; কেবল কেনা নয়, সেই সঙ্গে পড়াও।

সে উত্তর-ভারতে বেড়াতে গিয়ে সেবার পেশোয়ারে সুরেশের বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। সুরেশ সেখানে রেলে চাকরি করে। মাইনে যা পায়, তা বেশ। সেখানে খাতিরও খুব। অনেকদিন বাঙলাদেশ ছাড়া। তাই কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে

এসেছে।

সে-রাতে একটা বিশ্রী শব্দে সুরেশের ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু ঘুমের ঘোরটা গেল না। সে প্রথমে বুঝতে পারলে না কোথায় আছে। পরক্ষণেই তার মনের জড়তা কেটে গেল। বুঝতে পারলে, সে আছে অমলেরই বাড়িতে। কিন্তু শব্দটা কিসের?

সম্ভবত ঝড়ের। ঝড়েই যেন জানলা-দরজার পাল্লা দড়াম্ করে বন্ধ করলে! কিন্তু তারপরও সেই রকম শব্দ হতে লাগলো।

শীতকাল; তাই সুরেশের দরজা-জানলা বন্ধই ছিল। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই অমলের জানলা খুলে শোবার অভ্যাস; সে বলতো, জানলা বন্ধ করে শুলে আমার দম আটকে যায়! শব্দটা যেন সুরেশেরই ঘরখানার নিচে হচ্ছে! তার ঘরের নিচে আছে অমলের পড়বার ঘর। হয় সে এখনও পড়ছে অথবা জানলা খুলে রেখেই শুতে গেছে! পড়বার ঘরের পাশেই তার শোবার ঘর।

এই সব ভেবে সুরেশ আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম আর এলো না, থেকে থেকে শুধু শব্দই হতে লাগলো!

সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। ঘড়ি দেখলে—রাত দুটো!

আবার দড়াম্ করে শব্দ হলো। এরকম শব্দ হতে থাকলে ঘুমোনোই দায়! সুরেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো। মোটা আলোয়ানখানা গায়ে, চটিজোড়া পায়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দরজার পাশে সুইচ ছিল। সুইচটা টিপতেই বারান্দাটি আলোকিত হলো। সামনে নিচের সিঁড়ির মাথায় আলো ছিল। সে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়ে নিচে নামতেই, পরিষ্কার বুঝতে পারলে শব্দটা কোথা থেকে আসছে!

সুরেশ ঘরখানার দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। অমল কি এখনও পড়ছে? না,—সামনের দিকে তাকিয়েই তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেল, আর এক পাও নড়বার শক্তি রইলো না! সে দেখলে, অমল কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে হাত দু'খানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার কপালে একটি ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে রক্ত বার করে একটি লাল ধারায় কার্পেটে পড়ছে।

ক্ষতটি দেখে সুরেশের মনে পড়লো, এরকম ক্ষত হয় রিভলভারের গুলিতে। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো, তাহলে সেই অস্ত্রটি কোথায়? কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না। এটা খুন, না আত্মহত্যা? আত্মহত্যা হলে অস্ত্রটা কাছেই থাকবে; খুন হলে খুনিই সেটা নিয়ে গেছে। কিন্তু—

সুরেশ সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। সেই

সময় অমল একবার চোখ মেলে তাকালো এবং তার ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠলো। সে যেন কি ফিস্ ফিস্ করে বললে!

সুরেশ তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, অমল, এ কি? কে করলে এ কাজ?

অমল অতি কষ্টে ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুরেশ, সে আমাকে খুন করেছে। পুলিশকে বলে যে—

ঠিক সেই সময় জানলায় এত জোরে শব্দ হলো যে অমলের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

সুরেশ আরও ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, আমি শুনতে পাচ্ছি না অমল, কে?

কিন্তু অমলের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো থেমে গেল!

সুরেশের হাত-পা আর চললো না। সে অসাড়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রইলো। কিন্তু একটু পরেই স্বপ্নের মতো মনে হলো, সেখানে আরও কে এসে দাঁড়িয়েছে!

সুরেশ তাকিয়ে দেখে, দরজায় অমলের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় দাঁড়িয়ে। সে ও এসেছে দিন-দুই হলো, শিলং থেকে কলকাতায়। নাম তার শরৎ।

শরৎ বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ; সে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে সুরেশবাবু!

—অমলকে কেউ খুন করেছে। আপনি নিচে ওর সরকারকেও জানান। আমি ততক্ষণে এইখানেই থাকবো।

শরৎ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সে শুয়েছিল সুরেশের পাশের ঘরে।

শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুরেশ জানলাটা বন্ধ করে দিলো। টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলিশকে আসবার জন্যে থানায় ফোন করলো। একজন ডাক্তারকেও সঙ্গে আনতে বলল।

পুলিশ যখন এল, তখন হল্-ঘরে বাড়িরই কয়েকজন জমা হয়েছে। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। এমন কি, বাড়ির চারধারে যে বাগানখানি ছিল, সেখানেও আলো জ্বলছিল।

ডাক্তারকে নিয়ে পুলিশ তাড়াতাড়ি অমলের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ডাক্তার অমলকে পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন; বললেন, বারুদের দাগ নেই, পিস্তলটাকেও দেখা যাচ্ছে না। এ তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খুন। তবে বেশিক্ষণ আগে হয়নি। মিনিট কুড়ি কি বড় জোর আধঘণ্টা আগে হবে।

দরজার কাছে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, দারোগাবাবু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, সকলের আগে কে দেখেছেন?

সুরেশ সভয়ে গলা পরিষ্কার করে বললে, আমি যখন আসি, তখনও ওর নিশ্বাস পড়ছিল। কে খুন করেছে ও আমাকে বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

—তার আগে কি হয়েছিল?

—জানি না। কেবল ঝড়ে ঐ জানলাটা জোরে জোরে বন্ধ হচ্ছিল। সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপরও শব্দের জন্যে আর ঘুমোতে পারিনি। তাই নিচে নেমে এসেছিলাম।

—কাউকে তখন দেখেছিলেন?

—কাউকে দেখিওনি, ঝড়ের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতেও পাইনি। তবে আমার পর এসেছিলেন শরৎবাবু। উনিও শব্দে ঘুমোতে পারছিলেন না।

দারোগা সরকারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এ বাড়িতে আর কে কে আছে?

—দু'জন চাকর আর একটা ঠাকুর। মোটর-ড্রাইভারটার বাড়ি কাছেই; সে সকালে আসে, রাতে চলে যায়।

—কোথায় খাওয়া-দাওয়া করে?

—এখানেই।

—বলতে পারেন, আপনার বাবু এত রাত অবধি কি করছিলেন?

—তা জানি না। তবে মাস-কয়েক থেকে উনি রাতে ভাল ঘুমোতে পারতেন না। প্রায়ই রাত জেগে পড়াশুনা করতেন।

—আচ্ছা, উনি এ রকম বিপদের কথা কখনো বলেছিলেন?

—আমার কাছে তো বলেননি; আমি সরকার। আমার কাছে মনের কথা বলবেন কেন?

—তবে কার কাছে বলতেন, বলতে পারেন? বলে দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

—বন্ধু-বান্ধবের কাছে।

—ওঁর বন্ধু কে?

—অনেকে। অনেকেই বাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। বড়লোক—অনেকের সঙ্গেই আলাপ ছিল।

—এঁরা কে?

—ইনি সুরেশবাবু; আমাদের বাবুর বন্ধু। পেশোয়ারে থাকেন। দিন-কয়েক হলো বেড়াতে এসেছেন। উনি বাবুর আত্মীয়। শিলংয়ে থাকেন।

—আজ সন্ধে থেকে ওঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল, জানেন?

—আমি ভাড়া আদায়ে বেরিয়েছিলাম, রাত দশটায় ফিরেছি।

দারোগাবাবু সুরেশের দিকে ফিরে বললেন, আপনার সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়?

—রাত ন'টায়। রাত আটটায় আমরা একসঙ্গে খাই। তারপর একঘন্টা গল্প করেছিলাম।

—তখন কি ওঁর উদ্বেগের ভাব দেখেছিলেন?

—সে-বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারিনি। তবে কেমন উন্মনা মনে হচ্ছিল! আগে আমি ওঁকে কখনো এ রকম দেখিনি।

দারোগাবাবু তারপর শরতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কখন ওঁর শেষ দেখা হয়েছিল?

—রাত সাড়ে দশটায়।

—আপনার কি অনুমান হয়েছিল, অথবা ওঁর সঙ্গে কথায়-বার্তায় কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, উনি জানেন ওঁর জীবননাশ হতে পারে?

—তখন যে রকম দেখেছিলাম, তাতে সে ধারণা করতে পারিনি বটে, তবে এখনকার অবস্থা দেখে বলা যেতে পারে, উনি এই রকমই আশঙ্কা করেছিলেন।

—হু। দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর আবার বললেন, বলুন তো শরৎবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিন অন্তর দেখা হয়?

—ঠিক নেই, মাসে দু'একবার তো বটেই। কারবারের কাজে আমাকে এখানে প্রায়ই আসতে হয়।

—উনি কি বরাবরই এই রকম অস্থির ছিলেন?

—না। সুরেশবাবু যা বলেছেন, তা ঠিক। উনি আগে এরকম ছিলেন না।

—আচ্ছা, কবে থেকে আপনি তাঁকে এরকম দেখছিলেন?

—তা মাস-দুই হবে। মধ্য-প্রদেশের এক শহরে একটা খুন হবার পরেই ওঁকে কেমন একটু বিচলিত দেখছি!

—কি রকম? সে আবার কি? দারোগাবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

—সেখানে উনি গিয়েছিলেন বেড়াতে। তখন ওঁর এক বন্ধুকে একজন খুন করে। বন্ধুটির নাম ছিল হরিশ সমাদ্দার। সমাদ্দার যে হোটেলে ছিল, সেই হোটেলে উনিও গিয়ে উঠেছিলেন।

—তারপর?

সমাদ্দারকে একজন সাহেববেশী বাঙালী গুলি করে। যে লোকটা তাকে গুলি করে, তার নাম উপেন চন্দ্র। তার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল। উপেন ধরা পড়ে, কিন্তু কি করে যেন হাজত থেকে পালিয়ে যায়! এ খবর কি আপনি জানেন না?

—বলে যান।

—উপেন তো আর ধরা পড়েনি! বলে শরৎবাবু চুপ করলেন।

দারোগাবাবু তাঁর দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ওঁর কোনও শত্রু ছিল, এমন কথা কোনও দিন বলেছেন?

—না। মনে পড়ে না।

—আচ্ছা, উনি বিয়ে করেননি কেন?

—জানি না।

দারোগাবাবু তারপর সুরেশকে বললেন, আপনি কি প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন?

—না, সে সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কেননা, আমি থাকি ভারতের এক প্রান্তে; ছুটি বড় একটা পাই-ই না। আর ও নিজেই আমার ওখানে যেত, হয়তো বছরে একবার!

দারোগাবাবু চুপ করলেন। তার একটু পরেই বললেন, আপাতত আপনাদের আর দরকার নেই। তবে চাকর-বাকররা কেউ যেন কোথাও যায় না, পরে সকলকে আবার দরকার হতে পারে। আপনারা এখন বাইরে যান। আমি ঘরখানা ভাল করে পরীক্ষা করবো।

সকলে বার হয়ে গেল। দারোগাবাবু পরীক্ষা করতে লাগলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো কনস্টেবল।

দারোগাবাবু দেখতে লাগলেন। আরাম-চেয়ারের পাশে একখানি ছোট টেবিলের ওপর একখানি বই খোলা পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, অমল বইখানি পড়ছিল। খোলা জানলাটার দিকে সে পেছন ফিরে বসেছিল। খুনিটা হয়তো সোজা ঘরে ঢুকেছে। সে ঢুকতেই অমল বইটি নামিয়ে রেখে খুনিটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাল লক্ষ্য করে গুলি করেছে। গুলি লাগতেই কার্পেটের ওপর ওইভাবে, যেমন করে আছে—সেই রকম করে পড়ে গেছে। পিস্তলের আওয়াজ হয়ত বাজপড়ার শব্দে গেছে ডুবে। ঘটনাটা খুব সহজ নয়। এর ভেতরে কিছু একটা আছে। খুনিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটা কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, দেখ তো এঁর পকেটে কি আছে?

কনস্টেবলটা এগিয়ে এসে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পোশাক তল্লাস করতে লাগলো।

জামার পকেট হাতড়ে প্রথমেই পেল একখানি রুমাল, দুটো চুরুট ও একবাক্স দেয়াশলাই। তারপর আর এক পকেটে পেল এক গোছা চাবি ও খান-খয়েক নোট, আধুলি, সিকি, আনি।

পরক্ষণেই আবার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা জিনিস টেনে বার করেই বলে উঠলো, ই ক্যায়া?

দারোগাবাবুও দেখলেন একটি রিভলবার। তিনি সেটা কনস্টেবলটার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার ছটি খোপেই ছটি গুলি ভরা।

—হুঁ। দেখা যাচ্ছে, এরকম একটা কিছু হবে তা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তবে রিভলবারটা ব্যবহার করবার সময় পাননি। আচ্ছা, আর কি আছে?

আর এক পকেটে ছিল কতকগুলো চিঠি। দারোগাবাবু চিঠিগুলো কনস্টেবলের হাত থেকে নিয়ে আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপরই বলে উঠলেন, আরে! পাওয়া গেছে! এই যে একখানা টাইপ-করা চিঠি। এতেই খুনি কে, কেন খুন করেছে, তা পাওয়া যাবে। আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের খোরাক। খাসা!

তিনি কাগজখানি পড়ে সাবধানে ভাঁজ করে চিঠিগুলো একখানি খামে পুরে পকেটে রাখলেন, এবং ঘরখানি আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছু দিন পর।

ভোরের দিকে তারা যখন মোটরে ফিরছে, মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, শরৎই যে খুনী, এটা কি করে ধরতে পেরেছিলেন মিঃ গুপ্ত?

—আপনার কথার উত্তর দেবার আগে একটা কাজের ফয়সালা করা যাক। চন্দ্রের কি হবে? আপনি নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে আর মামলা চালাবেন না?

—না। শরৎ রায়ই সে-পথ বন্ধ করে দিল। মিঃ শুক্লও বোধহয় আর এগোবেন না?

—এগোবার উপায় নেই।

গুপ্ত বললে, মিঃ মুখার্জি, এবারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। যখন খবর পাই, শরৎ রায়কে কে গুলি করেছে, তখনই আমার সন্দেহ হয়, এটা ওর সাজানো। ওর জামার হাতায় যে-লোকটা গুলি করেছিল, সে ওর ঐ ওলি মহম্মদ। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি ওর ঘর থেকে রায়ের পিস্তলটা সরিয়েছি। তাতে গুলি চালাবার চিহ্ন আছে।

—কি বলছেন?

—আজই আপনাকে দেখাবো। আর ওর সেই ড্রাইভারটাও সরে পড়েছে আপনার সহকারীর চোখে ধুলো দিয়ে। শরৎ রায়ই যে মাকড়শা, এটা আমি আবিষ্কার করি তখনই। ওর ওপর আমার কড়া নজর ছিল। ও থানায় খবর দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল সত্যি; কিন্তু যেখানে এসেছিল, সেখান থেকে আমারই লোক টেলিফোন করেছিল। সে ছিল ওর পিছু-পিছু। লোকটা ছিল ভারী চালাক। কতবার আমার চোখে ধুলো দিয়েছে!

—যাক্, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো।

—এখনও নয়। আগে বড়কর্তার কাছ থেকে চন্দ্র-সম্বন্ধে অভয় নিতে হবে, তারপর।

শুক্ল বললে, আমার মনে শান্তি এসেছে। এবার হাল্কা মনে দেশে ফিরে যেতে পারি।

—আমার রবিবারে পার্টিতে যোগ দেবার পর যাবেন—তার আগে নয়।

শুক্ল হাসতে-হাসতে বললে, আচ্ছা।

অ্যাকসিডেন্ট্

জরাসন্ধ

ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস ঘন্টা চারেক লেট। হাওড়া পৌঁছবার কথা ভোরবেলায় ব্যান্ডেল আসতেই বাজল নটা। কাগজওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল। একখানা বাংলা কাগজ কিনলাম। ভাঁজ খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের নামটা চোখে পড়তে থেমে যেতে হল। পড়ে দেখলাম, কাল রাত্রে আমার মৃত্যু হয়েছে।

চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে আর একবার পড়লাম। না, ভুল করিনি। নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীগোলোকচন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে মথুরা এক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা আসিতেছিলেন। পথি-মধ্যে ট্রেন হইতে পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার সদগতি হউক।'

বর্ণনা নির্ভুল। আমারি নাম গোলোক সান্যাল। নিবাসও হাটখোলা। বস্ত্র-

ব্যবসায়ে কিছুদিন হল "বিখ্যাত" হয়েছি, সে কথাও ঠিক। যে রাস্তা ধরে বিখ্যাত হয়েছি সেটা ঠিক 'সাদা' রাস্তা নয়। সেই জন্যেই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় আমার আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।

প্রথমটা বেশ মজা লাগল। মন্দ কি? নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজেই পড়ছি। সে সুযোগ ক'জন পায়? হঠাৎ গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো? রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কে জানে তখন যদি দেহান্তর হয়ে গিয়ে থাকে? এই যে আমি শ্রীগোলোক সান্যাল, মথুরা এক্সপ্রেসের একখানা ক্লাশ টু কামরায় বসে কাগজ পড়ছি, এ হয়তো ঠিক কালকের "আমি" নই। নাড়ি দেখলাম; ঠিক আছে। নিঃশ্বাস? তাই বইছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম, রীতিমত লাগছে। গাড়িতে রোদ এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, ছায়াও পড়ছে। তবে?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?

বসে পড়ে বললাম, না, না। ও কিছু না। অন্য লোককে কেমন করে বলি যে আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই খবর? মনে পড়ল, অনেক দিন আগে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। কে এক যাদব চক্রবর্তী; বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল, তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বলে,—আরে এই তো আমি বেঁচে আছি,—কেউ স্বীকার করে না। আমার কি সেই দশা হল? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। এই সেদিনও পাড়ায় শখের থিয়েটারে ২০০ টাকা দিয়েছি। গিন্নীর হাতে ভারি আর্মলেট। হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা খোলের দাম বলে নিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা। নাঃ, আমি দু-নম্বর যাদব চক্রবর্তী হতে রাজী নই। এ-সব এই কাগজওয়ালার ধাপ্পা নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আমার নাম গোলোক সান্যাল।

হাওড়ায় পৌঁছে বাড়ী যাওয়া আর হল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটলাম সেই কাগজওয়ালার অফিসে।

একটা প্রকাণ্ড টেবিল। পুরনো বনাতে মোড়া। জায়গায় জায়গায় কালির দাগ। মাঝে মাঝে ছেঁড়া। একরাশ কাগজপত্তর ছড়ানো তার ওপর। একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক একমনে লিখে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। আমার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, বসুন। বলেই আবার ডুবে গেলেন লেখার মধ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললাম, আপনিই কি সম্পাদক?

—সহকারী সম্পাদক।

—আপনাদের আসল ব্যবসাটা কি বলুন তো?

এবার তিনি চোখ তুললেন। কাগজখানা তাঁর সামনে ফেলে দিয়ে বললাম, এ

সব কি হচ্ছে? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়ে কাজ হাসিল করতে চান? সহকারী সম্পাদকের নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে হাঁ-টা বড় হয়ে গেল। মোটা চশমার আড়ালে চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। মুচকি হেসে মিহি গলায় বললেন, দেখুন, প্রথমত আপনিই যে গোলোক সান্যাল সে কথা এখনো প্রমাণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে আমাদের সংবাদ-দাতা এ খবরটা কোত্থেকে পেয়েছেন। তৃতীয়ত—

বাধা দিয়ে বললাম, থাক, আর তৃতীয়তে দরকার নেই। এই নিজস্ব সংবাদ-দাতার ঠিকানাটা দিন। বোঝাপড়া ঐখানেই করে নেবো।

সহকারী মহাশয় গলাটা আরো মিহি করে বললেন, আজ্ঞে, সংবাদ-দাতার নাম ঠিকানা আমরা প্রকাশ করতে পারি না।

—কেন?

—ওটা সাংবাদিক রীতি নয়।

—তার মানে, ঐ সব সংবাদ-দাতা-টাতা সব ভুয়ো। আজগুবি খবরগুলো বুঝি এই বনাত ছেঁড়া টেবিলে বসেই তৈরী হয়।

কোন জবাব এল না। কাগজ তুলে নিয়ে বললাম, এই দামী খবরটা কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটুকু বলবেন কি?

—ঐ কাগজে যেটুকু আছে, ওর বেশী আমার কিছু বলবার নেই।

কাগজটা খুলে দেখলাম খবর এসেছে ধানবাদ থেকে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, আসলে দেখলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন। ধানবাদের মত জায়গায় খবর কাগজের নিজস্ব সংবাদ-দাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন কিছু একটা না করে ফিরেই বা যাই কি করে? একদিন এ-পাড়া একদিন ও-পাড়া ধরনা দেওয়া শুরু করলাম। বাংলা কাগজখানার নামই কেউ জানে না, তার সংবাদদাতার খোঁজ দেওয়া তো দূরের কথা। একটা উড়ো খবর পেয়ে বাইরেও ঘুরে এলাম দিন দুই। এমনি করে কেটে গেল ছ-সাত দিন। শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে এসেছে। ফিরে যাব মনে করেই শেষটায় ইস্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে আড্ডা নিয়েছি। দেখলাম একজন খদ্দর-ধারী চশমা পরা ছোকরা রোজ কলকাতায় খবরকাগজগুলো বুঝে নিতে আসে। গাড়ি আসতেই চেপে ধরলাম তাকে।

—আপনিই কি অমুক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা?

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারকয়েক তাকিয়ে নিয়ে বলল, কেন বলুনতো?

বুঝলাম, নরম রাস্তা ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, বিদেশী লোক। বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনিই তাহলে—

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার রিপোর্টার। বলুন কি করতে হবে আমাকে?

—ওঃ, বাঁচালেন মশাই। এই খবরটা দেখুন। এই গোলোক সান্যাল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইনি কি করে মারা গেলেন, দেহটারই বা কি ব্যবস্থা হল? অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা—বিশেষ করে ওঁর বাড়ির সবাই। ভদ্রলোক বললেন, সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না। রেল পুলিশে খবর নিন। মৃতদেহ এখানেই আনা হয়েছিল। ময়না তদন্তও হয়েছে, এই পর্যন্ত জানি। নামধাম সব ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

পরদিন রেল-পুলিশের অফিসে হানা দিলাম। দারোগাবাবু মন দিয়ে আমার সমস্ত কথা শুনে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং আপনার এ খবরে কী দরকার?

—আমি গোলোক সান্যালের নিকট আত্মীয়; এবং সেই জন্যেই এ খবরে আমার বিশেষ দরকার।

—কিন্তু আমরা তো সেই দিনই তার বাড়ির ঠিকানায় তার করে সব জানিয়ে দিয়েছি।

নিজের অগোচরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কি বললেন। বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন?

—তা ছাড়া আর কি করা যেত বলুন? অন্যায় হয়েছে কিছু?

—শুধু অন্যায়? সর্বনাশ! চরম সর্বনাশ করেছেন আপনি। দারোগার চোখে মুখে ঘোর সন্দেহের ছায়া পড়ল। বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি?

নাম মুখে এসে গিয়েছিল; সামলে নিলাম। সত্যি পরিচয় দিয়ে লাভ হত না। বিশ্বাস করবে না। বললাম, নাম দিয়ে আর কি হবে আপনার?

জানতে ইচ্ছে হয় বৈকি একটু। নতুন আলাপ হল।

হঠাৎ যা মনে এল বলে ফেললাম,—আমার নাম গোবিন্দলাল সামন্ত।

দারোগাবাবু হেসে বললেন, দেখুন বাবুসাব, আমরা পুলিশের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। কিন্তু যতটা কম আপনারা মনে করেন, ঠিক ততটা নয়। সান্যালের আত্মীয় হতে হলে আর যাই হোক, সামন্ত হওয়া চলে না। নামটা বদলে দিন। নইলে অনেক ফ্যাসাদ। জানেন তো পুলিশের লোক আমরা।

এর পরে আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না। বললাম, তা জানি বৈকি? আপনাদের বিদ্যার কি আর অন্ত আছে? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি, মরার খবরটা বেশ ঘটা করে তার বাড়িতে জানিয়েও বসে আছে।

দারোগাবাবু এবার চটলেন। রুক্ষভাবে বললেন, এ সব আপনি কি বলছেন?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলছি। আমার আসল নামটা শুনলে বিশ্বাস করবেন? যে লোকটাকে নিয়ে আপনারা এত কাণ্ড করছেন, আমিই সেই গোলোক সান্যাল।

চলে যাচ্ছিলাম। দারোগাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায়? উঁহু। এটা মোটেই সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট্ নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে। বলে এক হাঁক দিলেন, এই, কৌন হ্যায়? একজন সিপাই ছুটে এলো। দারোগা হুকুম দিলেন, উনকো হাজতমে লে যাও। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। কিছু মনে করবেন না। কাল আবার দেখা হবে। নমস্কার।

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। না হয় ছেপেছিল একটা মৃত্যুসংবাদ। সত্যি সত্যিই তো আর মরিনি। শুধু কাগজে কলমে মরা। কোনো ক্ষতি ছিল না। আর, এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দুরাত ধরে ছারপোকা আর মশা মিলে যে রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত-ঘর থেকে যে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব, এমন ভরসা নেই। তাছাড়া দুটো দিন পেটে কিছু পড়েনি। দারোগাবাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেন নি। ত্রুটি আমারই, সেটা মুখে তুলতে পারি নি। ছেঁড়া কম্বলের উপরে একরকম অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। একটি পুলিশ এসে বলল আমাকে এবার জেলে যেতে হবে।

যেখানে হোক যাবার জন্যে মনটা অত্যন্ত ছটফট করছিল। বললাম, বেশ চল। জেলেই চল।

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি! তারই একটাদিক পুলিশের হাতে। সবাই তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত দেখিয়ে হাসছে, দুধার থেকে কানে আসছে—চোট্টা হ্যায়...নামকরা পকেট-মার...কি রকম ডাকাত দেখেছ?

চোখে জল এসে পড়ল খানিকটা। পাশ দিয়ে একখানা গাড়ি যাচ্ছিল। যে লোকটি ভিতরে বসে, মনে হল যেন চেনা মুখ। সেও ঝুঁকে পড়ে দেখল, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তার চোখ এড়ানো গেল না।

—এই, রোখো, রোখো—

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধানবাদের কয়লা-খনির মালিক বংশীপ্রসাদ, আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। চোখের জল এবারে আর বাধা মানল না, অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

—ব্যাপার কি সানিয়েল বাবু?

ব্যাপার বলবার মত অবস্থা তখন আমার নয়। বংশীপ্রসাদের গাড়িতে থানায় ফিরে এলাম এবং খানিকটা সামলে নিয়ে মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বললাম। বংশী

গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সেই দারোগাটি ছুটতে ছুটতে এলেন। একগাল হেসে, একরাশ ক্ষমা চেয়ে এবং একবোঝা বিনয় দেখিয়ে এমন আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কখন এর হাত থেকে রেহাই পাব। অবিশ্যি দেরী হল না। বংশীর গাড়িতে যেতে হল তার বাড়ি, সেখান থেকে কিছু মুখে দিয়েই সোজা ইস্টিশনে।

তার-বেগে ট্যাক্সি ছুটছে। বাড়ির কাছে এসে কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই। মনটা বিষিয়ে উঠল। স্ফূর্তি করবার আর সময় পেলেন না বাবাজিরা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

গেটে গাড়ি থামল। একি! এত লোকজন কিসের? দুধারে কলাগাছ। আগা-গোড়া গেটটা ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। বাড়ি ভুল করিনি তো? নাঃ। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম, একেবারে চক্ষুস্থির!

সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি জুড়ে জমকালো চাঁদোয়া খাটানো। তার নীচে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। মেহগিনির খাট, তার ওপরে দামী বিছানা, চৌকি, আসন, বোঝা বাসন পত্তর,—রুপোর সেট, কাঁসার সেট,—ছাতা, জুতো, কার্পেট, সতরঞ্চি, আরো কত কি! হঠাৎ চোখে পড়ল তারি মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান—মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে পুরোহিত। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না, যে এটা হচ্ছে শ্রাদ্ধবাসর। শ্রাদ্ধ হচ্ছে আমারই। ছেলেরা বেশ ঘটা করেই করছে, যেমনটা ঠিক হয়ে থাকে অন্য পাঁচজন বড়লোকের বেলায়।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরুত ঠাকুর তার হাতে এক কুশী জল দিয়ে বললেন, ভীত হয়ো না বৎস! নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার প্রেতাত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল সিঞ্চন কর। বল, স্নাত্বাপিত্বা সুখীভব!

হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেতাত্মা! লাথি মেরে সব একাকার করে দিলাম। প্রেতাত্মা! হটাও সব। চারদিকে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় শ্রাদ্ধবাসর। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখলাম—সে আর এক কাণ্ড। হল্ ঘরের মেঝের উপর গিন্নী পড়ে আছে। পরনে সাদা থান, গয়না নেই, পুরোপুরি বিধবার বেশ। দু'তিন জনে মাথায় জল ঢালছে। জ্ঞান নেই।

এমন সময় খবর এল পুলিশের কোন সাহেব এসেছেন দেখা করতে। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়।

—কি চাই বলুন?

—আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর বেরিয়েছিল সেজন্য আমরা আন্তরিক

দুঃখিত। সব কাগজে প্রতিবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—সে তো দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

পুলিশ সাহেব একখানা নাম-ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, এটা আপনার কার্ড?

—হ্যাঁ, আমারই কার্ড। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন?

—২২ তারিখে ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস থেকে নামতে গিয়ে একজন লোক হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মানিব্যাগে নাম ঠিকানা লেখা এই কার্ডখানা ছিল।

—ওঃ! সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক! এলাহাবাদে তার সঙ্গে আলাপ। আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। একখানা কার্ড দিলাম। মানিব্যাগেই যেন রাখল মনে হচ্ছে। আহা! লোকটি মারা গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন?

পুলিশ সাহেব কথা বললেন না। জিজ্ঞেস করলাম, ভুলটা ধরা পড়ল কি করে?

—ময়না তদন্তে ডাক্তারের সন্দেহ হল, মৃত ব্যক্তি বোধ হয় মারোয়াড়ী। আরো তদন্ত চলল। তারপর ধানবাদ থানায়—

—তার সাক্ষী তো আমি নিজেই। কিন্তু এই ভুলটা আগে জানতে পারলে নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না। আর এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ এড়ানো যেত।

অর্জুন হতভম্ব

সমরেশ মজুমদার

বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। দরজা খুলে একপলক দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বলুন, কী দরকার?"

লোকটা পিটপিট করে তাকাল। তারপর হাতজোড় করে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান বাবু। আমি মরে গিয়েছি।"

রোগা এবং বেঁটে লোকটির পরনে সস্তার শার্ট-প্যান্ট। দেখলেই বোঝা যায়, অবস্থা ভাল নয়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি যে আপনাকে বাঁচাতে পারি, এ-কথা কে বলল?"

"আপনার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। আমার এক শালা রূপমায়া সিনেমাতে টিকিট ব্ল্যাক করে, ও আপনার খুব প্রশংসা করে। বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি।" লোকটি তখনও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

"আপনার নাম কী?"

"যজ্ঞেশ্বর মাইতি।"

"কী করেন?"

লোকটি মুখ নামাল "বলতে সঙ্কোচ হয়, তবু বলি, আমি চুরি করি বাবু।"

"চুরি করেন? চোর!" অর্জুন অবাক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজকর্ম পাইনি, পয়সাও নেই যে দোকান-টোকান দেব, তাই চুরি করে পেট ভরাই। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলেমেয়ে! মুখ দেখে তো কেউ খেতে দেবে না!"

"আপনার বিপদটা কী? পুলিশ?"

"না বাবু, চুরির জন্যে পুলিশ আমাকে ধরলে আপনার কাছে আসতাম না।" রাস্তার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল যজ্ঞেশ্বর, "এখানে দাঁড়িয়ে বলা কি ঠিক হবে? কেউ যদি শুনে ফেলে!"

অর্জুনের বাড়ি গলির একটু ভেতরে। গলিটা চওড়া, রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটছে। একটা চোরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বসাতে প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছিল না, পরে মত বদলে সে ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

যজ্ঞেশ্বর সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ার দেখিয়ে দিল অর্জুন, "বসুন।"

"না, না আমি ঠিক আছি, আপনি বসুন বাবু।"

অর্জুন আর অনুরোধ না করে চেয়ার টেনে নিল, "আপনার নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে?"

"তা তো থাকবেই বাবু। এর আগে চারবার জেল খেটেছি। তবে ওই তিন থেকে ন' মাস। বড় কাজ তো কখনও করিনি। এবার করতে গিয়েছিলাম।" যজ্ঞেশ্বর হাতজোড় করেই বলল, "ওই যে কথায় বলে না বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার শখ, তাই হয়েছিল আমার। সেটা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি বাবু।"

"ফেঁসে গেছেন?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পুলিশের বড়কর্তারা আপনাকে খুব খাতির করে, আপনি বললে ওরা শুনবে।" কঁকিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"যারা অন্যায় কাজ করে আমি তাদের সাহায্য করি না।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

"বিশ্বাস করুন বাবু, আমার বাচ্চার দিব্যি, গত রাত্রে আমি কোনও অন্যায় করিনি।"

"তা হলে আপনি কিসের ভয় পাচ্ছেন?"

এবার যজ্ঞেশ্বর সব কথা খুলে বলল। গত রাত্রে সে চুরি করতে গিয়েছিল শিল্পসমিতি পাড়ায়। কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিল ওই বাড়িতে প্রচুর গাড়ি

আসছে-যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে পাঁচিলঘেরা বাগান আছে। বাগানের গেট লোহার। আগে কোনওদিন দরোয়ান ছিল না। গাড়িগুলোর আসা-যাওয়া শুরু হওয়ার পর একটা নেপালি দরোয়ান রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিক দীর্ঘকাল জলপাইগুড়িতে ছিলেন না, যজ্ঞেশ্বর খবর পেয়েছে তিনি আমেরিকায় ব্যবসা করেন বলে নিজের শহরে এতকাল আসতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বর বুঝতে পারছিল, তার জন্য অনেক সম্পদ ওই বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একে আমেরিকার ব্যবসাদার, তার ওপর গেটে দরোয়ান বসানো, এ-সবই ইঙ্গিত করছে ওই বাড়িতে এখন দামি-দামি জিনিসপত্র এসেছে। এই শহরের যে-কোনও বাড়ির ভেতরের ছক জেনে নিতে যজ্ঞেশ্বরদের বেশি সময় লাগে না। ওই বাড়িটারও জোগাড় হয়ে গেল। দরোয়ান থাকলেও সে পরোয়া করেনি। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল বাগানে। দরোয়ান টের পায়নি। তারপর জলের পাইপ বেয়ে সোজা তিনতলায়। সে দোতলায় নামেনি। কারণ সেখানে আলো জ্বলছিল। তিন তলাটা অন্ধকারে পড়ে ছিল। ব্যালকনিতে নেমে সে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ সব জরিপ করে নিল। ব্যালকনি থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। এবং সেটা ভেতর থেকেই। অর্থাৎ ওই পথ যজ্ঞেশ্বর ব্যবহার করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে দোতলায় নেমে আসতে হল। পাইপ ধরে ঝুলে থেকে যখন নিঃসন্দেহ হল বারান্দার আশপাশে কেউ নেই, তখন সে দোতলায় নামল। ওইভাবে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদে পড়তে হবেই, যজ্ঞেশ্বর দ্রুত একপাশে সরে এল। ভেতরে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এ-সময় অবশ্য গৃহস্থ জেগে থাকে না, কিন্তু কেউ তো এত আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোয় না। একটু অপেক্ষা করে সে উঁকি মারল। ঘরটা খালি। ডিঙিয়ে সে যে-ঘরে এল, সেখানে অনেক আসবাব। একটি খাটও আছে। কিন্তু কোনও মানুষ নেই। ঘরের আলো জ্বলছে। যজ্ঞেশ্বরের অস্বস্তি হল। অন্ধকার ছাড়া চুরি করতে সে কখনওই পারে না। ঠিক ওই সময় একটা আর্তনাদ তার কানে এল। প্রাণের দায়ে মানুষ এমন আওয়াজ করতে পারে।

কিন্তু চিৎকারটা সম্পূর্ণ হল না। কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছিল। যজ্ঞেশ্বর পা টিপে-টিপে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মারল। একটা ষণ্ডামার্কা লোকের হাতের থাবা চেপে রয়েছে শুয়ে-থাকা বৃদ্ধের মুখে। বৃদ্ধটির হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। একটু দূরে ইজিচেয়ারে বসে খিলখিল করে হাসছে গোল আলুর মতো দেখতে একটি লোক। লোকটি বলছে, "কেটে টুকরো-টুকরো করে তিস্তায় ভাসিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকি? অষ্টধাতুর ব্রজগোপালের মূর্তিটা কোথায়? এখনও সুযোগ দিচ্ছি, বলে ফেলো। হাত সরাও।"

"আমি জানি না। তুমি তো তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আসোনি, এলে তখনই

জানতে পারতে ওঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে থেকেই মূর্তিটা নেই। সেই শোকে সেই সতীলক্ষ্মী হার্টফেল করলেন।" ষণ্ডামার্কা হাত সরাতে কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে গোল আলু বলল, "নাভিতে পিন ফোটা।"

ষণ্ডামার্কা হুকুম তামিল করতেই আবার চিৎকার, আবার মুখ চেপে ধরা। গোল আলু এবার রেগে গেছে। "ব্রজগোপালের অষ্টধাতু-টাতু সব বাজে, ফালতু। আই-ওয়াশ। ওর পেটের মধ্যে ছিল দামী হীরে। অনেকদিন আগে মুঘলদের কাছ থেকে ডাকাতি করে ওটা পেয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। পেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল জিনিসটা, ব্রজগোপালের পেটে। তুমি ছাড়া কেউ এ-বাড়িতে ছিল না। অতএব না বলা পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

এসব কাণ্ড দেখে যজ্ঞেশ্বর বুঝল, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।" হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে কেটে পড়লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে চটপট একটা আলমারি খুলল। জামা-কাপড়ে ঠাসা। হঠাৎ তার মনে হল বড্ড বেশি লোভী হয়ে পড়েছে। ওই ষণ্ডামার্কা লোকটার হাতে পড়লে তার বারোটা বেজে যাবে। সে দ্রুত ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। ওই সময় একটা চেয়ারে তার পা ঠুকে যাওয়ায় শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে গোল আলু চিৎকার করে উঠল, "কে কে ওখানে?" আর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নেমে বাগান পেরিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বর।

অর্জুনের বেশ লাগছিল একজন চোরের আত্মকাহিনী শুনতে। এবার বলল, "আপনাকে তো কেউ দেখেনি, ধরতেও পারেনি। তা হলে ফেঁসে গেলেন কী করে?"

"ওই তো বিপদ। ওই হাঁক শুনে পালাবার সময় ভয়ের চোটে তাড়াহুড়োতে আমার তালা খোলার যন্ত্রটা ফেলে এসেছি।" কঁকিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"ওটা যে আপনার, তা কী করে লোকে জানবে?"

"পুলিশ জানে। এই শহরের সব চোরের হাতিয়ার পুলিশের জানা।

অর্জুন স্থির করতে পারছিল না সে কী করবে। অন্যের বাড়িতে চুরি করার জন্য গভীর রাত্রে ঢুকে যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে। অপরাধীকে বাঁচানো তার কাজ নয়। কিন্তু একজন বৃদ্ধকে বেঁধে রেখে হিরের জন্য অত্যাচার করা নিশ্চয়ই ন্যায়কর্ম নয়। যজ্ঞেশ্বর যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে চুপচাপ বসে থাকার কারণ নেই।

অর্জুন বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায়?" ভয় পেয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর।

"থানায় পুলিশকে এসব কথা খুলে বলবেন।"

"ওরে ব্বাবা। পুলিশ আমাকে ফাটকে ঢুকিয়ে দেবে।"

"আপনি নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। পুলিশ তা করতেই পারে। কিন্তু আমি আপনাকে এ ছাড়া অন্য কোনওভাবে সাহায্য করতে পারছি না।"

শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বর বারান্দা থেকে নেমে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

অর্জুনের এবার অস্বস্তি শুরু হল। মাথার ভেতর কিছু ঢুকে গেলে সেটা না বার হলে স্বস্তি নেই তার। মোটরবাইক বের করে থানায় চলে এল সে!"

বাইক থামতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেজার মুখে তিনি জিপের দিকে এগোচ্ছিলেন। অর্জুনকে দেখে হাসার চেষ্টা করলেন, "কী ব্যাপার সাতসকালে?"

"আপনার কাছে এসেছি। চললেন কোথায়।"

"আর বলবেন না। আমাকে আজকাল ছোটখাটো অপরাধের তদন্তেও যেতে হচ্ছে। ভদ্রলোক আবদার করেছেন এস.আই.পাঠালে চলবে না, আমাকেই যেতে হবে। শুনেছি উনি খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। তাই।"

"কার কথা বললেন?"

"এস.পি.সেন। আমেরিকার বড় ব্যবসায়ী। শিল্পসমিতি পাড়ায় ওঁর আদি বাড়িতে এসেছেন। কাল রাত্রে নাকি সেই বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।

অর্জুন খুশি হল, "আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে অসুবিধে হবে?"

"অসুবিধে? না, না। কিন্তু এটা চুরিটুরির কেস। খুনটুন তো নয়।"

"তাতে কী?"

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "বেশ, চলুন।" বড়বাবুর জিপটাকে অনুসরণ করে বাইকে চেপে অর্জুন শিল্পসমিতি পাড়ার যে বাড়িটায় পৌঁছল, সেটি সদ্য সারানো এবং সাজানো হয়েছে। পুলিশ দেখে দরোয়ান গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে অর্জুন আন্দাজ করে নিল, কাল রাত্রে যজ্ঞেশ্বর কোন পথে ওপরে উঠেছিল।

এস.পি.সেন লোকটিকে গোল আলু বলেছে যজ্ঞেশ্বর। একবর্ণ মিথ্যে কথা বলেনি। বসার ঘরে সোফায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "হোয়াট ইজ দিস? জলপাইগুড়ি শহরের ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবস্থা এইরকম? আমি সি. এমকে জানাব। এন. আর. আইদের উনি দেশে ফিরতে বলছেন কিন্তু কোন ভরসায় আসব?"

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী-কী চুরি গিয়েছে আপনার?"

"চুরি করতে পারেনি। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একটা দিশি যন্ত্র ফেলে গিয়েছে। টমি!" চিৎকার করলেন এস. পি. সেন।

যজ্ঞেশ্বর যাকে ষণ্ডামার্কা লোক বলেছিল, তাকে দেখতে পেল ওরা। লোকটা দুটো লোহার শিকগোছের জিনিস টেবিলে রাখল। দুটো হলেও মাথাটা একটা তারে

বাঁধা। যজ্ঞেশ্বর এই দিয়ে তালা খোলে।

বড়বাবু সেটা তুলে দেখলেন, "একদম পাতিচোর। একে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ক্লু যখন রেখে গিয়েছে, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।"

"তাই ? লোকটা কে, জানতে পারলেই আমাকে জানিয়ে দেবেন অফিসার।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কোন ঘরে ঢুকেছিল?"

"দোতলায়। পাইপ বেয়ে উঠেছিল।"

"একটু দেখা যেতে পারে?"

"শিওর। টমি, এদের নিয়ে যাও।"

দোতলায় উঠে এল ওরা। যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়বাবু বললেন, "চুরি যখন করতে পারেনি তখন এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী?" এটা একদম ছিঁচকে ব্যাপার। পেছনে কোনও ব্রেন নেই।"

"তা ঠিক। আচ্ছা, ওপাশের ঘরে কে থাকে?" অর্জুন টমিকে প্রশ্ন করল।

"কেউ না।"

উত্তরটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন দরজার পাল্লা টেনে উঁকি মারল। না। ঘরে কেউ নেই। অথচ যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনা অনুযায়ী ওই ঘরেই বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার হয়েছিল। বৃদ্ধকে কোথায় সরাল ওরা?

সে জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়িতে কে-কে থাকেন?"

টমি বলল, কয়েকজন কাজের লোক, আমি আর সাহেব।"

"আগে একজন বৃদ্ধ এখানে থাকতেন। তিনি কোথায়?"

"আমি জানি না। বোধ হয় দেশে চলে গিয়েছে।"

"দেশ! দেশ কোথায়?"

"আমি জানি না।"

নীচে নেমে এস. পি. সেন কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি আপনাদের এই বাড়িতে অষ্টধাতুর তৈরি ব্রজগোপালের মূর্তি আছে। খুব দামি। সেটা ঠিক আছে তো?"

"ব্রজগোপালের মূর্তি!" এস. পি. সেন ভ্রূ কোঁচকালেন।

"আপনি জানেন না? ওহো, আপনি তো সেন। এ-বাড়ির কর্তারা রায় ছিলেন। গেটে তো দেখলাম, 'রায়বাড়ি' লেখা আছে।"

"আমার মামা হৃদয়রঞ্জন রায় বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে এইসব সম্পত্তি তিনি আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন!" এস. পি. সেন বাঁকাস্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনাদের এ-বাড়ির অষ্টধাতুর কথা শহরের সবাই জানে। শুনেছি বাহাদুর শাহ যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল মুঘল সৈন্যের ওপর লুঠতরাজ করে এই বংশের পূর্বপুরুষ অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা বড় হিরে ছিল। সেই হিরে ওই অষ্টধাতুর মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চোর এসেছিল শুনে আমার মনে হয়েছিল ওই মূর্তির সন্ধানেই সে এসেছিল। "অর্জুন হাসল, যাক, মূর্তিটি চুরি যায়নি?"

"আমি এমন মূর্তির কথা কখনও শুনিনি। অবাক লাগছে।"

"যে বৃদ্ধ এ-বাড়িতে থাকতেন, তিনিও তো রায়। তিনি জানতে পারেন।"

"পারেন। কিন্তু আমি আসামাত্র তিনি ছুটি নিয়ে তীর্থে চলে গিয়েছেন। তা ছাড়া ওসব গল্প বিশ্বাস করার মন আমার নেই।"

"তা হলে অন্য কথা। তবে ওই বৃদ্ধ হাকিমপাড়ায় প্রায়ই যেতেন।"

"হাকিমপাড়া! কেন?"

"ওখানে একজন ব্যাচেলর প্রবীণ মানুষ আছেন। অমল সোম। লোকে ওঁকে খুব বিশ্বাস করে। নির্লোভ মানুষ। এমন হতে পারে বৃদ্ধ আপনাকে নিজের বংশের মানুষ নন মনে করে অমল সোমের কাছে মূর্তিটা গচ্ছিত রেখেছেন।

বড়বাবু বললেন, "আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ওঁর সময় নষ্ট করছি। মূর্তি সম্পর্কে ওঁর যখন কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তখন; আচ্ছা চলি। চোরটাকে ধরতে পারলেই আপনাকে জানাব। নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বড়বাবুর জিপকে অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জিপটাকে থামাল অর্জুন। বড়বাবু অবাক! অর্জুন তাঁকে এবার সব কথা খুলে বলল। বড়বাবু হতভম্ব হয়ে বললেন, "তা হলে সেই বুড়ো মানুষটাকে ওরা বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে?"

"মনে হয়। ছাদের চিলেকোঠা অথবা মাটির তলায় ঘর, যে-কোনও একটা জায়গায় হয়তো এখন সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমলদা এখন জলপাইগুড়িতে নেই। আজই ওঁর বাড়িতে হানা দেবে এরা। হাবু বাড়িতে আছে। ও কথা বলতে পারে না, কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের উচিত ওঁর বাড়িতে লুকিয়ে পাহারা দেওয়া।" অর্জুন বলল।

"ফাঁদ পাততে বলছেন? কিন্তু এস. পি. সেন আপনার ফাঁদে পা দেবেন?"

"লোভ বড় মারাত্মক জিনিস।"

"ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

সেই রাত্রে অমল সোমের বাড়িতে কোনও হামলা হল না। অর্জুন একটু অবাক। তার পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। এস. পি. সেন, এটা সে ভাবতে পারেনি। সকালে

থানায় এল সে। বড়বাবু বললেন, "আপনার যজ্ঞেশ্বর হাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

"মানে!"

"তার বউ বলছে সে নাকি কাজকর্মের খোঁজে শিলিগুড়িতে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি। যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানাটা দিন তো?"

মাসকলাই বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের ভাঙা টিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ওর বউ বলল, "কবে ফিরবে বলে যায়নি।"

"টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওর তো হাতে টাকা ছিল না। দিল কী করে?"

"একজন বুড়োমানুষ এসেছিলেন ওর কাছে রায়বাবু নাম। তিনি দিলেন।"

"কবে এসেছিলেন?"

"কাল সকালে।"

"কীরকম দেখতে?"

"খুব রোগা আর বুড়ো।"

বাড়ি ফিরে এসে অর্জুন বড়বাবুকে ফোন করল, "বড্ড বোকা বনে গেছি। এস. পি. সেন কাউকে বেঁধে রেখে অত্যাচার করেননি। সেই বৃদ্ধ বাইরে, আর তার পরামর্শে যজ্ঞেশ্বর ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি করে একসঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে। লোকটা আর পাতিচোর নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ও কেন আমার কাছে এল? আমার কাছে আগ বাড়িয়ে মিথ্যে বলে ওর লাভ কী হবে?

বড়বাবু বললেন, "একদিনের জন্যে আমরা ওর দিকে নজর দিতাম না, এটা কি ওর কম লাভ? বুড়োর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল! কিন্তু কোথায় পালাবে?"

অর্জুন রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে হতভম্ব!

অপরাধী কে?

চিরঞ্জীব সেন

বাড়িখানা টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে। পুরনো হলদে রঙের দোতলা বাড়ি, বেশি বড় নয়, গায়ে শ্যাওলার ছোপ; তবে বাড়ির কম্পাউণ্ড মস্ত বড়। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা, ধারে ধারে নানারকমের গাছ। ফটক থেকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা। ভেতরে নানারকমের ফুল গাছ। তখনও দেশ ভাগ হয়নি, এত ভিড় জমেনি, টালিগঞ্জ অনেক ফাঁকা ছিল।

বাড়িটার একটা বিলিতী নাম ছিল, "পিস কটেজ"। কোনো এক সাহেবের বাংলো ছিল এটি। সাহেব যখন বিলেত চলে যায় তখন তার কাছ থেকে বাড়িখানি কিনে নেয় জয়ন্ত বোস। জয়ন্ত বোস পুরনো মোটর কেনাবেচার ব্যবসা করে, শেয়ার মার্কেটেও ফাটকা খেলে। বেশ দু'পয়সা আছে, আচারে-ব্যবহারে পুরো সাহেব। সুদর্শন, বয়স চল্লিশ বোধ হয়।

কলকাতায় যেসব ক্লাবে রাতের আড্ডা জমে ওঠে সেইসব ক্লাব মহলে জয়ন্ত বোস সুপরিচিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেইসব ক্লাবে মোটা মোটা টাকার বাজী রেখে ফ্ল্যাশ খেলা চলে। আর কত যে হুইস্কির বোতল খালি হয় তার হিসেব রাখে ক্লাবের মেম্বাররা নয়, সেক্রেটারিও নয়, ক্লাবের একমাত্র খানসামা!

কাবেরী পালকে বিয়ে করে জয়ন্ত রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ে। কাবেরী আর তার দুই বোন, নর্মদা আর তৃপ্তীর নাম কলকাতা শহরের হাই সোসাইটিতে কে না শুনেছে? তিনটি বোনই স্বনামধন্যা! নর্মদা বড়, বড় ঘরেই তার বিয়ে হয়েছে, ছোট তৃপ্তী—সে এনগেজড। কাবেরী বর জোটাতে পারছিল না। 'নাইন ও ক্লক ক্লাবে' জয়ন্তর সঙ্গে তার পরিচয়। মোটর ব্যবসায়ী জয়ন্তর নিত্য নতুন মোটর গাড়ির প্রতি কাবেরী অধিকতর আকৃষ্ট হয়। জয়ন্তকে বিয়ে করে কাবেরি। আফশোষ করেনি। জয়ন্ত তাকে আরামেই রেখেছে, জয়ন্তকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে।

নৃত্যে কাবেরীর খুব সুনাম। এখনও মাঝে মাঝে ডাক আসে। পার্ক সার্কাসে জয়ন্তর গ্যারেজের কাছে এক স্কুলে সে সপ্তাহে তিন দিন ড্যান্সিং লেসন্ দেয়। কাবেরী সুন্দরী না হলেও তার সুঠাম দেহভঙ্গিমা সুন্দর।

পিস কটেজে সত্যিই শান্তি বিরাজ করে। বাড়িতে আর কেউ নেই। জয়ন্ত আর কাবেরী। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না, নিজের নিজের মতো থাকে। এরা দু'জন ছাড়া আছে জয়ন্তর নিজস্ব ভৃত্য নীলকণ্ঠ, কাবেরীর নিজস্ব ঝি করুণা, নীলকণ্ঠর বৌ, বাবুর্চি, বাগানের মালী লক্ষ্মণ আরও একজন ঝি আর চাকর।

সেদিন ক্লাব থেকে জয়ন্ত যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ রাত্রি হয়েছে, একটা বেজে গেছে। চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক বদলে চুপচাপ শুয়ে পড়ল, পাছে আওয়াজ হয়, কাবেরীর ঘুম ভেঙে যায় সেজন্যে সে যেমন নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। কাবেরী তার ঘরে ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক।

পরের দিন সকালে, তখন বেশ বেলা হয়েছে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে নীলকণ্ঠ কেবল জয়ন্তর একারই ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল, কাবেরীর নয়। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই জয়ন্ত নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করল "তোর বৌদি কৈ রে?"

"বৌদি? কৈ? আমি ত জানি না, সকালে উঠে কোথাও গেছেন বোধ হয়।" নীলকণ্ঠ জবাব দিল।

সত্যিই ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দ। জয়ন্ত হঠাৎ যেন অনুভব করল বাথরুমে জলের শব্দ সে পায়নি, কাবেরীর গুনগুন গানও সে শোনেনি, রেডিওটাও সে খোলেনি আজ। এত সকালে তাকে না বলে কাবেরী কোথায় গেল?

"করুণা", ডাকল জয়ন্ত। করুণা ফুলদানীতে ফুল রাখছিল। নিঃশব্দে জয়ন্তর সামনে এসে দাঁড়াল। "তোমার বৌদি কোথায় গেছে?" জিজ্ঞাসা করল জয়ন্ত।

মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে করুণা উত্তর দিল, "আমি ত জানি না দাদাবাবু, তিনি ত কাল রাত্তিরে নিজের বিছানায় শোননি, আমি মনে করলুম বুঝি আপনার ঘরে তিনি ঘুমুচ্ছেন।" কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

"না তো" বলল, জয়ন্ত, "কোথাও বেরুতে দেখেছ?"

"না, তিনি ত কোথাও যাননি।" উৎকণ্ঠার স্বর।

"সে কি? কোথায় গেল?" উদ্বিগ্ন জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠল, কাবেরীর ঘরে এল। মশারি ফেলা রয়েছে, জয়ন্ত মশারি তুলে দেখল, কাবেরী ত নেই-ই এমন কি সে যে বিছানায় শুয়েছিল তারও কোনো আভাস নেই।

করুণা বলল, "বৌদি কাল রাত্তির ন'টায় ফিরে এলেন, বললেন, 'করুণা খাবারটা আজ আমার ঘরেই দিস।' আমি যখন বৌদির খাবার গুছিয়ে নিয়ে উপরে এলুম তখন বাইরে শাড়ি জামা ছেড়ে রাত্রিতে যে সেমিজটা পরে ঘুমোন সেইটে পরে শোফায় বসে খুব মন দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন। আমি একটা ছোট টেবিলে বৌদির খাবার সাজিয়ে দিলুম। তাঁর খাওয়া শেষ হতে হাত-মুখ ধুইয়ে দেবার পর তিনি বললেন, 'আমার চুলটা খুলে দে।' আমি চুল খুলে বেশ করে আচড়ে দিলুম। তিনি বললেন যে, 'বইটা ভারী মজার রে!' আমি তখন বৌদির ছাড়া শাড়ি, জামা, বডিস সব আলনায় গুছিয়ে রেখে নীচে এলুম। তারপর আমি আর কিছুই জানি না।"

কি একটা অজানা আশঙ্কায় জয়ন্তর বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল, তার গলা শুকিয়ে গেল, সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল যেন! কাবেরী নেই! কোথায় গেল সে?

করুণাকে বলল, "দেখ তো কি জামাকাপড় পরে বেরিয়েছে সে।"

করুণা সব দেখে এসে বলল, "না, দাদাবাবু সবই ঠিকঠাক আছে। তিনি যদি বাড়ি থেকে কোথাও গিয়ে থাকেন তাহলে সেই সেমিজটা পরেই বেরিয়েছেন, এমনকি চটিও পায়ে দিয়ে যাননি।"

জয়ন্ত ঘরে এল। সত্যিই ত। টেবিলের ওপর কাবেরীর ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে, ভেতরে গোটা কুড়ি টাকাও রয়েছে। আলমারি বা ড্রেসিং টেবিলও কেউ খোলেনি। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে কিছু গহনাও রয়েছে। আশ্চর্য তো! কাবেরী শুধুমাত্র একটা রাত্রিবাস পরে নিরুদ্দেশ হ'ল? অবিশ্বাস্য!

ততক্ষণ বাড়ির অপর সব লোকজনও ওপরে এসে পড়েছে। সমস্ত বাড়ি আর বাগান তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। কোথাও কাবেরী নেই। তাজ্জব ব্যাপার!

কাবেরী কি উবে গেল?

জয়ন্ত চুপ করে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর উঠে টেলিফোন করতে লাগল, যেখানে কাবেরী যেতে পারে। না, কাবেরীর খবর কেউ জানে না।

অগত্যা পুলিসকে খবর দেওয়া হ'ল।

পুলিস এল। যে ইনস্পেক্টরটি এলেন তাঁকে বেশ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন বলেই মনে হ'ল। নাম ব্যানার্জি, চওড়া কাঁধ, চওড়া চোয়াল, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘ, চটপটে। একে একে সকলকে জেরা করলেন। কেউ এমন কিছু বলতে পারল না, যা থেকে সামান্য একটু হদিস পাওয়া যায়। কেবল লক্ষ্মণ মালী বলল, বৌমা বাড়ি আসবার পর সে রোজকার মতো কুকুর দুটো ছেড়ে দিয়েছিল। জেরার উত্তরে সে বলল যে, পরিচিত কাউকে দেখলে কুকুর দুটো চেঁচায় না, কিন্তু অপরিচিত কাউকে বাগানে আসতে দেখলেই তারা ঘেউঘেউ করে ডেকে ওঠে।

ব্যানার্জির সন্দেহ হ'ল, নীলকণ্ঠ আর লক্ষ্মণকে। কিন্তু এরাই বা কাবেরীকে গুম করবে কেন? টাকা বা গয়নার লোভে? কিন্তু বাড়ি থেকে কিছুই ত হারায়নি? তাহলে? ব্যানার্জির কপাল ঘেমে উঠল। হতে পারে একটা ব্যাপার। বাইরের কোনো লোকের কাছ থেকে টাকার লোভে তারা হয়ত কাবেরীকে বিক্রি করে দিয়েছে। এতক্ষণে হয় তারা কাবেরীকে কোনো দূর দেশে চালান করে দিয়েছে কিংবা হয়ত এখানেই কোথাও গুম করে রেখেছে, জয়ন্ত বোসের কাছে কাবেরীর মুক্তিপণ হিসেবে অনেক টাকা দাবী করে একখানা চিঠি দেবে। কিন্তু এও কি সম্ভব? ব্যানার্জি মনোভাব প্রকাশ করল না। ব্যানার্জি জয়ন্তকে নিয়ে কাবেরীর ঘরে ঢুকলো। করুণাকে ডাকা হল। সে আগে জয়ন্তকে যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করল, নতুন কিছুই সে বলতে পারল না।

এইটুকু বোঝা গেল যে, কাবেরী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে যায়নি। কোনো মেয়ে একখানি মাত্র নৈশবাস পরে বাড়ির বাইরে দূরের কথা নিজের ঘরের বাইরেই আসে না। চুরি-ডাকাতির লোভেও কেউ যদি এসে তাকে খুন করে, ঘরে তারও কোনোই প্রমাণ নেই।

ব্যানার্জি ঘরের পূবদিকের জানালার ধারে এল। জানালার গরাদ নেই। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বানার্জি এদিক ওদিক দেখল। নীচে ফুটপাথের মতো বাঁধানো সরু রাস্তা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে। হঠাৎ ব্যানার্জি জানালার চৌকাঠে সামান্য একটু সাদা গুঁড়ো মতো কি যেন দেখল। পকেট থেকে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বার করে সেটিকে ভাল করে দেখল, তারপর পকেট থেকে একটা বুরুশ আর ছোট একটা খাম বার করল, তারপর বুরুশ দিয়ে সেই সাদা গুঁড়োটাকে তুলে

নিয়ে খামে ভরে নিল।

রাত্রে কাবেরী যে শাড়ী জামা পরেছিল, ব্যানার্জি করুণাকে সেগুলি দেখাতে বলল। সেগুলি আলনায় গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। ব্যানার্জি সেগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। ব্লাউস থেকে একটা মৃদু অথচ মিষ্টি সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। ব্যানার্জি নিশ্বাস টেনে বেশ কয়েকবার ঘ্রাণ নিয়ে ব্লাউসটা জয়ন্তর হাতে দিল, জিজ্ঞাসা করল, "আপনার স্ত্রী কি এই এসেন্স ব্যবহার করতেন?" জয়ন্ত কয়েকবার ঘ্রাণ নিয়ে বলল, "না, তবে করুণা ভাল বলতে পারবে।" করুণা ব্লাউসটা নাকে চেপে ধরে ঘ্রাণ নিয়ে বলল, "না, দাদাবাবু ঠিকই বলেছেন"—এই কথা বলে সে কাবেরীর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার রুমালটাও বার করে দিল। ব্যানার্জি আর জয়ন্ত দুজনেই ব্লাউসের গন্ধ আর রুমালের গন্ধের পার্থক্য সহজেই বুঝতে পারল। তাহলে কাবেরীর ব্লাউসে এই গন্ধ এল কোথা থেকে? শুধু ব্লাউস নয়, যে শোফাটায় কাবেরী বসেছিল সেই শোফা থেকেও সেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ কাবেরী তার বাইরের সেই শাড়ি ব্লাউস পরে শোফায় বসেনি। করুণার কথা অনুযায়ী কাবেরী যখন শোফায় বসেছিল তার পরনে গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা নৈশবাস ছিল। ব্যানার্জি এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আর এক সমস্যার সম্মুখীন হ'ল।

যাবার আগে ব্যানার্জি কাবেরীর ঘর থেকে কয়েকটা আঙুলের ছাপ তুলে নিল আর বাড়ির কম্পাউণ্ডটা ভাল করে ঘুরে দেখে গেল।

পুলিশ চলে গেল, ভিড়ও সরে গেল। বাড়িতে তখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সারা বাড়িটা থমথম করতে লাগল।

খবর পেয়ে বিকেল বেলায় ভবানীপুর থেকে জয়ন্তর ছোট বোন ছায়া এল। আপাতত সে দাদার কাছে থাকবে, দাদাকে দেখাশোনা করবে।

তিন-চারদিন কেটে গেল। কাবেরীর অন্তর্ধানের কোনোই হদিস পাওয়া গেল না। পুলিস সন্দেহজনক নানা জায়গায় হানা দিল নানা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কেউ কিছু বলতে পারল না। যে সময়ে কাবেরী নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে অনুমান করা হ'ল সে সময়ে টালিগঞ্জের ঐ অঞ্চলে নৈশবাস পরা কোনো মহিলাকে কেউ দেখেনি, কোনো ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়িতে ঐরকম কোনো মহিলা সওয়ারীও হয়নি।

আঙুলের যে ছাপ ব্যানার্জি নিয়ে গিয়েছিল সেগুলি কাবেরী আর করুণার। সেই সাদা গুঁড়োটুকু পরীক্ষা করে জানা গেল যে, সেটি ক্যারারা মার্বেলের গুঁড়ো।

পিস কটেজের পূবদিকে একটা বাগানওয়ালা বাংলো বাড়ি আছে পশ্চিম

দিকটা ফাঁকা। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে জয়ন্ত অথবা কাবেরীর আলাপ-পরিচয় ছিল না। পূবদিকের বাংলোয় যিনি থাকেন তিনি একজন ভাস্কর, বাঙালী নন, কোনদেশী কে জানে, গেটে কাঠের ছোট সাইনবোর্ডে লেখা আছে ভিক্টর পিটার লোবো। এখানে কোথা থেকে এল কে জানে? ব্যানার্জি যখন শুনল যে লোকটা ভাস্কর তখন তার সন্দেহ হ'ল সে হয়ত ক্যারারা মার্বেলের গুঁড়ো ব্যবহার করে। ব্যানার্জি তখনই সাদা পোশাকে একজন লোককে লোবো সাহেবের বাংলোয় পাঠাল। ফিরে এসে সে যা রিপোর্ট দিল তাতে ব্যানার্জির কিছুই সাহায্য হ'ল না। এইটুকু শুধু জানা গেল যে, লোবো সাহেব ক্যারারা মার্বেলের গুঁড়ো ব্যবহার করে।

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাঁর কোনোই সন্ধান পাওয়া গেল না এই তিন-চার দিনের মধ্যে। এমন বিপদে কখনও ব্যানার্জিকে পড়তে হয়নি। আরও তিন-চারদিন কাটল। খবরের কাগজে পুলিসের তীব্র সমালোচনা হ'ল। আজ নিরাপত্তার কতখানি অভাব, খবরের কাগজের সম্পাদকরা সেইটুকু পাঠকদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিকই কাবেরীর অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতে না পারলে তাকে ওপরওয়ালাদের কাছে বেইজ্জত হতে হবে। সেদিন সন্ধ্যার পর থানায় বসে ব্যানার্জি বোধ হয় এইসব কথাই চিন্তা করছিল। এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন করছে জয়ন্ত বোস, সন্ধ্যা থেকে তার বোন ছায়াকে পাওয়া যাচ্ছে না, কাবেরীর মতো সেও উবে গেছে।

যথারীতি ব্যানার্জি তদন্ত করতে এলেন। এবারও কোথাও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। জানা গেল বিকেলে একতলায় ডাইনিং হলে ছায়া একাই ছিল। নীলকণ্ঠকে ছায়া ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারে পাঠিয়েছিল, লক্ষণ মালীও বাড়ি ছিল না। বাবুর্চি তখনও আসেনি, করুণা ছাদে না কোথায় যেন ছিল। জয়ন্ত দোতলায় নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে চুপচাপ শুয়ে ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হয় ছায়া ডাইনিং হল থেকে কি যেন আনতে নীচে গেছে, অনেকক্ষণ হ'ল তবুও ফিরছে না দেখে সে ছায়ার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল, সাড়া না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। ডাইনিং হল অন্ধকার, কিন্তু কোথায় ছায়া? তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। বাড়ির কম্পাউণ্ডের সমস্ত আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল, ছায়ার কোনো পাত্তা কোথাও পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত একেবারে মুষড়ে পড়েছে। সে বাড়িতে উপস্থিত থাকতে এইভাবে তার বোন অদৃশ্য হয়ে গেল, সে কি করে তার ভগ্নীপতিকে মুখ দেখাবে? জয়ন্ত ছোট ছেলের মতো যেন আবদার করে ব্যানার্জিকে বলতে লাগল, "যেমন করে পারেন আপনি ছায়াকে খুঁজে দিন!"

ডাইনিং হলে ঢুকে ব্যানার্জি চমকে উঠল। সেই মৃদু অথচ মিষ্টি সুবাস, এবার যেন একটু জোর, ঘুম পায় যেন। এটা কি কোনো সুগন্ধি না কোনো ওষুধ? কে জানে কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই নাম না জানা সুবাসে!

সে রাতের মতো এনকোয়ারি শেষ করে ব্যানার্জি ফিরে গেল। রাত্রে তার ভাল ঘুম হ'ল না। সে সারা রাত্রি ধরে এই অভূতপূর্ব অদ্ভুত অন্তর্ধানের বিষয় চিন্তা করেছে। ভোর হতে না হতেই সে পিস কটেজের বাগানে ঢুকে পড়ল। মালী সবেমাত্র উঠে খুরপি হাতে বাগানে কাজ করছে। ব্যানার্জিকে সে এই ক'দিন চিনেছে। সে নিজের মনে কাজ করতে লাগল। ব্যানার্জি সাব্যস্ত করেছে এই পুরনো আমলের বাড়িখানা, টালিগঞ্জের নবাব পরিবারের কেউ কখনও তৈরি করেছিল হয়ত, এরই মধ্যে কোথাও কোনো অদৃশ্য এবং অজানা দরজা আছে, দরজাটা হয়ত বাড়ির মেঝেতে কোথাও আছে, যেখানে পা পড়লে মানুষ কোনো গভীর অতলে পড়ে যায়, তারপর আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু মিষ্টি আর মৃদু সুবাসটা? সেটা হয়ত ঐ পাটাতন ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির নীচে কোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। সেই রহস্য ভেদ করতে হবে। কিন্তু, বাড়িতে এত লোক থাকতে দু'জন যুবতীই বা ঐভাবে পাতালে অদৃশ্য হল কেন?

পায়চারি করতে করতে ব্যানার্জী বাগানের পূবদিকে পাঁচিলের ধারে এসে পড়েছে। পাঁচিল ঘেঁষে একটা দেবদারু গাছ ওঠায় পাঁচিলটা খানিকটা ভেঙ্গে গেছে। সেখান দিয়ে একজন লোক যাওয়া আসা করতে পারে। সেখানে ব্যানার্জী একটু দাঁড়ালো। লক্ষ্য করল কয়েকখানা ইঁট কে যেন সরিয়েছে। স্পষ্ট দুটো জুতোর ছাপ। ব্যানার্জী গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। চুপ করে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল।

কার কাশির শব্দে ব্যানার্জীর চিন্তাজাল ছিঁড়ল। মুখ তুলে দেখল পূব দিকের বাড়ির পাঁচিলের ধারে লম্বা চওড়া কৃষ্ণকায় একজন প্রৌঢ় তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে সিল্কের সার্ট, পরনে ফুল প্যান্ট, হাতে একটা ছড়ি।

সে নিজেই নিজের পরিচয় দিল। সেই পিটার লোবো। সে জানতে চাইল, মিস্টার কি এই বাড়িটা কেনবার মতলব করছেন? ব্যানার্জীর সুবিধেই হ'ল। সেও নিজের পরিচয় গোপন করে ফেলে সম্পত্তি-ক্রেতার ভূমিকাই নিল। লোবোরও ইচ্ছে বাড়িখানা কেনে। দু'জনের আলাপ একটু অগ্রসর হতেই লোবো

ব্যানার্জীকে নিজের বাড়িতে চা খেতে ডাকল। ব্যানার্জীও এই সুযোগ খুঁজছিল।

চা খাওয়া শেষ হ'ল। ব্যানার্জী লোবোর স্টুডিও দেখতে চাইল। সানন্দে রাজী হ'ল লোবো। স্টুডিওতে ঢুকেই ব্যানার্জীর নাক কুঁচকে উঠল। সেই মৃদু অথচ মিষ্টি সুবাস। এখানে গন্ধটা যেন কিছু তীব্র, ঘুম পায়। স্টুডিওতে নানা মূর্তি, পুরুষ, নারীর, ছোটখাটো জীবজন্তুরও। একটা নারীমূর্তি বোধ হয় সদ্য নির্মিত, কিন্তু কি চমৎকার আর নিখুঁতভাবেই না তৈরী করেছে লোবো, মনে হয় যেন সত্য সত্যই নিরাভরণ কোনো এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। ব্যানার্জী ঘুরে ঘুরে মূর্তিটির চারিদিকে দেখতে লাগল। পিঠের দিকে একটা অংশ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। কথা বলতে বলতে সেইখানটা সে হাত বুলিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। তারপরই হঠাৎ ব্যানার্জী পিস্তল বার করে লোবোকে বলে উঠল, "তুমি এইবার ধরা পড়ে গেছ, সব স্বীকার কর।" আচমকা এইভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় লোবোও অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ল।

ব্যানার্জী যখন পিস কটেজের কম্পাউণ্ড পার হয়ে লোবোর বাগানে ঢুকলো তখন কয়েক পা যেতে না যেতেই সে বাগানের রাস্তায় লোবোর জুতোর ছাপ দেখে চমকে উঠল। এই সেই একই ছাপ যা সে ভাঙা পাঁচিলের উপর দেখেছিল। স্টুডিওতে সেই মৃদু ও মিষ্টি সুবাস তার সন্দেহ দৃঢ়তর করল। কিন্তু ব্যানার্জী নিঃসন্দেহ হ'ল সেই নারীমূর্তি দেখে। পিঠের একটা অংশ থেকে সামান্য একটু প্লাস্টার অফ প্যারিসের চটা উঠে গিয়েছিল। সেই জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে ব্যানার্জী চটা ওঠা জায়গাটা একটু বড় করে ফেলেছিল তারপর আঙুল দিয়ে টের পায় যে প্লাস্টার অফ প্যারিসের নীচে যা রয়েছে তা আসল নারীর মৃতদেহ। ব্যানার্জী আর দেরী করল না। অতর্কিতভাবেই সে লোবোকে পরাভূত করল।

লোবো পরে সব দোষ স্বীকার করল। সে বহুদিন থেকেই নিজের ঘরের জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূরবীণের সাহায্যে কাবেরীকে দেখেছে এবং শিল্পী হিসাবে তার সুগঠিত দেহ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। মানবদেহকে মমি করে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল সে পুরনো ফরাসী বই পড়ে আয়ত্ত করেছে। সেই মৃদু আর মিষ্টি সুবাস হ'ল তীব্র একটা বিষ। সেই বিষের কণিকামাত্র রক্তস্রোতে মিশলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু এমন কি জোরে ঘ্রাণ নিলেও মৃত্যু। কুকুর দুটোকে লোবো প্রায় একমাস ধরে মাংসের টুকরো খাইয়ে খাইয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল। ঘটনার দিন সে অলক্ষ্যে বাগানে ঢুকে কুকুর দুটোকে একটু আড়ালে সরিয়ে বেঁধে রাখে।

নিজের বাড়ি থেকে সে আগেই দেখে নিয়েছিল যে, চেয়ারে বসে কাবেরী

ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আর দেরি করেনি। ছোট একটা মই এনে জানালায় উঠে ছোট্ট একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ থেকে কাবেরীর ঘাড়ে সেই তীব্র বিষের সামান্য একটু ইঞ্জেকসান দিয়ে দেয়। কাবেরী সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। তারপর মৃতদেহটা কাঁধে ফেলে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। পরে মই সরিয়ে আনে, কুকুর দুটোকেও ছেড়ে দেয়। এত সহজে সাফল্য লাভ করে তার সাহস বেড়ে যায় এবং পরেই ছায়া অদৃশ্য হ'ল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সহজেই।

ছায়ার দেহও পাওয়া গিয়েছিল পিটার লোবোর স্টুডিওতে। ছায়া সুন্দর একটি নারীমূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

ব্যানার্জীকে পুলিসের লোক বলে, লোবোর একেবারেই সন্দেহ হয়নি, নইলে কি সে খাল কেটে কুমীর আনে?
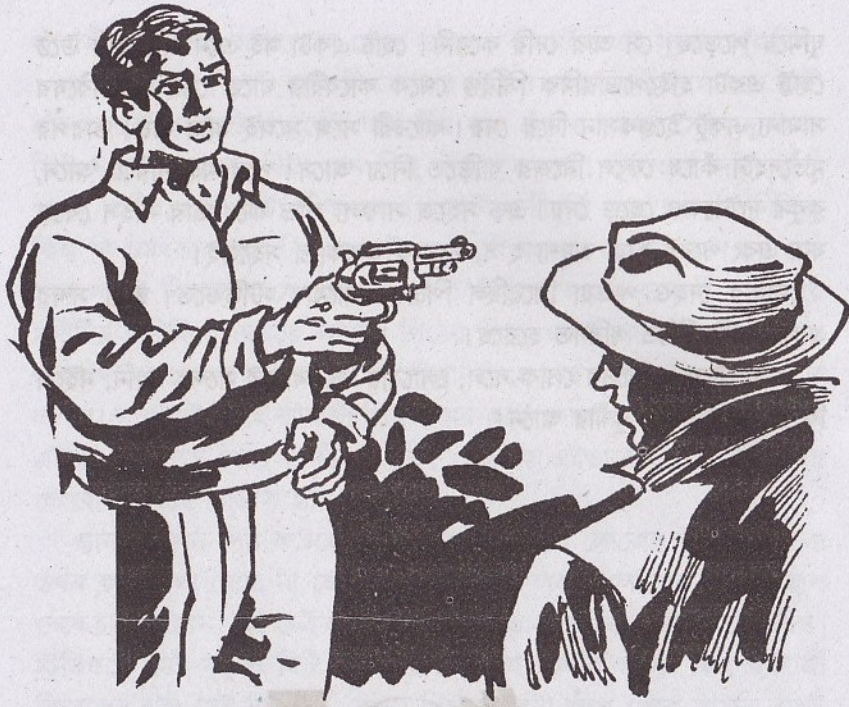
গোয়েন্দার ঘরে

শেখর বসু

সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘন কালচে মেঘ সাদা আকাশে। বিকেল হতে না হতেই সারা শহরে অন্ধকার নেমে এল। সন্ধ্যে বেলাতেই মনে হল বেশ রাত্তির। আর রাত্তির বারোটার সময় যেন শেষ রাত। বিখ্যাত গোয়েন্দা মণিময় রুদ্র হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুললেন। কাজের টেবিল থেকে উঠে ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয়েছে এবার।

খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। অন্যান্য রাতে এ-সময়ে আশে-পাশের দু' একটা ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে, ছোটখাট শব্দ ভেসে আসে। আজ কোথাও কোনো শব্দ নেই। বাইরে এত অন্ধকার যে, মনে হচ্ছে পাশের বাড়িগুলোও অনেক দূরে সরে গেছে।

মণিময় রুদ্র টেবিলের দরকারী কাগজগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফ্লাস্ক থেকে এক

কাপ কালো কফি ঢেলে নিলেন, শুতে যাওয়ার আগে কালো কফি খাওয়া ওঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

কফিতে সবে প্রথম চুমুকটা দিয়েছেন এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। নিশুতি রাতে হঠাৎ কলিংবেলের শব্দে সামান্য একটু চমকে উঠলেন মণিময়বাবু! কে?

ছোট্ট পিস্তলটা স্লিপিং স্যুটের পকেটে ঢুকিয়ে দরজা খুললেন। দরজার গোড়ায় সারা শরীর বর্ষাতিতে ঢাকা ভদ্রলোক মণিময়বাবুর অচেনা। ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা আপনি কি প্রাইভেট ইনভেষ্টিগেটর মণি—"

থামিয়ে দিয়ে মণিবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে আসুন।"

বসার ঘরে টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসবার মুখে ভদ্রলোক বললেন, "অসময়ে আসার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এত জরুরি কাজ যে এখনই না এসে উপায় ছিল না।"

মণিময়বাবু কথার উত্তর না দিয়ে খুব দ্রুত খুঁটিয়ে দেখে নিলেন ভদ্রলোককে! উনি বর্ষাতি খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকছিলেন, চেয়ারে বসার পরে ওটা নামিয়ে রাখলেন মেঝের ওপর। ভদ্রলোকের বয়েস বছর পঞ্চাশ। পোশাক-আশাক বেশ দামী, হাতের আঙ্গুলে বেশ বড় একটা হীরের আংটি।

ভদ্রলোক একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "কাজটা সত্যিই খুব জরুরি। তাছাড়া এত রাত্তিরে আসার বড় কারণ হল, আমি এ ব্যাপারটা—"

"গোপন রাখতে চান, তাই তো?"

অবাক হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বুঝলেন?"

মণিময়বাবু হেসে বললেন, "এটা বোঝার জন্যে খুব একটা বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই যথেষ্ট। এখন বৃষ্টি নেই, অথচ বর্ষাতি আর টুপিতে আপনি সারা শরীর-মাথা ঢেকে এসেছেন। আরও একটা ব্যাপার, আপনি এই রাস্তার মোড়ে আপনার গাড়ি রেখে এসেছেন।"

এবার ভদ্রলোক একটু বোধহয় চমকেই গেলেন।

মণিময়বাবু আগের মতোই হেসে বললেন, "এটা বোঝা আরও সোজা। বড় রাস্তা সি.এম.ডি.এ. খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। বৃষ্টিতে সে রাস্তা কাদায় কাদা! এই পথ দিয়ে হেঁটে এলে আপনার জুতোয় কাদা লেগে থাকত, আপনি আবার আমার বাড়ির সামনে গাড়ি থেকেও নামেননি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, এই রাস্তার মোড়ে আপনি গাড়ি রেখে এসেছেন!"

ভদ্রলোক বেশ তারিফ করার ভঙ্গিতে বলেন, "আপনার কথায় আসা যাক!"

"তার আগে বলুন আপনার নাম কী, কোথায় থাকেন, কী করেন? কিছু মনে

করবেন না, কোনো কেস হাতে নেওয়ার আগে এগুলো আমি জেনে নিই।”

ভদ্রলোক মণিময়বাবুর কথার উত্তর দিলেন না সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “আমি খুব দুঃখিত, আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব না। আমি আমার পরিচয় গোপন রাখতে চাই। তবে, আপনি আপনার কাজের জন্যে ভাববেন না, যা চান তাই দেব। আমি একটা দলিল আপনাকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে চাই। দলিলটা ঠিক না জাল—আপনি শুধু এইটুকু বলে দেবেন।”

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক ছোট্ট একটা ব্যাগের ভেতর থেকে একটা দলিল বার করে মণিময়বাবুর সামনে রাখলেন।

মণিময়বাবু গম্ভীরভাবে দলিলটা ওলটাতে-ওলটাতে বললেন, “ঠিক আছে, এটা রেখে যান এখন, দিন-চারেক বাদে এসে রিপোর্ট নিয়ে যাবেন।”

ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন, “দয়া করে এখনই এটা পরীক্ষা করে দিন। খুব আর্জেন্টি। টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। যা চাইবেন আমি তাই দিতে রাজি আছি।

মণিময়বাবু এবার একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “বার বার টাকা পয়সার কথা তুলবেন না। আমার যা ফিস আমি তাই নিয়ে থাকি, কখনোই তার বেশী নেই না।”

ভদ্রলোক রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। “না না, আমি আপনাকে অসম্মান করতে চাইনি। হয়ত আমার বলাটা ঠিক হয়নি। আপনি যদি একটু কষ্ট করে এটা এখনই পরীক্ষা করে দেন, আমি দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাই।”

মণিময়বাবু এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা কুড়ি বাজে। ঘড়ি দেখে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা টেনে নিয়ে ধরলেন দলিলের ওপর।

ভদ্রলোকের মুখে একটু স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। উনি পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন ভাল করে। তারপর ওঁর চোখ সমানে ঘুরতে লাগল ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর দলিলের ওপর।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাইক্রোসকোপ, নানা ধরনের কেমিক্যাল, আলট্রা ভায়োলেটার ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে দলিলের ওপর একটার পর একটা পরীক্ষা চালাতে লাগলেন মণিময়বাবু। এদিকে ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে ঘুরেই চলেছে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল ঝমঝম করে। মস্তবড় একটা কাচের ছাইদানি সিগারেটের ছাই আর টুকরোয় ভর্তি হয়ে গেল প্রায়। আকাশে ভোরের আলো ফুটে ওঠার মুখে দলিল পরীক্ষা শেষ হল।

মণিময়বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে বললেন, দলিলের নীচে যে তারিখ বসানো আছে সেটা ধরলে

বলতে হয়, আজ থেকে ঠিক ত্রিশ বছর আগে দলিলটা তৈরী হয়েছে। এতক্ষণ ধরে পরীক্ষা না করলে আমি বলতাম, সত্যিই এটা ত্রিশ বছর আগে তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমার শেষ পরীক্ষাটা বলল—”

কথাটা শেষ না করে মণিময়বাবু সিগারেটে টোকা মেরে মেরে সবটুকু ছাই ঝাড়লেন ছাইদানিতে, তারপর বললেন, “শেষ পরীক্ষায় জানলাম, এ দলিলটার বয়েস তিন সপ্তাহের বেশী নয়। প্রায় নিখুঁত জালিয়াতি, বোঝা যায় বেশ পাকা লোকের কাজ।”

ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠলেন—“বলেন কী?”

মণিময়বাবু হেসে বললেন, “হ্যাঁ, সত্যিই পাকা কাজ। আমি তো আর একটু হলেই রায় দিয়ে ফেলেছিলাম—দলিলটা খাঁটি।”

ভদ্রলোক থমথমে মুখ করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখ খুললেন, “আচ্ছা দলিলটা যে জাল সেটা আপনি ছাড়া আর কোনো ডকুমেন্ট এক্সপার্ট কি ধরতে পারবে?”

মণিময়বাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, “এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন, আর বোধহয়, উচিতও হবে না।”

“না না, আপনি বলুন।”

“দেখুন, এই ধরনের ডকুমেন্ট পরীক্ষার কাজে দুটো জিনিসের দরকার হয়। এক, বুদ্ধি। দুটি সফিসটিকেটেড যন্ত্রপাতি। কার বুদ্ধি কতখানি, সে বিচার আপনারা করবেন। তবে, আমার কাছে যে ধরনের যন্ত্রপাতি আছে, সে ধরনের যন্ত্রপাতি এ দেশে আর একজনেরই ছিল। আমার মনে হয়, তিনি হয়ত ধরতে পারতেন, এ দলিলটা জাল।”

“কে তিনি? এখন কোথায় আছেন?”

“তাঁর নাম ডক্টর সাকসেনা। সাকসেনা আজ থেকে ঠিক দু'সপ্তাহ আগে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন।”

“খুন! খুনী ধরা পড়েছে?”

“না।”

খুনের খবর শুনে ভদ্রলোকের মুখ দুঃখী দুঃখী হয়ে উঠল। নীচু গলায় বললেন, “আজকাল এই এক হয়েছে, কথায় কথায় খুন—। আচ্ছা আমি এবার উঠব, একটু চা কিংবা কফি—।”

মণিময়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, “নিশ্চয়ই।” বলে ফ্লাস্কটা টেনে নিয়ে দু কাপ কফি ঢাললেন।

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, “আমার আবার কালো কফি ঠিক চলে না।

একটু দুধ...।”

“দুধ তো...মানে আমি তো দুধ খাই না। এত ভোরে বাইরে থেকে আনবার উপায়ও নেই।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে”—ভদ্রলোক অপ্রস্তুত মণিময়বাবুকে শান্ত করার গলায় বললেন। তারপর বললেন, “এক গ্লাস জল হবে?”

টেবিলের ওপরই ওয়াটার বট্‌ল ছিল, মণিময়বাবু এক গ্লাস জল ভরে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে।

“ঠাণ্ডা জল হবে না?”

“না, আমার ফ্রিজটা পরশু থেকে খারাপ হয়ে গেছে।”

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক দু' চুমুক জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। মুখে কেমন যেন অস্বস্তির ছাপ। মণিময়বাবু বললেন, “আপনি কিছু স্ন্যাক্স, মানে বিস্কুট-টিস্কুট খাবেন?”

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

মণিময়বাবু উঠে গেলেন ভেতরের ঘরে। ফিরে এলেন মিনিট চারেক বাদে। হাতের প্লেটে তিন-চার রকমের বিস্কুট।

ভদ্রলোক এর মধ্যেই কালো কফির কাপ অর্ধেক শেষ করে ফেলেছেন। মণিময়বাবু ঘরে ঢুকতেই বললেন, “ঈশ। আপনার কফি তো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খেয়ে নিন।”

মণিময়বাবু কথার উত্তরে মৃদু হাসলেন, তারপর বিস্কুটের প্লেটটা ভদ্রলোকের সামনে রেখে কফির কাপ টেনে নিলেন।

ভদ্রলোক বিস্কুটের একটা টুকরো ভেঙে মুখে ফেলে বললেন, “কফি কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?”

“না, তাছাড়া আমি একটু ঠাণ্ডা কফিই পছন্দ করি।”

আবহাওয়া, রাতে ঘুমোতে না পারা ইত্যাদি নিয়ে দুটো-চারটে কথা হওয়ার পরে ভদ্রলোক আবার বললেন, “একি! আপনি কফি খাচ্ছেন না কেন? খান।”

“না না, তাই কখনো হয়! একটু অন্তত খান। না খেলে আমিও আর খাব না।” ভদ্রলোক হাতের বিস্কুটটা নামিয়ে রাখলেন প্লেটের ওপর।

মণিময়বাবু এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, আপনি কি ডক্টর সাকসেনাকে চিনতেন?”

“কোন্ সাকসেনা? ওহ! ডকুমেন্ট এক্সপার্ট সাকসেনা। না, চেনা তো দূরের কথা, ওঁর নাম আমি আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।”

“আমি যদি বলি, আপনি ওকে চিনতেন। এই দলিলটা আপনি ডক্টর সাকসেনাকে

দিয়েও পরীক্ষা করিয়েছেন।”

“কী যা তা বলছেন, পরীক্ষা করিয়েছি তার প্রমাণ কী?”

“প্রমাণ আছে। ডক্টর সাকসেনার গোপন মাইক্রোফিল্ম আর—”

ভদ্রলোক বাঁকা করে হেসে বললেন, “আপনি নির্ঘাত কিছু একটা ভুল করছেন। ডক্টর সাকসেনার কাছে আমি গিয়েছিলাম—এটা গোপন করার পেছনে আমার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?”

“উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আপনি দেখতে চেয়েছিলেন দলিলের জালিয়াতি ডকুমেন্ট এক্সপার্টরা ধরতে পারে কি না। আপনি নিশ্চিত হয়ে জাল দলিল যথাস্থানে পেশ করতে চান। আপনি আমার কাছেও ওই একই কারণে এসেছেন। ডক্টর সাকসেনা ধরতে পেরেছিলেন দলিলটা জাল, সুতরাং...।”

“সুতরাং কী?” ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

মণিময়বাবু একটু হেসে বললেন, “আমি আপনার জন্যে ও-ঘরে বিস্কুট আনতে গিয়ে পুলিশকে ফোন করেছি। পুলিশ এক্ষুণি এসে পড়বে। চুপ করে বসুন। আপনাকে গ্রেফতার করার পেছনে দুটো অভিযোগ। এক, মার্ডার, দুই অ্যাটেম্প্‌ট টু মার্ডার।”

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনি আমাকে অপমান করছেন।”

মণিময়বাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, “আপনি কিছুক্ষণ আগে নানা অজুহাতে আমাকে ঘর থেকে বার করার চেষ্টা করছিলেন, শেষকালে বিস্কুট আনার নাম করে আমিই আপনাকে সুযোগ দিলাম।”

“কিসের সুযোগ?”

“ডক্টর সাকসেনাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। কে বা কারা চায়ের কাপে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। আমি বিস্কুট আনতে গিয়ে আমার কফির কাপে বিষ মেশাবার সুযোগ দিয়েছি।”

ভদ্রলোক চোখ মুখ লাল করে দ্রুত পকেটে হাত ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গে স্লিপিং স্যুটের পকেট থেকে ছোট পিস্তলটা বার করে ভারি গলায় বললেন, “পিস্তল বার করার চেষ্টা না করে চুপ করে বসুন।”

ভদ্রলোকের চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উনি পকেট থেকে হাত বার করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন ধপ করে।

একটু পরেই সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। মণিময়বাবু গলা তুলে বললেন, “সোজা ঘরে চলে আসুন ইন্সপেক্টরবাবু।”

সিঁড়ি থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর এল, “আসছি।”

শ্মশানে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

সিঁড়ির ধাপে ধাপে পায়ের শব্দ—একসঙ্গে অনেক লোক উঠছে যেন। ভীতসন্ত্রস্ত চোখে খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুদর্শন। একটু আগে আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ খুলে ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেছে। রামভকত নেই। দক্ষিণ দিকের চারপাইটা খালি। মানুষটা কখন দরজা খুলে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে সুদর্শন টের পায়নি একটুও। মরণ ঘুম ঘুমিয়েছিল যেন। উত্থানশক্তি রহিত সুদর্শন উঠতে চেষ্টা করছে। দু'হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করল খানিক। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকবে, সে উপায়ও নেই। মাস দুয়েক হল গলার স্বর উচ্চগ্রামে ওঠে না আর। কমতে কমতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, এখন তো পাশের লোকও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কথা বুঝতে পারে না তার। ফিসফিস করে নিঃশ্বাসের আওয়াজে কথা

কয় সে। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা কয় না আর। কইতে পারেও না।

গলায় যতটা জোর দেওয়া যায়, ততটা জোর দিয়েই রামভকতকে ডাকল বার তিনেক। শুনল না কেউ, সাড়া দিল না কেউ। সুদর্শন নিজের কানেই শুনল স্রেফ। আর শুনল বোধহয় ঘরের বাঁ কোণের প্রদীপের শিখাটা। ওটা একটু জোরে কেঁপে উঠল বার তিনেক।

ঘরে ঢুকল পরপর ক'জন। গোনবার সময় ছিল না তখন সুদর্শনের। দেখেছিল কতকগুলো কালো ছায়া ঘরময় ঘোরাফেরা করছে তার চারপাশে। বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করছে। মৃত্যুর আগে নিজের মৃত্যু দেখছে। কালোছায়াগুলো তার চারপাইয়ের চতুর্দিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে! হাত না তুলেও তাকে স্পর্শ না করে ওরা যেন একসঙ্গে বহু হাতে তার আপাদমস্তক সজোরে চেপে ধরছে। হিম হয়ে আসছে সর্বশরীর। ক্ষীণ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। দম আটকে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। 'পিলসুজ সুদ্ধ প্রদীপটা নিয়ে এস এদিকে!' বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করল একজন অন্যজনকে। ঘরটা কেঁপে উঠল। প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে থরথর করে।

ছায়ার কথায় কায়ার কণ্ঠস্বর শুনে বুকের ভিতর ভারবোধ কমল অনেকখানি সুদর্শনের। ঘরটারও ঘন বাতাস পাতলা হয়ে এল। যে ক'টা এসেছে মানুষ ভিন্ন অন্য কেউ নয় তারা। ভূতপ্রেত অশরীরী নয় কেউ। কঙ্কালসার চেহারার ভিতরে সাহস ফিরে পাচ্ছে সুদর্শন। মানুষকে ভয় করতে জীবনে শেখেনি ও কখনো। একা একশো লোকের মহড়া নিয়েছে এক সময় ভরা যৌবনে। সুদর্শনের লাঠির সামনে সাহস করে এগিয়ে আসতে পারে নি কেউ কোনদিন। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি এক মুহূর্তও।

যৌবনের সুদর্শন লাঠিয়াল জেগে উঠছে যেন মৃত্যুপথের যাত্রী সুদর্শনের ভিতর। চোখ দুটো জ্বলে উঠছে দপদপ করে। সাদা ফ্যাকাশে চোখে অত রক্তের লাল এসে গেল হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে। সুদর্শন নিজেও জানে না। আগন্তুকদেরই একজন সামনে আনা প্রদীপটা পিলসুজ থেকে মুখের কাছে আরতির মতো দু'চার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করল। তারপর সরোষে বলে উঠল, 'রক্তচক্ষু দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। যা করতে এসেছি, তা আমরা করবই। যা করতে এসেছি, তা তোমাকে করতে হবেই।'

প্রদীপের আলোয় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকগুলোর পা থেকে মাথা অবধি একবার দেখে নিল সুদর্শন। প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কালো আলখাল্লায় ঢাকা। মুখ কালো মুখোশ ঢাকা। এই মিশমিশে কালো আবরণ ভেদ করে শরীরের কোন অঙ্গ দেখবার উপায় নেই কারো। চেনা-অচেনা নিশানা জানবার উপায় নেই কারো।

হাতের প্রদীপ নামিয়ে রাখল লোকটা পিলসুজের ওপর। মুখ না ফিরিয়েই

পাশের লোকের সামনে হাত বাড়াল। ও মানুষটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো। এবারে নড়ল একটু। বুকের কাছে, আলখাল্লার নিচ থেকে একখানা কাগজ বার করে হাতে দিল।

বুকের মধ্যে ঝড় বইছে সুদর্শনের। এ কি দেখছে! এ কি দেখলে! কাগজ দেবার সময় যার হাতে দেখল, যে আঙুল দেখল—অচেনা নয়, অজানা নয়। ফর্সা হাতটায় কালি মাখিয়েও চোখে ধোঁকা লাগাতে পারেনি সুদর্শনের। আংটিটা মাঝের আঙুল থেকে খুলতে ভুলে গেছিল হয়তো ও। আংটিই চিনিয়ে দিয়েছে ভালো করে সুদর্শনকে—ও কে।

নামটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে—থমকে গেল। ওরা সকলে মিলে উচ্চারণ করতে দিল না তাকে। চারদিক থেকে চোখ ধাঁধানো চক্‌চকে ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে। চোখের ওপর, মাথার ওপর, বুকের ওপর।

সুদর্শন বিস্মিত ক্রুদ্ধ নির্বাক নিরুপায়।

কাগজটা হাতে পেতে, সুদর্শনের দিকে এগিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শীগ্‌গির সই করে দাও। না দিলে, পরিণতিটা আঁচ করতে পারছ নিশ্চয়।' জোর করে সুদর্শনের ডান হাতে কলম গুঁজে দিল লোকটা।

একবার সবার দিকে তাকিয়ে দেখল সুদর্শন। তারপর ব্যর্থ ক্ষোভ ঝরে পড়ল মৃদু নিঃশ্বাসে। দুর্বল হাতে পুরো নামটা সই করে দিল।

কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। আর এক তিলও দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই কারো এ ঘরে। ত্বড়িৎগতিতে উধাও হয়ে গেল সকলে ঘর থেকে।

খানিক পরে আবার সিঁড়ির ধাপে ধাপে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সুদর্শন। যাবার সময় হয়তো ওকে শেষ করে যেতে ভুলে গেছে বলে ফিরে আসছে ওরা।

সুদর্শনের ভুল ধারণা ভাঙল আগন্তুকদের দেখে। যারা এসেছে, তারা রামভকতের লোক। এই রকম যে ঘটবে, এটা রামভকত বুঝতে পেরেছিল বাইরের লোকের কানাঘুষা থেকে। সকালেই বুঝেছিল। তার লোকেদের বলাও ছিল এদের প্রতিরোধ করবার জন্য। উচিতমত শিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করবার জন্য।

ওদের আসবার আগে রাতে উঠে নিজের লোকদের আনতে গেছিল তাই ও। আফশোসের অন্ত নেই তার। তারা পৌঁছবার আগেই কাজ সমাধা করে সরে পড়েছে ওরা।

রামভকতের কথা শুনে মুখে কিছু বলল না সুদর্শন। কিছুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে দেখল শুধু ওকে। দেখল আর ভাবল। কি দেখেছে রামভকতকে এতদিন ধরে? কি ভেবেছে ওর সম্বন্ধে? জয়রাজের সমস্ত কথাই কি ফলবে শেষ পর্যন্ত?

যুক্তিতর্কের তলোয়ার দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছে জয়রাজের অনেক যুক্তিতর্ক। তবুও হার মানেনি জয়রাজ। হার মেনেছিল সে-ও কি তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে? না, সেখানে সে অটুট অবিচল।

দৌড়ে কাছে এসে সুদর্শনের বুকের ওপর বাচ্চা ছেলের মতো ঝাপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল রামভকত। 'চাচা—ক্ষমা করো! দেরী হয়ে গেছে। এসে যে তোমায় প্রাণে বেঁচে থাকতে দেখেছি—এটাই পরম ভাগ্য আমার।'

নির্বাক মুখে রামভকতের মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুদর্শন শীর্ণ হাতে। বুকের ওপর থেকে উঠে পড়ল রামভকত। সুরাই থেকে জল গড়িয়ে গেলাস ভর্তি করে নিয়ে এল—'চাচা! এতক্ষণে বুকের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে নিশ্চয়! ভিতরটা ভিজিয়ে নাও একটু একটু করে।'

সুদর্শনের দু'চোখে ভয়। ঘাড় নাড়ল। খাবে না। ঠোঁট টিপে রইল জোর করে। দিনে রাতে যে কোন সময় জল খাওয়াতে গেলে এই রকমই করে সে। ভিতরটা জ্বলে যায় তার হু হু করে।

সব জানে রামভকত। সব শুনেছে সুদর্শনের কাছ থেকে । তবুও রামভকত সব সময় ওকে জল খাওয়াবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুক্তি দেখায়, ডাক্তার বলেছেন। জোর করে খেতে হবে। পেটের ভিতর বুকের ভিতর ঘায়ের জন্য কষ্ট একটু হবে। শীগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে। এ কষ্ট থাকবে না তখন আর।

ঠোঁট ফাঁক করে, জোর করে জল ঢেলে দিল গলায় রামভকত। ফেলতে পারল না সুদর্শন। মুখে হাত চেপে ধরল রামভকত। ঢোক গিলল সুদর্শন অতি কষ্টে। মুখখানা যন্ত্রণাকাতর বিবর্ণ হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু'গাল বেয়ে।

* * *

এই অবধি পড়ার পর আমার যেন কেমন মনে হতে লাগল। হঠাৎ টওসা নদীর ঠাণ্ডা বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল যেন, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসছে ঘরের ভিতর। আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমার গায়ে। ভিতর বার জ্বলে যাচ্ছে আমার। দারুণ জ্বলুনি। খাতাটা চারপাইয়ের ওপর রেখে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালুম আমি। টওসা নদীর তীরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কার মৃতদেহ পুড়ছে কে জানে! চিতার আগুনটা আকাশ ছুঁতে চাইছে বুঝি। সুদর্শনের ভিতরটা জ্বলতে জ্বলতে শেষে দেহটাও জ্বলে উঠেছিল একদিন নিয়তির টানে ওই চিতায়, ওই শ্মশানে। প্রাণহীন দেহটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছিল। পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছিল চিরদিনের মতো মানুষটা। সুদর্শনের চিতার আগুন পুরোমাত্রায় জ্বলে ওঠবার সময়, যে মর্মন্তুদ দৃশ্যবিভীষিকা দেখেছিলুম, ভুলতে

পারিনি। নতুন করে চোখের সামনে সেই সব ভেসে উঠছে আমার। দু'চোখে হাত চাপা দিলুম আমি। সরে এলুম চারপাইয়ের কাছে। বসলুম। তুলে নিলুম খাতাটা আমার হাতে। সন্ধ্যা নামছে বাইরে। আলো-আঁধারি হয়ে আসছে ঘরের ভিতরটা। আলোর দিকটায় খাতা রেখে সুদর্শনের কাঁপা হাতের টেড়া-বাঁকা লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করছি আমি। কানে বাজছে মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ একটা। তবু পড়ার দিকে মনটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছি আমি। পাতা ওল্টাচ্ছি, লেখা পড়ছি। এই সোঢরী গাঁওয়ের মানুষ নিরীহও যেমন ভয়ঙ্করও তেমন। অতি বড় মিত্র অতি বড় শত্রু হয়ে ওঠে নিমেষে এক ইঞ্চি জায়গার দখল নিয়ে। একজন আর একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না একটু। জমিজমা রক্ষার তাগিদে, দুশমনদের মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ছেলেকে সুদক্ষ লাঠিয়াল হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে হয় বাচ্চা বয়েস থেকেই—তার সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক। সুদর্শনের সামর্থ্য ছিল। সুদক্ষ লাঠিয়ালের মর্যাদার আসন লাভ করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি তাকে। এর জন্য অনেকের ঈর্ষার পাত্র যে হয়নি সে তা নয়। হয়েছিল। মৌখিক হৃদ্যতা দেখালেও অন্তরে বিষের ছুরি নিয়ে ঘুরত বহু লোক। সুযোগ সুবিধে পেলেই ওর নিপাত হওয়ার মারণাস্ত্র প্রয়োগ করতে কালবিলম্ব করবে না তারা।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল সুদর্শন—পাশের বাড়ির জ্ঞাতি ভাই বিহ্বলাল ওই দলের প্রধান পাণ্ডা । সুদর্শন জানে বিহ্বলাল তার কাছে অতি নগণ্য। তার হাতের দুটো আঙুলের ডগায় বিহ্বলালের প্রাণবায়ু। তাই যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে চলত বিহ্বলালকে। নিজের মনকে সব সময় বিশ্বাস করা অনুচিত। কখন কি কুমন্ত্রণা দিয়ে বসে কে জানে। সুদর্শনের এড়িয়ে চলাটাকে মহাদুর্বলতা ভেবে নিয়েছিল বিহ্বলাল। সকল বিষয়ে হাঙ্গামা বাধাবার জন্য ভীষণ তৎপর হয়ে সুদর্শনের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত ছায়ার মতো। স্বতন্ত্র ছিল বিহ্বলালের সম্বন্ধী রামভকত। পিতৃ-মাতৃহারা রামভকত ওই বাড়ির একটা ছেলে যেন। ছোটবেলা থেকে মানুষও ওখানে। বিহ্বলালের স্নেহপুষ্ট হয়েও ও যেন অন্য ধরণের। দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ। ও-বাড়ির চেয়ে এ-বাড়ি পছন্দ তার বেশী। বিহ্বলালের চেয়ে সুদর্শনকেই তার ভালো লাগে খুব। অনেকটা তার চাচার মতোই দেখতে বলে এই আকর্ষণ। চাচা পৃথিবীতে নেই আজ।

দাদা ডাকা উচিত হলেও সুদর্শনকে চাচা বলেই ডাকত রামভকত। জোয়ান রামভকত অনেক সময় অনেক কিছু এসে বলেছে বিহ্বলালের বিরুদ্ধে। বলেছে দেওয়ালীর দিনে তার জমি দখলের ষড়যন্ত্রের কথা। বলেছে ওই দিনেই নেশায় মাতোয়ারা করে বরাবরের মতো চাচার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবার কথা। চাচাকে

বাইরে বেরুতে বারণ করেছে। 'হুশিয়ার হয়ে চলতে অনুরোধ করেছে পায়ে ধরে বারবার। দু' চোখ ছল ছল করে উঠেছে। মৃত চাচার কথা মনে পড়েছে তার। দেওয়ালীর দিন সুদর্শনকে আগলে থেকেছে দিনরাত। একবারের জন্যও বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে দেয়নি। আঁকা-বাঁকা টওসা নদীর পূর্ব কিনারের জায়গাটাকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে লাঠালাঠি হয়ে গেছে। মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেছে। রক্তগঙ্গা হয়েছে। হেরেছে বিহ্বলালের দল। জিতেছে সুদর্শনরা। জিতলেও এ দলের দু' একজনের যে প্রাণহানি হয় নি, তা নয়। হয়েছে। রামভকত জানিয়েছে, চাচারই বিপদ হবার কথা ছিল। ভুল করেই ও-দু'জনের জীবন নিয়েছে ওরা। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। বাড়ি থেকে না বেরুনোয় চাচা রক্ষা পেয়েছে।

রামভকতকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে সুদর্শন। বড় ছেলে পরাশরের হাতে ওর হাতটা টেনে নিয়ে এসে মিলিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'আজ থেকে জানবে এও তোমার এক ভাই।' পরের দিন সকালে রামভকত বাড়ি ফিরতে বিহ্বলালের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এসেছে সুদর্শনের কানে। জানালার কাঠের রেলিং ধরে দেখেছে ও বাড়ির ঘরের ভিতরের ব্যাপার। রামভকতকে দেওয়ালে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে বিহ্বলাল। বাড়িসুদ্ধু সকলে এসে ছাড়াতে চেষ্টা করেছে। রাগে ফুঁসছে আর চিৎকার করে বলছে বিহ্বলাল—নিমকহারাম বিশ্বাসঘাতকদের স্থান হবে না এবাড়িতে একদণ্ডও। রামভকতকে বার করে দিয়েছে বিহ্বলাল বাড়ি থেকে। সাদা বালির রাস্তায় বসে বসে হাপুস নয়নে কেঁদেছে রামভকত। এ বাড়িতে আসেনি! পরাশরকে পাঠিয়ে জোর করে সুদর্শন নিয়ে এসেছে ওকে। সেই থেকে রামভকত এ বাড়িতেই রয়েছে। বছর খানেকের ভিতর হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে উঠেছে সে। বিষয় দেখাশোনা থেকে কোন কাজেই সে ছাড়া গতি নেই কারো। সুদর্শনের প্রাণের প্রাণ সে। পরাশরের বিশ্বাসী বন্ধু। সুদর্শনের ছোট ছেলে মনোহরের অভিভাবক।

সকলের কাছে ভালো রামভকত কিন্তু একজনের দু'চক্ষের বিষ কেবল। এ-বাড়িতে আসার শুরু থেকে কোনদিন সুনজরে দেখে নি ওকে সে। সুদর্শনের বাল্যবন্ধু বিশেষ অন্তরঙ্গ লোক জয়রাজ। জয়রাজ অনেক কিছু কানে কানে বলে কান ভারী করতে চেয়েছে সুদর্শনের। ফল ফলে নি। সুদর্শন বন্ধুর ওপর বিরক্ত হওয়া ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বন্ধু তার পথ থেকে সরে নি একচুলও। রামভকত শত্রুপক্ষের লোক। শত্রু যখন মিত্র হয়ে ঘরে ঢোকে তখন শিয়রে মৃত্যু আসারই সামিল মনে করতে হবে। বিষয়-আশয় নিয়ে রেষারেষি দু'বাড়ির লোকের রক্তমজ্জায়। এটা পূর্বপুরুষ থেকেই চলে আসছে। রামভকতকে দিয়ে নানা অভিনয়ের জাল বিস্তার করে, অনেক কৃত্রিম ঘটনা ঘটিয়ে সুদর্শনের মনের কোণে

রামভকত সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস আনিয়েছে বিহুলাল। বাইরের শত্রু ঘরে ঢুকছে। প্রতিরোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করবে বিহুলাল শীগ্‌গির রামভকতকে দিয়ে।

বন্ধুর সতর্কবাণী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সুদর্শন। সাবধান তো হয়ই নি, বরং বন্ধুর গোপন উপদেশ—পরামর্শ—সমস্ত বলে দিয়েছে রামভকতকে। পিঠে হাত চাপড়ে সস্নেহে বলেছে, 'তুমি কিছু মনে কর না। জয়রাজটা বদ্ধ পাগল। কাকে বিশ্বাস করতে হয়, কাকে অবিশ্বাস করতে হয় কিছু জানে না।' এরপর থেকে কালরোগ ধরল সুদর্শনের। পেটের ভিতর জ্বালা। ডাক্তার-বৈদ্যরা রোগ ধরতে পারল না। রোগ সারাতে পারল না হাজার চেষ্টা করেও। রোগের ব্যাপার নিয়েও জয়রাজ বলেছে, ওর যত্ন নিতে, ওর হাতে কিছু খেতে কতবার মানা করেছি। 'নিশ্চয় কিছু জিনিস খাইয়েছে ও তোমায়।' ঘৃণা এসেছে বন্ধুর ওপর। খুব নীচমনা জয়রাজ। যে লোকটা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে দিনরাত জেগে, প্রাণ দিয়ে, সেবা করছে, সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা করছে, তার নামে এই দুর্নাম দিতে জিভে বাধল না জয়রাজের।

সুদর্শনের কিছু হলে ছেলেটা পথে বসবে। নিজের দুই ছেলের মতো ধর্মছেলে রামভকতকেও বিষয়ের সমান অংশ উইল করে দিয়েছে। উইলের সময়ও বিশ্বাসের ভিত টলেনি সুদর্শনের একবারের জন্য। টললে পরাশর খুন হয়ে যেতেন। টওসা নদীর ধারে জমি দখলের ব্যাপার নিয়ে দখলের সময় পরাশরকে জায়গাটায় যেতে বারবার প্ররোচনা দিয়েছে রামভকত। পরাশরের যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও। এ সময়ও পরাশরকে পাঠাতে নিষেধ করেছিল জয়রাজ। বড় যাবার পর ছোটকেও তৈরি করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল রামভকত। ভীতু হয়ে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। মনোহরকে যেতেই হবে অন্য জমি দখল করতে। ভাইয়ের খুনের বদলে খুন করতে হবে তাকে।

জয়রাজ সুদর্শনের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে বারণ করল মনোহরকে যেতে দিতে। মনোহর চলে গেলে বংশে বাতি দিতে থাকবে না আর কেউ। কথাটা দাগ কাটলো সুদর্শনের মনে। ভিতরটা অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করে উঠল। বড় ছেলে যাবার পর থেকে ও-বাড়ির জানালা দিয়ে ভেসে আসে বিহুলালের পৈশাচিক উল্লাসের হাসি। কি জল খাওয়ায় কে জানে রামভকত! অন্যের হাতে জল খেলে ভিতর জ্বলে। আর ওর হাতে খেলেই ভীষণ জ্বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গে।

সম্পূর্ণ রামভকতের কব্জায় চলে গেছে সুদর্শন। ও তার নিয়তি ও তার মৃত্যু। রেহাই নেই ওর হাত থেকে বেরুবার আর এ-জীবনে। তার শেষ হোক দুঃখ নেই। মনোহর বাঁচুক। বংশ রক্ষা পাক। গোপনে জয়রাজের সঙ্গে মনোহরকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে সুদর্শন। মনোহরকে বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখতে না পেয়ে

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে রামভকতের দু'চোখে। মোহ কেটেছে তাই এ-আগুন দেখতে পেয়েছে সুদর্শন। ভয়ে শিউরে উঠেছে। জয়রাজের পরামর্শ মতো আগের উইল ছিঁড়ে ফেলেছে টুকরো টুকরো করে। এসে পড়েছে ঘরে রামভকত। ঘরময় ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখে চমকে উঠেছে। কাগজ কুড়িয়ে ভালো করে দেখে বুঝতে পেরেছে, উইল ছিঁড়ে বিষয়ের অধিকার থেকে নাকচ করে দিয়েছে তাকে সুদর্শন। রামভকতের মুখখানা রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

এর পরের ঘটনা—সেই রাতেই লোকলস্কর নিয়ে এসে ভয় দেখিয়ে সুদর্শনকে সই করিয়ে নিয়েছে। ওর হাতের আংটিটা দেখে চিনেছিল সুদর্শন ওকে। সমস্ত বিষয়টা নিজের নামে রাখবে বলে যে সই করিয়ে নিয়েছে, এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল সে। নতুন উইলে লিখেছে, আগেকার মত উইল, জ্ঞানে অজ্ঞানে যেখানে যা সই করেছে, সমস্ত বাতিল, সব সম্পত্তি মনোহরের।

পাতা ওল্টাচ্ছি আমি। খাতার খান তিনেক পাতা একেবারে সাদা। কালির আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। চতুর্থ পাতায় সুদর্শন লিখেছে আবার! খুব ছোট্ট লেখা। এইটাই শেষ লেখা তার। মনোহর কোনদিন ফিরে এসে যদি রামভকতকে বেঁচে থাকতে দেখে, একটুও দেরী না করে তখুনি যেন শহরে মামার বাড়িতে চলে যায়। খাতাটা সুদর্শনের বিশ্বস্ত বন্ধু জয়রাজ দিয়েছিল পড়তে। বাপ মারা যাবার খবর পেয়ে আমার সঙ্গে গাঁওয়ে এসেছিল মনোহর।...তখন চিতা জ্বলছে। শুনলুম, সুদর্শন না কি দুটো হাত ধরে বিশেষ অনুরোধ করে বলে গেছে রামভকতকে, মরার পর ও-ছাড়া অন্য কেউ যেন তার মুখাগ্নি না করে। করলে তার আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

আমি আর মনোহর শ্মশানে বসে আছি। কাঁদছে মনোহর। চিতা থেকে একটু দূরে রামভকতও বসে আছে। কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। নজর পড়ল মনোহরের দিকে। ভিজে গলায় রামভকত চিৎকার করে বলে উঠল, 'চাচাজী চল গ্যয়েরে মনোহর'।

আচমকা কি যেন ঘটে গেল, বুঝে উঠতে পারল না শ্মশানসুদ্ধু কেউ। চিতার আগুনটা, লাফিয়ে উঠে, সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন রামভকতের ওপর। মুহূর্তে জ্বলে উঠল রামভকতের সর্বশরীর। বাঁচবার জন্য রামভকতের কি আকুলি বিকুলি! বুক ফাটানো কি করুণ আর্তনাদ! যে দিকেই ছুটে পালাতে যাচ্ছে—আগুনটা যেন সেদিকের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। টানছে চিতার দিকে। নিয়ে এল চিতার পাশে একবারে। একজন দু'জন নয়, বহুজন স্বচক্ষে দেখলুম সে নির্মম দৃশ্য। নিমেষে একটা দমকা বাতাস এসে রামভকতকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে। লাল গনগনে আগুনটা আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠল ঠিক সেই সময়।

খুলনা জেলার খুনীরা সাধু হয়ে যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা হয়তো ইস্কুল মাঠে বল পিটিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি ফিরছি—ফিরে গিয়ে পড়তে বসতে হবে। সামনে অ্যানুয়াল। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো সবে জ্বলে উঠেছে। হৈ হৈ করে এক দল লোক উল্টোদিক থেকে খেয়াঘাটে চলেছে। তার মানে রূপসা পেরিয়ে ওপারের কোন গাঁয়ে যাবে।

এমন সময় রাস্তার ওপর বাড়ির বারান্দায় দিনরাত বসে থাকা সুধন্য হোড় চেঁচিয়ে উঠলেন, কারা এত হৈ হৈ করে যায়?

অমনি সন্ধ্যের আবছা আলোয় পুরো দলটা একদম চুপ। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে ইলেকট্রিকের আলোয়। অনেকেরই পাকা চুল দাড়িতে ঢাকা মুখ সামান্য সামান্য দেখা যায়। খালি গা—কোমরে আলুথালু কিছু কাপড়। ওদেরই একজন গলা তুলে বললো, দারোগাবাবু। আমরা বেলখুলিয়া ডাকাতি মামলার আসামী—

অ। কবে ছাড়া পেলে? ক'টা খুন করেছিলে?

আজই। খানিক আগে। তিনটে খুন দারোগাবাবু। এখন বাড়ি ফিরছি—

কদ্দিন মেয়াদ খাটলে?

দশবছর—

অ—তা সাধু হয়ে গেলে পারতে। তাহলে ধরাও পড়তে না—জেলও খাটতে হোত না!

আজ্ঞে আমরা যে বারোজন। একসঙ্গে একই খুনের অতজন সাধু হই কি করে? এতটুকু জেলা—

অ। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। রাত হয়ে যাবে—

ওরা খেয়াঘাটের দিকে চলে গেল। সুধন্য হোড় তার বেতের চেয়ারে বসে আবার ভুড়ুক ভুড়ুক করে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

ভোরবেলা ওকে কোলে করে এনে ওই বেতের চেয়ারখানায় বসিয়ে দেওয়া হয়। আবার রাত হলে ওকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সুধন্য হোড়কে আমরা কখনো দারোগার ড্রেসে দেখিনি। কোন অসামী ধরতে গেলে নাকি ডাকাতরা দু'খানা পা-ই কেটে ওকে ফেলে রেখে যায়। ভেবেছিল, মরে গেছেন। বেঁচে উঠে সুধন্য হোড় বহুদিন হল সরকার থেকে পুরো মাইনে পেনসন পেয়ে আসছেন। আমাদের বাবাদের কথাবার্তায় এসব শোনা। সুধন্য হোড় নাকি খুব সাহসী জবরদস্ত দারোগা ছিলেন। সারা জেলার খুনে ডাকাতরা ওকে চিনতো। ওর নাম জানতো।

ভৈরব নদী যেখানে রূপসা নদীতে মিশেছে—সেই ক্রসিংয়ে আমাদের স্কুল। ভৈরবের গায়ে জেলখানার ঘাট। ফাঁসীর অসামীরা নাকি জেলখানার জানলা দিয়ে ভৈরবকে দেখে প্রমাণ ঠুকে তবে ফাঁসী কাঠে চড়ে। ওই ঘাটের সামনেই ধরা পড়ে ইলিশ জালের ভেতর লাফায়।

সত্য মিথ্যা জানতাম না তবে সবই শোনা কথা। জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে আটবছর দশবছর জেলখাটা খুনে ডাকাতরা সিধে বাজারে গিয়ে বাজার করতো—কেনাকাটা করতো—তারপর রূপসার খেয়া পেরিয়ে নিজের নিজের বাড়ি ফিরতো। এ হামেশা দেখা। ভৈরব পেরিয়ে কিংবা রেললাইন ডিঙিয়েও অনেকে ঘরে ফিরতো।

একবার যাবজ্জীবনের চোদ্দ বছর জেল খেটে তিনজন খুনে ডাকাত খালাস পেল। পেয়েই বাজারে গিয়ে বাড়ির জন্যে বাজার করতে করতে তাদের মাথা গরম হয়ে গেল। জেলে থাকতে পাথর ভাঙা, দড়ির পাপোস বোনার মজুরিই তাদের রেস্ত। জেলে যাবার সময় একরকম দর দেখে গেছে এক কৌটো বার্লির।

স' পাঁচ আনা। এখনকার ছত্রিশ সাঁইত্রিশ পয়সার মত। আর চোদ্দ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখছে সেই এক কৌটো বার্লির দামই পাঁচ টাকা বারো আনা। মানে পাঁচশো পঁচাত্তর পয়সা।

ইয়ার্কির জায়গা পাও নি? দিনে দুপুরে ডাকাতি! দেখাচ্ছি মজা—বলেই নিজেদের খুন ডাকাতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দোকানীর মাথায় সদ্য কেনা নতুন বালতির বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে দোকানী শেষ। ওরাও তিনজন অমনি সব ফেলে সামনে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

খুলনা শহর কলকাতা থেকে ট্রেনে চার ঘন্টার জার্নি। একশো ছমাইল। ভাড়া ছিল সম্ভবত একটাকা দু আনা। এখনকার একশো বারো পয়সা। চারখানা জেলার ওপর দিয়ে রেল লাইন। খুলনা, যশোর, নদীয়া, চব্বিশ-পরগনা।

জেলাগুলোর পায়ের কাছে সুন্দরবন, নদী, সাগর। তাতে বাঘ, কুমীর, মাছ, মধু, সাপ, ভীমরুল। জেলাগুলোর ভেতরে ভেতরেও নানান নদী। মাঝে মাঝে শহর। ছোটবড়। খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, গোবরডাঙা, বনগ্রাম। তাদের কোথাও ইলেকট্রিক। আবার কোথাও শুধুই হারিকেন।

এদের ভেতরে খুলনা জেলায় আবার জঙ্গলটা বেশি। নদীটা বেশি। নদীতে কুমীরটা বেশি। ডাঙ্গায় খুনটাও বেশি। খুন করে আবার উধাওটাও খুলনায় কিছু বেশি হয়।

গুলি করে খুলনায় খুব একটা খুন করে না কেউ। কাউকে খুন করার হলে তাকে দা দিয়ে দু'খানা করে ফেলাই রেওয়াজ। আর খুন করেই গা ঢাকা দাও। নদীতে নয়তো জঙ্গলে। কোন পাহাড় নেই খুলনায়। মেঘ খুলনায় শুধু বর্ষাকালে দেখা যায়। বাকি সময় আকাশ পরিষ্কার।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ষোল না হলে বসা যায় না। সেরকম না-বসতে পারার কেস বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু নাইন টেনে যারা পড়ে—তাদের কেউ কেউ এতোই তাগড়া—গালে ভুর ভুর করছে দাড়ি—নদী সাঁতরানো, নারকেল গাছ বাওয়া সব শরীর স্বাস্থ্যের কয়েকজনকে দেখলে মনে হবে এম এ পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। এমন দশাশই চেহারার দুজনকে—প্রাণকৃষ্ণ দাঁ আর রফিকুজ্জমান হাওলাদারকে ভুলি কি করে? আমরা ফাইভ-সিক্সে। ওরা নাইনে। প্রাণদা আর রফিকদা নাইনের হাফ-ইয়ার্লির আগে কনসান্ট করতে করতে ইস্কুলের মাঠ দিয়ে হাঁটছে। একজন ধুতির ওপর ফুলশার্ট। আরেকজন ট্রাউজারে শার্ট গুঁজেছে। হায়ার ক্লাশের পড়াশুনো নিয়ে ওরা বেশ চিন্তিত। দেখে মনে হবে—দুজন স্যার কোশ্চেন সেট করে আলোচনা করছেন। আমরা সমীহের চোখে দূর থেকে ওদের দেখি। যেমন লম্বা চওড়া—তেমনিই দাড়ি—হাতের গুলি। রীতিমত গার্জেন গার্জেন ভাব।

এমন চেহারার স্টুডেন্ট নাইন টেনে সাত আটজন থাকেই। ওরা স্কুলেরও সম্মান। আন্তঃস্কুলে টাগ-অফ-ওয়ারে খুঁটি কিংবা ফুটবলে হাফব্যাক নিয়ে কখনো ভাবতে হয়নি।

তা এই প্রাণকৃষ্ণ দাঁ ক্লাশ টেনে উঠে রাগের মাথায় একজনকে দা দিয়ে দুখানা করে ফেললো। ধারালো দায়ে ডাব কেটে খাওয়ার সময় কথা কাটাকাটি। তা থেকে মানুষ দুফাঁক করেই প্রাণদা উধাও।

আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। সামনে প্রি-টেস্ট। বছর ঘুরলেই ম্যাট্রিকুলেশন। প্রাণদার আর বসা হবে না। এমনিতে খুব ভাল বাঁশী বাজায়। সাইকেল চালায়। ফুটবলে স্কুলটিমের স্তম্ভ। গো-অ্যাজ-ইউ-লাইকে বিশপ সাজে। সেই মানুষ গেল কোথায়?

রূপসা দিয়ে চুনের নৌকোর মাঝি সেজে বঙ্গোপসাগরের গা ধরে ধরে মেদিনীপুর চলে চায়নি তো? কিংবা খালিশপুরের জঙ্গলে বেদে সেজে খালি গায়ে সাপ ধরে বেড়াচ্ছে কি? বাঁশী জানে। সাপ মোহিত করতে কতক্ষণ।

একদিন শহর খুলনার কয়লাঘাটে টেকনিক্যাল স্কুলের গায়ে বটতলায় এক সাধু ধরা পড়লো। লোকটা রোজ রূপসায় চান করে কপালে সিঁদুর লেপে সকালে ধ্যানে বসতো। দুপুর দুপুর সমাধি। উঠে দাঁড়িয়ে এক পায়ের ওপর ঘন্টাখানেক ধরে পাথর দশা। তখন যা জানতে চাও বলে দেবে। চোখ বুজে। মামলার রেজাল্ট। হারানো গরুর ঠিকানা। কুয়োয় ডোবা আঙটির খবর। এমনকি দশ বছর আগে মরে যাওয়া মানুষ চেনাশুনো কোন বাড়িতে কে হয়ে ফের জন্মেছে—তাও।

খুলনায় টাউন দারোগা চিরকালই এসে থাকেন লম্বা চওড়া রসিক ধাঁচের মানুষ। হর্ষ পাইনের এর ওপর আর এক জোড়া জল্লাদ গোঁফ। গুলের কাওয়ালীর বইয়ের ছবিতে শাহজাদাকে বধ্যভূমিতে যে জল্লাদ নিয়ে যাচ্ছে—ঠিক তার মত।

হর্ষ পাইন সমাধি দশায় সাধুর পেটে রুলের গুঁতো মেরে প্রথমেই দশ বারোটা জাল টাকা বের করলেন। তারপর বেরোলো—সাধুর ঝোলা থেকে অজ্ঞান করার ক্লোরোফর্মের শিশি।

কিছুদিন অন্তর এরকম সাধু প্রায়ই ধরা পড়ে। রেল স্টেশনে। স্টিমার ঘাটায়। করোলেশন সিনেমা হলে দর্শকের ভেতর থেকে। কিংবা খেয়াঘাটে। কেউ জাল নোট ছাপে। কেউ বা দাগী খুনী কেউ জেলখাটা খুনের আসামী।

একদিন আবার শহরের বড় ডাকঘরের কাউন্টারে ধরা পড়লো একদম এক খাঁটি সাধু। তিনি মনিঅর্ডার করছিলেন হরিদ্বারে। সেই সময়। তাঁকে খোঁচাতেই বেরিয়ে পড়লো—তিনি এখানকার স্কুলের ড্রিলস্যার সখানাথবাবুর হারানো বাবা। তিরিশ বছর আগে ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে যান। এতদিন পরে লুকিয়ে সখানাথকে একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছিলেন। দেখে চিনতে না পেরে ফিরে যাবার

পথে নিজের আশ্রমের হেড অফিসে ইষ্টবৃত্তির টাকাটা মানিঅর্ডারে পাঠাচ্ছিলেন। পকেটমারের ভয়ে। কেননা খুলনা আসার পথে দু দুবার তার গাঁটকাটা গেছে।

পরিচয় বেরিয়ে পড়তে সাধু মীননাথকে সবাই ধরাধরি করে রূপসার খেয়াঘাটের কাছে শ্মশানে নিয়ে গেল। সেখানে ড্রিলস্যার সখানাথ রিটায়ারের পর সাধু হয়ে গিয়ে আশ্রম করেছেন। কিন্তু দুজনেই সাধু বলে কেউ কারও আগের সম্পর্ক ধরে ডাকলেন না। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জাল সাধু আর আসল সাধু নিয়ে খুলনা যখন এইভাবে ভীষণ মাতোয়ারা—সেই সময় আরেক সাধু এসে হাজির হল শহরের গায়ে খালিশপুরের জঙ্গলে—ভৈরবের তীরে।

রাগের মাথায় খুন করলেই যে কেউ খুনী হয়ে যাবে এমন কোন মানে নেই। কথাটা প্রথম শোনা গেল প্রাণকৃষ্ণ দাঁ-এর বাবা বটকৃষ্ণ দাঁ-এর মুখে। আমরা নিজেদের ভেতর তাকে বলি বটেকৃষ্ণ। হেডস্যারের সঙ্গে বটেকৃষ্ণ দাঁ যখন কথা বলছিলেন তখন তার মুখ থেকে কথাটা প্রথম শুনি।

তারপর শুনলাম, সাবালক না হয়ে কাউকে খুন করে ফেললেও ওখানে সে ঠিক ঠিক খুনী নয়। এইসব শুনছি আর ওপরের ক্লাশে উঠছি। তার ভেতরে বটেকৃষ্ণ দাঁ-এর দাড়ি আরও পেকে গেল। তিনি তখন খুলনা বার্তা, খুলনা মার্তণ্ড, প্রহরী নামে চারপাতার যেসব সাপ্তাহিকে পুকুর জমা, হুইল ছিপে মাঝ ধরতে বসার টিকিট আর নিলামের বিজ্ঞাপন বেরোয়—সেখানে আধখানা পাতা জুড়ে ফি-হপ্তায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—

ফিরে এস
প্রাণকৃষ্ণ
রাখে কৃষ্ণ
মারে কে?

বর্ষাকালে ক্লাশ নাইনের জানলা দিয়ে দেখি ভৈরবের বুকে যেমন—রূপসার বুকেও তেমনি বৃষ্টি হচ্ছে। কোনদিন যা ভৈরবের বুকে মুষলধারে—অথচ রূপসার বুকে কিছুই নয়। এইসব সময় স্যার না এলে—মনটা আনমনা হয়ে পড়ে। আমাদের মনে তখন প্রাণকৃষ্ণদা—তার বাবা বটেকৃষ্ণ দাঁ—বটেকৃষ্ণর বিজ্ঞাপনে রাখে কৃষ্ণ মারে কে?—এইসব ভেসে ওঠে! ভেসে ওঠে বাঁশী বাজাতে ব্যস্ত প্রাণকৃষ্ণদার মুখখানা। বড়বড় চোখ। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। আর গাল জুড়ে দাড়ি। কোথায় গেল প্রাণকৃষ্ণদা। জনপথে উধাও হয়ে অকূল সমুদ্রে ভেসে যায়নি তো? কিংবা জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে গিয়ে শেষে বাঘের পেটে যায়নি তো? উঃ আর ভাবতে পারি না।

এর মাঝে সাচ্চা সাধু মীননাথ তার ছেলে সখানাথের শ্মশানের ডেরা ছেড়ে একদিন লোটা কম্বল নিয়ে ভৈরবের গায়ে শহরঘেষা খালিশপুরের জঙ্গলে চলে গেলেন।

তার যাবার সময় সখানাথ নাকি জানতে চান, সবই শোনা কথা, আমাদের জানিয়ে তো লোকে কথা বলে না—হিমালয়ে চললেন?

না, আপাতত খালিশপুরের জঙ্গলে যাচ্ছি।

এখানটায় কি অসুবিধে হল? রূপসার এমন সুন্দর বাতাস ফেলে খালিশপুরের জঙ্গলে মশার কামড় খাবেন?

খেলে খাবো। ওখানেও ভৈরবের সুন্দর বাতাস আছে।

বটেকৃষ্ণ দাঁ-এর বিজ্ঞাপনের চারটি লাইন—

ফিরে এসো
প্রাণকৃষ্ণ
রাখে কৃষ্ণ
মারে কে?

আমরা সবাই গত তিন চার বছর ছড়ার মতই আওড়াই। প্রাণকৃষ্ণ দাঁকে ভোলার কোন উপায় নেই। খানিকটা এই চার লাইনের দৌলতে—আর খানিকটা বটেকৃষ্ণ দাঁ-এর ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে অবিরাম চেষ্টা-চরিতে।

একদিন তো বটেকৃষ্ণ দাঁ শহরের সব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে রেলমাঠে সভা ডাকলেন। সারা শহরে ঘোড়ার গাড়ির মাথায় ড্রাম বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলানো হল। তাতে লেখা—

যেখানেই থাকো
প্রাণকৃষ্ণ ফিরে এসো
রাখে কৃষ্ণ মারে কে?
অদ্য বৈকাল ৫ ঘটিকায়
রেলমাঠে মহতী জনসভা
দলে দলে যোগ দিন

রাগের মাথায় নাবালক যদি খুন করে তবে কি সে খুনী?

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা কি বলেন? মন দিয়ে শুনুন।

খুনী আমাদেরই স্কুলের। হায়ার ক্লাশের। এটা একটা আলাদা গর্বের ব্যাপার। হেডমাষ্টার, পোস্টমাস্টার, নাইম ড্রেসের টেলারিং মাস্টার, স্টেশনমাস্টাররা সবাই তো এলেনই। এলেন সারা শহরের ছ'জন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। শান্তিরক্ষা করতে টাউন দারোগা হর্ষ পাইন। আর স্কুল ভেঙে আমরা সবাই। আমরাই তখন হায়ার

ক্লাশের স্টুডেন্ট। সারাটা দিনকে রুটিনে ভাগ করে আমরাই তখন ঘণ্টা, মিনিট হিসেব করে টেনে ওঠার অ্যানুয়ালের জন্যে প্রিপ্যারেশন করছি। তার পরের বছরেই তো ম্যাট্রিকুলেশন। সে বড় সোজা জিনিস নয়। কুরুক্ষেত্র, খালিশপুর রেল জংশনে ক্যালকাটা মেলের অ্যাকসিডেন্ট কিংবা রূপসার বর্ষার বন্যা হওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অনেকটা ধান ওঠার পর সারা দেশ জুড়ে নবান্নর মতই। ম্যাট্রিকুলেশন এগজামিনের সময় দেখা যায়—রোদে খুব তেজ। আকাশে মেঘ থাকে না। আর সেই পরীক্ষা না দিয়েই এতদূর পড়াশুনোর পর প্রাণকৃষ্ণদা গায়েব হয়ে গেলেন?

হ্যাণ্ডবিলখানা দেখে বাবা বললেন, বটেকেষ্টর ঘটে বুদ্ধিও ধরে!

মা বললেন, কেন? কি করলেন?

বেছে বেছে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের সভায় ডাকা কেন বলতো?

কেন?

ওরাই তো খুনের মামলায় জুরি হয়ে থাকেন। ওদের মতামত নিয়ে তবে জজ রায় দেন।

তা দিক! ছেলেটা তো আর সত্যি সত্যি দাগী খুনী নয়। রাগের মাথায় করে ফেলেছে। কি বা বয়স—

কোথায় দ্যাখোগে সাধু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিদ্বার, কনখল, লছমনঝোলা—

মা বললেন, ফিরে এলেই তো পারে।

তা পারে। কোর্টে দাঁড়ালেই রেহাই পাবে। সাজা হবার নয় এই বয়সে।

তা ফিরছে না কেন?

হয়তো জানেই না এসব। সাজার ভয়ে উধাও হয়েছে। আহারে! বড় ভাল বাঁশী বাজাতো ছেলেটা—

মা ধমকে উঠলেন বাবাকে, ওভাবে বলছো কেন? দেখো প্রাণকেষ্ট নিশ্চয় বেঁচে আছে।

শুধু বেঁচে থাকলেই তো চলবে না। তার জানা দরকার—ফিরে এলেও বিশেষ কোন বিপদ নেই। ফিরতে পারছে না—এই ভয়ে—এলেই ফাঁসি হয়ে যাবে।

মা চিন্তিত হয়ে বললেন, বেশিদিন বাইরে বাইরে থেকে শেষে যদি সখানাথবাবুর বাবার মত বিবাগী হয়ে যায়? তখন কোনদিন যদি ফিরেও আসে তো বটেকেষ্টবাবুকেই হয়তো চিনতে পারবে না। শেষে যদি মীননাথের মত হয়ে পড়ে। এসেই ফের ফিরে যাবে—

একবার ফিরুক না। এলেই বটেকৃষ্ণ দাঁ ওর বে দিয়ে দেবেন—তাই তো ঠিক করেছেন শুনলাম।

তার চেয়ে সারা দেশে হ্যাণ্ডবিল ছেপে বিলি করতে বল। ওরে প্রাণ ফিরে আয়—

কোথায় বিলাবে?

খুলনা, যশোর, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা—

তোমার কথামত না হয় শহরে শহরে দিল। তারপরেও তো বনবাদাড়, জঙ্গল, নদীপথ পড়ে থাকে? সাধু হয়ে গিয়ে থাকলে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে প্রাণকৃষ্ণ।

মা কিছুই বলতে পারলেন না।

স্কুল ঝেঁটিয়ে আমরা সবাই গিয়ে হাজির। তাতে সভা বেশ সরগরম। মঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে নানারকমের মাষ্টার মশাইরাও বসেছেন। সন্ধ্যের মুখে মুখে রেলমাঠে বিশাল পাকুড় গাছের বাসায় কাকের দল ফিরে আসছিল। টেস্টিংয়ের সময়ে মাইকে তাদের কা কা।

বটেকৃষ্ণ দাঁ লম্বা স্পিচ্ দিয়ে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের গলায় মালা দিলেন। তারপর তারা একে একে উঠে ভাষণ দিলেন। তাতে আইনের কথা। দেশের কথা। প্রাণকৃষ্ণের কথা ছাড়াও আগাম জামিন, সাক্ষী খালাস—এইসব কথাও ছিল। সভা ভাঙলো সন্ধ্যেরাতে।

ক'দিন পরে দেখা গেল—শহরে যে মুদিখানায় যা-ই কেনা যায়—সোডা থেকে মিছরি—সবই একই রঙের লালচে কাগজে মুড়ে তবে দোকানী খদ্দেরকে দেয়।

সবাই কাগজখানা খুলে পড়ে দেখে। প্রাণকৃষ্ণ ফিরে এসোর বদলে বটেকৃষ্ণ এবার ভাষাটা কিছু বদলেছেন—তোমার আসন শূন্য আজি।

হে বীর ফিরে এসে পূর্ণ করো ফিরে এসে—কথা দু'টি কিছু বড় করে ছাপা। আর হ্যাণ্ডবিলের নিচে ফার্স্ট ব্রাকেটের ভেতর খুব ছোট করে ছাপা—রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে!

তবুও প্রাণকৃষ্ণ দাঁ ফিরলো না। দিন যায়। মাস যায়। সূর্য ডোবে। চাঁদ ওঠে। অমাবস্যা পূর্ণিমা আসে যায়। আমাদের কোনদিকেই খেয়াল নেই। প্রিটেস্টের জন্যে তৈরি হচ্ছি।

এমন সময় শোনা গেল, বটেকৃষ্ণ দাঁ-এর মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে। হতেও পারে। প্রাণকৃষ্ণ দাঁ-এর মত অমন তাগড়া বড়সড় ছেলে আজ চার সাড়ে চার বছর উধাও, মাথার কি আর দোষ!

কাউকে ছড়াতে দিলে সে যদি ফের হ্যাণ্ডবিলগুলো ওজন দরে মুদিখানায় মুদিখানায় বেচে দেয়—তাই দেখা গেল—বটেকৃষ্ণ দাঁ দিস্তে দিস্তে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে শহরের তেতলা চারতলা বাড়ির ছাদে উঠে যাচ্ছেন আর সেখান থেকে সে সব বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছেন! প্রথম যেদিন উনি আদালতের ছাদে উঠে ওসব নিজের হাতে ওড়াতে গেলেন—সেদিন তখন পুলিশ গিয়ে ওকে নামিয়ে আনলো।

তারপর থেকেই বটেকৃষ্ণ বাবুর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেল।

এদিকে প্রায়ই দেখা যায়—শহর ছাড়িয়ে খালিশপুরের জঙ্গলের দিকে কলকাতা যাওয়ার রেল লাইনে লেভেল ক্রসিংয়ের মুখোমুখি মানুষের লাইন পড়ছে। মেয়ে—পুরুষ আলাদা আলাদা।

প্রথম শোনা গেল রিক্সাওয়ালাদের মুখে। তারা বলে—বাবা খালিনাথ। খালিশহরে থাকেন বলেই হয়তো ওরা নামটা নিজেদের সুবিধার জন্যে মুখে মুখে ছোট করে নিয়েছে। সেটাই আস্তে আস্তে সব জায়গায় রটে গেল। বাবার বয়স অনেক। সবাই বলে, কিন্তু দেখলে মনে হবে বড়জোর বিশ বছর। সাধনার ফল! এমনকি গালের একটি দাড়িও পাকেনি। মাথাও কালো।

অবিশ্বাসীরা বলে, ভাল প্যালা পড়ছে। খায় দায় ভালো। চুল পাকবে কোত্থেকে!

আরেক রকমের অবিশ্বাসী বলল দ্যাখোগে ভাল করে কলপ করা।

কলপ করলে তো ধরা পড়ে যাবে। কাছাকাছি যে-সেলুনেই যাক তারা বলে দেবে।

টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

অ্যাতো বয়স! গায়ের চামড়া তো ঢিলে হবে। তাও হয়নি। বল পয়সা দিয়ে টাইট করে রেখেছেন!

ভিড় বাড়তেই থাকলো। তার একটা বড় কারণ, বাবা খালিনাথ যাকেই দেখেন তাকেই পয়লা দর্শনে বলে দেন—

কোথায় থাকা হয়?

বাড়িটা কেমন?

কে কে আছে?

কি করে?

বাবার নাম কি?

স্টুডেন্ট? ব্যবসায়ী? না, সার্ভিস হোল্ডার?

তাদের কলকাতায় কেউ থাকে কি না?

এমনকি বছর পাঁচ ছয় আগে বড় কোন অসুখ হয়েছিল কি না।

কিছু জানতে চাওয়ার আগেই পরের পর তাক লাগানো জবাব। সারা শহর তো অবাক। মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রস্তাব উঠলো, বাবা খালিনাথের থানটি স্টোনচিপ আর সিমেন্ট দিয়ে মোজাইক করে দেওয়া হোক।

এই সময় বটেকৃষ্ণ দাঁকে নিয়ে তার বউ এক গলা ঘোমটা দিয়ে বাবা খালিনাথের সামনে এসে হত্যা দিয়ে পড়লেন।

বাবা দেখেই বললেন, সব জানি। কোন চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে সময়মত।

আশ্বাস পেয়ে বটেকৃষ্ণর বউ ঘোমটা খুলে ফেললেন। চোখে জল। মুখে হাসি। হবে বাবা?

হবে যা! হবে—

বটেকৃষ্ণের বউয়ের মনে হল—বাবা খালিনাথের চোখেও যেন জল টলটল করছে। কি মায়াবী তাকানো। আহা! বড় দয়ার শরীর বাবা। মুখে বললেন, পঞ্জিকা দেখলেই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবেন।

ছিঁড়ুক। তবু এগিয়ে দেবেন। ওতেই এখন ওর শান্তি।

বাবা খালিনাথ ছাড়া কথা নেই শহরে। একদিন শুধু রিটায়ার দারোগা সুধন্য হোড় বললেন, আমায় নিয়ে গিয়ে একবার দেখাতে পারো?

কে নিয়ে যাবে কোলে করে! কেউ বললো, ডালায় করে সাইকেল ভ্যানে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু রাস্তার যা ঝাঁকুনি কি সহ্য হবে?

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বললেন, সুধন্যবাবু একবার চোখের দেখা দেখুন—তারপর না হয় বাবা খালিনাথের থানটি চাতাল বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বাবার নামে যে জোয়ার এসে গেছে।

এর ভেতর একদিন সকালে সখানাথ বাবুর গৃহী জীবনের বাবা—এখন সাধু মীননাথ থানায় এসে হাজির।

টাউন দারোগা হর্ষ পাইন সদর থানায় বদলি হয়ে এসে কেবলই সাধু, চোর, ফকির, ডাকাত, দরবেশ, খুনী ঘেঁটে ঘেঁটে অস্থির হয়ে পড়েছেন। বললেন, কী ব্যাপার?

ভৈরবের তীরে নিরিবিলিতে ধ্যানে বসারও উপায় নেই একটু—

কেন? কি হল?

রাত হলেই কী খালিনাথ না ফালিনাথ বাঁশী বাজাবেই—

তা একটু বাঁশী না হয় শুনলেনই। মন্দ কি?

শুনলে মন উতলা হয়। ধ্যান ভেঙে যায়—এক একদিন ঘুমোতে পারি না। ওই ফালিনাথকে থামান।

ওরে বাবা! ফালিনাথ বলবেন না। বলুন খালিনাথ। সারা সদর ওর ভক্ত। তাছাড়া জঙ্গল আমাদের এক্তিয়ারে নয়—

একটা এক নম্বরের হঠযোগী!

কে?

ওই আপনাদের বাবা খালিনাথ।

টাউন দারোগা হর্ষ পাইন বললেন, শুনেছি দেখেই বলে দেন জবাবগুলো। একদম নির্ভুল। কোন প্রশ্ন করার আগেই—

সাধে কি বলি হঠযোগী! এসব লোকের জন্যে নিরিবিলিতে একটু ভগবানকেও

ডাকতে পারবো না?

কেন? কি করে?

কি বলবো দারোগো বাবু। পরশু রাতে ওর থানে ভিড় ভাঙলে গোলমাল থামলো। ভৈরবের পাড়ে বসে ভাবছি, চাঁদ উঠেছে—এবার নির্জনে একটু ধ্যানে বসবো। চোখ খুলে দেখি কি পরণের চেলি মালকোঁচা মেরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ঢাউস বুনো বাতাবি। আমি তো অবাক!

মীননাথের কথা শুনে হর্ষ পাইন কম অবাক নন! সোজা হয়ে বসলেন—বাঁশী বাজিয়ে ধ্যান করতে দেয় না—?

হ্যাঁ। সে তো হামেশা। রাত হলেই খালিনাথ বাঁশী বাজাবে।

তা পরশু রাতে কি বলছিলেন? বাতাবি নিয়ে—

হ্যাঁ। কোত্থেকে একটা বুনো বাতাবি নিয়ে এসে হাজির। খটখট করছে জ্যোৎস্না। বলে কি জানেন?

কি?

আমি এই আটানব্বইতে পড়েছি। আমায় বলে কি না—আসুন ফুটবল খেলি! বুঝুন?

ফুটবল? জঙ্গলে? রাতের বেলায়?

হ্যাঁ দারোগাবাবু। ফুটবলের বদলে বাতাবি। মাঠ বলতে খালিশপুরের জঙ্গলে ভৈরবের গায়ে ফাঁকা জায়গা। রাত তাতে কি? খটখট করছে জ্যোৎস্না। আসলে কি জানেন—আপনাদেরই খালিনাথ একটি তান্ত্রিক হঠযোগী। নয়তো সারাদিন ঠায় বসে থেকে বাবাগিরি করার পর ফুটবল খেলার জোর পায় কোত্থেকে? এর একটা বিহিত করুন অপানি—। আমি একশোর ধারাধারি সামান্য মানুষ। একটু ধ্যান করতে পারবো না নির্জনে?

হু-র-রের বলে লাফিয়ে উঠলেন টাউন দারোগা।

কি হল?

আপনার ধ্যানে আর কাল থেকে বাধা হবে না কোন। আপনি চলে যান।

সখানাথের বাবা মীননাথ হাসিমুখে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে সারা শহর তোলপাড়। দুপুর দুপুর টাউন দারোগা হর্ষ পাইন খালিশপুরের জঙ্গলে গিয়ে বাবা খালিনাথকে অ্যারেস্ট করেন। বিকেলের ভেতর বাবা থানা লকআপে।

সন্ধ্যের মুখে মুখে রাস্তার ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। থানা থেকে একজন সেপাই গিয়ে বটেকৃষ্ণ দাঁ-এর বাড়ি খবর দিল, আপনার ছেলে ফিরেছে।

বটেকৃষ্ণ দাঁ তখন খুব মন দিয়ে পঞ্জিকার পাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়ছিলেন।
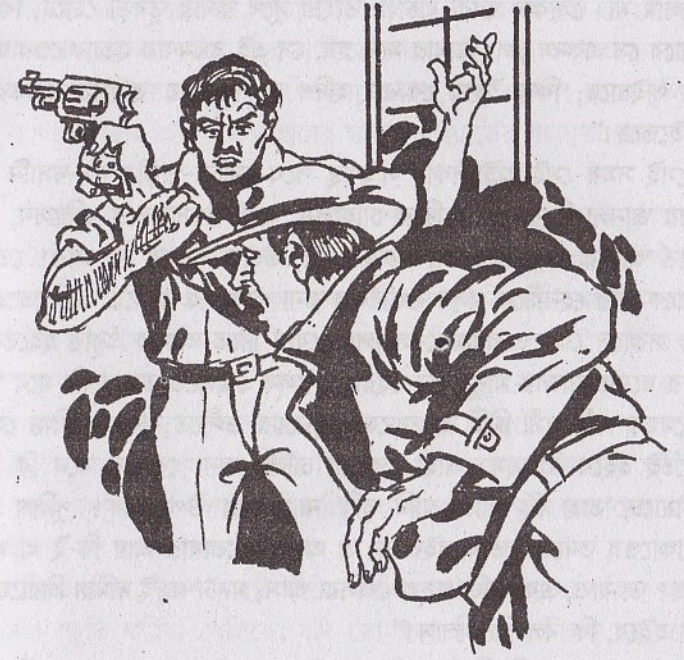
অদৃশ্য হস্ত

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মেজর ফরেস্ট পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল ঘুরিয়ে আসিয়া তিনি তাঁহার অতিথিবর্গ সহ প্রাতঃভোজনে বসিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "হত্যাকারী-সন্দেহে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ইন্সপেক্টর রজার কার্ল অধিক রাত্রে ক্লে-বারোতে ফিরিয়া গিয়াছে। আজ সকালেই তাহার এদিকে আসিবার কথা আছে।—কনস্টেবল জিমির সঙ্গে আমার দুই একটা কথা হইয়াছে।"

হেনরি বলিল, "পুলিশ কি হত্যাকাণ্ডের কোনও কারণ স্থির করিতে পারিয়াছে?"

মেজর বলিলেন, "জিমির সঙ্গে আলাপ করিয়া সে-রকম ত কিছু বুঝিতে

পারিলাম না। লোকটা ভারী বাচাল, তাহার মুখে কথার তুবড়ী ছোটে; কিন্তু এই ব্যাপারে সে একদম চুপ! আমার মনে হয়, সে এই প্রথমবার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার পাইয়াছে; কিন্তু ইহার কোনও হদিশ না পাওয়ায় তাহাতে ভয়ঙ্কর মাথা ঘামাইতেছে।"

সেই সময় সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথে মোটর-গাড়ীর ঘস্-ঘসানি শুনিয়া মেজর জানলা দিয়ে পথের দিকে চাহিলেন, এবং উৎসাহভরে বলিলেন, "আরে পামার্স আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! পল, উহার মতলব কি জান? তোমাকে, আমাকে আর হেনরীকে গল্ফ খেলিবার জন্য পাকড়াও করিতে আসিতেছে; কিন্তু আজ সকালে কোনও রকম খেলাধূলায় যোগ দিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহার ঘরের দরজায় মানুষ খুন হইয়াছে, গল্ফ খেলিতে তাহার কি মনে সরে?"

মেজর-পত্নী লুসী মিহি আওয়াজে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "কিন্তু তোমাকে যাইতেই হইবে প্রিয়তম। আহা, বেচারা চার্লির জন্য তোমার মনে কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা কি আর আমি বুঝি না? কিন্তু উপায় কি? পুলিশ ত এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার লইয়াছে; এ অবস্থায় তোমার আর কি-ই বা করিবার আছে? তা যাও, এক বাজি গল্ফ খেলিয়া আস; মনটা বড়ই দমিয়া গিয়াছে, একটু চাঙ্গা হইবে, কি বল নিকোলাস।"

সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ রূপবান যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লুসী তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছিল। কিন্তু লুসীর সকল কথা সেই যুবকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, এই জন্য সে লুসীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কাহার চাঙ্গা হওয়ার কথা বলিতেছিলে? তোমাদের কর্তাটির না কি? হাঁ, হাঁ, এক বাজি গল্ফ খেলিলে, আলবৎ উহার মন ওক গাছের গুঁড়ির মত চাঙ্গা হইবে।" এই কথা শুনিয়া মেজর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, ওসব আজ আমার ভাল লাগিতেছে না; আমি সত্যি কথাই বলিতেছি।—নিকোলাস্। ইহার সঙ্গে তোমার বুঝি আলাপ নাই? পলের সঙ্গে ত পূর্বে কোনও দিন তোমার দেখা হয় নাই। পল, ইনি নিকোলাস্ পামার্স।"

পল নবাগত পামার্সের হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন। লুসী তাহাকে এক পেয়ালা কফি দিলে, পামার্স তাহাতে চুমক দিতে দিতে হত্যাকাণ্ডের কথার আলোচনা আরম্ভ করিল। সে এ সম্বন্ধে একটা নূতন কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "যদি আপনারা আমার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব ডিককে যে খুন করিয়াছে, সে হয় কোনও ভবঘুরে পথিক, না হয় কোন জীপ্সী। গ্রামের শত্রুতা ছিল না।"

মেজর বলিলেন, "হ্যাঁ, একথা সত্য বটে? আর কাহারও সঙ্গে তাহার মতান্তর

ছিল—এ অনুমান যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও, তাহার এরকম শত্রু কেহই ছিল না, যে তাহাকে হত্যা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। এই হত্যারহস্য বড়ই জটিল বলিয়া মনে হইতেছে, পুলিশের একার চেষ্টায় কোনও ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় অবিলম্বে তাহাদের স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত।"

যাহা হউক, মেজরের মানসিক অবস্থা শোচনীয় বুঝিয়া কেহই তাঁহাকে খেলিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে করিল না; কিন্তু সকলকেই হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া মেজর স্বয়ং হাল ধরিলেন। তিনি চেয়ারখানি পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না ঘরে বসিয়া নিষ্কর্ম্মাভাবে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় মন আরও খারাপ হইবে। যদি ক্লাবে যাইতেই হয় ত তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল; নতুবা লাঞ্চের সময় আমরা ফিরিতে পারিব না। লুসী প্রিয়তমে। তুমি মিসেস্ হপ্সনের বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না। কাল আমি হপ্সনকে বলিয়া রাখিয়াছি—আজ সকালে তুমি তাহাদের বাড়ী যাইবে। আমার সে কথার খেলাপ হইবে না ত?"

লুসী হাসিয়া বলিল, "বেশ তাহাই হইবে। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব। আশা করি তোমরা স্ফুর্তি করিয়া খেলিবে। যদি তোমাদের ফিরিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে লাঞ্চের সময় তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিব।"

মেজর তাঁহার দুইজন অতিথিসহ পামার্সের গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলে, স্থূলোদর সজীব মাংসপিণ্ড হার্নিম্যান মুখ-বিবর হইতে নিষ্ঠীবনবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে নেকড়ে বাঘের মত হুঙ্কার দিয়া বলিল, "মিসেস্ হপ্সনটা কে? আমি আশা করিতেছিলাম, তুমি আর আমি এই ফাঁকতালে পল্লীপথে বাহির হইয়া কিছুদূর পর্যন্ত প্রমোদ-ভ্রমণ করিয়া আসিব।"

লুসী সুমধুর হাস্যে সেই জরদ্গবটার মুণ্ড ঘুরাইয়া বলিল, "হাঁ, সে ত আমরা যাবই। উহাদের এত তাড়াতাড়ি বিদায় করিলাম, ইহার কারণ কি তুমি বুঝিতে পার নাই? যাইবার সময় হপ্সনের কুটীরের অদূরে গাড়ী রাখিয়া, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিব। সে জল-দারোগার স্ত্রী। বেচারা ভয়ঙ্কর ভুগিতেছে কি না, তাই তাহার রোগ-শয্যায় তাহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। এই অঞ্চলে যত লোক আছে, আমাদের বুড়োটা তাহাদের সকলেরই খোঁজ-খবর লইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে মিলা-মিশা করিতে ভালবাসে; সুতরাং আমাকেও তাহার মন যোগাইয়া চলিতে হয় অগত্যা আমাকে যাইতেই হইবে।"

কয়েক মিনিট পরে লুসী সেই সচল মাংসপিণ্ডটাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং তাহার মোটর-কার পরিচালিত করিতে লাগিল। গাড়ী পথে আসিয়া, যে দিকে জল-

দারোগার বাড়ী, সেই দিকে ছুটিল।

একটি পথ নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই পথের উভয় পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট গুল্মরাশি ও অরণ্য। লুসী সেই পথে আসিয়া গাড়ি থামাইল। সে তাহার সঙ্গে জালা-পেটা হার্নিম্যানকে বলিল, "এই পথের অদূরে হপ্‌সনের কুটীর। আমি এখানে নামিয়া সেই কুটীরে রোগিনীকে দেখিতে যাইব। তুমি কি করিবে? সেখানে যাইবে না গাড়িতেই বসিয়া থাকিবে?"

হার্নিম্যান বলিল, "আমি এখানেই বসিয়া থাকিব। কোথাও রোগী-টোগী দেখিতে যাইব, সে রকম বিদ্‌ঘুটে সখ আমার নাই।"

লুসী তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া নামিয়া গেল। হার্নিম্যান মূলার মত স্থুল একটা চুরুট বাহির করিয়া, তোলা হাঁড়ির মত গোল মুখে পুরিল; তাহার পর তাহার ডগায় অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূমপান করিতে করিতে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় লুসীর সুললীত গতিভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। লুসীর প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল, লুসী ফরেস্ট সুন্দরী বটে, হাঁ পরমা সুন্দরী। তাহার স্ফুর্তির প্রাণ। তাহাকে নগরে লইয়া গিয়া লাঞ্চের যোগাড় করিলে মন্দ হয় না। আর যদি ডিনারের আয়োজন করিতে পারা যায়—সে আরও ভাল।"

ক্রমশঃ সেই জরদ্‌গবের চিন্তা বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই সুন্দরী যুবতীর নিরানন্দময়, ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ফরেস্টের মত ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে কদাকার গাধাটাকে বিবাহ করিয়া, এই প্রকার পল্লীগ্রামে সেই বুনো বেরসিকের সহবাসে জীবনপাত করিয়া তাহার কি সুখ? তাহার জীবন এখানে নিশ্চিতই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এই নির্জ্জন নিঃসঙ্গ পল্লীপ্রান্তে প্রেম নাই, আনন্দ নাই, স্ফুর্তিও নাই। সে এই কদাকার, অরসকি, আধবুড়ো লোকটার প্রেমে মজিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবন ব্যর্থ করিতেছে ইহা হার্নিম্যানের অদ্ভুত মনে হইল। লুসীর মত সুন্দরী যে কোনও ভাগ্যবান পুরুষকে লাভ করিতে পারিত। যদি এই সুন্দরীর সহিত আলাপ করিবার, তাহার সঙ্গে মিশিয়া স্ফুর্তি করিবার আশা না থাকিত, তাহা হইলে সে মেজরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সপ্তাহ-শেষ ক্রফোর্ড-হলে অবসর যাপন করিতে আসিত না।

প্রথমে কিরূপে লুসীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সেই কথা তাহার মনে পড়িল। লণ্ডনে একটি 'চ্যারেটি হলে' নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া সেই স্থানে তাহাদের প্রথম পরিচয়। লুসী ফরেস্টের স্ত্রী, এ সংবাদ শুনিয়া তাহার ঘাড়ে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই দিনই সে লুসীর নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইয়া—আর তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইল না। হঠাৎ কাহার দুইখানি হাত পশ্চাৎ হইতে তাহার ঘাড়ে পড়িল এবং লোহার সাঁড়াশীর মত দৃঢ়বলে তাহার গলাটি চাপিয়া ধরিল।

সেই সুদৃঢ় বন্ধনে হার্নিম্যানের মুখ-বিবর উদঘাটিত হইল, এবং তাহার মুখের চুরুট খসিয়া পড়িল। হার্নিম্যান সেই সুদৃঢ় বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার বিশাল বপু লইয়া আততায়ীর সহিত প্রবল বেগে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল, কিন্তু বজ্রকঠিন অঙ্গুলীর প্রচণ্ড চাপে তাহার কানের ভিতর যেন ঝড় বহিতে লাগিল; তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার পর সে অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত মধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল!

....এধারে মিঃ পল আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন তাহার সহিত যেন ভীষণ যন্ত্রণা, মর্ম্মভেদী বেদনার সুতীব্র ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। মিঃ হার্নিম্যানকে গুম্ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল। মিঃ পল তৎক্ষণাৎ সেই অট্টালিকার ওক কাষ্ঠ নির্ম্মিত সদর দরজার পাশে সরিয়া গিয়া অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিলেন। মিঃ পল দ্বিধাশূন্য চিত্তে সঙ্কল্প সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, তাহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তিনি সেই গভীর রাত্রেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিবেন।

অতঃপর মিঃ পল সেই দ্বার খুলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

চেতনা ফিরিলে হার্নিম্যান বিচলিত স্বরে বলিল, "সেই না কি?" পল বলিলেন "সে ভিন্ন আর কে?"

হার্নিম্যান বলিল, "সে দ্বার খুলাইবার জন্য ঘণ্টা বাজায় কেন? দরজার চাবি কি তাহার কাছে নাই?"

পল বলিলেন, "এই বাড়ীর অর্গলরুদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপ করিবার প্রয়োজন ছিল। আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে ভিতরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

হার্নিম্যান উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি এখানে অপেক্ষা করিব না; আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আমি সেই নরপশুকে সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িব না। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের অতিরিক্ত আরও কিছু তাহার ঘাড়ে চাপাইতে চাই।"

পল বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি ঠাণ্ডা হইয়া চলুন। আপনি অত গরম হইবেন না।"

পল এই কথা বলিয়া বাতিটা হাতে লইয়াই নিচের দিকে দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন। হার্নিম্যান মোটা মানুষ, তাহার উপর শৃঙ্খলিত দেহে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণারও অভাব ছিল না, সে কম্পিত পদে টলিতে টলিতে অন্ধকারে মিঃ পলকে অনুসরণ করিল। সেই সময় বর্হির্দ্বারের ঘণ্টা পুনর্বার বাজিতে আরম্ভ করায়, সেই শব্দে হার্নিম্যানের পদশব্দ ডুবিয়া গেল; ইহাতে পল অত্যন্ত খুশী হইলেন।

মিঃ পল বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া, বাতিটা বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতে দ্বারের শিকল অপসারিত করিয়া তাহার অর্গল খুলিলেন; তাহার পর দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন, এবং দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত পরে আগন্তুক দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার দেহ ওভারকোটে আবৃত, মাথায় নরম ফেল্টনির্ম্মিত টুপি। সে দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়াই সক্রোধে হুঙ্কার দিল; উচ্চৈস্বরে বলিল "ওরে আহাম্মক! এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি? ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আমি হয়রান হইলাম!" মিঃ পল সংযত স্বরে বলিলেন, "সে জন্য আমি দুঃখিত, পামার্স!"

তাঁহার কথা শুনিয়া নিকোলাস্ পামার্স ঘাড় বাঁকাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মুখ আরক্তিম!

"তুমি?"—বলিয়া হুঙ্কার দিয়া পামার্স বুক পকেটে হাত পুরিল।

কিন্তু মিঃ পল সেই মুহূর্তে পামার্সের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। পামার্সের পিস্তলের গুলি সবেগে মেঝেতে প্রতিহত হইল। তাহার পর জড়াজড়ি ও হুড়োহুড়ি করতে করতে উভয়ের দেহ সশব্দে প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইল।

পার্মাস পলের মুখে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতে লাগিল; পল তাহার ঘুসি-বৃষ্টিতে বিব্রত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পামার্স মুক্তিলাভ করিয়াই পলকে এরূপ বেগে ধাক্কা মারিল যে পল সেই ধাক্কায় মুখ গুঁজিয়া পাশের দেওয়ালে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই সুযোগে পামার্স পিস্তলটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে হাত বাড়াইয়া পিস্তলটা তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে হার্নিম্যান দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বিরাট দেহ পামার্সের দেহের উপর নিক্ষেপ করিল। পামার্স তাহার দেহের নিচে পড়িয়া চ্যাপ্টা হইবার উপক্রম। এবারও তাহার পিস্তলের গুলি বে-কায়দায় অন্য দিকে চলিয়া গেল। হার্নিম্যান পামার্সের দেহের উপর চাপিয়া থাকিলে পার্মাস তাহার পদদ্বয় মুক্ত করিয়া এরূপ বেগে হার্নিম্যানের পাঁজরে পদাঘাত করিল যে, হার্নিম্যান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কুষ্মাণ্ডের মত গড়াইতে লাগিল। পার্মাস মুক্তিলাভ করিয়া মিঃ পলের মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিতেই তিনি বসিয়া পড়িলেন। গুলি মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পর মুহূর্তেই পল পার্মাসকে আক্রমণ করিয়া, তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া তাহার মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সে হার্নিম্যানের পায়ের কাছে পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

এইবার মেজর ফরেস্টের কথা বলিব।

মধ্যরাত্রি অতীত-প্রায়। মেজর ফরেস্ট তাঁহার ড্রয়িং-রুমে পদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইতেছিল।

লুসী বিবর্ণ মুখে এক পাশে বসিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; তাহার চোখে মুখে দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট।

সহসা সম্মুখের দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। লুসী সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, "চাকরেরা সকলেই ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কে আসিল আমিই দেখিয়া আসি।"

মেজর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "না প্রিয়ে, তুমি কেন কষ্ট করিয়া যাইবে? আমিই যাইতেছি। তুমি বসিয়া থাকো।"

লুসী বসিয়া রহিল। তাহার স্বামী দ্বার খুলিলেন, সে শব্দও সে শুনিতে পাইল। মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, "পল? কি আশ্চর্য! তুমি এই গভীর রাত্রিতে...."

পল মেজরের কথায় বাধা দিয়া কি বলিলেন; তাহার পর উভয়ে হলঘরের দিকে চলিলেন। পল মেজরের সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলে মেজর তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "পল ফিরিয়াছে দেখিতেছি।—সেই সময় ওর গাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে; তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তিনি খোঁড়াইতেছেন। অবস্থা দেখিয়া মেজর ফরেস্ট গভীর বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি সর্বনাশ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে পল! তোমার এ রকম অবস্থার কারণ কি? কাহারও সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে নাকি?"

পল বলিলেন, "আমি অত্যন্ত অবসন্ন; আপনার ঘরে ব্রান্ডি থাকিলে আমাকে এক গ্লাস আনিয়া দিন। শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়া আপনাকে সকল কথাই বলিতেছি।"

মেজর বলিলেন, "খাবার ঘরে প্রচুর ব্র্যান্ডি আছে; আমি এক মিনিটের মধ্যে তাহা তোমাকে আনিয়া দিতেছি।"

মেজর প্রস্থান করিলে পল লুসীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর; দৃষ্টি অচঞ্চল, অত্যন্ত কঠোর।

পল নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি হার্নিম্যানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। পামার্সকে আমি মুঠায় পুরিয়াছি; তাহার যে সহযোগিনী ক্লোরোফর্মের সাহায্যে হার্নিম্যানকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহাকেও হাতে পাইয়াছি। মার্স গ্রেজে তাহার যে ভৃত্য ছিল, তাহাকে আমার হাতে পড়িয়া শৃঙ্খলিত হইতে হইয়াছে; আর মানুষের জীবন লইয়া নরপিশাচ মণ্ডলোর খেলা শেষ হইয়াছে; সে মরিয়াছে। আমার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছ? তোমার কুহকের ফাঁদ আমি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।"

লুসী বিবর্ণ মুখে রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিল, "এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

পল বলিলেন, "আমি দরজায় আসিয়া সাড়া লইবার পূর্বেই তোমাদের গ্যারেজে গিয়াছিলাম। তোমার গাড়ী গ্যারেজ হইতে বাহির করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য

করিয়াছি। তাহার ভিতর তোমার ব্যাগ এবং লাগেজ দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তুমি উড়িবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, এখন ডানা মেলিতে যে কিছু বিলম্ব।"

লুসী ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মুখে কথা সরিল না। সে অপরাধিনীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ পল মৃদুস্বরে কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বজ্রের কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "আমার অধিক কথা বলিবার সুযোগ হইবে না; বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই। আমি যাহাই জানিতে পারিয়া থাকি, পামার্স তোমার সম্বন্ধে এখনও কোনও কথা প্রকাশ করে নাই; ভবিষ্যতেও সে তোমাকে এই হীন ষড়যন্ত্রে জড়াইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ সে তোমাকে আড়ালে রাখিবে। এই সুযোগে তুমি ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়া দেশান্তরগামী কোনও এরোপ্লেনে আশ্রয় গ্রহণ কর। আর এদেশে কাহাকেও মুখ দেখাইও না। ঢলাঢলি করিয়া মেজর বেচারার মুখ পুড়াইও না। আর এক কথা—"

মিঃ পল লুসীর হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "যে স্ত্রীলোকটা হার্নিম্যানের নামে চিঠি লিখিয়াছিল, এবং যে চিঠির জন্য ডাক-পিওনের-প্রাণ-গিয়াছে, তাহার রহস্যটা কি, সে কথা আমাকে বলিতে এখন তোমার আপত্তি আছে কি?"

লুসী বলিল, "সেই পত্রে হার্নিম্যানকে সতর্ক থাকিতে বলা হইয়াছিল। টাকার বখরা লইয়া সেই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে পামার্সের ঝগড়া হইয়াছিল। হার্নিম্যানের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাহারা উভয়েই তাহাকে শোষণ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটা হার্নিম্যানকে যে দিন সেই চিঠি লিখিয়াছিল, সেই দিনই সে পামার্সের একখানি পত্র পাইয়াছিল। পামার্স সেই পত্রে স্ত্রীলোকটার প্রস্তাবিত বখরাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।"

মিঃ পল বলিলেন, "এই জন্যই কি সে হার্নিম্যানকে পত্র পাঠাইয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল? তাহার পর সে বোধ হয় টেলিফোনে পামার্সকে জানাইয়াছিল—সে হার্নিম্যানকে যে পত্র লিখিয়াছিল, ক্রুফোর্ড-হাউসে হার্নিম্যানের নিকট তাহা ডাকে চলিয়া গিয়াছে।—এখন সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম?"

"তুমি এখন যাইতে পার" বলিয়া মিঃ পল লুসীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। লুসী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছে সেই সময় মেজর ব্র্যান্ডির বোতল ও গ্লাস লইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই তাঁহার স্ত্রীকে দ্বারপ্রান্তে যাইতে দেখিলেন। তিনি তাহাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাও প্রিয়তমে, এই গভীর রাত্রে? তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন? মেজাজ সরিফ?"

"হা প্রিয়তম"—বলিয়া সেই মায়াবিনী উভয় হস্তে তাহার স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল! তাহার পর করুণা-বিগলিত স্বরে বলিল, "বেচারা পলের দুর্দশা দেখিয়া আমি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়াছি; তবে আশা করি, কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ধাক্কাটা আমি সামলাইতে পারিব। নারীর মন পরমেশ্বর কি উপাদানে নির্মাণ করিয়াছেন, তা পুরুষ তুমি কি বুঝিবে?"

লুসী সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল। পল ব্র্যান্ডি ঠুকিয়া কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হইলে মেজর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার দুর্দশার কারণ কি, এবং কোথায় বা তুমি ডুব মারিয়াছিলে, এখন তাহা খুলিয়া বলিবে ত?"

পল সকল ঘটনার কথা সংক্ষেপে মেজরের গোচর করিলেন; তাহা শুনিয়া মেজর বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, রোগ ও নিকোলস্ পামার্স উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি? একবার সে ডাক্তার রোগের অভিনয় করিতেছিল, আবার খোলস বদ্‌লাইয়া নিকোলাস্ মূর্তিতে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া স্ফূর্তি করিতেছিল?"

মিঃ পল বলিলেন, "হাঁ, আমার এই ধারণা সত্য। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, "রোগের ছদ্মবেশে সে আমাদের উভয়েরই সম্মুখে আসিয়াছিল। আমি এক দিন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়াছিলাম; তুমিও ডাক-পিয়ন ডিক চার্লির হত্যার রাত্রিতে তাহার মৃতদেহের অদূরে সেই ছদ্মবেশীকে দেখিতে পাইয়াছিলে; কিন্তু আমরা উভয়েই তাহাকে চিনিতে পারি না—ইহার কারণ কি?"

পল বলিলেন, "সেই দুর্যোগের রাত্রে আমি আমার মোটর-কারের মাথার আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—তখন সে খানিক দূরেই ছিল। বিশেষতঃ তাহার ছদ্মবেশ নিখুঁত হওয়ায় আমি তাহাকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ পাই নাই। ডাক্তার রোগের কুব্জদেহ ও আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া, বলবান ও চট্‌পটে নিকোলাস্ পামার্সে সহিত তাহার তুলনা করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমার মনে হয় নাই।" মেজর বলিলেন, "তোমার এ কথা সত্য।"

মিঃ পল এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢালিয়া গ্লাসটা মেজরের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটুকু আপনি পান করুন। আপনাকে এখন যাহা বলিব তাহা শুনিবার জন্য আপনার যথেষ্ট ধৈর্য্য ও মানসিক বলের প্রয়োজন।"

মেজর গ্লাসটি শূন্যগর্ভ করিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ পলের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ পল ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাঁহার গুণবতী পত্নীর গুপ্ত লীলাসংক্রান্ত সকল কথাই বলিলেন। সেই মায়াবিনী কুহকিনী প্রেমাভিনয়ের অন্তরালে এত দিন কি খেলা খেলিয়া আসিয়াছে, সেই যাদুকরী কোন মন্ত্রে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া কি

ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—যাহার অস্তিত্ব মাত্র কোনও দিন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাহার বিস্ময়কর বিবরণ শুনিয়া মেজর চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। আত্মসংযম তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

মিঃ পল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার শোচনীয় মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, দুঃশীলা তরুণীর প্রেমমুগ্ধ সেই প্রতারিত প্রৌঢ়ের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল না। তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমার কথা সত্য, অতি কঠোর সত্য। লুসী এই কুকর্মে পামার্সের বখরাদারী করিত। মঙ্লো হার্নিম্যানকে তাহাকে তাহার পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, তাহাকে বেহুশ করিয়াছিল; তাহার পর লুসীই তাহার মোটরকারে ফোর-গেবলস্এ রাখিয়া আসিয়াছিল। সেখানে তাহারা হার্নিম্যানকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল; সন্ধ্যার পর পামার্স তাহাকে মার্সগ্রেঞ্জে লইয়া গিয়াছিল। আমি মঙ্লোর অনুসরণ করিয়া জলার ভিতর দিকভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মার্সগ্রেঞ্জের সম্মুখে আসিয়া যাহাকে গ্রেঞ্জে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সে পামার্স ভিন্ন অন্য কেহ নহে। আমার বিশ্বাস, সে আমারই সন্ধানে, আমি এখানে আছি কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছিল।"

মেজর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সম্ভব বটে! কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্লো কি উদ্দেশ্যে লুসীকে এখানে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল?" পল বলিলেন, "উহা একটা ছল মাত্র। সে আপনার স্ত্রীকে আঘাত বা তাহার উপর কোনও অত্যাচার করে নাই, তাহা ত আপনি জানেন। পামার্স পুলিশকে ও আমাকে ভুল বুঝাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্যই এই খেলা খেলিয়াছিল।" মেজর বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, তুমি লুসীর সকল কীর্ত্তিই জানিতে পারায় সে আমাকে ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তোমার একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। না, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য—আমার প্রতি তাহার মমতা অতুলনীয়।"

মিঃ পল বলিলেন, "প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে অতুলনীয় বলিতে পারেন। আমার কথায় অসন্তুষ্ট হইবেন না; আপনার মত গতযৌবন অরসিক প্রৌঢ়কে লইয়া লুসীর মত নবযুবতী, মায়াবিনী কুহকিনী প্রেমের অভিনয় করিতে পারে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে বাঁদর নাচাইতে পারে, কিন্তু আপনাকে ভালবাসিতে পারে না। সে আপনার প্রেমে বন্দিনী হইবার জন্য আপনার সংসারে আসে নাই।"

সন্দেহ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

চায়ের দোকানে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের রহস্যময় মৃত্যুর কথা আলোচনা হচ্ছিল। দোকানের মালিক বিমলদা বললেন, আমার মনে হয় আত্মহত্যা।

আমি আর এক কাপ চা ফরমাশ করে বললাম, আত্মহত্যা বলে মনে হয় না, ঠিক—দুর্ঘটনা বলেই বোধ হয়। কোনও রকমে মাথায় ধাক্কাটাক্কা লেগে—

ওপাশে একটি সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক বসে চা খাচ্ছিল। শ্যামবর্ণ, ঈষৎ কোঁকড়া চুল, মুখের ভাব কঠিন, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে হঠাৎ চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে বলল, অ্যাকসিডেন্টও নয়, আত্মহত্যাও নয়, খুন, সোজাসুজি খুন!

কথাটা কারও পছন্দ হলো, কারও বা হলো না! নিজের নিজের মতামত নিয়ে তর্ক করতে করতে একদল লোক বের হয়ে গেল। দোকান একটু ফাঁক হতে আমি

সেই ছোকরার কাছে ঘেঁষে বসলাম। সে যেমন জোরের সঙ্গে কথা বলল, শুনে মনে হয় আর যাই হোক, খুব তলিয়ে না বুঝলে এমন করে কেউ কথা বলতে পারে না!

বিমলদাও হাতের কাছে খরিদ্দারের ভিড় না থাকায় সামনের চেয়ারে এসে বসে পড়ে বললেন, কিসে বুঝলেন?

সে বলল, খুনের ব্যাপারটা সব শুনেছেন তো? ঘটনাটা—সবকিছু?

বিমলদা বললেন, কতক কতক শুনেছি—

বক্তা যুবকটি আর এক কাপ চা দিতে ফরমাশ করে বলল, মরেছে যে বুড়ি তারই বাড়ি ওটা, রাস্তার ধারে একতলার ঘরটায় দোকান আছে, বইয়ের দোকান। ওরই ওপরে যে ঘরটা, সেটায় এক ছোকরা আর্টিস্ট ফোটোগ্রাফির দোকান করেছিল, আর দোতলায় ভেতরের ঘরে বুড়ি থাকত নিজে, ঠিক তারই নিচের ঘরে ওর ভাঁড়ার আর রান্না দুই-ই চলত। ঝি-চাকর রাখত না পয়সা খরচের ভয়ে, বাড়ির পাট-ঝাট নিজেই করত। ভয়ানক পয়সার মায়া ছিল, সেই জন্যেই গেরস্ত ভাড়াটে দেয়নি, ভাড়া কম পাবে বলে।

পয়সা কিছু জমেও ছিল। কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে দশ হাজার, কিন্তু সম্প্রতি পুলিশ খবর নিয়ে জেনেছে যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে ছিল হাজার পাঁচেক টাকা আর পোস্ট অফিসে ক্যাশ সার্টিফিকেট ছিল হাজার চারেকের। আত্মীয়স্বজন কেউ কোনওদিন দেখা যায়নি, তিনকুলে কেউ আছে বলেও জানা নেই। বত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, সেই থেকে এই অবধি ওই বাড়ি আগলে পড়ে আছে। বাড়ির আয়েই ওর খরচ চলত। মিতব্যয়ী বলে টেক্স দিয়ে বাড়ি সারিয়েও টাকা জমাতে ওর অসুবিধা হয়নি। আরও জমানো উচিত ছিল। কিন্তু ও বলত যে কে ওর এক বোনপো আছে, সে-ই মাঝে মাঝে জোর করে কিছু টাকা নিয়ে যায়।

বিমলদা বললেন, বোনপো? তবে যে বললেন তিনকুলে কেউ নেই?

—কেউ নেই একথা তো বলিনি, কেউ আছে বলে জানা নেই তাই, বলেছি। ওই বোনপোকে কেউ দেখেনি, বুড়িও বিশেষ তার কথা কাউকে বলত না। শুধু আর্টিস্ট ভাড়াটে ওর কি যেন নাম—সুধাংশু—হ্যাঁ সুধাংশুই, পুলিশের কাছে ওই বোনপোর কথা বলেছে। কিন্তু ওর কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। সুধাংশুই খুনের চার্জে ধরা পড়েছিল কিনা!

আমি বললাম, কেন? বিশেষ করে ওকেই ধরলে কেন?

—বলছি। সুধাংশু ছেলেটি অন্য ভাড়াটের মতো বাইরে বাইরে এসে চলে যেত না, সে বুড়ির সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল, ওকে মাসিমা বলে ডাকত এবং ইদানীং এমন হয়ে গিয়েছিল যে এটা ওটা বাজার থেকে কোনও ভাল জিনিস এনে দেওয়া,

সঙ্গে করে থিয়েটার বায়স্কোপ নিয়ে যাওয়া, খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করত। বুড়িও ওকে ভালবাসত এবং বিশ্বাস করত। ভাল কিছু রাঁধলে বা পিঠে তৈরি করলে সুধাংশুর জন্যে রেখে দিত। খুনের দিনও বিকেলে বুড়িকে নিয়ে ও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল—স্টার থিয়েটারে মন্ত্রশক্তি প্লে—ফিরতে রাত একটা কি দেড়টা হয়েছিল। দুটোর সময় ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুধাংশু নিজের বাড়িতে গেছে—এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওদেরই পাড়ার বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বাড়িতে স্ত্রীর ব্যথা ওঠায় দাই ডাকতে গিয়েছিলেন বুড়ির বাড়ির পাশে।

—তার পরের দিন এগারোটায় স্টুডিও খুলতে এসে সুধাংশু ওপরে উঠে গিয়ে বুড়ির ঘরের দোর ভেজানো দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে ডেকেছে ওকে, কিন্তু সাড়া পায়নি। সদর দোর খোলা, সিঁড়ি উঠান ধোওয়া মোছা সব পরিষ্কার, তার মানে বুড়ি সকালে উঠেছিল নিশ্চয়ই—অসুখ করলে উঠতে পারত না। তবে এমন সময় শুয়ে কেন? তারপর মনে হয়েছে যে আগের দিন রাত জেগেছে বলে বোধহয় সকাল করে রান্না খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। সেইজন্য তখন আর ডাকেনি। নিজের স্টুডিওতে বসে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু চারটে বেজে গেল যখন, তখন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল—সাড়ে তিনটের সময় বুড়ি রোজ নিজে চা খেত আর ওকে দিয়ে যেত, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখে একটু বিচলিত হলো—এতক্ষণ বুড়ি রাত্রেও ঘুমোয় না—তার উপর দিনের বেলা এত ঘুম!

....সুধাংশু তখন বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ওকে ডেকেছে দু'-তিন বার, তাতেও সাড়া না পেয়ে জোরে ডাকে, তাতেও কোন উত্তর না পেয়ে দোর ঠেলেছে, দোর ঠেলতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। দক্ষিণের জানলার ধারে মেঝের উপর পড়ে আছে বুড়ি, মুখে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। প্রথমে মনে করেছিল অজ্ঞান হয়ে আছে, কিন্তু তারপরই গায়ে হাত দিয়ে গা ঠাণ্ডা দেখে চিৎকার করে ওঠে। বাইরে এসে বইয়ের দোকানের লোকজনকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর পুলিশ এল, ডাক্তার এল। মাথায় একটা কঠিন কিছুর আঘাত পেয়ে খুলি ভেঙে প্রাণ বেরিয়েছে। সে আঘাত পিছন থেকেও কেউ করতে পারে, কিম্বা বুড়ি জানলার ধারে মেঝেয় বসে কিছু করতে করতে হঠাৎ মাথা তুলতে গিয়ে কপাটের একটা পাল্লা মাথার পিছনে লেগে যেতেও পারে।

বিমলদা অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, এক্ষেত্রে তাহলে সুধাংশুকে ধরলে কেন?

বক্তা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটি সরিয়ে রেখে বলল, বুড়ি কিছুদিন ধরে নাকি খুব ভয়ের মধ্যে ছিল। ওর সেই বোনপো নাকি বলেছিল যে ওকে হাজার পাঁচেক টাকা না দিলে সে ওকে খুন করে ফেলবে। এ সবই সুধাংশু

বলছে অবশ্য; বুড়িও কিছুদিন যাবৎ কাশীবাস করবে স্থির করেছিল। সেই অনুসারে বুড়ি সুধাংশুর নামেই লেখাপড়া করে দেবে, ওরাই ওর বাড়ি-ঘর-দোর দেখাশুনা করবে....শুধু বুড়ি যত দিন বাঁচবে, যেখানেই থাক না কেন ওর সব খরচ এরা পাঠিয়ে দেবে। সুধাংশুর বাপ অ্যাটর্নি, তাঁরই অফিসে গিয়ে চুপিচুপি ঘটনার দিনই দলিলে সই করে দিয়ে আসে। কাউকে না জানিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল ওর সেই বোনপোর ভয়ে।—

বিমলদা বললেন, সুধাংশুই তো যথাসর্বস্ব পেত, তবে ও খুন করবে কেন?

—যত তাড়াতাড়ি পায় এই জন্যে।—তা ছাড়া বুড়ির কাছে পুরনো গয়না, মোহর যা কিছু ছিল তাও সেদিনই ও বেচে আসে, বিদেশ যাবার আগে হাতে নগদ টাকা কিছু করা দরকার বলে। প্রায় সাত-আটশো টাকা হবে। সে টাকাটা পুলিশ পায়নি খুঁজে—এবং সে টাকার কথাও সুধাংশু ছাড়া আর বিশেষ কেউ জানত না।

—কিন্তু সুধাংশু আজ মুক্তি পেয়েছে।

আমি ও বিমলদা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলাম, কি করে?

—হ্যাঁ, আজই রায় বেরিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে এমন ভয়ানক সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ওর বাপের তদ্বিরের ফলে ও মুক্তি পেয়ে গেল। বুড়ির সামনের বাড়ির লোকেরা সাক্ষী দিয়েছে যে খুন রাত্রি দুটোর সময় নাকি কিছুতেই হতে পারে না, যেহেতু তারা আজ সকালে বেলা সাড়ে ছ'টার সময় ওকে নিয়মিত সদর দোর খুলে জলছড়া ঝাঁট দিতে দেখেছে। যেমন অন্যদিনও একখানা খয়ের রঙের গায়ের কাপড় গায়ে দিয়ে প্রথমে সদর দোরে, জল দিত, তারপর খ্যাংরা দিয়ে পথটা আর উঠোনটা ধোয়ামোছা করত তা করতে দেখেছে। ওরা আর ওদের পাশের বাড়ির লোকেরা সকলেই এই কথা সাক্ষ্য দিয়েছে।

সেদিনই সুধাংশু সকালবেলা ভবানীপুরে আশুবাবুর বাড়িতে ফোটো তুলতে গিয়েছিল এক বর-কনের, একথাও প্রমাণ হয়ে গেল। সেখানে প্রায় সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত ওর দেরি হয়, তারপরই বাড়ি এসেছে, স্নান করেছে, খেয়েছে—ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছে, তারপর স্টুডিওতে এসেছে এগারটার সময়। এ পর্যন্ত ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে—কাজেই ডাক্তারেরা যখন একবাক্যে বলেছেন যে যত পরেই মৃত্যু হোক আটটার আগে নিশ্চয়ই হয়েছে, তখন সুধাংশু কি করে খুন করতে পারে? সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত সে আশুবাবুদের বাড়িতেই ছিল।—

—সুতরাং বিচারকেরা অনুমান করলেন যে জানলা থেকে আঘাত লেগেই মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

আমি বিজয়গর্বে বললাম, আমিও তাই বলছিলাম।

বিমলদা বললেন, তবে আপনি বলছিলেন 'সোজাসুজি খুন' কেন?

ছোকরা একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে বলল, কিন্তু টাকাগুলো? গয়না-বেচা টাকাগুলোর কি হাত-পা হলো? যদি অ্যাক্সিডেন্টই হয়, টাকাগুলো কোথা যাবে?

বিমলদা এবং আমি উভয়েই দস্তুরমতো দমে গেলাম। বললাম, আপনি কি অনুমান করেন?

—আমার বিশ্বাস সেই বোনপোই খুন করেছে। বুড়ি যে উইল করেছে তা জানতে পারা তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয় এবং সেদিন গয়না আর মোহর বেচে যে টাকা এনেছে এটাও তার পক্ষে জানা অসম্ভব নয়। এমনি মরে গেলে তো এক পয়সা পাবে না স্থির হয়েই গেল, কাজেই ওই সাত-আটশো টাকা যদি কোনও রকমে হাত ছাড়া হয়ে যাবার আগে বাগাতে পারে সেই মতলবই ছিল। ধরুন বাড়ি ঢোকবার সুযোগেরও অভাব হয়নি। ওরা যখন রাত দেড়টার সময় থিয়েটার থেকে এসে দোর খুলে ভেতরে গেছে, সেই সময় সে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারে। ওপরে সুধাংশু মিনিট দশেক ছিল একথা সে নিজ মুখেই বলেছে। সেই সময়টা তার পক্ষে নিচে বা ওপরে কোথাও লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়—পায়খানাতেও ঢুকে থাকতে পারে। যাই হোক—তারপর সুধাংশু চলে গেলে বুড়ি হয়তো দোর বন্ধ করে ওপরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে শোবার উদ্যোগ করছিল, সেই সময় মনে করুন সে পেছন দিক থেকে এসে যদি কোনও একটা জিনিস দিয়ে আঘাত করে থাকে—হয়তো তার একেবারে খুন করবার উদ্দেশ্য ছিল না, মনে করেছিল এমনি একটু জখম হবে বা অজ্ঞান হয়ে পড়বে—কিন্তু বুড়ি ওই এক আঘাতেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর টাকাটা খুঁজে নেওয়া তার পক্ষে এমন আর আশ্চর্য কি?

আমি বললাম, কিন্তু সামনের বাড়ির লোকেরা যে সকালে দেখেছে ওকে—

—ওকেই যে দেখেছে তার তো কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না! ধরুন সেই খুনী বোনপোই হয়তো টাকা খুঁজতে খুঁজতে ভোর হয়ে গেছে দেখে, সে সময়ে বাড়ি থেকে ওকে বেরোতে দেখলে সন্দেহ হতে পারে মনে করেছিল, তাই নিজেই মাসির একটা থান পরে আর গায়ের কাপড় জড়িয়ে ধোয়া-মোছা বাসনমাজা সব করেছে। মাথা গা যতদূর সম্ভব ঢাকা ছিল—শীতকাল, কেউ সন্দেহ করেনি—কাজেই ভাল করে কেউ দেখতেও পায়নি। সুতরাং দূর থেকে ওর মাসিকেই মনে করেছে। তারপর বাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। বেলা হতে, সুধাংশু স্টুডিও খুলতে, যখন বাইরের লোক ভেতরে ঢোকা বা বাইরে যাওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়, সেই সময় এক অবসরে বেরিয়ে গেছে। এ রকম তো হতে পারে? পুলিশের মাথায় অবিশ্যি এত কথা যাবে না, এ সে আগেই জানত—

আমি এবং বিমলদা কিছুক্ষণ দূরে—রাস্তার ওপারে চেয়ে রইলাম। শেষের কথাগুলি এত বিস্ময়কর যে আমরা দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে

অন্তত তখন যেন ঘটনাটা বায়স্কোপের ছবির মতো সরে সরে যাচ্ছিল—তারপর একটু পরেই আমাদের দু'জনের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। ফিরে পাশের চেয়ারের দিকে চেয়ে দেখি চেয়ার খালি—ছুটে রাস্তায় বার হয়ে এলাম, যতদূর দৃষ্টি চলে বক্তার চিহ্নমাত্র নেই, যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিমলদা বললেন, অ্যাঁ, চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল!

চোরাবালির নকশা

সঙ্কর্ষণ রায়

'এই হল রূপনগর শহর'। আমাদের গাইড শ্যামরতন বললে, 'সামনেই রাজাসাহেবের পুরোনো হাভেলি।' একটা ভগ্নস্তূপের সামনে শ্যামরতনের নির্দেশমত আমার জিপটাকে দাঁড় করিয়েছে ড্রাইভার থানুরাম। শহর থেকে একটু তফাতে একটা নেড়া কোয়ার্টজাইট্ পাহাড়ের নিচে হাবেলিটাকে (প্রাসাদ) এই পাহাড়েরই একটি অংশ বলে মনে হচ্ছে। 'রাজাসাহেব এখানে থাকেন নাকি?' আমি প্রশ্ন করি। 'না' 'শ্যামরতন জবাব দিল, 'আগে থাকতেন। এখন থাকেন নতুন হাবেলিতে।' আমার পাশে বসেছিলেন সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসার জগজিৎ সিং, তিনি বললেন, 'রাজাসাহেব না থাকলেও পিটার মুর আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি যাই....' 'না।' খপ্ করে জগজিৎ সিংয়ের একটি হাত ধরে ফেলে শ্যামরতন বললে, আপনাকে একা এই হাবেলির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যায় না।

রাজাসাহেব সপরিবারে এই হাবেলি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কেউই থাকে না এখানে, কারোরই থাকার কথা নয়। মুর সাহেব কোন সাহসে এসেছেন এখানে ভেবে পাই নে।' 'রাজাসাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ রাজস্থানের মরুভূমির কয়েকটা মানচিত্র এই হাবেলির মধ্যে রাখা আছে। এই নকশাগুলি দেখতে পেয়েছেন মুর সাহেব। নকশাগুলো আমাকেও দেখাবেন বলে আমাকে আজ এখানে হাজির হতে বলেছেন।' বলে জগজিৎ সিং জিপ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেন। 'চলুন আমরা সবাই যাই আপনার সঙ্গে। বলে আমিও নেমে পড়ি জিপ থেকে। পিটার মুর সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপদেষ্টা। সার্ভে অব সউদি আ্যারাবিয়া থেকে এসেছেন রাজস্থানের মরু অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করতে। জগজিৎ সিং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছেন। সম্প্রতি তাঁরা দুজনে মিলে মানচিত্রে মরুভূমির চোরাবালিগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। রাজস্থানের মরুভূমির বালির তলায় খনিজ খুঁজে বেড়ালেও আমি এ কাজে তাঁদের সাহায্য করছি কারণ এখানে পথে পথে অসংখ্য চোরাবালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাবেলিটা রয়েছে শহর থেকে একটু তফাতে। রূপনগর আসলে রূপনগর। এই রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে পড়েছ। নামেই রূপনগর, আসলে এমন বিশ্রী শহর আর কোথাও দেখিনি। পাথরের বাড়িগুলো সবই ঘিঞ্জিভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িকে তফাৎ করা যাচ্ছে না। শুধু এই হাবেলিটাই স্বতন্ত্র। একদিকে পাহাড় ও তিন দিকে বালি। এই বালি আর বালিয়াড়ি হাবেলিকে পাঁচিলের মতো ঘিরে ফেলেছে। দুর্গের পাঁচিলের মতো এই বালিয়াড়ির মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নেই, যার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়।

শ্যামরতন গজর গজর করতে করতে বললে, 'মুর সাহেব অদ্ভুত লোক তো! এমন একটা জায়গায় আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন যেখানে জন্তু-জানোয়ারও ঢুকতে পারবে না। এই বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে ঐ হাবেলির মধ্যে ঢোকা কি সোজা কথা।' বালির বাড়িতে জগজিৎ সিং ও আমি দুজনেই কাজ করছি, কাজেই এই বালিয়াড়ি পেরিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কাজ নয়। মোটামুটি হাবেলির সামনের দিক কোনটা তা ঠিক করে নিয়ে আমরা বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে যেতে উদ্যত হই। এক পা এক পা করে বালিয়াড়ির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় জগজিৎ সিং আমার হাত ধরে বললেন, যাবেন না ভাই সাহেব, এই বালিয়াড়ি চোরাবালি।' 'কি করে বুঝলেন?' আমি প্রশ্ন করি। 'বালির চেহারা দেখে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মুর সাহেব এই চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢুকলেন কি করে!' 'বোধ হয় ঢোকেননি। এই চোরাবালি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কি সম্ভব?'

'কিন্তু গত দুদিন ধরে তিনি এই হাবেলির মধ্যেই আছেন। হাবেলির মধ্যে অনেক পুরনো নকসা ও মানচিত্র পেয়েছেন, সেগুলি পরীক্ষা করছেন। ওগুলো আমাকে দেখাবেন বলেই তিনি আমাকে যেতে বলেছেন ওখানে....' 'অসম্ভব।' শ্যামরতন বললে, 'এই বালিয়াড়ি যদি চোরাবালি হয়, তার ওপর দিয়ে যেতে পারবেন না আপনি।' 'মুর সাহেব যদি গিয়ে থাকেন আমিও পারব যেতে। জগজিৎ সিং বললেন, 'হয়তো এই বালিয়াড়ির সবটাই চোরাবালি নয়'....এমন সময় ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। মরুভূমির বালি মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ে, আকাশ ও মাটির মাঝখানকার শূন্যস্থান বালি দিয়ে ভরে যায়। খানিকক্ষণ বাদে ঝড় থামে, বালি থিতিয়ে পড়ে, কিন্তু জগজিৎ সিংকে দেখতে পাই না। 'কোথায় সিংজী?' আমি উত্তেজিত স্বরে বলে উঠি, 'ঝড়ে উড়ে গেলেন না উবে গেলেন!' 'দেখছেন তো স্যার, কি রকম সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল!' আর্তস্বরে বলে উঠল শ্যামরতন, মনে হচ্ছে হাবেলির মধ্যে থেকে কেউ এসে তাকে হাবেলির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে....'তা হলে চল হাবেলির মধ্যে ঢুকে ওঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করি আমরা।' আমি বললাম। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢোকার কথা ভাবছেন কি করে?' 'সিংজী তো ঢুকেছেন....' 'চোরাবালি ডিঙিয়ে যেতে পারে এমন কেউ এসে সিংজীকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার পাল্লায় পড়তে আমি চাই নে....' বলতে বলতে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে শ্যামরতন। 'ও কি শ্যামরতন, চলে যাচ্ছ কেন!' কাতর স্বরে বলে উঠলাম আমি, 'সিংজীকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে না।' 'আমাদের সাধ্য কি!' সড়কের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আমার জিপ লক্ষ্য করে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামরতন বললে, 'যিনি ওঁকে নিয়ে গিয়েছেন, তিনিই ওঁকে ফেরত দিয়ে যাবেন!' অগত্যা শ্যামরতনকে অনুসরণ করে জিপে চেপে ফিরে এলাম আমরা ক্যাম্পে। রূপনগর শহর থেকে একটু দূরে একটি বাগানবাড়ির বাগানের মধ্যে ক্যাম্প করে আছি আমরা। মরুভূমির মধ্যে ছোটখাট মরুদ্যান এটা। বাগানে অজস্র গাছপালা, ফুল-ফলের সমারোহ। একটা বাঁধানো কুয়ো আছে বাগানের মাঝখানে, তাতে কখনো জলের অভাব ঘটে না। এই তাঁবুর সামনে পাশাপাশি তাঁবু খাটিয়ে আছি আমি ও জগজিৎ সিং। পিটার মুর থাকেন সম্বরে বিশ্রামগৃহে।

আমি আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জগজিৎ সিংয়ের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল তাঁর চাকর ইউনুস। তার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু বলার আগে শ্যামরতন বললে, 'তোমার সাহেব রূপনগরের হাবেলির মধ্যে আটকা পড়েছেন, আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গো ভাইজান....' 'বলো কি!' ইউনুস প্রায় চিৎকার করে ওঠে। আমার তাঁবুর বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্থানীয় থানার

দারোগা মোহনলাল। তিনি জানতে চাইলেন পিটার মুরের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে কিনা। 'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।' আমি জবাব দিলাম, 'তবে আমার বন্ধু জগজিৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকতে পারে। মুর সাহেব তাঁকে আজ রূপনগরের হাবেলিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।' 'কবে বলেছিলেন?' মোহনলাল প্রশ্ন করেন। 'গতকাল জগজিৎ সিংয়ের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে এসে দেখা করেছিলেন তিনি।' 'আপনি দেখেছিলেন তাঁকে?' 'না। আমার কাছে আসেননি তিনি, জগজিৎ সিংও তাঁকে নিয়ে আসেননি আমার কাছে।' 'আপনি কি শিওর যে তিনি নিজে জগজিৎ সিংয়ের কাছে এসেছিলেন গতকাল?' 'নিশ্চয়ই, জগজিৎ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেননি।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বললেন, 'অথচ আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে পিটার মুর সাত দিন আগে থেকে নিরুদ্দেশ। সম্বরের ডাকবাংলোর চৌকিদার আমাদের জানিয়েছেন যে সাত দিন আগে ভোরবেলায় সেই যে ডাকবাংলো থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি....' এমন সময় জগজিৎ সিং এসে হাজির হলেন। নির্বাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'হাবেলির মধ্যে ঢুকলেন কি করে সিংজী? ওখান থেকে বেরিয়ে এলেনই বা কি করে?' 'আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন পিটার মুর।' জগজিৎ সিং বললেন, ওখান থেকে বেরও করে নিয়ে এসেছেন তিনি....'

মোহনলাল বললেন, 'আপনাকে হাবেলির মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে এসে মুর সাহেব কি আবার হাবেলির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন?' 'তা বলতে পারব না।' জগজিৎ সিং জবাব দিলেন, হাবেলি থেকে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি যে কোথায় গেলেন তা বলতে পারব না। আমার মনে হল তিনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন....' 'বাতাসে কোনো মানুষ মিলিয়ে যেতে পারে না, কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়ই, যাই ওঁকে ধরে ফেলার চেষ্টা করি....' 'উনি যদি আবার হাবেলির মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাকেন, ওঁকে ধরতে পারবেন না।' জগজিৎ সিং বললেন, 'কারণ চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢোকা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।' 'হাবেলির চারপাশে এই চোরাবালিটা সত্যিই একটা আশ্চর্য ব্যাপার।' আমি বললাম, 'এটা হল কি করে?' 'এটা হল কি করে তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন মুর সাহেব।' জগজিৎ সিং বললেন, 'এখন থেকে এ নিয়ে আমিই সমীক্ষা চালাব। মুর সাহেব এসব কাজের দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।' 'তাঁর কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই কি তিনি আপনাকে ঐ হাবেলির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন?' 'হ্যাঁ।' 'হাবেলির মধ্যে পাওয়া নকশাগুলো আপনাকে দেখাননি?' 'দেখিয়েছেন বই কি? দেখানো শুধু নয়, ওগুলোর দায়িত্বও দিয়েছেন আমাকে।' 'হাবেলির মধ্যে

নকশাগুলির হদিস তিনি পেলেন কি করে?' 'রাজাসাহেবের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর নতুন হাবেলিতে এই নকশাগুলোকে নিয়ে যাননি তিনি, কারণ এগুলো সম্বন্ধে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর ঠাকুর্দার আমলের এই নকশাগুলো তিনি পুরনো হাবেলির আলমারির মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন। মুর সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করলে ঐ আলমারির চাবি তাঁকে দিয়ে ওগুলোকে উদ্ধার করতে বলেছিলেন।' 'ওগুলো উদ্ধার করেও মুর সাহেব আপনাকে দিয়ে দিলেন কেন?' তাঁর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর নকশাগুলো নিজের কাছে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি। ওগুলো আমাকে দিয়ে থর মরুভূমির মধ্যে যাবতীয় চোরাবালি চিনে নিয়ে মানচিত্রে চিহ্নিত করতে বললেন।' 'কিন্তু কেন? হঠাৎ এইসব কাজের দায়িত্ব আপনার ওপরে চাপিয়ে দিলেন কেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে জগজিৎ সিং কিছু বলার আগে আমাদের ক্যাম্পের সামনে আর একটি পুলিশের গাড়ি এসে থামল। সেই গাড়ি থেকে নামলেন মোহনলালের সহকারী হীরালাল। উত্তেজিত ভাবে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, মুর সাহেবের হদিস মিলেছে স্যার, সম্বর হ্রদের ধারে চোরাবালির মধ্যে চাপা-পড়া তার মৃতদেহ ঘন্টা দুয়েক আগে উদ্ধার করেছি তাঁর অ্যালসেশিয়ান কুকুরটির সাহায্যে। আমাদের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন যে সপ্তাখানেক আগে চোরাবালির মধ্যে ডুবে মরেছেন তিনি। 'কিন্তু একটু আগেই তো তাঁর সঙ্গে দেখা হল আমার!' কম্পিত স্বরে বললেন জগজিৎ সিং, 'কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের হাতে এই নকশাগুলো দিলেন আমাকে।' বলে এক বাণ্ডিল মানচিত্র আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন জগজিৎ সিং।

দ্বিতীয় অভিযান

প্রফুল্ল রায়

আজ রবিবার।

আটটা বাজতে না বাজতেই সকালের খাবার খেয়ে তার নুতন স্কুটারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাজা। তার একটা জমকালো ভাল নামও আছে, রাজর্ষি দত্তচৌধুরী। ওটা শুধু স্কুল আর বাইরের লোকদের জন্য।

রাজা একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। এ বছর সেভেন থেকে এইটে ফার্স্ট হয়ে ওঠার পর বাবা তাকে দারুণ একটা স্কুটার কিনে দিয়েছেন।

ওরা থাকে গল্ফ গ্রীনে। বাবার একটাই শর্ত, গলফ গ্রীনের ভেতর যত পারে স্কুটার চালাক রাজা, কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। অন্য দিন বড় রাস্তায় প্রচুর গাড়ি টাড়ি থাকে, যে কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। বাবা সাবধান করে দিয়েছেন, তার কথা না শুনলে স্কুটারে চড়া বন্ধ করে

দেবেন।

রাজা কখনও মা-বাবার অবাধ্য হয় না, তাঁরা যা বলেন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

রাজা সম্পর্কে আরো দু-একটি কথা জানানো দরকার। তার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় অফিসার, মা একটা কলেজে পড়ান। তারা এক ভাই, এক বোন। সে ছোট, দিদি এ বছর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ইংলিশ অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে।

রাজা গোয়েন্দা গল্পের পোকা। বিশেষ করে শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনী পড়ার পর থেকে সে ঠিকই করে ফেলেছে, তাকে ডিটেকটিভ হতেই হবে। এ ব্যাপারে তাকে সবসময় উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন বাবার এক বন্ধু—প্রবীর সেন। প্রবীরকাকু লালবাজারের একজন ঝানু অফিসার।

গলফ গ্রীন থেকে বেরিয়ে টিভি সেন্টারের পাশ দিয়ে আনোয়ার শা রোডে এসে পড়ে রাজা। রবিবারের প্রায় ফাঁকা রাস্তায় জোরে স্কুটার চালাতে দারুণ লাগছে। সে যাবে মতিলাল নেহরু রোডে তার বন্ধু সৌরভদের বাড়ি। প্রত্যেক ছুটির দিনে ওখানে যাওয়া চাই তার।

লেক গার্ডেনস-এর ভেতর দিয়ে রেললাইন পেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোড ধরলে মতিলাল নেহরু রোডে কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু ছুটির দিনে প্রচুর মালগাড়ি যাতায়াত করে বলে লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকে, রেল লাইন পেরুতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই আনোয়ার শা দিয়ে ঘুরে, ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে, বাঁয়ে লেকের পাড় ধরে খানিক এগিয়ে, বিড়লা অ্যাকাডেমির পাশ দিয়ে সোজা মতিলাল নেহরু রোডের দিকে চলে যায় রাজা। আজ সেই রুটটাই ধরেছে সে।

কিন্তু লেকের ধারে সাদার্ন অ্যাভেনিউর ওপর দিয়ে সবে বিবেকানন্দ পার্কের কাছাকাছি রাজা এসেছে, হঠাৎ স্কুটারটা থেমে গেল। তেল নেই। মনে পড়ে ক'দিন আগে তিন লিটার পেট্রোল ভরে নিয়েছিল, কিন্তু সেটা যে ফুরিয়ে এসেছে, আজ বেরুবার আগে খেয়াল করেনি।

আশেপাশে কোনো পেট্রোল পাম্প নেই। স্কুটার ঠেলে ঠেলে হয় রাজাকে যেতে হবে গোল পার্কের কাছে, নইলে ল্যান্সডাউনের মোড়ে। দু'জায়গাতেই তেল পাওয়া যাবে। কিন্তু এতটা রাস্তা স্কুটার ঠেলা বেশ কষ্টকর। তা ছাড়া সময়ও নষ্ট হবে অনেকটা। ওদিকে সৌরভদের বাড়িতে বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

কী করবে রাজা যখন ভাবছে হঠাৎ চোখে পড়ে একটা ঝকঝকে নীল অ্যামবাসাডর খানিকদূরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে লোক গাড়িটার

গায়ে হেলান দিয়ে নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে।

একটা লোকের মুখভর্তি দাড়ি, একজনের পাকানো গোঁফ, আরেকজনের মুখ পরিষ্কার কামানো। তাদের চেহারা এবং পোশাক বেশ ভদ্রলোকের মতো।

রাজা জানে, অনেক গাড়িতে প্লাস্টিক কি টিনের ক্যান-এ এক্সট্রা কিছু পেট্রোল রাখা হয়। হয়তো এমন জায়গায় তেল ফুরিয়ে গেল যেখানে কাছাকাছি রিফিলিং স্টেশন নেই—তখন পেট্রোলটা কাজে লেগে যায়। সে ভাবল যদি এই লোকগুলোর কাছে বাড়তি তেল থাকে, তা হলে লিটার খানেক চেয়ে নেবে। তার জন্য দাম অবশ্য দিয়ে দেবে। তেল না পাওয়া গেলে স্কুটার ঠেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে পায়ে লোক তিনটের কাছে চলে আসে রাজা। তাকে দেখে ওরা চুপ করে যায়। ভুরু সামান্য কুঁচকে দাড়িওলা লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে ভাই?'

রাজা তার সমস্যার কথা জানিয়ে বলে, 'যদি কাইন্ডলি আমাকে একটু সাহায্য করেন—'

লোকটা অমায়িক গলায় বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের গাড়িতে এক্সট্রা তেল আছে, এক্ষুণি দিচ্ছি—বলে গাড়ির দরজা খুলে একটা বড় ক্যান বার করে আনে।

লোকটাকে বেশ ভাল লেগে যায় রাজার। আজকাল কেউ কাউকে সাহায্য করতে চায় না। সেদিক থেকে এই লোকটা চমৎকার।

আজ সকাল থেকে উল্টোপাল্টা হাওয়া দিচ্ছে। এখন সেটা আরো জোরাল হয়ে ওঠে।

লোকটা নিজে রাজার সঙ্গে এসে তার স্কুটারে তেলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে পেট্রোল ঢালতে থাকে। তেজী হাওয়ায় তার চুল দাড়ি উড়ছে।

কৃতজ্ঞ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল রাজা। আচমকা তার কানে ঠিন ঠিন করে একটা ধাতব আওয়াজ ভেসে আসে। মুখ ফেরাতেই চমকে ওঠে সে। নীল অ্যামবাসাডরটার পেছন দিকে পাতলা টিনের নাম্বার প্লেটটা প্রবল বাতাসে বার বার লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ছে। টিনের নাম্বার প্লেটটার নিচে আরেকটা নাম্বার প্লেট রয়েছে। টিনের প্লেটটার নম্বর হলো ডব্লু বি এম ১০৪৮০, নিচের প্লেটটা যেটা গাড়ির সঙ্গে সাঁটা তার ওপর লেখা ডব্লু বি কে ১১২০৯।

রাজার মস্তিষ্কের ভেতর শার্লক হোমস কাজ শুরু করে। একটু আগের ধারণাটা নাকচ করে দেয় সে—না; লোকগুলো ভাল নয়। নিচের নাম্বার প্লেটটা যে আসল এবং টিনের পাতের নাম্বার প্লেটটা যে অন্যের চোখে ধুলো দেবার জন্য, এতক্ষণে

বুঝে ফেলেছে রাজা। নিশ্চয়ই এই লোকগুলো মারাত্মক কিছু ঘটাবার মতলব করেছে বা করছে।

চট করে গাড়ির আসল নকল দুটো নম্বরই মনে মনে টুকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় রাজা। সে যে লোকগুলোকে সন্দেহ করেছে সেটা কোনো ভাবেই জানতে দেওয়া ঠিক নয়। ওরা তিনজন, আর সে একা। কাছাকাছি লোকজনও বিশেষ নেই। তার মনের কথাটা টের পেলে ওরা নির্ঘাত বিপদে ফেলে দেবে। রাজা ভালমানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদিকে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়ে দাড়িওয়ালা বলে, 'এক লিটার চেয়েছিল, দু লিটারের মতো দিলাম। একটু বেশি থাকা ভাল।'

রাজার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। পকেট থেকে বার করে সে বলে, 'খুব উপকার হলো। দয়া করে দামটা নিন।'

লোকটা একেবারে ভদ্রতার অবতার। বলে, 'সামান্য একটু পেট্রোল দিয়েছি, তার জন্য দাম নেবো। লোকে বিপদে পড়লে তার পাশে গিয়ে যদি না দাঁড়াই, তা হলে কি চলে ভাই। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও—'

রাজা বলে, 'তা হয় না। দামটা না নিলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।' কথা সে বলছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধু দাড়িওলাই নয়, বাকি দু'জনকেও' লক্ষ্য করছিল এবং তাদের চেহারার ফোটো অদৃশ্য ক্যামেরায় মাথার ভেতর তুলে রাখছিল।

বাবার বন্ধু প্রবীরকাকু বলেন, ভাল গোয়েন্দা হতে হলে সবসময় চোখ কান খোলা রাখতে হয়, আর কাজে লাগাতে হয় মগজটাকে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে তার ফোটো তুলে রাখা বা তেমন কিছু শুনলে টেপরেকর্ডারে ধরে রাখাটাও ভীষণ জরুরি। খুনী ডাকাতদের ধরার জন্য কখন কোনটা কাজে লাগবে, তার তো কিছু ঠিক নেই।

অন্য সময় হয় ক্যামেরা, নইলে টেপ-রেকর্ডার তার সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আজ কোনোটাই নেই। যে কোনো একটা থাকলে দূর থেকে ওদের বুঝতে না দিয়ে কাজে লাগানো যেত। কেন যে ও দুটো আনেনি, ভাবতেই তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

লোকটা হেসে হেসে বলে, 'ঠিক আছে দাও।' পেট্রোলের দাম নিয়ে সে পকেটে পুরে ফেলে।

রাজা আর দাঁড়ায় না। মাথার ভেতর শার্লক হোমস তাকে অস্থির করে তুলছিল। কিছু একটা করতেই হবে। স্কুটারে উঠে স্টার্ট দিয়ে বিবেকানন্দ পার্কের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার সে ভাবে সৌরভদের বাড়িতেই যায়। খেলে

টেলে গলফ গ্রীনে ফিরে ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কিছু করা যাবে। তক্ষুণি প্রবীরকাকুর কথা মনে পড়ে যায়। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্টিগেসন বা তদন্ত শুরু করা ভীষণ জরুরী। দেরি করলে অনেক ক্লু নষ্ট হয়ে যায়। তখন অপরাধীদের ধরতে অসুবিধা হয়, অনেক সময় তাদের ধরাও যায় না।

সৌরভদের বাড়ি গেলে, না খেলে পারা যাবে না। ওরা জোর করে ব্যাডমিন্টনের কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে, কি চেসবোর্ডের সামনে বসিয়ে দেবে। ভাল করে নীল অ্যামবাসাডরের কেসটা ভাবার সময় পাওয়া যাবে না। রাজা গাড়িটা ঘুরিয়ে ফের গলফ গ্রীনে ফিরে আসে।

তার মতোই ছুটির দিনে বাবা বাড়ি থাকেন না। গলফ গ্রীনে আসার আগে রাজারা অনেক বছর ভবানীপুরে ছিল। সেখানে বাবা আর তার বন্ধুরা মিলে তাস খেলার ক্লাব করেছেন। রবিবার সকাল হলেই বাবা তাস খেলতে পুরনো পাড়ায় চলে যান।

মা একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কি রে, আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?'

ঘরশত্রু দিদিটা সবসময় তার পেছনে লেগেই আছে। সে বলে, 'নিশ্চয়ই ঝগড়া-টগড়া করেছিল, তাই বন্ধুরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

রাজা এমনিতে খুব শান্ত, কিন্তু দিদির ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই যুদ্ধ বেধে যায়। অন্য সময় হলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত, কিন্তু নীল অ্যামবাসাডর এখন মাথার ভেতর চেপে বসে আছে। সে শুধু বলে, 'খেলতে ইচ্ছে করল না, তাই চলে এলাম।'

মা কতটা বিশ্বাস করলেন তিনিই জানেন, তবে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

দিদিটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ডাহা মিথ্যে। নিশ্চয়ই ওকে খেলায় নেয়নি।'

এবারও ততটা ক্ষেপে ওঠে না রাজা। ভেংচি কেটে বলে, 'চুপ কর মুটকি।'

দিদিটা সত্যিসত্যিই বেশ মোটা। সে হাত-পা ছুঁড়ে নাকী সুরে ঘ্যানঘ্যানানি জুড়ে দেয়, 'মা, দেখ দেখ বাঁদরটা আমাকে মুটকি বলল। ওর চোখ আমি গেলে দেবো।'

মা বললেন, 'যা ইচ্ছে কর। আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই। এতটা বেলা হলো, এখনও রান্না চড়ানো হয়নি।' বলতে বলতে তিনি কিচেনের দিকে চলে যান।

রাজাও আর দাঁড়ায় না, আরেকবার লম্বা ভেংচি কেটে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

দিদির ঘ্যানঘ্যানানিটা আরেকটু বাড়ে। অন্য সময় হলে রাজার পেছন পেছন এসে তাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ত। আজ কিন্তু এল না। এটুকুই বাঁচোয়া।

রাজার ঘরের ডান পাশে ড্রইংরুম। সেখানে টেলিফোনটা আছে।

কিছুক্ষণ নিজের ঘরে খাটের ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকে রাজা। এখন কী করা উচিত? ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করে ফেলে, প্রবীরকাকুকে আগে ব্যাপারটা জানানো দরকার। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরের স্টেপ ঠিক করতে হবে।

আশেপাশে কেউ নেই, বিশেষ করে দিদিটা। সে থাকলে ফোনে প্রবীরকাকুর সঙ্গে তার সব কথাবার্তা কান খাড়া করে শুনত, তারপর টুক করে মায়ের কানে লাগিয়ে আসত। রাজা শার্লক হোমস হোক, খুনে ডাকাতদের নিয়ে মাতামাতি করুক, মা তা একেবারে চান না। প্রবীরকাকুকেও এ ব্যাপারে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়। প্রবীরকাকু কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে ড্রইংরুমে চলে যায় রাজা। এবারে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকে। এখন আর ওপাশ থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

রবিবারেও প্রবীরকাকুর লালবাজারে ডিউটি থাকে। একবারেই তাকে পাওয়া গেল।

প্রবীরকাকু মজার গলায় বলেন, 'হ্যালো মাস্টার শার্লক হোমস, কী ব্যাপার? হঠাৎ ছুটির দিনে ফোন? বন্ধুর বাড়ি যাওনি? 'রাজার সব নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন তিনি।

রাজা বলে, 'ভেরি সিরিয়াস কেস কাকু।' তার গলায় চাপা উত্তেজনা। 'কি হয়েছে?'

নীল অ্যামবাসাডরের ঘটনাটা জানিয়ে দেয় রাজা।

প্রবীরকাকু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হুঁ, ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।'

রাজা বলে, 'একটা কিছু করা দরকার।'

'হ্যাঁ।'

'আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'ওরা গাড়িটা চুরি করে ফলস্ নাম্বার প্লেট লাগিয়ে খুন ডাকাতি—এরকম কিছু একটা করার মতলব এঁটেছে।'

চিন্তিতভাবে প্রবীরকাকু বলেন, 'ঠিক বলেছ।' একটু থেমে বলেন, 'ঘণ্টাখানেক

পরে তোমাকে ফোন করব। এর ভেতর খবর নিচ্ছি ডব্লু বি কে ১১২০৯ নম্বরের গাড়িটা সত্যিই চুরি গেছে কিনা।'

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে খোঁজ করবেন?' আসলে গোয়েন্দা হবার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও ইনভেস্টিগেসনের অনেক কিছুই তার জানা নেই। গাড়ি চুরি হলে কেমন করে খবর পাওয়া যাবে, সেটাই সে জেনে নিতে চায়। ভবিষ্যতে অন্য কোনো কেসে তা কাজে লাগাতে পারে।

প্রবীরকাকু বলেন, 'এখনই থানায় থানায় মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতার গাড়ি হলে একঘণ্টার ভেতর খবর পেয়ে যাব। বাইরের গাড়ি হলে দেরি হবে। তুমি বাড়িতে থাকছ তো?'

'হ্যাঁ। গাড়ির খবর পান বা না পান, ফোন করবেন কিন্তু। আমি খুব টেনশানে থাকব।'

'নিশ্চয়ই করব।'

ফোন নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে রাজা, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা সায়েন্স ফিকসান পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু একটা সেনটেন্সও তার মাথায় ঢোকে না। বইটা রেখে মাইকেল জ্যাকসনের গানের টেপ চালিয়ে দেয়। কিন্তু প্রিয় গায়কের পপ সং-ও ভাল লাগে না। টেপটা বন্ধ করে আবার পায়চারি শুরু করে। এইভাবে একটা ঘণ্টা কেটে যায়।

তারপরই প্রবীরকাকুর ফোন আসে, 'তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে, ওই নীল অ্যামবাসাডরটা চুরি হয়েছে। গাড়ির মালিক থাকেন নর্থ ক্যালকাটায়, তিনি কাল রাত্তিরে জোড়াসাঁকো থানায় ডায়েরি করেছেন।'

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'তা হ'লে এখন কী করতে হবে?'

প্রবীরকাকু নিশ্চয়ই জানেন কী করা দরকার। তবু বলেন, 'তুমিই বল না—'

অর্থাৎ কিনা প্রবীরকাকু রাজাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলে, 'আপনাদের কাছে গাড়ি চোরদের লিস্ট আর ছবি থাকে না?'

'থাকে। পুরনোদের নাম ফটো-টোটো পাওয়া যাবে। কিন্তু নতুন গাড়িচোর হলে তাকে ধরা মুশকিল।'

'পুরনোদেরগুলোই আগে দেখা যেতে পারে।'

'অবশ্যই পারে। তুমি যে তিনটে লোককে গাড়িচোর বলে মনে করছ তাদের নাম জানো?'

'না।'

'ওদের চেহারার ডেসক্রিপশন দিতে পার?'

'পারি।'

প্রবীরকাকু বলেন, 'এক এক করে বলে যাও। আমি টুকে নিচ্ছি। ভেবেচিন্তে বলবে চুলের ছাঁট, মুখচোখের স্পেশালিটি, হাতে পায়ে মুখে বা কপালে বিশেষ কোনো দাগ বা চিহ্ন আছে কিনা, দাঁত কেমন—কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

রাজা ভেবে ভেবে বলতে লাগল, 'ধরুন তিনটে লোকের নাম—এ, বি, সি। এ-র চেহারা মাঝারি কালো, হাইট পাঁচ ফিট ছয় কি সাত ইঞ্চি হবে, মুখ চৌকো, গালভর্তি চাপ দাড়ি, জোড়া ভুরু, গলায়—হ্যাঁ, গলার ডানপাশে একটা লালচে জড়ুল আছে। কপালে একটা কাটা দাগ। দাঁতটা ঠিক লক্ষ্য করিনি। এবার বি আর সি-র কথা বলছি। বি-র মুখটা লম্বা, রং ফর্সা, নাকের নিচে সরু গোঁফ আছে, চোখের মণি কটা। সি-র মুখটা গোল। মুখে গলায় হাতে বা কপালে বিশেষ দাগ আছে কিনা মনে পড়ছে না। তার গায়ের রং বাদামী, দাঁতগুলো ট্যারাবাঁকা আর কালো—মনে হয় খুব পান খায়। ও হ্যাঁ, লোকটার চুল কালো নয়, বাদামী।'

প্রবীরকাকু বলেন, 'টুকে নিলাম। তবে তুমি যা ডেসক্রিপশন দিলে তেমন সব চেহারা কলকাতায় হাজার হাজার রয়েছে। অবশ্য ওই দাড়িওলা কালো লোকটার গলায় লালচে জড়ুল আর কপালের কাটা দাগটা খুব ইম্‌পর্টেন্ট।' একটু থেমে ফের বলেন, 'ঠিক আছে, তোমার ডেসক্রিপসনগুলোর সঙ্গে গাড়িচোরদের ফোটো মিলিয়ে দেখছি। ঘণ্টা দুই বাদে আবার ফোন করব।'

এখন দশটা বাজতে বার মিনিট। বারটা পাঁচে প্রবীরকাকু ফের ফোন করলেন, 'তুমি যা ডেসক্রিপশন দিয়েছ তার সঙ্গে একটা ফোটোও ঠিক মিলছে না। মনে হচ্ছে এরা সব নতুন গাড়িচোর।' একটু থেমে বলেন, 'অবশ্য তোমার মুখে শুনে আমি ফোটোগুলো মেলাতে চেষ্টা করেছি, তাতে ভুলও হতে পারে। ওই লোক তিনটেকে কিছুক্ষণ আগে তুমি দেখেছ, গাড়ি চোরদের ফোটোর যে অ্যালবাম আমাদের কাছে আছে সেটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে তার ভেতর ওরা আছে কিনা। অ্যালবামটা দেখবে?'

এই ব্যাপারটা অনেক আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল। রাজা একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই। কখন দেখাবেন?' 'ধর, বিকেলে। তুমি আবার খেলতে বেরুবে না তো?' 'আপনি এলে বেরুব না।'

'আমি পাঁচটায় আসছি।'

ছুটির দিনের দুপুরবেলায় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেয় রাজা। আজ আর ঘুমটুম এল না, অন্যমনস্কর মতো একটা বইয়ের পাতা উল্টে কাটিয়ে দিল সে, যদিও একটি বর্ণও তার মাথায় ঢুকল না।

এর ভেতর বাবা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, দুপুরে ফিরবেন না।

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় প্রবীরকাকু এসে হাজির। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড একটা ছবির অ্যালবাম।

প্রবীরকাকুকে দেখে মা হেসে হেসে বলেন, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ রাস্তা ভুল করে নাকি?'

প্রবীরকাকু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলেন, 'নানা কাজে এত ব্যস্ত আছি যে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'কাজ মানে তো দিনরাত খুনে ডাকাতদের পেছনে ছুটে বেড়ানো।'

'কী আর করি! পুলিশে যখন ঢুকেছি, ওটা করতেই হবে। তা ক'দিন ধরে ভাবছিলাম, আপনাদের এখানে আসব। একটা না একটা ঝঞ্ঝাটে আটকে যাচ্ছিলাম। আজ জোর করেই চলে এলাম।'

'বেশ করেছেন। আসুন—' প্রবীরকাকুকে ড্রইংরুমে বসিয়ে মা বলেন, এমন দিনে এলেন যে আপনার বন্ধুও নেই, বনিও নেই। একজন ভবানীপুরে তাসের আড্ডায়, আরেকজন সিনেমায়।'

'তাতে কী, রাজা আর আপনি তো আছেন—' কোল থেকে অ্যালবামটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে প্রবীরকাকু বলেন, 'আপনাদের সঙ্গেই গল্প করা যাক। ওদের জন্যে আরেকদিন আসা যাবে।'

মা অ্যালবামটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। এবার জিজ্ঞেস করেন, 'ওটার ভেতর ফোটো আছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। মহাপুরুষদের ফোটো।' বলে হাসতে থাকেন প্রবীরকাকু।

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'মানে?'

'আমাদের কাছে চোর ডাকাত খুনীরাই মহাপুরুষ।'

রাজা বলে, 'অ্যালবামটা একবার দেখব কাকু?'

প্রবীরকাকু বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ না।'

মা চোখ কুঁচকে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'না না, ওসব দেখতে হবে না।'

'দেখলে আর দোষ কী।' প্রবীরকাকু বলেন, 'কী ধরনের লোক আমাদের ক্ষতি করার জন্য চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের চিনে রাখা ভাল।'

'আপনারা গল্প করুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

প্রবীরকাকু যে খেতে ভালবাসেন, এ বাড়ির সবাই তা জানে। শুধু চা নয়, মা সেই সঙ্গে কিছু খাবারও তৈরি করে আনবেন। সেজন্য বেশ খানিকটা সময় লাগবে। ততক্ষণে অ্যালবামটা দেখা এবং প্রবীরকাকুর সঙ্গে পরামর্শও সেরে নেওয়া যাবে। মা চলে গেলেন।

রাজা চট করে সেন্টার টেবিল থেকে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে

পাতা ওল্টাতে থাকে। প্রত্যেক পাতায় চারটে করে পোস্টকার্ড সাইজের ছবি; প্রতিটি ছবিতে একজনেরই মুখ। দারুণ ভাল ক্যামেরায় তোলা হয়েছে এগুলো। প্রতিটি মুখের গালের খাঁজ, কপালের ভাঁজ এমনকি ঘামের ছোট ছোট দানা পর্যন্ত সমস্ত দেখা যাচ্ছে।

প্রবীরকাকু বলেন, 'খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ।'

চোদ্দ পনেরোটা পাতা উল্টে যাবার পর একটা ছবির ওপর রাজার চোখ আটকে যায়। মুখটা সেই দাড়িওলার মতো। কপালের কাটা দাগ এবং জোড়া ভুরু প্রায় মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ফোটোর লোকটার দাড়ি নেই, গলায় লাগছে জড়ুলও না। বার বার ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে নানাদিক থেকে দেখতে থাকে রাজা।

পাশ থেকে প্রবীরকাকু বলেন, 'তুমি যা ডেসক্রিপসান দিয়েছ তার একটার সঙ্গেও কিন্তু এ ছবি মেলে না।' রাজা উত্তর দেয় না। সে যে ছবিটা দেখছিল সেই পাতার ফাঁকে আঙুল রেখে বাকি পাতার ছবিগুলো একে একে দেখে যায়। কিন্তু সকালে দাড়িওলা ছাড়া নীল অ্যামবাসাডরটার গা ঘেঁষে আর যে দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে তাদের কারো মুখের মিল অন্য ছবিগুলোতে নেই। রাজা ফের পাতা উল্টে সেই ছবিটা একদৃষ্টে দেখতে থাকে। নিচে লেখা আছে নিতাই হালদার। বাইশ বার গাড়ি চুরির কেস হয়েছে তার বিরুদ্ধে। দু'বার মাস তিনেকের বেশি তাকে জেল খাটানো যায়নি, বাকি কুড়িবার সে বেকসুর খালাস পেয়েছে। হঠাৎ রাজার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা আইডিয়া খেলে যায়। সে বলে, 'এই ছবিটার আর কোনো কপি কি আপনাদের আছে?'

'আছে। শুধু নিতাইয়েরই না, ক্রিমিনালদের সবারই আটটা দশটা করে ফোটোর কবি করানো হয়। তা ছাড়া নেগেটিভও থাকে। কেন, ছবিটা দিয়ে কী করবো?'

উত্তর না দিয়ে রাজা বলে, 'এটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?'

'না।'

'তা হলে বার করে নিচ্ছি।' ছবিটা খুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে রাজা বলে, 'পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন প্রবীরকাকু। তারপর উত্তেজিতভাবে বলেন, 'ছবিটা দিয়ে কী করবে, বোধহয় বুঝতে পেরেছি।'

একটু হেসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে রাজা। শুধু পড়াশোনা বা খেলাধুলোতেই না, ছবি আঁকার হাতও তার চমৎকার। টেবিলে রং তুলি টুলি সবই রয়েছে। সরু ব্রাশ টেনে নিতাই হালদারের

ছবির মুখে আস্তে আস্তে দাড়ি এঁকে ফেলে রাজা। তারপর ব্রাশটা ধুয়ে হালকা লাল রং দিয়ে জড়ুল বসিয়ে দেয়। এবার সকালবেলার দেখা সেই দাড়িওলার মুখটা হুবহু দেখা যাচ্ছে। তবু কোথাও এতটুকু খুঁত থেকে গেল কিনা, খুব ভাল করে দেখে নেয় রাজা। না; সব ঠিক আছে। এই দাড়িওলাই নিতাই হালদার। ছবিটা নিয়ে প্রবীরকাকুর কাছে এসে বলে, 'এবার দেখুন—'

প্রবীরকাকু ছবিটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলেন, 'একেই তুমি আজ তা হলে লেকের ধারে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'দাড়ি গজিয়ে আর ফলস জড়ুল লাগিয়ে মুখের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল নিতাই। কিন্তু তোমার অবজারভেশন সুপার্ব। জোড়া ভুরু আর কপালে কাটা দাগ লোকটাকে ঠিক ক'রে ফেলেছে। আসল কাজটা তুমি করে দিয়েছ, বাকিটা এবার আমাদের করতে হবে।'

'বাকী কাজটা কী?'

'অ্যারেস্ট করা।'

'নিতাই হালদার গাড়ি চুরি করে কেন?'

রং টং পাল্টে, গাড়ির কিছু অদলবদল করে অন্য রাজ্যে বিক্রি করে দেয়। নইলে মোটা টাকা নিয়ে মার্ডারার বা ব্যাঙ্ক রবারদের হাতে তুলে দেয়।'

এইসময় ওধারের প্যাসেজ দিয়ে মা আর ওদের কাজের মেয়ে সীতাকে আসতে দেখা যায়। সীতার হাতে একটা বিরাট ট্রে-তে প্রচুর লুচি, মিষ্টি, তরকারি ছাড়া রয়েছে চায়ের সরঞ্জাম।

লুচি তরকারি মিষ্টি আর পর পর তিন কাপ চা খেয়ে এবং ফাঁকে ফাঁকে গল্প করে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে একসময় উঠে পড়লেন প্রবীরকাকু। বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি ফর এক্সেলেন্ট লুচি তরকারি অ্যান্ড সন্দেশ। আপনার কর্তাকে বলে দেবেন খুব তাড়াতাড়িই আবার হানা দিচ্ছি।'

রাজা প্রবীরকাকুকে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে নিচে নামে। মা দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজার নিচে নামার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তখন মা এসে পড়ায় নিতাই হালদার সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা হয়নি। তার আরো কিছু বলার আছে।

রাজাদের ব্লকের সামনে অনেকটা ঘাসের জমি। সেখানে প্রবীরকাকুর জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির দিকে যেতে যেতে রাজা বলে, 'নিতাই হালদার অ্যারেস্ট হলে আমাকে খবর দেবেন তো?'

প্রবীরকাকু বলেন, 'কী আশ্চর্য, তোমার জন্যে এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল ধরা

পড়তে যাচ্ছে, আর তুমি খবর পাবে না? ফার্স্ট তোমাকে ফোন করব।'

'অ্যারেস্ট করার সময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না?'

'না। এখন তুমি আড়ালে থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে ক্রিমিন্যালদের ধরতে চেষ্টা কর। ওদের সামনে যাবার দরকার নেই। আরো বড় হলে তখন দেখা যাবে।'

প্রবীরকাকু জিপে উঠে চলে গেলেন।

ছ'দিন পর লালবাজার থেকে প্রবীরকাকুর ফোন এল। তিনি বললেন, 'নিতাই হালদার আজ সকালে ধরা পড়েছে।'

উত্তেজিতভাবে রাজা জিজ্ঞেস করে, 'কী করে ধরলেন?'

'আমাদের হাতে অনেক ধরনের দাগী আসামী থাকে, তাদের বলা হয় ইনফর্মার। একটা লোক একসময় নিতাই-এর দলে ছিল, গাড়ি চুরি করত। তাকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সে গোপনে খবর নিয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।'

'গাড়িটার কি হলো?'

'সেটাও উদ্ধার করেছি।'

'নিতাইরা ওটা চুরি করেছিল কেন?'

প্রবীরকাকু জানালেন, ওদের উদ্দেশ্য ছিল মারাত্মক। মোটা টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের একটা দলকে গাড়িটা দেবার ব্যবস্থা করেছিল নিতাইরা। ডাকাতরা ওটায় চড়ে আগামী সপ্তাহে আসানসোলে একটা ব্যাঙ্কে হানা দিত। নিতাই ধরা পড়ায় ব্যাঙ্কটা বেঁচে যায়। নিতাই-এর কাছ থেকে খবর নিয়ে ডাকাতের দলটাকেও পাকড়াও করা গেছে।

প্রবীরকাকু বলেন, 'এর জন্যে তোমাকে ডাবল কনগ্র্যাচুলেসনস্।'

রাজা অবাক হয়ে বলে, 'ডাবল কেন?'

'একটা নিতাইকে চিনিয়ে দেবার জন্যে। দু নম্বরটা হলো ব্যাঙ্ক ডাকাতরা ধরা পড়ার জন্যে।'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে আমি তো কোনো সাহায্য করিনি।'

'ইনডাইরেক্টলি করেছ। নিতাইকে চিনিয়ে না দিলে ওরা কি ধরা পড়ত?'

পরদিন প্রবীরকাকু লোক দিয়ে এক সেট ছোটদের এনসাইক্লোপীডিয়া আর জলভরা সন্দেশের মস্ত একটা বাক্স পাঠিয়ে দিলেন। সে সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠি। 'নিতাই এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে তোমার সাহায্যের জন্য পুলিশ এবং ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সামান্য উপহার পাঠালাম। চিঠিটা যেন তোমার মা দেখতে না পান, পড়েই ছিঁড়ে ফেলবে। ওঁর চোখে পড়লে আমাকে খুন করে ফেলবে। গোয়েন্দাগিরিতে তোমার প্রতিভা ষোলকলায় বেড়ে উঠুক। আমার আশীর্বাদ নিও। প্রবীরকাকু।'
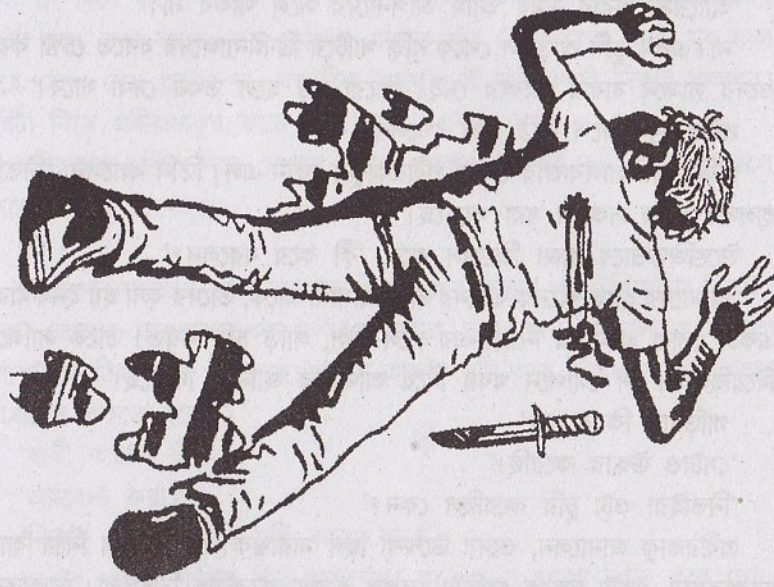
একটি প্যাঁচালো রহস্য

আনন্দ বাগচী

বিকেলের দিকে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিতে-নিতে সুধীরদা বলল, "চলি সুনন্দ। এখানে এসে যে এত ভাল লেগে যাবে ভাবিনি। কিন্তু উপায় নেই, আজই আমাকে ফিরতে হবে।" সুনন্দ বলল, "কী আর বলব বলো, একটু মন খারাপ হল এই যা। কিন্তু আমি তো ক'টা দিন থাকব বলেই এসেছি।" "নিশ্চয়, তুই থাকবি বইকী। সাতদিনের জন্যে তো বুক করাই আছে কটেজটা। তা ছাড়া যাওয়ার আগে বিনয় নায়েকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাব। ও তোর দেখাশোনা করবে, দেখবি কোনওই অসুবিধে হবে না।"

"বিনয় নায়েক।" সুনন্দ জানতে চায়, "সে আবার কে? কোথায় থাকে?" "বিনয় আমাদের কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা। এখানেই বাড়ি। বড় ভাল ছেলে। ওর আরও একটা পরিচয় আছে। 'স্থানীয় তদন্ত' নামে একটা পাক্ষিক

কাগজের ও সম্পাদক। পত্রিকাটির জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ ইস্তক সব একহাতে করে যাচ্ছে। ওর বাবা এখানকার এম. এল. এ.। খুব প্রভাবশালী লোক।"

কলকাতার নামকরা দৈনিক 'প্রত্যহ' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সুধীরদা এসেছিল মন্ত্রীর সফর কভার করতে। প্রায় আড়াইশো বছরের কিংবদন্তিজড়ানো মহাকালী এ-অঞ্চলের অতি জাগ্রত দেবী। প্রতি বছর মাঘ মাসের এক বিশেষ তিথিতে এই মহাদেবীর অন্নকূট উৎসব চলে আসছে আদ্যিকাল থেকে। বহু দূরদূরান্তর থেকে মানুষ এসে ভেঙে পড়ে ওই দিনটিতে অন্নভোগের প্রত্যাশায়। বিশাল মেলা বসে যায় চারপাশ জুড়ে। দিন তিনেক ধরে চলে তার জের। এবারের অন্নকূটের বাড়তি আকর্ষণ ছিল একটা। নবনির্মিত মহাকালী মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল আজ সকালবেলায়, অন্নকূটের পুণ্য তিথিতে। মন্ত্রীমশাই এসেছিলেন সেই উপলক্ষেই। চেন টেনে ব্যাগটা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্লিক করে আর-একটা শব্দ হল।

সুনন্দ চমকে তাকিয়ে দেখল একুশ-বাইশ বছরের এক তরুণ, হাতে ক্যামেরা, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সুধীরদা মুখ তুলতেই সে সহাস্যে বলল, "আপনার একটা ছবি নিলাম, দাদা। বিদায় বেলার ছবি।"

"আরে বিনয়ভাই, এসো, এসো! এই তো তোমার কথাই বলছিলাম। অনেককাল বাঁচবে।"

"আমার কথা। বলেন কী!" বিনয় কৌতূহলী চোখে সুনন্দর দিকে তাকাল। "হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এসো। চোখে না দেখলেও এর নামের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে নিশ্চয়। এই হচ্ছে সুনন্দ, কলকাতার সেই খুদে গোয়েন্দা। কিছুদিন আগেই কাগজে-কাগজে যার প্রশংসা বেরিয়েছিল। পুলিশের তরফ থেকে পুরস্কার ঘোষণার খবরের সুবাদে।"

"সত্যি?" একলাফে বিনয় সুনন্দর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "কী আশ্চর্য! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না!" "না হওয়ার কী আছে? ও তো আমার সঙ্গেই এখানে এসেছে।"

বিনয় গোটা দুই স্ন্যাপ নিয়ে সুধীরদার দিকে ফিরল, "এ কিন্তু আপনার খুব অন্যায়। একেবারে চেপেই গিয়েছিলেন খবরটা, দাদা। অথচ ঘুণাক্ষরেও....দুঃখ হচ্ছে এখন ঠিক যাওয়ার সময়...."

সুধীরদা হেসে বলল, "ঠিক আছে, ও তা হলে থেকেই যাক ক'টা দিন। তুমি ওকে একটু দেখো।"

অনেক বেলায় উঠে সবে ব্রেকফাস্ট সারতে বসেছে, এমন সময় বিনয় এসে হাজির। কাঁধে সর্বক্ষণের সঙ্গী ক্যামেরাটি আছে কিন্তু কেমন একটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। উসকোখুসকো চুল। দেখেই মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। সুনন্দ খেতে

বসেছে দেখে বোধ হয় কিছু ভাঙল না। শুকনো মুখে বলল, "অমি একটু বসছি, তুমি খাও।"

সুনন্দ ওর মুখের দিকে আর-এক নজর তাকিয়ে বলল, "সকাল থেকে তো কিছুই খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি।" বিনয় মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আর ঝামেলা করতে হবে না, আমার তাড়া আছে।"

"ঠিক আছে, তা হলে কফি অন্তত হোক।" ইতস্তত করে বিনয় শেষে বলল, "বেশ, জাস্ট কফি কিন্তু।"

"পটে লিকার আছে, তুমি বানিয়ে নাও।" বলেই সুনন্দ হাঁক দিল "রামাশিসজি, একটা খালি কাপ চাই।"

কাল সুধীরদা চলে যাওয়ার পর সুনন্দকে নিয়ে বিনয় অনেক রাত পর্যন্ত মন্দির চত্বরে আর মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল। দূরের, কাছে, নানা জাতের মেয়ে-পুরুষে মেলাপ্রাঙ্গণ তখন সমুদ্দুর। ছেলে, বুড়োয় একাকার। টয় ট্রেন, নাগরদোলা, নানা আধুনিক কেতার ঘূর্ণি, জাদুঘরের ভেলকি, বেলুন ফাটিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিসের বন্দুকওলা থেকে শুরু করে রাশি-রাশি খাবারের আর ঝুড়ি-ঝুড়ি পুতুলের দোকান ছাড়াও হরেককিসিমের ঘরগেরস্থালির স্টল জমে উঠেছে। রমরমিয়ে চলেছে ভি. ডি. ও-বায়োস্কোপ আর হাতে-গরম ফোটো তোলার দোকান। এরকম আধা শহর অঞ্চলে ভাবাই যায় না। মেলা থেকে ফিরে এসেও বহুক্ষণ ঘুম আসেনি সুনন্দর। শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছিল সন্ধে থেকে। নতুন জায়গায় একা বলেই হোক কিংবা অনেক রাতে খাওয়ার জন্যই হোক, ঘুম সহজে আসছিল না। ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়েছিল তাই। আর ভাঙার পরেও শীত-কাতুরে গড়িমসি ছিল। আসলে সকালে উঠে কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল না তো!

বিনয় ইতিমধ্যে দুধ-চিনি মিশিয়ে দু'কাপ কফি বানিয়ে ফেলেছিল। সুনন্দর দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখো, চিনি ঠিক আছে কি না।" সুনন্দ মাথা নাড়তে, ও নিজের কাপে চুমুক দিতে-দিতে একটা তৃপ্তির শব্দ করল। সুনন্দ ওকে লক্ষ্য করছিল। একটু সময় দিয়ে এবার বলল, "তারপর বল ঘটনাটা কী? কোনও বিপদ-আপদ, না কি কোনও দুঃসংবাদ?" "ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ! এখানকার ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি, এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।" "বলো কী!" সুনন্দ সোজা হয়ে বসে। "কাল গভীর রাতে মহাকালী মন্দিরের পুরোহিত ছুরিকাহত হয়েছেন।" বিষম খেতে-খেতে সামলে নিয়ে সুনন্দ বলে ওঠে, "মানে, মারা গেছেন? কোথায় ঘটল ব্যাপারটা? কারা করল? কেন?"

একটু চুপ করে থেকে বিনয় উত্তর দিল, "মারা গেছেন কি না ঠিক বলতে পারব না। আমাদের গাড়িতে করে সদর হাসপাতালে যখন নিয়ে গেল, তবে

জ্ঞান ছিল না, হিউজ ব্লিডিং হচ্ছিল। ঘটনা যা জানতে পেরেছি, তোমাকে বলছি। "প্রসাদ বিতরণ শেষ হলে মায়ের মূল কক্ষটি কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ঘর খুলে মধ্যরাতের আরতি-শেষে পুরোহিত মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তারপর সেবাইতদের ডাকেন। সবাই মিলে প্রণামীর টাকা বাক্সবন্দি করা হয়। প্রণামী ও মানতের অন্য জিনিস, শাড়ি ইত্যাদি গুছিয়ে রেখে ফলমূল, প্রসাদ ছাঁদা বেঁধে নিয়ে বাইরে আসেন। তখন মন্দিরের রক্ষীরা ভেতর ও বাইরের মন্দিরে তালা দিয়ে দেয়। কালকেও যথানিয়মে পুরোহিত ভেতরে ঢুকেছিলেন মায়ের নির্জন আরতি সারতে। হঠাৎ বুকফাটা আর্ত চিৎকার শুনে মন্দিরের সবাই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। কী ব্যাপার, কার চিৎকার, বুঝতে তাঁদের খানিকটা সময় লেগে গিয়েছিল। শেষে মূল মন্দিরের দরজা খুলে দেখা গেল ঘর ফাঁকা, শুধু পুরোহিতের নিস্পন্দ দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে মায়ের পায়ের কাছে। কোনও ধারালো সরু অস্ত্র দিয়ে কেউ বুঝি তাঁর বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।"

স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে সুনন্দ একসময় বলল, "হুঁ! কিন্তু হত্যাকারী পালাল কোন পথ দিয়ে?"

"ঘরের পেছন দিকের জানলা দিয়ে।" "জানলা দিয়ে।" সুনন্দর গলায় বিস্ময়।

"হ্যাঁ। জানলায় লোহার ফ্রেমে বসানো মজবুত গ্রিল ছিল। স্ক্রুগুলো খুলে গ্রিল সরিয়ে অপরাধীরা বাইরের মন্দিরের প্যাসেজে বেরিয়ে চম্পট দিয়েছে। ওদিকের গেট তখন খোলাই ছিল, লোকজনও কেউ ছিল না।"

সুনন্দ বলল, "কিন্তু কারণটা কিছু বুঝতে পারা গেল না। নিছক প্রতিহিংসা? একজন পুরোহিতের ওপর কারও কী এমন রাগ থাকতে পারে যে, তাঁর জীবন শেষ করে দিতে চাইবে? বিশ্বাস হয় না।"

"আরে, আসল ব্যাপারটাই তো তোমাকে বলা হয়নি। যে বা যারা এসেছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল অর্থ। তারা মায়ের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুঁলে নিয়ে গেছে। মন্দিরের ট্রাস্টির হিসেবমতো প্রায় পনেরো লক্ষ টাকার গয়না। লোকগুলোর এমন দুঃসাহস যে, মায়ের জিভ থেকে সোনার পাতটুকু পর্যন্ত খসিয়ে নিয়ে যেতেও ওদের হাত কাঁপেনি। সবচেয়ে দামি অলঙ্কারটি ছিল একটি হিরের নেকলেস। পাশের রাজ্যের মহারাজার বংশের দুর্লভ রত্নহার। গড় পুরন্দরপুরের বর্তমান উত্তরাধিকারী অবশ্য নামেই মহারাজা। একাধিক ব্যবসায় ফুলেফেঁপে তারা এখন ধনকুবের, এই তরুণ মহারাজা তো এতদিন নিঃসন্তানই ছিলেন। তিন-তিনবার তাঁর স্ত্রীর গর্ভে মৃত সন্তান আসার পর মহাকালীর আশীর্বাদে গত বছর তাঁদের একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। ছেলের জন্যে মহারাণি মানত করেছিলেন। সেই মানতের হার গতকালই নিবেদন করা হয়েছে রাজবংশের তরফ থেকে। এইসব

গয়না ছাড়া প্রণামীর টাকাও কয়েক হাজার হবে।”

গালে হাত রেখে সুনন্দ বলল, “আই সি! এ তা হলে ছোটখাটো সাধারণ চোরের কর্ম নয়। একেবারে সুপরিকল্পিত ছিনতাই, ডাকাতি এবং হত্যার চেষ্টা। কিন্তু তোমাদের এত জাগ্রত মহাকালী দেখা যাচ্ছে, একেবারে নির্বিকার। তিনি আসলে পাথরপ্রতিমা ছাড়া কিছু নন। নিজের সর্বস্ব তো গেলই, নিষ্পাপ পূজারির প্রাণটাও তিনি রক্ষা করতে পারলেন না।” বিনয় একটু আহত হল। অপ্রসন্ন গলায় বলল, “মাকে যা খুশি বলছ বলো। কিন্তু ওই পাষণ্ডরা দেখো ঠিক শাস্তি পাবে। লোকের ধারণা, মায়ের গায়ে হাত দেওয়ার দুর্মতি যাদের হয়েছে, চরম সর্বনাশ থেকে তাদের রক্ষা নেই।”

সুনন্দ বুঝল, বিনয়ের আঁতে ঘা লেগেছে। তাই নিজের মন্তব্যটাকে মোলায়েম করে দিয়ে বলল, “অবিশ্যি কথাটা অন্যদিক থেকেও ভাবার আছে। অক্ষম, অপদার্থ, বিকলাঙ্গ সন্তানকেই মায়েরা বুক দিয়ে আগলান দ্যাখোনি! সকলেই তাঁর সন্তান, তবু পাপীতাপীর ওপরেই তাঁর করুণা সকলের আগে ঝরে পড়ে।”

এই যুক্তিতে বিনয় মনে-মনে খুশিই হল। বলল, “তা সত্যি বলতে কী, অর্থ, ঐশ্বর্য এসবের মূল্য তো মানুষেরই মনগড়া। এসব অসাড় বস্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করে না। যাকগে, ভাই সুনন্দ, একবার যাবে নাকি মন্দিরের অবস্থাটা নিজের চোখে দেখে আসতে? তুমি গোয়েন্দা, আর আমারও এক হিসেবে তো গোয়েন্দা পত্রিকাই!”

“যাব কী বলছ!” সুনন্দ রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল, “খবরটা শোনামাত্র আমি মনে-মনে একপায়ে খাড়া হয়েই আছি। তবে একটা কথা, গোয়েন্দা বোলো না, ব্যোমকেশ বক্সির ভাষায় আমরা দু'জনেই সত্যসন্ধানী! ভেতরের সত্যিটাকে খুঁজে বেড়ানোই আমাদের কাজ। রাজি?” “নিশ্চয়! এবং সেটা আজ থেকেই। এই মুহূর্ত থেকেই।”

ওরা যখন মন্দিরে গিয়ে পৌঁছল, পুলিশের কাজ তখন প্রায় শেষ। ও. সি. তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। স্থানীয় এক ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে মূর্তির এবং মন্দিরের স্থানবিশেষের ছবি তোলানো হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় মূর্তির গায়ে এবং খুলে রাখা গ্রিলে হাতের ছাপ পেয়েছেন আর ওপাশের প্যাসেজে খুবই অস্পষ্ট ভাঙাচোরা কিছু জুতোর ছাপ। চারপাশ খতিয়ে দেখে ও. সি-র কী ধারণা হয়েছে তা আর ভাঙলেন না। গ্রিলটাকে আবার স্ক্রু এঁটে বন্ধ করে দিতে বলে সেবাইতদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর নাকি আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে, যা এখানে সকলের সামনে তিনি জিজ্ঞেস করতে চান না। পাকশালার রাঁধুনিদের, কর্মী ও রক্ষীদের জবানবন্দিতে কিছুই জানা যায়নি। শুধু কে তখন কোথায় ছিল,

কতদিন কাজ করছে এই খবরটুকু ছাড়া। এই নতুন মন্দিরের নকশার একটা নকল নিয়ে ও. সি. তাঁর জিপ হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

বিনয় হতাশ গলায় বলল, “আর কী দেখবে, সব হয়ে গেল! পুলিশে নিকানো মন্দির এখন ধোয়ামোছা, কোনও সূত্র কি আর ফেলে গেছে? এইজন্যেই তাড়াতাড়ি আসতে চাইছিলাম।

সুনন্দ হাসল, “সূত্র মানে তো আর সুতো নয় যে, কুড়িয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ! এই তো ভাল হল আমরা ধীরেসুস্থে চারপাশটা দেখার সুযোগ পাব। যে যেমন চোখে দেখতে পায়। আসলে কী জানো, আমাদের মনটাই চোখ দিয়ে দেখে।”

মন্দিরের ভেতরটা পরে দেখবে স্থির করে ওরা আগে প্যাসেজের দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা নিরিবিলি। বাইরের মন্দিরের করিডর সোজা কিচেনের দিকে চলে গেছে। যেখানে কাল ভোগ রান্না হয়েছিল। কিচেন থেকে করিডর এবং সেটা পার হয়ে মূল মন্দিরের জানলাতক প্যাসেজের গলিটা চোখে পড়ে না। ফ্রেম থেকে খুলে গ্রিলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। এইরকমই রাখা ছিল। জানলার তলা থেকে অনেক জুতোর ছাপ ফিকে হতে-হতে বার-মন্দিরের ডবল কোল্যাপসিব্‌ল গেটের কাছ বরাবর গিয়ে মিলিয়ে গেছে। গেট পেরোলেই তুলসীবন, টগর, জবা, কুন্দ আর দু-পাঁচরকম ফুলের ঝোপ। তারপরে কয়েকটা বেল আর হরতকী গাছের জটলা। একপাশে একটা ছোট্ট বেদি, তার গা ছুঁয়ে সাপের মতো পরস্পরকে পেঁচিয়ে ক'টা গাছ ফণা তুলে আছে, আলাদা করে তাদের চেনা যায় না। বিনয় জানাল ওখানে নাকি আগে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল। ওসব ছাড়িয়ে মন্দিরের সীমানা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার ওপারে আর নজর চলে না, ঘন জঙ্গল প্রায় দুর্ভেদ্য বন হয়ে আছে। জানা গেল, ওই জঙ্গলের গা ছুঁয়ে একটা মরা নদীর সোঁতা পাক খেয়ে মূল নদীতে গিয়ে মিশেছে।

বিনয়কে নিয়ে সুনন্দ আবার প্যাসেজের সামনে ফিরে এল। খোলা জানলার তলা থেকে জুতোর ছাপ এগিয়ে এসেছে। কালো মার্বেল পাথরের ওপরে এক বিচিত্র বর্ণের ছোপ পড়েছে। শ্বেত চন্দন আর রক্তের ছিটে দেওয়া হালকা গোলাপি রঙ লেগেছে খাপছাড়া ভাবে। ভাঙা টুকরো-টুকরো লাগার কারণ শুধু ওই ছ্যাকরা-ছ্যাকরা রংই নয়, উলটোদিক থেকে আসা আর-এক প্রস্থ জুতোর ছাপ পরস্পরের ওপর চেপে গেছে এলোমেলো ভাবে। তারপর রংটা ক্রমশ ফিকে হয়ে মুছে গেছে।

বিনয় দাগগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, “দ্যাখো, স্পষ্টই বোঝা যায় লোক একজন ছিল না, একাধিক। তারা বাইরের দিক থেকে গেছে, আর ভেতর থেকে এসেছে।”

সুনন্দ কোনও উত্তর না দিয়ে উবু হয়ে বসে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস

বের করে খুঁটিয়ে কিছু দেখছিল। মিনিট তিন-চার এগিয়ে-পিছিয়ে ছাপগুলো পরীক্ষা করে আপনমনেই মাথা নাড়তে লাগল। বিনয় নিঃশব্দে ওকে লক্ষ করছিল, তার হাতে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা প্রায় তৈরি। সামান্য অসহিষ্ণু গলায় শুধোল, 'কী বুঝলে? আমার কথা ঠিক না?''

সুনন্দ সে-কথার জবাব না দিয়ে শুধু বলল, ''মুশকিল হয়েছে, কোথাও গোড়ালির ছাপ পড়েছে, কোথাও জুতোর ডগার। কখনও গোড়ালিতে ভর দিয়ে কখনও পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ডিঙি মেরে হাঁটার মতো। শুধু একটা ব্যাপার স্ট্রেঞ্জ লাগছে...''

''কোন ব্যাপার? স্ট্রেঞ্জ কেন?''

সুনন্দ বিনয়ের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, ''কেবল ওই দুটো গোড়ালির ছাপ আস্ত আছে, তাই না? রঙের ছোপ খুব স্পষ্ট আর পুরু হয়ে পড়েছে। বোঝাই যায় জানলার ধাপ থেকে প্রথম নেমে আসার সময়ে গোড়ালির ওপর ভর রেখে নেমেছিল। আর রংগুলো কিসের জানি না, এসেছে মন্দিরের ভেতর থেকেই।''

বিনয় সুনন্দর কথাগুলোর খুব একটা গুরুত্ব দিল না। বলল, ''আর কী বোঝা যায়?'' গলার সুরে ব্যঙ্গের ছোঁয়া।

সুনন্দ গায়ে মাখল না। বলল, ''ওই একজোড়া গোড়ালির একটা ক্লোজআপ ছবি যদি নিতে পারো, খুব ভাল হয়।''

ছবির ব্যাপারে বিনয়ের বিন্দুমাত্র আলস্য নেই। সে এগিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে ক্যামেরা তাক করল। ক্লিক। ক্লিক। নির্ভুল হওয়ার জন্য গোটা দুই ছবিই তুলে নিল পর-পর। সুনন্দ ওর একটু আগের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করে, ''আর কী বোঝা যায়? বোঝা যায় লোকটা মোটাসোটা, অর্থাৎ বেশ ওজনদার। বোঝা যায় তার পায়ে বেশ পুরনো হাওয়াই চপ্পল ধরনের জুতো ছিল।''

''বাব্বা, একেবারে জ্যোতিষ গোয়েন্দা! তা হলে লোকটার বয়স, তার চেহারা, তার পোশাক-আশাক সম্পর্কেও কিছু শুনি?''

সুনন্দ মাথা নাড়ল, ''অতটা আমার দ্বারা হবে না ভাই। আমার অনুমান যে কত পার্সেন্ট নির্ভুল তাই জানি না। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা লক্ষ্য করো। বেশি স্পষ্ট, রংটা বেশি গভীর। কেন জানো? জানলার ধাপ থেকে ওই পা-টাই সে প্রথমে ফেলেছে, জোর বেশি পড়েছে, আর ভারী শরীর চলে চাপটাও বেশিমাত্রায়। কী দেখে বললাম? পুরনো জুতোর ক্ষয়া গর্তটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।'' প্রায় ইঞ্চি দেড়েক লম্বা সরু ফাঁকা জায়গাটা কেন যে এতক্ষণ বিনয়ের চোখে পড়েনি, কে জানে। যুক্তিটা অকাট্য মনে হতেই সে তারিফের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বন্ধুর

দিকে তাকাল। ''এখানে আমাদের আর কিছু দেখার নেই।'' সুনন্দ বলল, ''চলো, বাইরে দিয়ে নাটমণ্ডপ ঘুরে আমরা মন্দিরে প্রতিমা দর্শন করে আসি।''

মন্দিরের ভেতর তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। এখানকার গাঙ্গুলী পরিবার বহুকাল থেকে মন্দিরের উপস্বত্ব ভোগ করে আসছেন। এক সময় তাঁরাই পুরুষানুক্রমে মায়ের পুজো করে আসছিলেন। এখন পুজোর জন্য পুরোহিত রেখে দিয়েছেন। গাঙ্গুলি পরিবারও এখন শাখাপ্রশাখা অনেক শরিকে ভাগ হয়ে গেছেন। তাঁদের অনেকেরই এখন জীবিকা অন্য। অনেকেরই সাজপোশাকে আর ব্রাহ্মণত্ব নেই। তবে প্রণামীর টাকার ভাগবখরা সকলেই পেয়ে থাকেন। মানতের সামগ্রী আর বস্ত্রাদির জন্য ডাক হয়। সেই বিক্রীত অর্থ ও অংশ অনুযায়ী বাঁটোয়ারা হয়।

মন্দিরের ভেতর ঢুকে ওরা থমকে দাঁড়াল। মহাকালীর মূর্তির পায়ের তলায় চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে কালচে হয়ে আছে। ঘরের মেঝে, করিডর কিংবা প্যাসেজের মতো নয়, সাদা মার্বেলে বাঁধানো। চারপাশে কেমন একটা বিধ্বস্ত ভাব। পুরোহিতের হাত আর পায়ের ধাক্কা লেগে পূজা উপচারের অনেক কিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। দইয়ের মালসা ভেঙে ছিটকে গেছে অনেক দূর। পদ্মপাতার ওপর আবিরের চুড়ো করে রাখা সিঁদুরের স্তূপ ছড়িয়ে গেছে চারপাশে। আততায়ীর পা হড়কানোর চিহ্ন খুব স্পষ্ট। ওরা সেই তরল চটচটে জায়গাটা ডিঙিয়ে প্রতিমার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

মূর্তির অনেকটা পেছনে গর্ভকক্ষ, অর্থাৎ মাটির তলার কুঠুরি। ওখানেই গর্ভঘরের সিন্দুকে দেবীর উদ্বৃত্ত অলঙ্কার তোলা থাকে। বিশেষ-বিশেষ উৎসবের দিনে তাঁকে আপাদমস্তক সেই বহুমূল্য গয়নায় মুড়ে দেওয়া হয়। যেমন হয়েছিল গতকাল। আজ তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। তাই গর্ভঘরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তার ইস্পাতের পাতে মোড়া ডালা দুটো খোলাই রয়েছে, কেউ বন্ধ করেনি। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা পাথরের সুদৃশ্য চৌবাচ্চা। পুজোর শুকনো ফুল জমা করে রাখার জন্য।

বিনয় নিচুগলায় বলল, ''এখন দেখে মনে হচ্ছে অসম্ভব নয়। প্রতিমা দর্শনের ভিড়ে মিশে গিয়ে এই দলটা ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর সুযোগ বুঝে তাদের একজন বা দু'জন ওই গর্ভঘরে কিংবা চৌবাচ্চার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, অন্যরা বেরিয়ে যায়। তারপর পুরোহিত দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলে চটপট কাজ গুছিয়ে নেয়। একজন স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে গ্রিলটা ফ্রেম থেকে খুলে ফেলে, অন্যজন একটি-একটি করে মায়ের গায়ের গয়না সরায়। দলের বাকিরা ততক্ষণে প্যাসেজে জানলার সামনে অপেক্ষা করছে।'' সুনন্দ শুনছিল। বলল, ''হুঁ। আর খুন?''

"ভেতরের কাজ শেষ হওয়ার আগেই, পুরুতমশাই ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন তাই তাঁর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।" "হুঁ! হুঁ!" সমর্থনের ভঙ্গিতে সুনন্দ বলল, "এই তা হলে তোমার থিয়োরি? তা ভালই ফেঁদেছ।"

"থিয়োরিটা আমার হলেও বুঝলে ভাই," বিনয় খুশির গলায় বলে ওঠে, "আইডিয়াটা কিন্তু পেয়েছিলাম বাবার বন্ধু ডঃ নাথের কথা থেকে। তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত?" সুনন্দ কিছু ভাবছিল, বলল, "তোমার সঙ্গে আমার মতের অমিল হয়েছে তাও যেমন বলছি না, তেমনই মিল হয়েছে সেটাও বলতে পারছি না।"

"বাঃ, এ আবার কী হেঁয়ালি, ভাই?" বিনয় কেমন বিভ্রান্ত চোখে তাকায়, "হ্যাঁ আর না দুটোই কী করে একসঙ্গে....।"

"হেঁয়ালি না, আসলে আমি এখনই কোন ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। এত তাড়াহুড়োয় কোনও মত দেওয়া যায় না। পুলিশ কী ভাবছে, হাত-পায়ের ছাপ থেকেই বা কী বেরোল, তা যেমন আমাদের জানা দরকার, তেমনই আরও একটা ব্যাপারের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মনে রেখো, পুরুতমশাই যদি এ-যাত্রায় টিকে যান, তা হলে তাঁর জবানবন্দি অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। তিনিই হবেন এই মামলার সবচেয়ে ভাইটাল সাক্ষী। তবে একটা ব্যাপারে তোমার থিয়োরির সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।" বিনয় অবাক হয়ে জানতে চায়, "কী সেটা?"

"একগাদা লোক মিলে এই চুরি হয়নি। আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটাই একজনের কীর্তি। এক দুঃসাহসী ঠাণ্ডা মাথার লোক, যে খুব রয়ে-বসে প্ল্যানটা ভেঁজেছিল। চলো, আর কিছু আপাতত দেখার নেই।"

বিনয় বলল, "চলো। কিন্তু একটা কথা, তোমার এই বিশ্বাসের পেছনে কোনও কোনও প্রমাণ আছে, না নিছকই অনুমান।"

"প্রমাণ আছে। তবে সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারছি না এখনও। প্যাসেজের পায়ের ছাপগুলো যতই বিভ্রান্তিকর মনে হোক, টুকরো, ভাঙা, অস্পষ্ট হোক, ওগুলো একজোড়া জুতো থেকেই এসেছে। পুরনো ক্ষয়াটে হাওয়াই চপ্পল।" কথা-শেষে সুনন্দ একটু হাসল।

"আজ শুধু কফি নয় কিন্তু।" সুনন্দকে চমকে দিয়ে বিনয় ওর কাঁধে হাত রাখল।

নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে সুনন্দ একটা পেপারব্যাক থ্রিলার পড়ছিল। কোন সকালে মুখটুখ ধোয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু ব্রেকফাস্টের জন্য রামাশিশজির

ডাকের অপেক্ষা। চমকে মুখ ফিরিয়ে সুনন্দ হেসে ফেলল "এসো, এসো। পুরো ব্রেকফাস্টই হবে। দাঁড়াও বলছি।" "বলেই এসেছি। বিনয় হেসে ফেলল," "কীরকম স্মার্ট দেখছ তো!" "তা দেখছি। কিন্তু তুমি মশাই বেশ লোক। কাল সকালের পর থেকে আর তোমার টিকিটিরও দেখা নেই! কী ব্যাপার, একেবারে নো নিউজ।"

বিনয় ওর খাটের কিনারে বসে পড়তে পড়তে কমিক মুখ করে বলল, "বলতে গেলে অনেক নিউজ এবং নো নিউজ। কেমন, তোমার মতোই হেঁয়ালি করে বলতে পেরেছি কি না? তবে এইসব খবর সংগ্রহ করতে খুব দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে ভাই। এক সকালের ব্রেকফাস্টে খরচা পোষাবে না, সুনন্দভাই!" সুনন্দ গম্ভীর মুখ করে বলল, "শুরু করো।"

"ব্যাড নিউজ দিয়েই তা হলে শুরু করি। প্রথমে ভাইটাল খবর, পুরোহিত ভট্‌চাজ্জি মশাই পরশু রাতেই মারা গেছেন। হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। জ্ঞান ফিরে আসেনি, কোনও জবানবন্দি দূরে থাক, টু শব্দটিও করে যেতে পারেননি। এর্মাজেন্সি টেবিলেই আমাদের শেষ ভরসার বাতি নিভে গেছে।" আক্ষেপের ভঙ্গিতে সুনন্দ মাথা নাড়ল।

"দু'নম্বর, প্রতিমার গায়ে কিংবা গ্রিলে পুলিশ কোনও হাতের ছাপ পায়নি। না বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না, পেয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হবে না।" "কেন?" সুনন্দ খর চোখে তাকায়। ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো ভাঙাচোরা, অস্পষ্ট এবং এত লোকের যে, তা থেকে খুনির হদিস মেলা অসম্ভব। "জানতাম এরকমই হবে। তা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কথা কিছু কি জানা গেল?"

"হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়িই রিপোর্ট পাওয়া গেছে।" বিনয় উত্তর দিল, মোদ্দা কথাটা এই, অত্যাধিক রক্তক্ষরণই তাঁর হার্টফেলিওরের অন্যতম কারণ। ছুঁচলো ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে নয়, সরু অথচ ভোঁতাটে কোনও অস্ত্র দিয়ে তাঁর বুকে একটিমাত্র আঘাত করা হয়েছিল। খুব বলশালী কোনও লোক এত জোরে আঘাত করেছিল যে গায়ে জড়ানো শাল ফুঁড়ে বুক একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড়। মাংসপেশী ছিঁড়ে একটা ধমনী পর্যন্ত কেটে যায়। কাল তুমি জোরের সঙ্গে যা বলেছিলে তার সঙ্গে মিলছে না, পুলিশ কিন্তু অন্যরকম মনে করছে। এ কখনও স্থানীয় লোকের কর্ম নয়। মহাকালী সম্পর্কে এখানকার প্রতিটি মানুষের গভীর সংস্কার আছে, পুলিশের ধারণা, বাইরের কোনও কুখ্যাত দলের কাজ। এই ধরনের বড় মেলায় কত বিদেশি লোক আসে। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কোনও নটোরিয়াস গ্যাং অনায়াসেই এই কাজ হাসিল করতে পারে। তাই বাসস্ট্যাণ্ড আর রেল স্টেশনে পুলিশ খুব ভালরকম নজর। সুনন্দ বলল, "হুঁ। এখনও তা হলে চুরি যাওয়া গয়নাপত্তরের

কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।" "তা যায় নি। তবে পুলিশ কিন্তু বসে নেই। পাশের রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। মহারাজার নেকলেসটা আসার খবর ওখানে তো আগেই চাউর হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দ আর একটিও কথা বলল না। তার মুখ-চোখ চিন্তার ছাপকে হতাশার চিহ্ন মনে করে বিনয়ও চুপ করেই থাকল। ব্রেকফাস্ট শেষ হলে সুনন্দ হঠাৎ বলল। "চলো, আর একবার ঘুরে আসি।" বিনয় কথাটা শুনে খুব উৎসাহিত হল এমন নয়। তবু বলল, "কোথায়, মন্দিরে?" "হ্যাঁ, ওপাশের জঙ্গলের দিকটা কাছে গিয়ে দেখতে চাই। ওই পথ দিয়েই তো অপরাধীরা ভেগেছে।" "বুঝেছি।" বিনয় যেন একটু চাঙ্গা হল, "ওখানে কোনও সুত্রটুত্র পেয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। চলো!"

মন্দির থেকে সরু পায়ে-চলা পথটা বেড়ার ধারে যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার একপাশে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুনন্দ। তিনপ্রস্থ কাঁটাতারের টানা বরাবর বেড়া তৈরির কাজে ঘন করে সার বেঁধে কাঁটাগাছ লাগানো হয়েছে, প্রথম নজরে কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কয়েকটি কাঁটাগাছের পাতা কেমন শুকনো, নেতিয়ে আছে। সাবধানে হাত বাঁচিয়ে জালগুলো সরাতেই আসল রহস্যটা চোখে পড়ল। গোড়া থেকে কাটা কাঁটা গাছের ছালগুলো কেউ দিব্যি সাজিয়ে রেখেছিল। ওই জায়গাটায় কাঁটাতারগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। সুনন্দ বলল, "যে বা যারা চুরি করতে মন্দিরে ঢুকেছিল, এই পথেই তারা এসেছিল, আবার ফিরেও গেছে।"

বিনয়ের চোখ গোল-গোল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অনেক খুঁজেও গাছ কিংবা তারের কাঁটায় কোনও জামা-কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো কিংবা আঁশজাতীয় কিছু আটকে থাকতে দেখা গেল না। কোনও পায়ের ছাপও নয়। জঙ্গলের গাছের ঝরা শুকনো পাতার ওপরে স্বভাবতই কোনও পায়ের দাগ আশা করা যায় না।

তবু বিনয় পা দিয়ে শুকনো পাতা সরিয়ে বোধ হয় পায়ের দাগ খুঁজছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আরিব্বাবা! এ যে টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি!" বলেই নিচু হয়ে কয়েকটা ঝকঝকে টাকা আর আধুলি কুড়িয়ে নিল। পাতা সরিয়ে-সরিয়ে অনেক খুঁজল, কিন্তু আর কিছু পেল না। সুনন্দ চুপ করে দেখছিল। এবার বলল, "লোকটা যে একাই ছিল, এই টাকাগুলোই তার প্রমাণ।"

এমন উদ্ভট যুক্তি শুনে বিনয় হাঁ হয়ে গিয়ে বলল, "তার মানে?"

"তার মানে, লোকটা প্রণামীর কোনও কাপড়ের বোঁচকায় গয়নাগুলো আর পরাতের ওপর জমা পড়া গুচ্ছের নোট আর কয়েক কেজি রেজকি বেঁধে

নিয়েছিল। বেড়ার ধারে এসে সে প্রথমে বোঁচকাটা ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর সাবধানে কাঁটাগাছের কাটা গোড়াগুলো ডিঙিয়ে ওপাশে পৌঁছয়। আছাড় খেয়ে পড়ায় বোঁচকার ফাঁক দিয়ে কিছু খুচরো ছিটকে পড়েছিল, লোকটা খেয়াল করেনি।" বিনয় সায় দিয়ে বলল, "ঠিক, আমার প্রথমটায় মাথায় আসেনি।"

মেলা ভেঙে গেছে। দু-চারটে দোকান এখন যাচ্ছি করে রয়ে গেছে। বাকিরা কেউ-কেউ পাততাড়ি গুটিয়ে তাদের ছাউনি খুলছে। মেলা-প্রাঙ্গণ ঘুরে ওরা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন একটা শোক আর আতঙ্ক মন্দিরের চারপাশে নেমে এসেছে। কেউ প্রায় ধারে-কাছে নেই। মন্দির চত্বর আর নাটমণ্ডপ খাঁ-খাঁ করছে। অবশ্য বেশিরভাগ মানুষই এখন শ্মশানে। ভট্চাজ মশাইয়ের শব দাহ করতে বিরাট মিছিল গেছে। থানার ও সি. একটু আগেই ঘুরে গেছেন এখানে। বিনয়কে চেনেন। ডেকে বললেন, "মোহন মিস্তিরিকে গ্রিলটা লাগিয়ে দিতে বলেছি, ঠিকঠাক লাগানো হয়েছে কি না একটু দেখে নিয়ো।"

সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, "এই মিস্তিরি মোহনটি আবার কে? নাম শুনলেই দস্যু মোহনের কথা মনে পড়ে যায়?"

হো-হো করে হেসে উঠে বিনয় বলল, "ঠিক উলটো। একেবারে গোবেচারা, গবেট, তার ওপরে তোতলা। সবাই ওকে 'মান্দা মিস্তিরি' বলে ডাকে। অমন দশাসই চেহারা, কিন্তু একটা ধমক দাও, একেবারে কেঁচো। বউকে একেবারে যমের মতো ডরায়। কিন্তু ইলেকট্রিকের কাজ যা জানে, তোমার তাক লেগে যাবে!" "ইলেকট্রিশিয়ানদেরই আজকাল পয়সা।" সুনন্দ বলল, "অমন গুণী লোক বলছ, কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে কী এমন আর কামাই হবে!"

"হয়ই না তো। কোনওরকমে সংসার চলে। অলস, গেতোঁ! পাঁচবার ডাকলে তবে যদি তার দেখা পাওয়া যায়। তার ওপর ভবঘুরে, বাউন্ডুলে স্বভাব। থাকে-থাকে, উধাও হয়ে যায়। আসলে কাজকর্ম তো প্রায়ই থাকে না, কী আর করবে বেচারা! আর থাকলেও উচিত পয়সা কি আর পায়? এখানকার জামাই বলে, সবাই নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে নিতে চায়। আর মান্দাও এমন বোকার হদ্দ, এই যে মন্দিরের ব্যাপারটাই দ্যাখো না, অনেক টাকার কাজ। শহরের কন্ট্রাক্টর মোটা টাকার কোটেশান দিয়েছিল, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এমন সময় মান্দার আবির্ভাব। সে আর তার বউ কুসুম কলকাতা থেকে সেইদিনই গাঁয়ে ফিরেছে। কুসুম দজ্জাল হোক আর যাই হোক, ঠাকুর-দেবতায় খুব ভক্তি। সে এসে হামলে পড়ল, 'বাবু মশাইরা, আমার মিস্তিরিকে একটা চান্স দেন মায়ের কাজ করতি। সব ফিরিতে করে দেবে'খন।' কিন্তু করে দেবে বললেই তো আর হয় না। এ তো সাধারণ ওয়্যারিংয়ের কাজ নয়। বিরাট

ব্যাপার। আধুনিক কেতার কাজ হবে। এই নতুন মন্দিরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হালফ্যাশনের আলো, পাখা ইত্যাদি বসবে। মান্দা হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে সব পারব, আমার কাজ আপনারা দেখে নেবেন। কিন্তু মাঝখানে আর পনেরো দিনও সময় নেই, জিনিসপত্র কিনতে হবে।' তবে, করে যদি দিতে পারে মোটা টাকার ধাক্কা বাঁচবে। তাই সেদিনই জরুরি মিটিং বসল মন্দিরে। মান্দাকে চান্স দেওয়ার ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল সভায়। কলকাতায় লোক গেল মান্দাকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্র কিনতে। অত টাকা নিয়ে তো আর ওকে একা ছাড়া যায় না। তারপর বললে বিশ্বাস করবে না। দিনরাত খেটে পাঁচদিনে কাজটা তুলে দিল মান্দা। দেখে তো সকলের চক্ষু ট্যারা। সামান্য খুচখাচ কাজ অবিশ্যি এখনও বাকি আছে। তা সেগুলো মেলা শেষ হলে করে দেবে বলেছে। ওই তো মান্দা কাজে লেগেই গেছে।" বাইরে থেকে তাকিয়ে সুনন্দ অবশ্য মোহন মিস্তিরিকে দেখতে পেল না। কিন্তু ভেতর থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছিল। সেই সঙ্গে মই টানার শব্দ। সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, "কী করে বুঝলে মোহন মিস্তিরি?"

"সে ছাড়া আবার কে! ওই যে তার জুতো দেখছ না?" বিনয় আঙুলে তুলে নাটমন্ডপের সিঁড়ির তলায় পড়ে থাকা জুতো দেখাল।

মন্দিরের ঢোকার মুখে সুনন্দ দেখল প্ল্যাটফর্ম-মার্কা প্রায় আড়াই ইঞ্চি সোলের ব্র্যান্ড নিউ হাওয়াই। সুনন্দ থমকে গিয়ে কেমন চোখে একটুক্ষণ জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে হল খুশি হয়নি। সে কি তা হলে জীর্ণ এক জোড়া সাধারণ হাওয়াই আশা করেছিল? ভেতরে ঢুকে দেখল এক সলিড চেহারার ঢ্যাঙা লোক কাঠের মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ইন-বিল্ট মাইক্রোফোন ঠিক করছে। নীচে দাঁড়িয়ে এক ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট। বিনয় বলল, "মান্দা, গ্রিলটা ফিট করে দিয়েছ?"

কাঠের সিঁড়ির ওপর থেকে একটা গাঁইয়া মুখ নীচের দিকে তাকাল। "ক-ক-ক-কক্ষোণ। দে-দে-দেখোগে!"

সুনন্দ থামল না। পায়ে পায়ে গ্রিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই সেই গ্রিল, যেটা সেই রাত্তিরে মন্দিরের ঢোকার জন্য খোলা হয়েছিল। স্ক্রুগুলো আবার ঠিকঠাক আঁটা হয়েছে, দেখে মনেও হয় না কখনও খোলা হয়েছিল। কিন্তু আগের মতোই ঠিকঠাক আঁটা হয়েছে তো? কথাটা মনে হতেই হঠাৎ সুনন্দ ভুরু কুঁচকে স্ক্রুগুলোর দিকে তাকাল। তাকিয়ে-তাকিয়ে কী ভাবছিল, খেয়াল করেনি, বিনয় এসে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল। "কী ভাবছিলে?" "কিছু না। চল, যাওয়া যাক।"

ওরা আবার মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। মন্দিরের ভেতরে তখন দর্শনার্থী একটি পরিবার স-কলরবে ঢুকে পড়েছে। মণ্ডপের সিঁড়ির শেষ ধাপে নামতে গিয়ে থমকে

দাঁড়াল। একঝাঁক জুতোর মাঝখানে তার একপাটি জুতো পড়ে আছে, অন্যপাটি উধাও। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো বোধ হয় এখানে হুটোপাটি করে তাদের জুতো-মোজা খুলতে গিয়ে এই জট পাকিয়েছে, না, অন্য পাটিটা খোয়া যায়নি, একটু তফাতে ঘাসের মধ্যে ছিটকে গেছে। জুতোটা নিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়ল সুনন্দ। পেছন ফিরে বসে সুনন্দ কী করছে বুঝতে পারেনি বিনয়। কাছে আসতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল সুনন্দ। বিনয় তাজ্জব! সুনন্দর এক হাতে একপাটি জুতো। কিছু বোঝার আগে বিনয়ের ব্যাগের মধ্যে সেখানা বিদ্যুৎগতিতে ঢুকিয়ে দিয়ে ও বলল, "শিগ্‌গির চল, এখান থেকে পালাই।' বিনয় কিছু বলতে গিয়েছিল, তার আগেই সুনন্দ ওকে টেনে নিয়ে ছুটতে লাগল।

কখন যে ছোঁড়াটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে টের পায়নি। সন্দেহ হতেই রান্নাঘর থেকে বঁটি হাতে বেরিয়ে এল কুসুম, বোধ হয় কুটনো কুটছিল। যে-ঘরে ঢুকেছিল সে, তক্তপোশের তলা থেকে বাক্স-প্যাটরা টেনে বের করে হাঁটকাচ্ছিল। কুসুম চিল-চিৎকার দিয়ে তেড়ে এল, "বলি ইটা হচ্ছে কী!" "গয়নাগুলো খুঁজছি। কোথায় রেখেছ বলে ফেলো না, দিদি?"

কুসুম এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মুখ ফ্যাকাসে। তারপরেই দ্বিগুণ তেজে বঁটি উঁচিয়ে ছুটে এল, "তবে রে মুখপোড়া, দাঁড়া দেখাচ্ছি। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বলেই ছক্কা মারার কায়দায় দু'হাতে বঁটি হাঁকিয়েছিল। কিন্তু ছোঁড়াটা একের নম্বরের সেয়ানা, কাঠবেড়ালির মতো এক লাফে তক্তপোশের ও-পিঠে গিয়ে দাঁড়াল। জিভ ভেংচানোর কায়দায় হাসতে গিয়েছিল, কিন্তু তার ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি যে লোকটা বাড়ি ফিরে আসছে, কে জানত! উলটো দিকের দরজা দিয়ে লোকটা কখন নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে হাতে এক বিকট আকৃতির রামদা, গোরিলার মতো চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে, এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে-আসতে চাপা বাঘ ডাকা গলায় বলল, "শয়তানের বাচ্চা! কেটে টুকরো টুকরো করে আজ তোকে বাগানে পুঁতে ফেলব।"

এ কি সেই লোক! কোথায় গেল এর তোতলামি। সুনন্দ মনে মনে প্রমাদ গুনল। বুঝল, আজ আর তার রক্ষা নেই। এই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে পালানো অসম্ভব, দু'দিকে দু'জন। সে একা, নিরস্ত্র। হাতে একটা খেলনা রিভলবার থাকলেও হত। ধারে কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে প্রথম ধাক্কাটা সামলানো যায়। বিনয়টা এত দেরি করছে কেন, এতক্ষণে তো তার এসে যাওয়ার কথা। তবে কি কারও দেখা পায়নি?

লোকটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। যে কোনও উপায়ে এখন খানিকটা সময়

চাই, যদি তার মধ্যে বিনয়রা এসে যায়, না হলে আজ শেষ। এখন নার্ভ হারালে চলবে না। লোকটাকে ঘাবড়ে অন্যমনস্ক করে দিতে হবে। সুনন্দ হঠাৎই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। শুকনো গলার ভেতর থেকে সেটা কৃত্রিম অট্টহাসির মতো শোনাল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা গর্জে উঠল, "হাসছিস কেন রে ছুঁচো! আজ তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না!"

"অত সোজা না! আমি তোমার নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে ফেলেছি!" "চোপ! কী জেনেছিস তুই?"

সুনন্দ ভেতরে-ভেতরে একটু ভরসা পেল। বলল, "ভট্‌চাজমশাইকে কী করে খুন করেছ?" থত মত খেয়ে লোকটা বলল, "আর"? "গয়নাগুলো কী করেছ, কোথায় লুকিয়েছ?" "চালাকি করছিস! বল, কোথায়? "তুমি খুব ভাল করেই জানো কোথায়!" "তাতে আমার কাঁচকলা! ভয় দেখাচ্ছিস? এখনই তোকে কিমা বানিয়ে বাগানে পুঁতব। কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।" "গাছতলায় তো।" হি হি করে হাসার চেষ্টা করল সুনন্দ। কিন্তু হাসির শব্দ আর গলা দিয়ে বেরোল না, শুধু দাঁত বেরোল। পলকের জন্য অন্যমনস্ক লোকটা যেন চমকে উঠল।

আর ঠিক সেই সময়ই ক্লিক-ক্লিক করে দুটো শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশগানের ঝলক। বিনয় এসে গেছে। শুধু বিনয় নয়, তাদের ক্লাবের দঙ্গল। "এক পা নড়েছ কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব! দা ফেলে দাও।"

চকিতে ফিরে তাকিয়ে সুনন্দ দেখতে পেল বিনয়ের হাতে ক্যামেরা। তার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ একজন বন্দুকের নল উঁচিয়ে আছে। সেই ছোট্ট ভাঙ্গাচোরা বাড়িটা তখন লোকে গিজগিজ করছে।

মোহন আর কুসুমকে অ্যারেস্ট করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে বড়বাবু বললেন, "সুনন্দ, বড়ই প্যাঁচালো রহস্য মনে হচ্ছে ভাই। খুনের কথা, গয়না চুরির কথা ওরা কিন্তু ঝেড়ে অস্বীকার করছে। অলঙ্কারের সন্ধান এখনও আমরা পাইনি। আর খুন, তারও তো কোনও সাক্ষী নেই। ওরা নিজেরা কবুল না করলে মামলা ধোপে টিকবে না। তবে, তোমাকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধেই আমি আপাতত ওদের গ্রেফতার করেছি।"

সুনন্দ বলল, "স্যার, প্যাঁচালো কেস তো বটেই, সেটা আমি এখনই আপনাদের দেখাব। আমার প্রথম ক্লু পাই প্যাসেজের জুতোর ছাপ থেকে। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি ওটা রহস্যের ক্লু নয় স্ক্রু।" বলেই বিনয়ের ঝোলার ভেতর থেকে একপাটি হাওয়াই বের করে দেখাল, "এই দেখুন।"

বড়বাবু ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন গোড়ালির পুরু, নরম সোলের মধ্যে

ইঞ্চি-দেড়েক লম্বা একটা গর্ত। তার ভেতরে কিছু যেন চকচক করছে। সুনন্দ খুঁচিয়ে তার ভেতর থেকে একটা চকচকে নতুন স্ক্রু বের করে দেখিয়ে বলল, "এই আমার ক্লু, মানে স্ক্রু। এর গায়ে প্যাঁচ যখন আছে, তখন প্যাঁচালোই বলতে পারি। মোহন অন্নকূটের আগের রাত অবধি মন্দিরে ইলেকট্রিকের কাজ করার সময় এক ফাঁকে গ্রিলের স্ক্রুগুলো ঢিলে করে রেখেছিল। পরের রাতে সে বাইরে থেকেই গ্রিলটা খুলে নেয়। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, এই স্ক্রুটা কখন যে গ্রিল থেকে খসে প্যাসেজে পড়ে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি। ও ভেতরে ঢুকে যখন অলঙ্কার আর টাকাকড়ির বোঁচকা বেঁধে ফেলেছে, সেই সময় ভট্‌চাজমশাই তাকে কেবল দেখেই ফেলেন না, চিনেও ফেলেন। ফলে..." বলেই এগিয়ে গিয়ে ঘরের তাক থেকে ফুটখানেক লম্বা একটা মজবুত স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এল, "এই যন্তরটিই তাঁর বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করা হল। ফরেনসিকে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করালে এতে রক্তের দাগ ধরা পড়বে। মোহন আপনার কথামতো গ্রিলটা আবার আটকে দিয়েছে। ভাল করে নজর করলেই দেখতে পাবেন দশটির মধ্যে ন'টি স্ক্রু-ই ঝকঝকে নতুন, কিন্তু একটি স্ক্রু ওদের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, রং আলাদা। বোধ হয় বেশ কিছুদিনের পুরনো। এটি মোহন অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করে এনেছিল। সুতরাং এটা তার অপরাধ প্রমাণের আর-একটি ক্লু! খোয়ানো স্ক্রুটা যে জানলার ধাপ থেকে নীচে নামবার সময় বাঁ পায়ের চটির সোলের মধ্যে শায়িত অবস্থায় গেঁথে গিয়েছে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আমিও না, ভেবেছিলাম ওই ছাপ-না-ওঠা জায়গাটা বোধ হয় কোনও পুরনো চপ্পলের ক্ষয়াটে গর্ত। তিন নম্বর হচ্ছে মায়ের অলঙ্কার। সেগুলো কোথায় আছে আমি জানি। অনেকদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রী তক্কে-তক্কে ছিল। এবার সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতা থেকে আগেভাগে গাঁয়ে এসে জুটেছিল। মন্দিরের কাজটা ছিল। তবে মোহন গুণী লোক, কাজ জানে, আর অভিনয়ও জানে। কিন্তু বারবার বাগানে পুঁতে ফেলতে বলে আমাকে শাসিয়েই ভুল করেছিল। আমি একটু আগে জায়গাটা খুঁজে বের করেছি।" বড়বাবু বললেন, "আমার মনে হয়, কলকাতা পুলিশের রেকর্ড খুঁজলে হয়তো দাগী আসামির তালিকায় মোহনের নামটা আমরা পেয়ে যেতে পারি।"

অলৌকিক আখড়া রহস্য

অদ্রীশ বর্ধন

ইন্দ্রনাথকে ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য জমিয়ে আড্ডামারা। ও বড্ড একলা থাকে। সঙ্গ দেওয়া দরকার। আমারও দরকার সুভাষ সরোবরে টাটকা হাওয়া।

টেলিফোনের ঘন্টা বাজল। তারপরেই শুনলাম ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ঃ

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....

খুট করে কেটে গেল লাইন। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রনাথের গলা চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু এরকম বিদঘুটে রসিকতাও আশা করিনি।

আবার ডায়াল করলাম। আবার সেই একঘেয়ে বয়ানের গা-জ্বালানো পুনরাবৃত্তি ঃ

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....

এবারও লাইন কেটে যেতে রিসিভার রেখে দিয়ে বললাম, "শুনছ?"

কবিতা বললে, "কী?"

"ইন্দ্রনাথের এই নতুন মজাটা একদম ভাল লাগছে না।"

"কী মজা?" ঝুঁকে বসল কবিতা। গোয়েন্দা ইন্দ্রঠাকুরপোর নাম শুনলেই রাজ্যের কৌতূহল জড়ো হয়, কবিতার চোখেমুখে। গোয়েন্দা ইন্ডিয়ান পোকা যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে এই কবিতা, আমার বউ।

"যতবার ফোন করছি, ততবার 'নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব' বলে লাইন কেটে দিচ্ছে।"

হেসে ফেলল কবিতা। ওর সেই মার্কামারা হাসি। যে-হাসি রাজরানিরা হাসে। হেসে কুটিপাটি হয়ে বললে, "তোমার মাথায় গোবর আছে। বাস করছ ইলেকট্রনিক যুগে। ইলেকট্রনিক ঠাট্টা-মজার খবর রাখ না?"

"ইলেকট্রনিক মজা!"

"ইন্দ্রঠাকুরপো একলা থাকে তো। যখন থাকে না, তখন টেলিফোন ধরবে কে? তাই ইলেকট্রনিক যন্তর বসিয়েছে। সেই যন্তরেই নিজের গলা রেকর্ড করে গেছে। জানো তো আজ শনিবার, তুমি ফোন করবে, তাই মজা করছে।"

রেগেমেগে বললাম, "কলেজ লাইফ থেকে ওর এই সৃষ্টিছাড়া মজার ঠেলায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। এই জন্যই ওর কিচ্ছু হল না।"

"সত্যিই কি হয়নি?" বলে আর-একদফা হাসি হাসল কবিতা। এ-হাসিটা বিদ্রুপের হাসি কি না ঠিক ধরতে পারলাম না।

ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক

আমরা এখন বেলেঘাটায়। গাড়ি থেকে নামবার আগেই দেখে নিয়েছি ইন্দ্রনাথের একতলার ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে বন্ধুবর নস্যি নিয়ে ফিরেছে।

গেট খুলতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি, 'এসেছে, এসেছে, ডিটেকটিভ গল্পের খদ্দেররা এসে গেছে।"

এবার কিন্তু রেগে গেল কবিতা নিজেই। তেড়েমেড়ে দাওয়ায় উঠে দরজায় ঠেলা দিয়েই অবশ্য থমকে গেল চক্ষের নিমেষে।

ঘরের সোফায় বসে পাশাপাশি দুটি মূর্তি। একটা মূর্তিকে আমরা হাড়ে-হাড়ে চিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এখন তার গায়ে রক্ত রঙের চাদর, পরনে লাল টকটকে ধুতি, কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ। কাপালিক-কাপালিক চেহারা। মৌজ করে নস্যি নিচ্ছে, আর সকৌতুকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তার পাশের মূর্তিটা যে সত্যি-সত্যি কাপালিক! গালে কালো কুচকুচে দাড়িগোঁফের আফ্রিকান জঙ্গল, লম্বা বাবরি চুলে চিরুনির পাট নেই, গলায় রক্তজবা

আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে-বুকে-কণ্ঠায় রক্তচন্দনের মাখামাখি, চোখ দুটো আগুনের গুলির মত ধকধকে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল কবিতা। ভড়কে গেছিলাম আমিও। তাই দেখে অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। এঁকে দেখে ভিরমি খাওয়ার দরকার নেই। এঁর চেহারাটা বিকট হতে পারে, মানুষটা অপরূপ, বিশেষ করে এঁর সাধনা।" এই পর্যন্ত বলেই বিকট কাপালিকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "বলুন না মশাই, আপনার নামটা বলুন।"

কাপালিক ভদ্রলোকের হাইট ইন্দ্রনাথের চেয়ে ইঞ্চিকয়েক বেশি। মানুষ-দৈত্য বললেই চলে। ইন্দ্রনাথের গুঁতো খেয়ে তিনি কিন্তু একটু হেলে পড়লেন। বন্ধুবরের নস্যির ডিবেটা দেখলাম তাঁর বাঁ হাতে। ডান হাতের দু' আঙুলে করে বেশ খানিকটা তামাকু-চূর্ণ নাসিকা-গহ্বরে ঠেসে দিয়ে নাকের ডগা মুছতে-মুছতে বললেন, "আমার নাম নাদাচার্য।"

চমকে উঠলাম গলার আওয়াজ শুনে। দৈত্য-বপুর গলা থেকে স্টিরিও-আওয়াজ বেরোবে ভেবেছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে উলটো।

বাচ্চা ছেলের মতো কচি গলায় কথা বলছেন নাদাচার্য। এবং বিলক্ষণ আধো-আধো গলায়।

আমার আর কবিতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চয় করুণা হল নাদাচার্য কাপালিকের। তিনি বললেন ইন্দ্রনাথকে, "দেখলেন তো, আমার গলা শুনেই কীরকম হয়ে গেলেন। স্রেফ এই জন্যই আমি কথা বলতে চাই না। কেন যে মা-তারা আমার গলাটাকে পাকিয়ে তুললেন না।"

কবিতা আমার হাত ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাশাপাশি বসলাম আর-একটা সোফায়। বললে কাষ্ঠহেসে, "সবার গলা কি মোটা হয়?"

আগুনচোখ মেলে নাদাচার্য আধো-আধো সরু গলায় বললেন, "না হোক, পুরুষালি গলা হতে ক্ষতি কী ছিল। তারা, তারা ব্রহ্মময়ী! হাজার হলেও আমি তো তান্ত্রিক।"

"বস্তাপচা শস্তা তান্ত্রিক অবশ্য নন"—পাশ থেকে বলে উঠল ইন্দ্রনাথ, "রীতিমত ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক।"

সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। বিশেষ করে নাদাচার্য মশাইয়ের হাসিটা শুনে। এত মিষ্টি, এত সুরেলা হাসি কচিকাঁচারাই শুধু হাসতে পারে।

কিন্তু ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক! সেটা কী বস্তু?

আমাদের মানে আমার আর কবিতার মনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মনের একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। মুখ খোলার আগেই ও বুঝে নেয়। এখনও বুঝল,

একা বসে থাকতে হয়। ক'টা দিন যা বিশ্রী লাগলো, তা আর কি বলবো। সেদিন রাত্তিরে এসে সে বললো, বন্ধু, এই অপরূপ বস্তুটি কি বলো তো? দেখলাম একটি বিবর্ণ পেয়ারা পাতা। এমনি একটি পাতা সে রামলালের বইয়ের ভেতর আবিষ্কার করেছিলো। সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি এই পাতা। কে জানতো এই পাতাই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করবে। এই বলেই সে এস. পি. কে ফোন করলো। বললো, আজ দয়া করে এ্যারেস্ট পার্টি রেডি রাখবেন। সেই সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট। তবে রামলালকে হয়তো জীবিত নাও পাওয়া যেতে পারে। মানে?

ঃ সাক্ষাতে বলবো। কিন্তু সব গোপন রাখবেন। আমিরআলিকেও কিছু জানাবেন না। হিম্মতসিংকা তাঁর পুরোনো কর্মচারীর চাকরি খেয়েছিলেন কেন তাও জানতে পেরেছি—লোকটার কোকেনের নেশা ছিলো। শুধু তাই নয়, ও বাড়ির চাকর ও দারোয়ানদেরও এ নেশা ধরিয়েছিলো। হরলালজি বলেছেন বুঝি? ঃ মোটেই না। জানতে পেরেছি খুব সহজে। ওদের দারোয়ান চাকর সকলের চোখই দেখলাম করমচার মতো লাল। বুঝলাম ওরা নেশা করে। তারপর চেপে ধরতেই স্বীকার করে ফেললো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এস. পি. সাব। আবার দেখা হবে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো সুজিত। আমাকে এখনও বলেনি, কে হত্যাকারী। অথচ আমি কি অধীর আগ্রহেই না অপেক্ষা করছি। হিম্মতসিংকার ঘরে সুবচন মিশ্র, হিম্মতসিংকা, তাঁর স্ত্রী, এস. পি., ও. সি. আমির আলি, সাদা পোশাকের আরো ক'জন অফিসার ও আমি বসে বসে সুজিতের কাহিনী শুনছি। সুজিত বলে চলেছে, দেখুন, রহস্য উদ্ধারের কাজে অতি সামান্য একটি পাতাও বড় সূত্র হতে পারে। এটি একটি পেয়ারার পাতা। রামলালের বইয়ের ভেতর থেকে পাওয়া গেছে। এইরকম আরো কিছু পাতা এই ঘরে পেয়েছি। এতে মনে হয়েছে রামলাল পেয়ারা খেতে ভালোবাসতো। এ বাড়িতে পেয়ারা কোনোদিন আসতো না, কারণ হরলালবাবু শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথকে পেয়ারা দিয়েছেন। শাস্ত্রমতো সে ফল তাঁর খাওয়া নিষিদ্ধ। এ কথা আমি পরে জিজ্ঞেস করে জানি। তাহলে রামলাল কোথা থেকে পেয়ারা পেতো? উত্তর খুবই সোজা। পাশে সুবচন মিশ্রর বাগান থেকে। প্রাচীর ডিঙিয়ে সে মাঝে মাঝে গিয়ে পেয়ারা ছিঁড়ে আনতো। ঘটনার দিন দুপুরে সে যায় এভাবে পেয়ারা আনতে। এ বাড়ির দারোয়ান ও চাকররা কোকেনের নেশায় মশগুল তাই তারা দেখতে পায় না। রামলাল পেয়ারা পাড়তে গিয়ে সুবচন মিশ্রের মুখোমুখি পড়ে যায়। সুজিতের কথা শেষ হতে না হতে সুবচন মিশ্র চিৎকার করে ওঠে ঃ মিথ্যা কথা। আমি সেদিন বিকেলে ফিরেছি। আমি কিছুই জানি না। সুজিত বলে, চেঁচাবেন না, আপনি যে সেদিন আপনার মোগলসরাই-এর বাগানে যাননি সে খবর আমি নিয়েছি। তারপর আপনারা শুনুন। সুবচন মিশ্র রামলালকে দেখে ভুলিয়ে

তাঁর বাড়ি নিয়ে যান। তারপর তার হাত-পা বেঁধে তাকে ছাদের চিলকোঠায় বন্ধ করে রাখেন। বিলকুল ঝুট! চেঁচিয়ে ওঠেন সুবচন মিশ্র। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। ভ্রূক্ষেপ না করে বলে সুজিত, ক'দিন আগে সুবচন মিশ্রর বাড়ি গিয়ে ছাদে ওঠার সময় চিলেকোঠাটা দেখে আমার সন্দেহ হয়। কিন্তু আমার সবচেয়ে সন্দেহ হয়েছিলো সেদিন হনুমানঘাটে অপহরণকারীরা না আসায়। পুলিশকে জানানোর জন্যই যে তারা আসেনি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুলিশকে যে জানানো হয়েছে, একথা সুবচন মিশ্র ছাড়া কেউ জানতো না। দ্বিতীয়ত রামলালের অপহরণকারীরা যে বাইরে থেকে আসেনি তার প্রমাণ গেটে যেমন তেমনি তালা বন্ধ ছিলো। এস. পি. সাব, আপনি মিঃ হিম্মতসিংকার প্রাণের বন্ধু সুবচন মিশ্রকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় ওঁর টাকার অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে। নির্জন দুপুরে একা বন্ধুপুত্রকে পেয়ে তিনি লোভ সামলাতে পারেননি। দশ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য টাকাটা পেলেও বন্ধু পুত্রকে তিনি ফেরত দিতেন না। কারণ তাহলে....হঠাৎ হরলাল পাগলের মতো গিয়ে সুবচন মিশ্রের কলার চেপে ধরলেন—শয়তান, তুমি আমার বন্ধু হয়ে....সুজিত বললো, বন্ধু বলেই উনি পুলিশের সব সন্দেহ থেকে এতোদিন নিষ্কৃতি পেয়েছেন। রামলালকে উদ্ধার করা গেলো। তবে জীবিত নয়, মৃত। তাকে হত্যা করে একটি পেয়ারা গাছের নিচে কবর দেওয়া হয়েছিলো।

গোঁফ রহস্যের গোয়েন্দা রণি

সুনীল দাশ

রণি যখন অষ্টম শ্রেণীতে উঠল, তখন ছবি আঁকাতেও সে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। সারা ভারত বসে আঁকো এক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সে পেল মজার এক পুরস্কার। কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়া আসার টিকিট। টিকিটের বদলে টাকাও নিতে পারে। কিন্তু রণির পক্ষে টিকিট নেওয়ার তখন একটি সুযোগ ঘটে গেল। রণির বড় মামা চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছিলেন বার্মিংহামে রণির জ্যাঠামণির কাছে, বিলেতে ডাক্তার হিসেবে জ্যাঠামণির পসার অনেকদিনের। ঠিক হল পুরস্কারের টিকিট নিয়ে রণি যাবে বড়মামার সঙ্গে জ্যাঠামণির ওখানে। পুজোর ছুটি কাটাবে বিদেশেই। এক মাস পরে জ্যাঠামণির একবার দেশে আসবার কথা। রণি দেশে ফিরবে তার সঙ্গে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতাটা হয়েছিল এক বিমান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। তাদের সহযোগিতায় বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলতে অসুবিধে

হল না। রণির এক খুড়তুতো দাদা রঞ্জুদাও ও ব্যাপারে সাহায্য করল খুব। আকাশে ওড়ার ক'দিন আগে থেকে রণি তো ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। ভারতের বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, এর আগে রণি কোনদিন প্লেনেই চড়েনি। প্রথমে কলকাতা থেকে বড়মামার সঙ্গে বম্বে উড়ে আসতে হলো রণিকে। বড়মামার অফিসের কি যেন একটা ব্যাপার ছিল বম্বেতে। সারাদিন বম্বেতে কাটিয়ে সেখান থেকে আবার অন্য প্লেনে। পুলিশী তল্লাসের জন্য অনেকটা সময় গেল বম্বের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে। এমনিতেই তো প্লেনটার টেক অফের সময়টাই বিদ্ঘুটে। রাত তিনটে নাগাদ। বাড়তি সময় লেগে গেল আরো ঘণ্টা খানেক ওই এয়ারপোর্টে বসে বসেই। যাকে বলে আর কি পুরোদস্তুর তল্লাশি। প্রতিটি বাক্স-প্যাঁটরা হাতড়ে, যাত্রী এবং তাদের মালপত্তর আতিপাতি করে খোঁজার পর তবে বম্বের মাটি ছাড়ল বোয়িং প্লেনটা। অন্ধকারে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল ডানাওয়ালা বিশাল একটা মাছের মত প্লেনটা। প্লেনের ভেতরে বড়মামা আর রণি যেখানে পাশাপাশি দুটো আসনে বসে আছে তার থেকে খানিকটা দূরে দেওয়ালে টাঙানো পর্দায় রঙিন ছবি দেখানো হচ্ছিল। হেডফোনের মত যন্ত্রটা কানে লাগালেই ওই ছবির শব্দ এবং কথা শোনা যাবে।

রণি ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখে বুঝল, বেশির ভাগ যাত্রীই বেশ চটপট ঘুমিয়ে পড়ল। কানে হেডফোন লাগিয়ে ফিল্ম দেখছে এমন যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। দূর পাল্লার ট্রেনে চাপলে গভীর রাতে যেরকম লাগে,—এ তার থেকে আলাদা। বিমান এখন অনেক উঁচু আকাশে চলে এসেছে। সেফ্‌টি বেল্ট আঁটো করে এখন আর আসনের সঙ্গে চেপে বসে থাকার দরকার নেই। বড় মামাও ঘুমিয়ে পড়লেন পেছনে হেলান দিয়ে। রণি আবার ওভাবে ঘুমোতে পারে না। বড়মামা অবশ্যি বলে দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে মণি পেছন দিককার ফাঁকা আসনগুলোতে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারে কিছুটা সময়। প্লেনের মাঝখানকার আসনগুলোর এই সুবিধে আছে। আসনের হাতগুলো নামিয়ে দিব্যি ডিভানের মতো করে নেওয়া যায়। কিন্তু প্লেনের দু'ধারের জানলা বরাবর যে দুটো করে আসন আছে তাতে ওইরকম ব্যবস্থা নেই। রণিদের আসন দুটো ডানপাশের জানলার ধারে। খানিকক্ষণ পরে রণি তার আসন ছেড়ে উঠে গেল পেছনের ফাঁকা আসনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার জন্যে। প্লেনের পেছনের দিকেই টয়লেট। রণির একবার টয়লেটে যাবার দরকার। আর টয়লেটে গিয়েই একটা তাজ্জব ব্যাপার লক্ষ্য করল সে। আশপাশের সমস্ত যাত্রী তখন ঘুমে বেহুঁস। শুধু একজনকে দেখা গেল টয়লেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রণি দেখে নিয়েছে মাঝবয়সী বেঁটে গোছের যাত্রী একজন। তাগড়াই গোঁফ আছে লোকটার। রণি অপেক্ষা করতে থাকল। গোঁফওয়ালা লোকটা বেরিয়ে আসলে সে

যাবে। কিছুক্ষণ পরে লোকটা টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে রণির সামনে দিয়েই নিজের আসনে ফিরে গেল। তখন রণি লোকটার মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল, আর লোকটার তাগড়াই গোঁফটা গেল কোথায়? কামিয়ে ফেলল নাকি? টয়লেটে ঢুকে রণি আরো বেশি অবাক। বেসিনের পাশে একজোড়া গোঁফ! কি ব্যাপার! বেঁটে ওই যাত্রীটি তাহলে নকল গোঁফ পরে? বহুদিন ধরে নিশ্চয় পরে না, বোঝা যাচ্ছে নতুন পরা আরম্ভ করেছে। তা নাহ'লে এভাবে ভুলে যায় কেন? এছাড়া লোকটি মনে মনে নিশ্চয় খুব উত্তেজনায় আছে—যার জন্যে নিজের নকল গোঁফটা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। কিন্তু লোকটা নকল গোঁফ পরে কেন? চোরাকারবারী? নিজের আসল চেহারাটা লুকোতে চাইছে বোঝা যাচ্ছে। কেন? কার কাছ থেকে লুকোতে চাইছে? তার মানে এই ছদ্মবেশে লোকটা কি সিকিউরিটির চোখেও ধুলো দিয়ে এসেছে? রহস্যের আভাস পেয়ে রণির বুকের মধ্যে উত্তেজনা লাফাতে শুরু করল। কিন্তু উত্তেজনা মানুষের সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। রণি তাই নিজেকে স্থির, ঠান্ডা রাখতে চাইল। হ্যাঁ, যাত্রীটি ভুল করে গোঁফজোড়া ফেলে গেছে যখন, তখন এক্ষুনি খেয়াল হলেই ফিরে আসবে টয়লেটে।

রণি আর একটুও দেরী না করে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে পেছনদিককার যে আসনটাতে হাতল নামিয়ে সে শোবার ব্যবস্থা করবে ভেবেছিল সেখানে গিয়ে ঘুমোনোর ভান করে পড়ে রইল। যাত্রীদের ভাল করে যাতে ঘুম হয় তার জন্যে ভেতরের বড় আলোগুলো অনেক আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হালকা আলো চড়ানো। তার মধ্যে প্রায় সকলেই ঘুমে ডুবে আছে। ভাল করে লক্ষ্য না করলে কে কোথায় আছে চট্ করে বোঝা যায় না। রণিকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নিজের আসন ফিরে গিয়েই সম্ভবত বেঁটে লোকটির তার নকল গোঁফের কথা খেয়াল হয়েছে। মুখে রুমাল ঘষতে ঘষতে লোকটি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে টয়লেটের দিকে। রণি চোখ বন্ধ করে যেন খুব ঘুমোচ্ছে—এমনভাবে শুয়ে থাকল। একটু পরে লোকটি আবার যখন বেরিয়ে এল টয়লেটের দরজা খুলে রণি লুকিয়ে দেখে নিল, এবার লোকটির মুখে সেই নকল গোঁফ জোড়া বসানো। বেঁটে লোকটি এবার যখন রণির আসনের পাশ দিয়ে চলে গেল, রণির মনে হল লোকটার মাথার চুলটাও নকল। নকল হয়তো ওর মোটা ফ্রেমের চশমাটাও। আরে! লোকটা তো রণি আর বড় মামার বসার আসনটার খুব কাছাকাছি বসেছে। দুটো রো আগে। রণির মনে নানা রকমের চিন্তা চলতে থাকল। এই ক্লাস এইটে উঠতে উঠতে রণি তো কম রহস্যসন্ধানের বই পড়েনি। এতকাল সে বাংলা বইই পড়েছে, ইদানিং ছোটখাটো ইংরেজি বই পড়াও রপ্ত করেছে। দুটো ব্যাপার ছবি আঁকা আর গল্পের বই পড়া, রণির আর সব বন্ধুবান্ধবদের তুলনায় এগিয়ে। বাবা ঠিকই বলেন ছবি

আঁকা এবং নানা বিষয়ে বই পড়ার মধ্যে দিয়ে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং অনুমান করার ক্ষমতা যেমন বাড়ে তেমন আর অন্য কিছুতে হয় না। হরেক রকমের বই পড়ে রণির এখন যেরকম জ্ঞান হয়েছে তাতে অসৎ দুবৃত্তরা তাকে চট করে ঠকাতে পারবে না। এরই মধ্যে মানুষের মুখ দেখে সে আঁচ করতে শিখেছে মানুষটা অপরাধী কি না। এই বেঁটে মোটা নকল গোঁফ জোড়ার লোকটা যে মোটেই সৎ নয় এ ব্যাপারে রণি নিঃসন্দেহ। না, এখন আর ঘুমানো অসম্ভব। বরং রণি যতই ওই নকল গোঁফের কথা চিন্তা করছে, ততই অস্থির হয়ে উঠছে তার ভেতরটা। চুপচাপ শুয়ে থাকলেও মাঝে মধ্যে একটু আধটু মুখ তুলে বেঁটে লোকটা কি করছে না দেখে সে থাকতে পারছে না। হঠাৎ দেখা গেল, লোকটা নিজের আসনে ছেড়ে উঠে পড়েছে আবার! এদিকেই আসছে ফের! আবার কি ও টয়লেটে ঢুকবে? নতুন করে কি আবার মেক আপ নেওয়ার মতলব করছে নাকি? কি উদ্দেশ্য? না, এবার আর বেঁটে গুঁফো লোকটি প্লেনের পেছনদিকটায় শেষ পর্যন্ত গেল না। রণির কাছটা পর্যন্তও এগোল না। রণি যে আসনে শুয়ে আছে ঠিক তার আগের রোতে এসে বসে পড়ল লোকটি। ওই রো-টাও ফাঁকা। একটাও যাত্রী নেই। লোকটি কি মতলবে এখানে এসে বসল রণি ধরতে পারল না। ঘুমোবে নাকি? একমুখ নকল সাজ আর একমাথা বদমাইশি বুদ্ধি নিয়ে কি কোন মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে? নিশ্চয়ই ওর অন্য কোন রকমের মতলব আছে।

মতলব যে আছে বোঝা গেল অল্প পরেই। প্লেনের আর এক পাশ থেকে অন্য আরেকটা লোক এসে বসে পড়ল ওই লোকটার পাশে। বোঝা গেল পরিকল্পনামাফিকই এসে বসেছে ওরা দুইজনই। পাশাপাশি বসার পর চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে, মোটামুটি সকলেই ঘুমোচ্ছে বুঝে নিয়ে, বেশ নামানো গলায়, হিন্দিতে কথা শুরু করেছিল। যদিও দু'জনের কথা হচ্ছিল ফিসফাস করে যতোটা সম্ভব নামানো গলায়, তবু কান খাড়া রেখে রনি ধরতে পারছিল কি বলছে লোকদুটো। এদের দু'জনের কথা বাংলা করলে দাঁড়ায় এইরকম—'যাক—মিস্টার তালোয়ার আমায় কোনরকম সন্দেহ করেননি তো?' 'একেবারেই না। আরে ভাই, আমি নেহাৎ তোমার মেক আপের ব্যাপারটা জানি তাই, না হলে আমি পর্যন্ত ধরতে পারতাম না। মেক্ আপটা এমন টেরিফিক হয়েছে ভাই, ভাবা যায় না।' 'এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা হাসিল হলে হয়।' তারপরেই শুরু—একদম রাজা।' 'হ্যাঁ—একেবারে ফিফটি ফিফটি।' তারপরের কথাগুলো হলো আরো নিচুগলায়। এত নিচু গলায় যে রনি একেবারে তা ধরতেই পারল না। শুধু যাবার আগে দ্বিতীয় লোকটি বলে গেল, 'তা'হলে এয়ারপোর্টে নেমে প্রথম টার্নিং ছেড়ে, দ্বিতীয় টার্নিংয়ে।' 'হ্যাঁ, দ্বিতীয় টার্নিংয়ে পড়লেই—' দ্বিতীয় লোকটি এবার খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'তোমার হাতের

নিশানা নির্ভুল! একটার বেশি দুটো গুলি করতে হবে না।' রণি চমকে উঠল। সর্বনাশ! নকল গোঁফ লোকটা তাহলে একেবারে পেশাদার খুনি যাকে বলে। মিস্টার তালোয়ার নামে যে যাত্রীকে এরা খুন করতে চাইছে তিনি তার মানে ওই বেঁটে নকল গোঁফের লোকটাকে চেনেন। দ্বিতীয়জনকে মিস্টার তালোয়ার চেনেন কি চেনেন না বোঝা গেল না। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে মিস্টার তালোয়ার কোন জন? প্লেন একেবারে বোঝাই নয়। অনেক আসন ফাঁকা যাচ্ছে। সুতরাং যাত্রীর ভিড় তেমন নেই অর্থাৎ যাত্রীদের মধ্যে থেকে মিস্টার তালোয়ারকে খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তবে মিস্টার তালোয়ার রণিদের মত ইকনমি ক্লাসের যাত্রী কি? না ফার্স্ট ক্লাসের? যে ক্লাসের হোন, তিনি খুন হতে যাচ্ছে। তিনি এয়ারপোর্টে নামার পর যখন গাড়ি নিয়ে, (নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে) দ্বিতীয় বাঁকে পৌঁছবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে হত্যা করার ব্যবস্থা পাকা। এটা জানার পর, একেবারে নিজের কানে শোনার পর কি ভীরু বালকের মতো চুপচাপ বসে থাকা যায়! রণি যে সে ধাঁচেরই ছেলে নয়। এক্ষুনি খুঁজে বার করতে হবে মিস্টার তালোয়ারকে, ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে হবে কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে তার জীবন নিয়ে। লোকদুটো সামনের আসন থেকে সরে গেলেই রণি আগে চলে যাবে বড়মামার পাশের আসনে। ভাবতে ভাবতে রণি শব্দ না করে আসনের মধ্যে উঠে বসল। ওই লোকদুটোও চলে যাবার জন্য উঠে পড়েছে ততক্ষণে। চলেও যাচ্ছিল! কিন্তু দুর্ভাগ্য রণির। কি মনে হওয়ায় নকল গোঁফের লোকটা এক পা পিছিয়ে আচমকা রণির আসনের কাছে চলে এল এবং একপলকে রণি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পাশে বসে পড়ল। বসে পড়ল দ্বিতীয় লোকটিও। প্লেনের এই শেষের দিকটা প্রথম থেকে ফাঁকাই আছে খুব। দূরে জানালার ধার ঘেঁষে যে সব যাত্রীরা আছে তারা কেউ জেগে নেই। হালকা আবছা আলোর মধ্যে দুটো খুনি লোক রণির পাশে বসে তাকে চাপা গলায় এই মুহূর্তে কি বলছে কারো লক্ষ্য করার কথা না। এয়ারলাইন্সের লোকজনও এখন আর প্যাসেজটা দিয়ে যাতায়াত করছে না, যে তাদের কারো চোখে পড়বে এদিকে। রণি প্রমাদ গুনল। নকল গোঁফের লোকটা রনির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "আড়ি পেতে শুনছিলিস আমাদের কথা বিচ্ছু ছেলে?"

লোকটা প্রশ্ন করল চোস্ত হিন্দিতেই। লোকটার মুখের দিকে তাকানো মাত্র রণির মনে পড়ল ঠিক এই রকম একটা শয়তানী মুখ সে ক'দিন আগে টিভির একটা ফিল্মে দেখেছিল। সেই ফিল্মটার নায়ক নায়িকা দু'জনেই ছিল বোবা আর কালা। শয়তান মানুষটার চোস্ত হিন্দিতে বলা প্রশ্নটা শুনতে শুনতে রণি একবার ভাবল সে একেবারে বোকা বোকা ভাব করে সাদা বাংলায় বলবে, হিন্দিকথা আমি একেবারেই

বুঝি না। তুমি কি প্রশ্ন করছো বুঝতে পারছি না। কিন্তু উত্তর দেবার সময় বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো একটা কায়দা তার মাথার মধ্যে এলো আর ভেতরে ভেতরে অনেকটা যেন মজা উপভোগ করতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বোবা-কালার মুকাভিনয় করে বসল। প্রথম থেকেই সে লোকটার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না। লোকটি দ্বিতীয়বার, আগের বারের মতোই খুব চাপা অথচ আরো কড়া গলায় প্রশ্নটা উচ্চারণ করল। বোবা কালা লোকেরা কোনো কথা শুনতে না পেরে না বুঝতে পেরে হাতের ইশারায় যেরকম করে বোঝানোর চেষ্টা করে সেইরকম হাবভাব করল রণি। বলতে হবে, এটা এক রকমের দুষ্টবুদ্ধিই। রণির মাথায় মাঝে মধ্যে দুমদাম এ রকম দুষ্টুবুদ্ধি চলে আসে। রণি ইশারায় জানাল সে কানে শোনে না, কথাও বলতে পারে না। সুতরাং লোকটার প্রশ্ন শোনা এবং উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটা রণির কথা খুব বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না। তবে রণি নিজেই বুঝতে পারছিল বোকাকালার অভিনয়টা সে দারুণ করে ফেলেছে। যাই হোক, সেই মুহূর্তে খুনি লোক দুটো রণিকে আর বিশেষ ঘাঁটালো না, শুধু নকল গোঁফের লোকটা চাপা কর্কশ গলায় বলে গেল, 'আমাদের কথা কাউকে যদি বল, এখানেই খতম হয়ে যাবে।' লোকটি মুখেই শুধু বলল না। খানিকটা ইঙ্গিতেও দেখাল। আর তাতেই রণি বুঝতে পারল লোকটা রণির কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করেনি। দু'জন খুনির একজন অর্থাৎ নকল গোঁফের সেই লোকটি আগের মতো ইকনমি ক্লাসেই তার নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল আর দ্বিতীয় লোকটি চলে গেল সামনের দিকে ফার্স্ট ক্লাসে। রণি বুঝতে পারল নকল গোঁফের লোকটি আড় চোখে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সেও আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ল বড়মামার পাশের আসনটিতে। এখন কি ভাবে বাঁচাবে মিস্টার তালোয়ারকে? আর আগে তার নিজেকে বাঁচাতে হবে! সে যে ঠিক কথা বলেনি, লোক দুটি যেন কোনক্রমেই তা টের না পায়। এখন বড়মামা ঘুমোচ্ছে। বড় মামাকে বলতে হবে রণি এখন বোবা কালার অভিনয় করবে একটা মজার জন্যে। কি মজা—সেটা অবশ্যি রণি পরে জানাবে। রণিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে আচমকা তার ব্যবহারে কিছুতেই যেন এমন কিছু প্রকাশ হয়ে না পড়ে যাতে তার বোবা কালার ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। পরমুহূর্তে মনে হল, মজার জন্য বললে বড় মামা হয়তো গুরুত্বই দেবে না। তার চেয়ে বড় মামাকে সব খুলে বলাই ভাল! কিন্তু খুলে বললে উনি আবার ভয় পেয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলবেন না তো! এখন উনি ঘুমোচ্ছেন, আরো বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোবেন! যতক্ষণ না উঠছেন ততক্ষণ কোন চিন্তা নেই। ততক্ষণ বরং রণি মিস্টার তালোয়ারের জীবনটা কিভাবে বাঁচাবে ভাবতে পারে। দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে

গেল। রণিরও তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। বেল্ট আঁটো করার নির্দেশ দেওয়ার ঘোষণায় তন্দ্রাটা কেটে গেল। বড় মামাও চোখ খুললেন। কোন কথা না বলে সীটবেল্ট এঁটে আবার ঘুমোতে লাগলেন। এয়ার ক্রাফট এখন নামছে রোমের বিমান বন্দরে। রোমের বিমান বন্দরের নাম লিওনার্দো। ইতালির সেই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নামে। রঞ্জুদার ঘরে 'মোনালিসা' ছবির প্রিন্ট আছে একখানা। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা সেই বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'মোনালিসা'। একদিকে যেমন বড় শিল্পী তিনি আবার উড়োজাহাজের পরিকল্পকও। ওঁর মত প্রতিভার নামে বিমানবন্দরের নাম রাখার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?

বিমানবন্দরে নামা কিংবা ওঠাটা বাদ দিলে রাতের বেলায় প্লেনে চড়ায় সত্যি ভ্রমণের কোন মজা নেই। শুধু অশেষ অন্ধকারে শূন্যের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাওয়া। সকালবেলাকার অভিজ্ঞতাটা অন্য রকম। রোমে এখন সকাল হয়েছে। কুয়াশা আছে বেশ। বড় পাখির মত রুপোলি ডানা মেলে প্লেনটা যত নামছে—সবুজ সুন্দর লিওনার্দো বিমান বন্দর হয়ে উঠেছে ততই রূপময়। সত্যি দেশভ্রমণের মত আনন্দ আর হয় না। আচ্ছা, মিস্টার তালোয়ার এবং খুনি লোকদুটি কি এই রোমেই নেমে যাবে? লিওনার্দো বিমানবন্দর থেকে নেমে প্রথম বাঁক দিয়ে দ্বিতীয় বাঁকে ঘোরার সময়ই আচমকা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাবেন মিস্টার তালোয়ার! এদিকে রণি তো এই সময়টুকুর মধ্যে কিছুই করতে পারেনি। তবে সে লক্ষ্য রেখেছে নকল গোঁফের মানুষটার দিকে। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না ও রোমে নেবে যাবে। তার মানে মিস্টার তালোয়ারও এখানে নামছে না। তবে অন্য যাত্রীরা যারা এখানে নামবে না তারা ট্রানজিস্ট প্যাসেনজারের পাশপোর্ট নিয়ে এখন পঞ্চান্ন মিনিট বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ঘুরতে পারবে। রণি ট্রানজিট প্যাসেনজারের পাশপোর্ট নিয়ে আর সব যাত্রীদের সঙ্গে লাউঞ্জে এল। আড়চোখে সে নকল গোঁফের লোকটাকে দেখে যাচ্ছে আর সবসময়েই সতর্ক থাকছে আচমকা লোকটা তার কানের কাছে এসে শব্দ করে তাকে চমকে না দেয় বা অন্য কোনভাবে দেখতে না চায় ছেলেটি সত্যি সত্যিই বোবা কালা নয়? রণি যা ভেবেছিল তাই হল। হঠাৎ নকল গোঁফের লোকটি তার পেছনে এসে, 'এই এই ভারতীয় ছেলেটা শোনো তো' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভাগ্যিস সতর্ক ছিল রণি। তাই সে কিছু শুনতেই পায়নি এমনভাবে লাউঞ্জের দিকে এগোতে থাকল। বোবা কালার অভিনয়টা ভালোই করতে পারছে ভেবে মনে মনে নিজেকে তারিফ করল রণি। নকল গোঁফের লোকটার সন্দেহ খানিকটা অন্তত কমাতে পেরেছে সে। যাত্রীদের কেউ কেউ নেমে গেল রোমে। লাউঞ্জে এসে এক জায়গায় একটা শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে নানা বাহারী জিনিস দেখতে থাকল রণি। হঠাৎ এক ভদ্রলোককে আর একজন যাত্রী মিস্টার তালোয়ার

বলে সম্ভাষণ করতেই সে কান খাড়া করে রাখল। লোকটি মিস্টার তালোয়ারকে জিজ্ঞাসা করছে যে মিস্টার তালোয়ার কোথায় যাচ্ছেন। শোকেস দেখতে দেখতেই মিস্টার তালোয়ারকে দেখে নিল রণি। হিন্দিতে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তার থেকে আরো সে জানতে পারল মিস্টার তালোয়ার নামবেন প্যারীতে। ফরাসী দেশের রাজধানীতে মিস্টার তালোয়ার যাচ্ছেন তার ব্যবসার সূত্রেই। সঙ্গে আছে তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারী মোহনলালজী। আর অল্প পরেই মিস্টার তালোয়ারের কাছে সেই মোহনলালজী এল। রণি তো অবাক। আরে এই লোকটিই তো সেই নকল গোঁফ লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল। এই তো মিস্টার তালোয়ারের খুনের সহযোগী! একেই বলে কপাল। যে লোকটাকে বিশ্বাস করে নিজের বিদেশ যাত্রার সঙ্গী করে নিয়েছেন মিস্টার তালোয়ার সেই লোকই তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করে রেখেছে বিদেশের মাটিতে। মিস্টার তালোয়ার যেমন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না কি ঘটতে যাচ্ছে তেমনি এখানে উনি খুন হ'লেও মোহনলালজীকে হত্যাকারীর সহযোগী কেউ ভুলেও মনে করবে না। এই বিভ্রান্তিটা তৈরি করার জন্যেই বোধহয় বিদেশের মাটিতে খুনটা সেরে ফেলার এমন উদ্‌যোগ। নকল গোঁফের লোকটি ঠিক নজর রেখে যাচ্ছে রণির ওপর। রণি যদি এখন ছুটে গিয়ে সিকিউরিটি পুলিশকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারে তো ভালো হয়। কিন্তু বলার উপায় আছে নাকি! রণি কথা বলছে এটা বোঝা মাত্র খুনি লোকটা কি যে করে বসবে বলা যায় না। অথচ পুলিশকে জানাতে হবেই এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। না হলে মোহনলালজী আর নকল গোঁফের লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়া যাবে কি ভাবে? ওদের চাউনি দেখলেই বোঝা যায় যখন তখন মানুষ খুন করতে ওদের হাত কাঁপে না। বলা যায় না রণি পুলিশকে খবর দিচ্ছে বা দিতে যাচ্ছে বুঝতে পারলে মরিয়া হয়ে ওরা রণিকেই খুন বা জখম করে দিতে পারে।

তাই যা কিছু করতে হবে ওদের চোখ এড়িয়ে, বিশেষ করে ওই নকল গোঁফের লোকটার চোখ এড়িয়ে করতে হবে। কেননা রণিকে ওই লোকটিই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। রণি আসন ছেড়ে উঠলেই লোকটার নজরে পড়বে। রণিদের ঠিক দুটো রো আগেই ও বসে আছে যে! তবে একটা সুবিধে হল লোকটা তার নিজের সিট থেকে উঠে এসে রণির সীটের পাশে না দাঁড়ালে রণি কি করছে বুঝতে পারবে না। রণি মাথা খাটিয়ে সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল। নিজের আসনে বসে বসেই কাজ সারার চেষ্টা করল। দেখা যাক কি হয়। রণিদের নিয়ে বোয়িং বিমানটি তখন উড়ে যাচ্ছে রোম ছেড়ে আল্‌পস পর্বতের মাথার ওপর দিয়ে। এই আল্‌পস পর্বতের কথা এতোকাল শুধু ভূগোল বইতেই পড়ে এসেছে রণি। এখন একেবারে ওপর থেকে দেখা! বরফ ছেয়ে আছে আল্‌পসের চূড়ায় চূড়ায়। হিমবাহের ওপর দিনের আলো

পড়ে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! এ দৃশ্য থেকে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। দুনিয়ার সেরা শিল্পীর আঁকা ছবি যেন। অথচ পুরোপুরি মন দিয়ে এমন একটা অপূর্ব দৃশ্যকেও রণি উপভোগ করতে পারছে না। নকল গোঁফের লোকটার ব্যাপার কি হয় ভাবনায় বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় থরথর করছে। দেখতে দেখতে প্যারিসের মাথায় পৌঁছে গেল প্লেন। যাত্রীদের সীট বেল্ট বাঁধতে বলা হয়েছে। সীট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে অস্থির হয়ে রণি ভাবছে। কই তার চেষ্টা তো কোন কাজে দিল না। এখনো কেউ তো এলো না? কি হলো? বিমান মাটি ছোঁয়ার পর এখন প্যারিসের যাত্রীরাও নামতে শুরু করে দিয়েছে। এর পরেই থামবে লন্ডনের হিথ্‌রো বিমান বন্দরে। বড়মামা আর রণি নেমে যাচ্ছেন। আর একটু পরে উনি এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে প্রথম বাঁক ছেড়ে দ্বিতীয় বাঁকে পৌঁছলেই কি সাংঘাতিক কান্ডটাই না ঘটে যাবে! সব জেনেশুনেও রণি একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারবে না? আপশোষে রণির নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আবার ট্রানজিট প্যাসেনজারের পাশপোর্ট নিয়ে সে লাউঞ্জের দিকে এগোতে লাগল। হঠাৎ একটা হৈ চৈ শুনে রণি পেছন ফিরে দেখল কয়েকজন সিকিউরিটি রিভলবার উঁচিয়ে ঘিরে ধরেছে সেই নকল গোঁফের লোকটাকে। সিকিউরিটির মধ্যে একজন এক টানে খুলে ফেলল লোকটার নকল গোঁফ। আর রণি যা অনুমান করেছিল—তাই, লোকটার মাথার চুলটাও নকল। আর একজন সেটাও খুলে ফেলেছে। অন্যদিকে আরো কয়েকজন যাত্রী ঘিরে ফেলেছে মিস্টার তালোয়ারের সহযাত্রী মোহনলালজীকে। প্রথমে মিস্টার তালোয়ার হকচকিয়ে গেছিলেন। তারপর নকল গোঁফ আর নকল চুল সরিয়ে ফেলা লোকটির দিকে তাকিয়েই তিনি অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। আরে এই বদমাশ আত্মীয়টাই তাকে কিছুদিন যাবৎ খুন করার হুমকি দিচ্ছে। এই ফাঁকে এসে পড়লেন সেই এয়ার হোস্টেস ভদ্র মহিলা। রণি তার নিজের আসনে বসে এই এয়ার হোস্টেস ভদ্রমহিলাকে এক টুকরো কাগজে রণির সাধ্যমত ইংরেজিতে লিখে জানিয়েছিল। আমি বোবা কালা সেজে বসে আছি। আমাদের দুটো রো আগে প্যাসেজের ধারের আসনটিতে নকল গোঁফ লাগিয়ে এক খুনি বসে আছে। প্যারিসে নেমে ও খুন করার ষড়যন্ত্র করেছে মিস্টার তালোয়ারকে। হঠাৎ আমি শুনে ফেলেছি ও ষড়যন্ত্র করছে মিস্টার তালোয়ারের সঙ্গী মোহনলালজীর সঙ্গে। আপনি কথাটা এক্ষুণি সিকিউরিটিতে জানান। পুলিশ দুই ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করার পর এয়ার হোস্টেস ভদ্রমহিলা রণিকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে। ছ'ফুটের ওপর লম্বা ভারিক্কি চেহারার ফরাসী সিকিউরিটি অফিসার হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—আজকের ঘটনার নিঃশব্দ নায়ক রণির সঙ্গে। এদিকে প্লেনের মধ্যে নিজের আসনে

চুপচাপ বসে আছেন রণির অসুস্থ মামা। এক জাঁদরেল সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে রণিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি প্রথমে বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেছেন। কি হ'ল? বড় মামাকে সব যখন জানানো হল তিনি তো অবাক। কখন এতো সব কাণ্ড করে বসলো তার ওইটুকুনি এক বোনপো। কি সাংঘাতিক সাহস রণির। অথচ কিরকম ঠাণ্ডা মাথা। আগে এসব জানতে পারতেন যদি বড় মামা নার্ভাস হয়ে গিয়ে কি কাণ্ডটা যে করে ফেলতেন তার ঠিক নেই। এরই মধ্যে জনাকয়েক বিমান বন্দর সাংবাদিক এসে ঘিরে ধরল রণিকে। রণি সংক্ষেপে তার সহজ ইংরেজিতে পুরো ঘটনাটা বলল তাদের। ওরা পটাপট্ ফটো তুলল রণির। পরদিন প্যারিসের কাগজে ছাপা হয়ে গেল ছোট এক বাঙালী ছেলের কৃতিত্ব। ফটো সমেত। আর মিস্টার তালোয়ার? তিনি তো কৃতজ্ঞতায় কিছু সময় কথাই বলতে পারেননি। রণির নাম ঠিকানা সব লিখে নিলেন। সিকিউরিটি অফিসারকে বললেন, 'রণি সত্যিকারের একজন সাহসী ভারতীয় ছেলে। এই রকম সাহসী আর বুদ্ধিমান ছেলে যে কোন দেশের গর্ব।' পরের দিন ফরাসী দৈনিকগুলোতে রণির যত খবর ফটো প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটির দু'কপির একটি করে কলকাতায় রণিদের বাড়িতে আর একটি করে বার্মিংহামে রণির জ্যাঠামণির ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন মিস্টার তালোয়ার।

টুবলুর গোয়েন্দাগিরি

মঞ্জিল সেন

লোকটার হাবভাবে কেমন যেন খটকা লাগে টুবলুর। আগে কখনও দেখেনি ও লোকটাকে। গায়ের রঙ শ্যামলা, একমুখ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। একটা চিত্তির-বিচিত্তির জামা চাপিয়েছে গায়ে, পরনে চাপা প্যান্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। ডান হাতে শিখদের মতো একটা বালাও আছে। দু-তিন দিন ধরে ঘুর-ঘুর করছে পাড়ায়।

টুবলুর সন্দেহ করার আরও একটা কারণ আছে। হেমেন রায়ের গোয়েন্দা-গল্পের ভীষণ ভক্ত ও, মনে মনে ইচ্ছে, বড় হয়ে ও একজন শখের গোয়েন্দা হবে। তাই ওর বয়সী ছেলেদের চাইতে ওর চিন্তা-ভাবনা আলাদা। টুবলুর বয়স অবশ্য বেশি নয়, চোদ্দ, ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু ওর জ্ঞানের বহরের জন্য বন্ধুরা ওকে রীতিমত সমীহ করে চলে।

সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে টুবলু, তাই এখন কিছু দিনের জন্য ইস্কুল যাওয়া

বন্ধ। দোতলার বারান্দায় বসলে পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায়। তাই দেখে আর গল্পের বই পড়ে সময়টা ওর মন্দ কাটছে না। সেই সূত্রেই লোকটির ওপর নজর পড়েছে ওর। একটা ব্যাপার কিন্তু সত্যিই সন্দেহজনক, লোকটা বেলা এগারোটার আগে আসে না। বাড়ির বাবুরা আপিসে আর ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে চলে যাওয়ার পর পাড়াটা যখন খাঁ-খাঁ করে, তখন আসে লোকটা। বার দু-তিন রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় টহল দেয়, দু'পাশের বাড়ি-গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর চলে যায়। কী মতলব লোকটার!

মায়ের কাছে কথাটা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারে না টুবলু। মা হয়ত বিশ্বাসই করবে না, বলবে, ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে ওর মাথায় পোকা ঢুকছে। তা ছাড়া মা একটু ভিতু প্রকৃতির, কী দরকার মাকে মিছিমিছি বিব্রত করার। কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করে ওর। ঠিক চতুর্থ দিন ঘটল ঘটনাটা। টুবলু বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় একটা বই খুলে বসে ছিল, কিন্তু ওর চোখ দুটো রাস্তার ওপর। আজ লোকটা আসতে দেরি করছে।

তারপরই চমকে উঠল ও। লোকটা আসছে, তবে একা নয়, ওর সঙ্গে আরো দুজন। তাদের চেহারাও সুবিধের নয়, কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব। টুবলুর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। ওরা গট-গট করে এগিয়ে আসছে, একজনের হাতে একটা থলি। লোক তিনজন ওদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল টুবলুর, একটা বিপদের আশঙ্কায় খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম।

না, ওদের বাড়ি নয়। ওদের ঠিক উলটো দিকের বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা, সন্দেহজনকভাবে তাকাতে লাগল এপাশ-ওপাশ। তারপরই ওদের বারান্দার দিকে। ভাগ্যিস টুবলু বুদ্ধি করে বই দিয়ে মুখটা আড়াল করেছিল, যেন ওদের দেখতে পায়নি, বইয়ের পাতায় ডুবে আছে। আসলে বইয়ের ঠিক ওপর দিয়ে সব কিছুই ও লক্ষ্য করছিল। টুবলুদের সামনের বাড়িটা তেতলা। একতলায় থাকেন অনিমেষবাবু। তাঁর ছোট ছেলে গদাই টুবলুর বন্ধু। দোতলায় থাকেন এক মাদ্রাজী পরিবার। নতুন এসেছেন এই পাড়ায়, শুধু স্বামী স্ত্রী। দুজনেরই বয়স কম বোধহয় নতুন বিয়ে হয়েছে। অনেক মালপত্তর এসেছে, দামী দামী সব জিনিস। বয়স কম হলেও ভাল চাকরি করেন নাকি ওই মাদ্রাজী ভদ্রলোক, গদাইয়ের মুখে শুনেছে টুবলু। তেতলায় বাড়িওলা, রামদাসবাবু।

একতলার ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই একটু সরু ঢাকা গলি মতো, তারপরই সিঁড়ি তিনতলা পর্যন্ত চলে গেছে। গলির মুখে একটা কোলাপসিবল গেট, সেটা বন্ধ হয় রাত দশটায়। একতলায় ফ্ল্যাটের সঙ্গে ওই সিঁড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

লোক তিনজন হঠাৎ ঢুকে পড়ল ওই কোলাপসিবল গেট দিয়ে, কেউ লক্ষ্যই

করল না। এক মিনিট। কলিং বেলের শব্দ। কান খাড়া করল টুবলু, উত্তেজনায় ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মন বলছে, নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। লোক তিন-জনকে দেখেই ওর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল ওদের হাব-ভাব ভাল লাগেনি।

পরপর কয়েকদিন কাগজে ডাকাতির খবর বেরিয়েছে। দুপুরে বাড়ির পুরুষরা যখন বাড়ি ছিল না, তখন হানা দিয়েছিল ডাকাতরা। একটা ঘটনায় বাড়ির গিন্নি বাধা দিতে গিয়ে ছোরার আঘাতে ভীষণ আহত হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। মেয়েলী গলায় একটা চাপা আওয়াজ হল না? দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ; না, আর কোনো সন্দেহ নেই টুবলুর মনে। এক ছুটে ও ঘরে চলে এল। মা কী একটা কাজ করছিলেন, ওর অমন ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? দৌড়চ্ছিস কেন?" "মা...." হাঁপাতে হাঁপাতে টুবলু বলল, "তিনটে লোক....গুন্ডার মতো....গদাইয়ের বাড়ির....সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমার মনে হল....একটা চিৎকার শুনতে পেলাম....জোরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ...."

ওর মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। "হয়ত মিস্তিরি-টিস্তিরি," তিনি মনে সাহস এনে বললেন।

"না, মিস্তিরি নয়। ওদের একজন তিনদিন ধরে আমাদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিল, সব বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল, আমি বারান্দা থেকে দেখেছি....।" আবার হাঁপাতে থাকে টুবলু। "কী হবে।" ওর মা অসহায়ের মত বললেন।

"আমি লালবাজারে ফোন করব?" টুবলুর বুদ্ধি যেন খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"লালবাজারের ফোন নম্বর তুই জানিস?"

"হ্যাঁ, একদিন কাগজে জরুরি সব টেলিফোনের নম্বর দিয়েছিল, তার মধ্যে লালবাজারও ছিল। আমি টুকে রেখেছি।"

"কিন্তু", এবার ওর মা একটু বাঁধো-বাঁধো গলায় বললেন, "যদি তোর ভুল হয়? পুলিশ এসে দেখে, কিচ্ছুনা?"

"তাতে না হয় আমাকে একটু বকাবকি করবে, কিন্তু যদি সত্যিই কিছু হয় আর আমরা জেনে শুনে চুপ করে থাকি, তবে.... ?"

"তোর বাবার আপিসে একটা ফোন করলে হত না?"

"এখন আর সময় নেই মা," টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল টুবলু।

ওর ভাগ্য ভাল, একবারেই লালবাজার পেয়ে গেল। টুবলু ঝড়ের মতো সব কিছু বলে গেল। ওদের বাড়ির নম্বর, ওর নাম, রাস্তার নাম, নিশানা, কিছুই বাদ

দিল না। হেমেন রায়ের জয়ন্তর মত ওর মাথা খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"আমরা কাছাকাছি বেতার ভ্যানকে খবর দিচ্ছি, এখুনি যাবে, আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকুন, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।" লালবাজার অনুরোধ করল।

টুবলুর নিজেকে বড় বলে মনে হল পুলিসের লোক ওকে আপনি করে বলেছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ও রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এদিকে সামনের বাড়িটায় সত্যিই তখন ডাকাতি হচ্ছে।

কলিং বেলটা বেজে উঠতেই মাদ্রাজী বউটি দরজা খুলে একটু ফাঁক করেছেন। কলকাতায় নতুন এসেছেন, হালচাল কিছুই জানেন না।

দরজা ফাঁক হতেই ঘরে ঢুকে পড়ল তিনজন লোক, বউটিকে ধাক্কা দিয়েই। বউটি চিৎকার করবার জন্য হাঁ করলেন কিন্তু একটা থাবা চেপে ধরল হাঁ-করা মুখে। আরেকজন লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা, তারপর ছিটকিনি তুলে দিল তৃতীয়জন একটি ছোরা ধরল বউটির নাকের ডগায়। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, বাড়াবাড়ি করলেই নাকটা কেটে শূর্পণখা করে দেবে। দু চোখ বড় বড় হয়ে গেল বউটির, গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, তারপরেই মূর্ছা। চটপট একটা বড় তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ বেঁধে ফেলল একজন।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে সারা ফ্ল্যাটটা তারা তছনছ করল। দামী জিনিসপত্তর যা পেল ভরল বড় একটা থলিতে। ভাল জামা-কাপড় একটা বোঁচকায় বেঁধে নিল। বউটির ততক্ষণে জ্ঞান হয়েছে, ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন ওদের কান্ডকারখানা।

জিনিসপত্তর নিয়ে ডাকাতরা খুশি মনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভাল দাঁও মারা গেছে। একজন দরজাটা একটু ফাঁক করে মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখে নেবে, তারপর পথ পরিষ্কার বুঝলে ভাল মানুষের মতো নেমে যাবে। বোঁচকাটা একজন মাথায় নিয়েছে, যেন বাড়ি থেকে ধোপা বেরুচ্ছে।

দরজাটা ফাঁক হতেই একটা চকচকে কালো রিভলবারের নল লোকটার বুকে চেপে বসল, চমকাবারও সময় পেল না সে। ওই অবস্থাতেই তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর, সবাই সশস্ত্র। চোখের নিমেষে কাবু করে ফেলল বাকি দুজনকে। তারপর তিনজনকেই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে বাইরের কালো রংয়ের বড় গাড়িটায় তুলল। বাইরে ততক্ষণে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে।

পরদিন খবরের কাগজে টুবলুর ছবি বেরুল, সেই সঙ্গে ফলাও করে ওর বুদ্ধি আর সাহসের কাহিনী। ছবিসমেত কাগজের ছাপা অংশটা বাঁধিয়ে নিজের ঘরের দেয়ালে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছে টুবলু।

হার্টফেল

অসীম ভৌমিক

কাকুর মৃত্যু বাড়ির সবাই মোটামুটি মেনে নিলেও তা বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকেছে ষোলো বছরের রাজুর কাছে। মনটা ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেলেও ঠাণ্ডা মাথায় এ বিষয়ে প্রতি পদক্ষেপে আলোচনা করে করে সে এগোচ্ছে রহস্যের জট খুলতে। এদিকে সারা বাড়ীতে শোকের ছায়া। দাদু শোকে পাথর। ঠাকুমাকে ট্যাবলেট খাইয়ে সামাল দেওয়া হচ্ছে কোনো রকমে। ডেথ সার্টিফিকেটের বয়ান অনুসারে হার্টফেলই কাকুর মৃত্যুর কারণ। এই কারণটিই সন্দেহ উদ্রেক করেছে তার মধ্যে। মামাবাড়িতে থেকে মোটে ক্লাস নাইনে পড়লে কি হবে, এই বয়সেই ডাক্তারি-টাক্তারি সম্বন্ধে টুকটাক জ্ঞানগম্যি অর্জন করার তীব্র পিপাসা তার। পারিপার্শ্বিক অবস্থা উগরে দিয়েছে তার এই ইচ্ছাশক্তি। একে দু'মামা ডাক্তার, তার ওপর মামাবাড়ির

একতলায় নার্সিংহোম। এই সুবাদে অসুখ-বিসুখ নিয়ে নানা কথাবার্তা সে শুনছে প্রতিনিয়ত। আর নার্সিংহোমের টুকটাক অপারেশানও যেতে আসতে চোখে পড়েছে মাঝে মাঝে। এভাবে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে চিকিৎসা বিষয়ে সে এতটাই ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছে আজকাল যে অসুখ-বিসুখের প্রসঙ্গ উঠলেই পড়াশোনা শিকেয় তুলে কান খাড়া করে শোনে। তারপর দস্তুরমত ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাসের ফাস্ট বয় সে। ডাক্তারি বিষয়ে মামাদের রিডিংরুমে পাওয়া জার্নালগুলো খুব উৎসাহে খুঁটিয়ে পড়ে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করে। বুঝতে না পারলে জেনে নেয় মামাদের কাছে। জয়েন্ট এনট্রান্সের সিঁড়ি ডিঙিয়ে ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার অ্যাম্বিশন তার। তাছাড়া, মামার সঙ্গে ডাক্তারি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করে করে আবছা ধরণের তার যা ধারণা জন্মেছে, তাতে কাকুর হার্টফেল করার ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে ঠেকছে তার কাছে। কাকুর একমাত্র অসুখ-বিসুখ বলতে প্রায় বারোমাসই সর্দি কাশি হাঁচি লেগে থাকত। কফ জমে যেত বুকে। জ্বর হত। হাঁপানির টানে কষ্ট পেত নিদারুণ। তাই হাঁপানির টান কমানোর উদ্দেশ্যে ডাক্তার রায়ের কাছে তারই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করায়। কাকু আজ প্রায় দশ-বারো বছর ধরে এই ডাক্তারেরই পেশেন্ট। কিন্তু প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল ইত্যাদি যখন সব-নরম্যাল, তখন কি করে যে স্ট্রোক হল, তা কিছুতেই ঢুকছে না রাজুর মাথায়। এইতো, দিনকুড়ি আগে রাজুকে দেখতে এসে-খেয়ালের বশে চেক্ আপ করিয়েছে মামারই নার্সিংহোমের প্যাথোলজিতে। কিন্তু ক'দিনের মধ্যে কি কোলেস্টেরল হার্টফেল করার অবস্থায় পৌঁছে গেল। প্রত্যহ ট্যাবলেট খাওয়া সত্ত্বেও প্রেসার বেড়ে গেল। ডাক্তার মামা সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কাকু দারুন হিসেবী। ঘি, মাখন, মাংস-টাংস খেতেই না। শাক-শবজীটাই পছন্দ বেশী। তার ওপর আবার খেলাধূলার সঙ্গে ব্যায়াম-ট্যায়ামের নেশা, যাতে শরীরে মেদ না জমে। শুধু তাই নয়, কবিরাজী ডাক্তারের পরামর্শ মতো এক কোয়া রসুন আর টক দই খাওয়ার অভ্যেস প্রতিদিন সকালে উঠেই। সেহেতু কাকুর যে হার্টফেলে মৃত্যু, তা বিশ্বাস করা যায় না কিছুতেই। ক্লাসের পড়াশুনা বন্ধ রেখে সে এখন মামাবাড়ি আর নিজের বাড়ি দৌড়ঝাঁপ করছে গত ক'দিন। কাকুর মৃত্যুর রহস্য না উন্মোচন করা অব্দি এতটুকু শান্তি নেই তার মনে। এমনিতে জেমস হেডলি চেজ থেকে সত্যজিতের ফেলুদা গুলে খেয়েছে সে।

(দুই) কাকুর টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে হাতড়ে রাজু একটা প্রেসক্রিপশন পায়। ছাপার অক্ষরে লেখা ডাক্তারের নাম, ডিগ্রি ও ঠিকানার হেডিংয়ে চোখ বুলায়। প্রেসক্রিপশনটি কলিকাতায় একটি নাম করা হসপিটালের এলার্জি সেকশনের। হিজিবিজি টানাভাবে লেখা ওষুধগুলির মাথায় ঢোকা যে আদৌ সম্ভব নয়, তা

ভালোমতেই বুঝতে পারে। তাই মামাকে দেখানোর জন্য ব্যাগে পুরে নেয়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় এই শহরে ডাক্তার রায়ের নার্সিংহোমের সুইপার চরণদার বাড়িতে। কাকু মারা যাওয়ার ক্লু পাওয়ার খোঁজে. অবশ্য বার কয়েক গিয়েছে নার্সিংহোমে। কিন্তু ফিরেছে হতাশ হয়ে। তবে একটা বিরাট খটকা দিয়েছে তাকে। ওখানে কেমন যেন সবাই চুপচাপ। কুলুপ এঁটেছে মুখে। এই গুমোটে হয়ে থাকাটাই সন্দেহের শিখা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজুর মনে। তাছাড়া সুইপার চরণদার বাড়ি না পৌঁছলে কেউ পাত্তা দেয়না তাকে। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিতেও সেও কম যায় না কোনো অংশে। তাই, চরণদার ছোটো ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। হামু খায়। তারপর কোল থেকে নামিয়ে একমুঠো টফি গুজে দেয় ছেলেটির দু'হাতে। কয়েক পা এগিয়ে চরণের মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। আর মিষ্টির একটা প্যাকেট ব্যাগ থেকে বের করে ধরিয়ে দেয় হাতে। তখন যে ভাবান্তরের রেখা ঠাওর হয় চরণের চোখে মুখে। উসখুস করে পেট থেকে কিছু উগরে দেওয়ার জন্যে। পরক্ষণে এপাশে ওপাশে চঙমঙ করে তাকিয়ে রাজুর ডান হাত ধরে টেনে ঢুকিয়ে নেয় শোবার ঘরে। ব্যাগের ভেতর লুকিয়ে রাখা রাজুর টেপটি তখন হাই ভলিউমে অন্ করা। চরণ কানের কাছে-মুখ এনে বলে, বাবাজীবন, মুখখু হলেও বুঝি সব। এই শিশিটার ওষুধ ডান হাতে ইনজেকসন দিবার সাথে সাথেই ত মারা গেল আমার কাকা। শিশিটা রাখ তুমি। তবে মোকে ফাঁসাওনি। নিহাত পেটের দায়ে মুখ বন্ধ করছি। পরক্ষণে একেবারে চুপ হয়ে যায় বৌয়ের ইসারায়। কোনোরকমে আমতা আমতা করে হাতজোড় করে বলে,—আর কোনো কথা না। সেনদিদির কাছে যান। এখানকার সিস্টার। শেষ সময়টায় ডাক্তারবাবু আর উনিইত পাশে ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে রাজুর সঙ্গে আলোচনা মাফিক তার মাসতুতো দিদি ঝুমু ধীর পায়ে সেন-সিস্টারের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। ঠিক এই সময়টাতেই সিস্টার সেনের নার্সিংহোমে যাওয়ার কথা। যথাসময়ে নার্সটিকে তার বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোতে দেখে ঝুমু সজাগ হয়। উদাসীনভাবে হাঁটতে থাকা ঝুমু পায়ের গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। একটু বাদে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে দু'জন। ঐ অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে আলতো হেসে জানতে চায় ঝুমু,—মাফ করবেন, ডাক্তার রায়ের নার্সিংহোমটা কোথায় বলতে পারেন?—সঙ্গে চলুন। আমিতো ওখানে চাকরি করি। ডাক্তারবাবুকে দেখাবেন তো?

টুকটাক কথাবার্তার মাধ্যমে ঝুমুও অতি সহজে মিশে যায় সিস্টার সেনের সঙ্গে। রাজু তখন কিছুটা পেছন থেকে পথচারী ও দোকানের পাশে নিজেকে আড়াল রেখে গুটিগুটি এগিয়ে চলে। ঝুমু একটিবার পেছনের দিকে ঘাড় ঘোরাতেই রাজু শ'খানেক হাত দূরে থেকে হাত নেড়ে ইশারা করে। ইংগিত মতনই ঝুমু তখন

সিস্টারের কাছে জানতে চায়,—দিদি প্রথম পরিচয় তবুও বলছি কলকাতায় ভালো নার্সিংহোমে চাকরি করবেন? আমার চেনাজানা। মাইনে তিনহাজার। ঝুমু সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে 'ছাপা কর্মখালির বিজ্ঞাপনটি ব্যাগ থেকে বের করে মেলে ধরে সিস্টারের চোখের সামনে। সিস্টার তখনই আনন্দে উদ্বেল হয়ে জড়িয়ে ধরে ঝুমুর দু'টো হাত,—চাকরিটা পেলে বেঁচে যাই দিদি। এখানে মাইনে মোটে বারশো। তারপর পরিবেশ একেবারে বাজে।'—হ্যাঁ, শুনেছি। ক'দিন আগেই নাকি ইনজেকশন নিতে গিয়ে হার্টফেল করেছে কোন্ একজন।—না, আসলে এতো পলিটিকাল মার্ডার। এবারের ভোটে নমিনেশন পাওয়ার কথা মারা-যাওয়া ভদ্রলোকটির। তাই ডাক্তারকে হাত ধরে মানুষটাকে সরিয়ে দিল পাঁচু ঘোষাল। এখন পাঁচুরই নমিনেশন পাওয়ার কথা। তা বলে এতো নীচে নামতে পারে মানুষ!—টাকা, টাকা। সেনসিভিটি টেষ্ট না করেই পেনিসিলিন ইনজেকশন পুশ করেছে। অথচ ডাক্তার রায় ভালো করেই জানে সে শৈবালবাবু ক্রনিক এলার্জির পেশেন্ট। এক্ষেত্রে পেনিসিলিন ইনজেকশন পুশ করা মানেই হার্টফেল। আমিতো পেছনেই ছিলাম। অথচ না বোঝার ভান করে এড়িয়ে গিয়েছি। প্রচুর টাকা ঢেলেছে পাঁচু। ঝুমু তার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটা ঠিকমত চলছে কিনা পরখ করে নেয় একবার। পরের দিন লোক্যাল থানায় রাজু হাজির হয় তার ডাক্তার মামা, ঝুমুদিদি আর টেপটি নিয়ে। মামা খুলে বলেন আগাগোড়া সবই। টেপ বাজিয়ে শোনায়। কিন্তু তবুও পাত্তা দেয়না পুলিশ অফিসার। তখন রেগে ওঠে ডাক্তারমামা, পাঁচু ঘোষাল এখানেও টাকা ঢেলেছে তাহলে। এস, পি, আই, জি, তেমন হলে মিনিস্টার অব্দি যাব। তখন বুঝবেন, কত ধানে কত চাল।
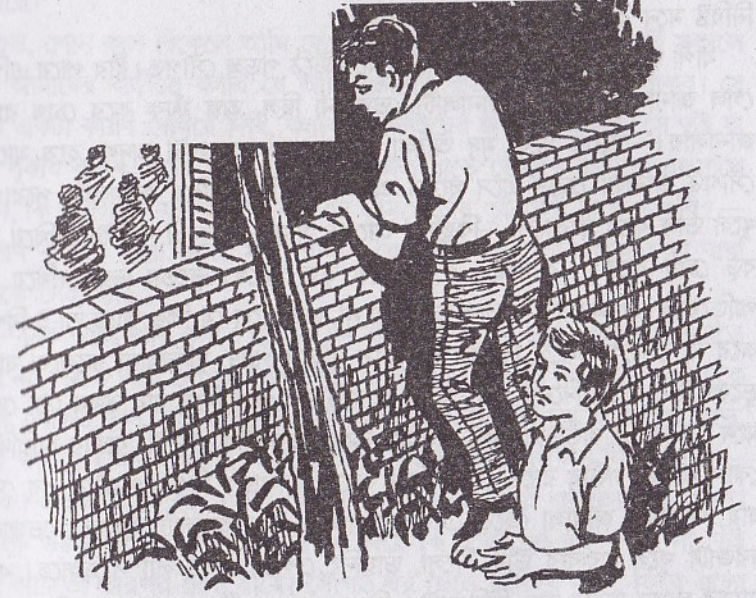
পোড়ো বাড়ীর আলো

শমীক মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে সৌগত, ঠিক মধ্য রাতে ওদের বাড়ীর সামনে যে জরাজীর্ণ বাড়িটা সেটায় আলো জ্বলে টিম টিম করে। রাত জেগে পড়তে হয় তাকে স্কুল খুললেই পরীক্ষা, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। পাশের ঘরে বাবা মা থাকে, এটা সৌগতর নিজস্ব ঘর। ডানপাশের ঘরে থাকে দিদি, সৌগত পড়ার টেবিল থেকে উঠে জানালার সামনে এগিয়ে গেল খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেওয়াল ঘড়িটা এই মুহূর্তে বেরসিক শব্দ ঢংঢং করে বারটা ঘোষণা করল। বিরক্তির চোখে সুদৃশ্য ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল-ঘণ্টা বাজার আর সময় ছিল না। ঘণ্টার শব্দ থেমে গেলে আবার জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ডায়নিং স্পেসে কার পায়ের শব্দ—নিশ্চয়ই বাপী উঠেছে। তড়াক

করে লাফিয়ে আবার চলে এলো পড়ার টেবিলে, সৌগত জানে ওর বাপী একবার ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দেবে ছেলে কি করছে দেখবে। দিলোও তাই, সৌগত নিবিষ্ট মনে বই-এর দিকে তাকিয়ে আছে।

বাপী শুয়ে পড়তে আবার চেয়ার থেকে উঠে পড়ল সৌগত। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার সামনে। জানালাটা ভেজানো ছিল, অল্প ফাঁক করে চোখ রাখল জানালায়।—ঘরের মধ্যে মৃদু আলো, মাঝে মধ্যে আলোটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সৌগত জানালা ছেড়ে এসে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানালাটা পুরোপুরি খুলে ভাল করে তাকালো—কিছুদিন আগেও মামনি ওকে ঐ বাড়ীটা দেখিয়ে বড় বড় চোখ করে বলেছে—ঐ বাড়ীতে ভূত আছে। ভূতের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। এখন আর সৌগত ভয় পায় না, ভূত বলে যে কিছু আছে তা-ই বিশ্বাস করে না লোকে শুনলে কি বলবে? ক্লাস নাইনে পড়ে, দুদিনবাদে কলেজে যাবে, ভূতের ভয় পায়। দিনের বেলা যখন ঐ বাড়ীটার পাশ দিয়ে যায় তখন তো দেখে মনে হয় না ঐ বাড়ীটায় কেউ বসবাস করে। জরাজীর্ণ বাড়ীটা, বাড়ীর চারিদিকে ঝোপ জঙ্গল, গভীর রাতে কে ওখানে আলো জ্বালায়? ঠিক এগারটার পর দেখা যায়, পা টিপে জানালা ছেড়ে টেবিলের সামনে এসে আলোটা জ্বালল। ভেজানো দরজাটা খুলে একবার উঁকি দিলো, ডায়নিং স্পেসে নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। বাবা মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, দিদি ভাইও নিজের ঘরে গভীর আচ্ছন্ন। ডায়নিং স্পেস অতিক্রম করে সোজা চলে এলো ড্রইং রুমে। দরজা খোলাই ছিল, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দরজা বন্ধ করে দিলো, ফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে ডায়াল করলো। একটু পরেই ওর মুখ থেকে বিরক্তি সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এলো এনগেইজড, আবার ডায়াল করল, ওপ্রান্তে ক্রিং ক্রিং আওয়াজে রিং বেজে উঠল। ড্রইং রুমে টাঙ্গানো দেওয়াল ঘড়িটায় এক নাগাড়ে টিকটিক শব্দ হয়ে চলেছে বারটা পঁচিশ ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো-হ্যালো-কে শমীক?-বলছি, এত দেরী করে ফোন করলি কেন? আমি শুয়ে পড়েছিলাম। বাবা উঠে পড়েছিল।—আজ কি দেখলি?—সেই একই ঘটনা, সন্ধ্যে থেকে আমি চোখ রেখেছিলাম। আলো দেখতে পেলাম ঠিক সাড়ে এগারটার পর। ও প্রান্তে কোন সাড়া নেই, সৌগত চাপা কণ্ঠে বলল—হ্যালো—কি হল, কথা বলছিস না কেন?—ভাবছি

—কি ভাবছিস?-না, থাক এখন বলব না, শোন পরীক্ষাটা হয়ে যাক তারপর ভাবা যাবে, বুঝলি? তুই কিন্তু নজর রাখবি, দরকার হলে নোট করে রাখবি, প্রতিদিন কি দেখছিস, না দেখছিস কি ঠিক আছে?—ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো দুই বন্ধু স্কুল থেকে বেরিয়েই ঐ আলোচনায় মেতে উঠল। শমীক অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল-তুই সব নোট করে রেখেছিস্ তো,

কবে কি দেখলি? সৌগত মাথা একপাশে যতটা সম্ভব নুইয়ে দিল অর্থাৎ লিখে রেখেছে।

গুড, শোন কাল বিকেলে আমি তোদের বাড়ীতে যাব, তার আগে তুই সকালে এসে আমাদের বাড়ীতে বলবি যে আমি তোদের বাড়ীতে খাব এবং থাকব। যে কোন একটা কারণ দেখিয়ে দিবি, বলবি দিদিভাইয়ের জন্মদিন অথবা...সে তুই যা ভাল বুঝবি বলবি। আমি আর তুই আগামীকাল রাতে তোদের বাড়ীতে একসাথে থাকব, কি বুঝলি?—যদি আমার বাড়ীতে জানতে চায় তুই কেন রাতে থাকবি?—সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এতো মাথা ঘামাস কেন বুঝি না, বলবি আমার মা বাবা বাড়ীতে নেই, তাই...

—ঠিক আছে আর বলতে হবে না। দু বাড়ীতেই ওদের কোন ঝামেলায় পরতে হলো না। শমীক আর সৌগত তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ল, সৌগত ফিস ফিস করে বলল-শমীক চল আমরা লাইট বন্ধ করে শুয়ে পড়ি, সবাই ভাববে ঘুমিয়ে পড়েছি।—তার আগে তুই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আয়।—কি কি?-একটা টর্চ লাইট, একটা মোমবাতি, দেশলাই, আর ধারালো কোন অস্ত্র। আঁতকে উঠল সৌগত-ধারালো অস্ত্র! ও দিয়ে কি হবে? -ও তুই বুঝবি না, তুই নিয়ে আয়তো তারপর দেখা যাবে। সৌগত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ফিরে এলো মিনিট দশেক পর, তোয়ালের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে টর্চ লাইট, মোমবাতি দেশলাই আর পাউরুটি কাটার ছুরি। শমীক হাতে নিয়ে বলল-গুড, এবার লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়।

রাত প্রায় বারটা। গোটা বাড়ী নিস্তব্ধ সবাই শুয়ে পড়েছে, শমীক অন্ধকারে জানালা খুলে বসে ছিল, সৌগত ঠিকই বলেছে সোয়া এগারটা সাড়ে এগারোটায় আলো দেখা গেল। সৌগত বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। জানালা ছেড়ে শমীক সৌগতর কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে ডাকলো। চল তৈরী হয়ে নে এবার বেরুব। দুজনে টাইট প্যান্ট গেঞ্জী সু পরে নিলো, শমীকের কোমরে ছুরি আর টর্চ, সৌগতর পকেটে দেশলাই আর মোমবাতি। পা টিপে টিপে ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, টিভির উপর থেকে সদর দরজার চাবি নিয়ে ওরা নীচে নেমে এলো। ওদের বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ী পেটাচ্ছে, সদর দরজার সামনে এসে নিশ্চিন্ত।

রাত বারোটা মানে এই এলাকা জন মানব শূন্য। রাস্তার কুকুরগুলো শুধু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, এত রাতে দুটি মানুষকে রাস্তায় দেখে ওরা এক নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। ওরা ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ কাটিয়ে চলে এলো সৌগতদের বাড়ীর পিছন দিকে, এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার শমীক ফিস্ ফিস্ করে বলল—এই দিকটায় একটা আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই?—

আলোর ব্যবস্থা আছে, লাইট থাকে না, কে বা কারা যেন ইট মেরে ভেঙ্গে দেয়। অন্ধকারে শমীক সৌগতর মুখের দিকে তাকায় কোন কথা বলে না, মনে মনে কি যেন ভেবে বলে চল, ঐ পাঁচিলটার উপর উঠি।

সৌগত নীচু হয়ে দাঁড়াল, শমীক ওর কাঁধে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে পড়ল। পাঁচিলের উপর উবু হয়ে বসে শমীক যা দেখলো তাতে তার চোখ ছানা বড়া হয়ে গেল। পোড়ো বাড়ীর ঘরে বসে আছে চারজন। ঘরের দুপাশে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, ঐ চারজনের দুজনকে খুব ভালভাবে চেনে, এ পাড়ায়ই থাকে। প্রায় বিকেলেই ওরা বাইক নিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়, কিন্তু ওরা করছেটা কি, এত শিশি কিসের? আর তাতে কিই বা সাটাচ্ছে? শমীকের মনে সন্দেহ হলো, রাতের অন্ধকারে লোক চক্ষুর আড়ালে, ওরা নিশ্চয়ই কোন ভাল কাজ করছে না। এদিকে সৌগতর সারা শরীরে মশা প্রায় ছেঁকে ধরেছে, উপর দিকে তাকিয়ে শমীকের ইশারার অপেক্ষা করতে লাগল। শমীক মাথা ফিরিয়ে ইশারা করল নামবে, পাঁচিলটা ধরে শমীক ঝুলে পড়ল, মাটিতে নেমে খুব ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। সৌগত ফিস ফিস গলায় জিজ্ঞাসা করল—কি রে কি দেখলি?—চুপ আগে বাড়ী চল, সব বলছি।

বাড়ীর সামনে এসে শমীক সব খুলে বলল—বুঝলি ওরা অপরাধ মূলক কোন কাজে করছে, আচ্ছা বলতে পারবি এখানকার থানার ফোন নাম্বার কত? বাবার ডায়রীতে লেখা আছে, কেন? তুই থানায় ফোন করবি নাকি?-নিশ্চয়ই। ভয়ার্ত গলায় সৌগত বলল—যদি কিছু হয় আমাদের?—আমাদের কি হবে আবার? ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করতেই থানার বড়কাকু ধরল, শমীক নিজেদের পরিচয় গোপন করে বিস্তারিত সব খবরা খবর জানিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন খবরের কাগজে বড় বড় করে ছাপা হল অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের ফোনে ধরা পড়ল জাল ঔষধ তৈরীর এক চক্র। খবরের কাগজ নিয়ে শমীক ছুটে এলো সৌগতর বাড়ীতে, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলল দেখলি আমরা সমাজের কত বড় দায়িত্ব পালন করলাম।
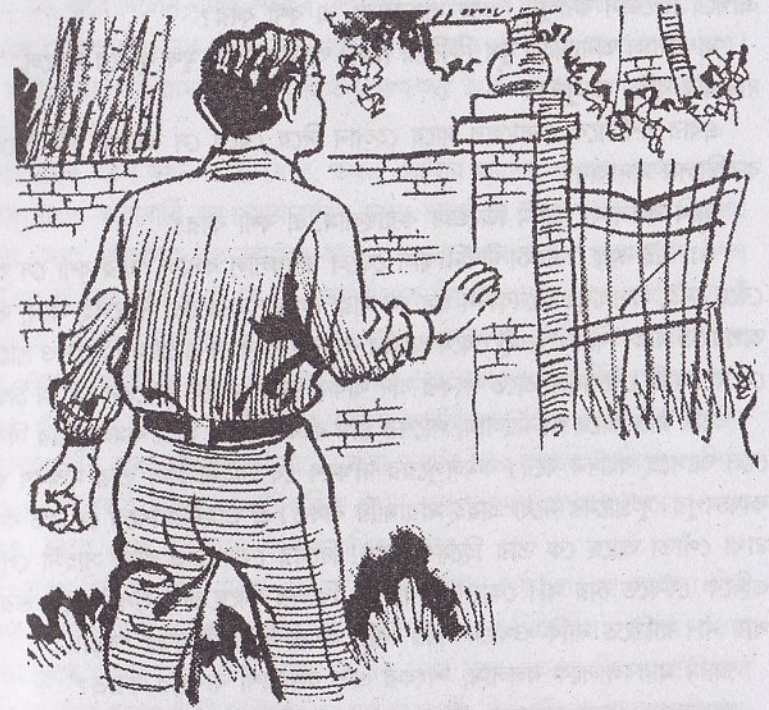
গোয়েন্দা রহস্য

সুনীলকুমার গুপ্ত

আমার বাবা কমলপুর গ্রামের জমিদারের নায়েব ছিলেন। ছেলেবেলাটা আমার মামার বাড়ি কলকাতায় কেটেছে। মামার ছেলেপুলে ছিল না, তাই আমি মামার কাছেই থাকতাম। বি.এ. পরীক্ষার পর আমি কিছুদিন গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে থেকেছিলাম। এই সময় গ্রামের এক সেরা সড়কি চালকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে ওই সড়কি চালকের বাড়ি। ওর নাম মাধবলাল। আমি ওর কাছে নানা কৌতূহলোদ্দীপক গল্প শুনতাম। একদিন ওর বাড়ির কাছ দিয়ে আসছি, এমন সময় উঁকি মেরে দেখি মাধবলাল বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসে একটা বর্শায় সিঁদুর আর তেল মাখাচ্ছে। এত বড় বর্শা কোনো মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু

এগিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ওহে মাধবলাল, এ বর্শা কার?'

মাধবলাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'ওঃ, দাদাবাবু বুঝি! আসুন।'

এবার বর্শাটাকে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে সে বললে, 'কি জিজ্ঞেস করছিলেন দাদাবাবু?'

আমি বললাম, 'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এ বর্শা কার!'

'ওঃ, এই কথা!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাধবলাল বললে, 'যার বর্শা সে আর বেঁচে নেই, দাদাবাবু। অনেকদিন হল সে মারা গেছে। মারা তো সকলেই যাবে, তবে অপঘাতে মরল কিনা!' একটু থেমে আবার বললে, 'ও বছর এ গ্রামের সঙ্গে ও গ্রামের যে মারামারি বেঁধেছিল তাতে শংকর যদি থাকত তবে দেখতে পেতেন সে কী চীজ!'

আমি মার কাছে শুনেছিলাম, পাশের গ্রাম কাঞ্চনপুরের সঙ্গে কমলপুরের বিবাদ চলে আসছে বহুদিন ধরে। কমলপুরের দক্ষিণে যে ডাইনী বিল তার দক্ষিণে ওই কাঞ্চনপুর। দু'গ্রামের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাঁধত। ঐ ডাইনীর বিলে যে কত কাঁচা মাথা পোঁতা আছে কে তার হিসেব রাখে! দিনের বেলাতেও অতি সাহসী লোক ওদিকে ঘেঁষতে চায় না। কোনো চাষা ওই বিলের কাছে চাষ-বাস করতে ভরসা পায় না। রাত্রিতে নাকি ওখানে সারি সারি কবন্ধ ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

আমি মাধবলালকে বললাম, 'শংকর এত বড় বর্শা ব্যবহার করত?'

মাধবলাল হেসে বললেন, 'বিশ্বাস না হওয়ারই কথা, দাদাবাবু। তবে শংকর সাধারণ মানুষ ছিল না। প্রায় সাত ফুট লম্বা, বাহান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। ওর গায়ে ছিল অমানুষিক শক্তি। আমাদের মতো বিশটার মহড়া রাখতে পারত একা।'

আমার কৌতূহল চরমে পৌঁছল। বললাম, 'বল না মাধবলাল, কি করে শংকরলাল মারা গেল?'

পাশের হুঁকোতে বারকয়েক টান মেরে ও বলতে আরম্ভ করলে—

'আমি এ গল্প শুনেছি আমার বাবার কাছে। শংকরলাল সম্পর্কে আমার জ্যেঠতুত ভাই। আমার জ্যেঠামশাই তিন গাঁয়ের মধ্যে বর্শা চালানোয় ছিল সবচেয়ে বড় ওস্তাদ। জ্যেঠামশাই যে কত লোককে বর্শা মেরে ঘায়েল করেছেন তার ঠিক নেই। শংকরলাল ছেলেবেলা থেকে বাবার মতো হল না। আমাদের তিনকুলের মধ্যে কেউ লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু ছেলেবেলায় শংকর গাঁয়ের পাঠশালায় বেশ কিছুটা পড়াশুনো করলে। পড়াশুনোয় তার কৃতিত্ব দেখে অনেকেই বিস্মিত হল, সবচেয়ে তাজ্জব বনে গেল তার বাবা। তিনি শংকরকে বহুবার জাত ব্যবসা ধরানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। শেষে তিনি ভাবলেন যে, লেখাপড়া শেখানোর জন্যেই শংকরের এই পরিবর্তন ঘটছে। তিনি শংকরের পাঠশালায়

যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু শংকর লেখাপড়া ছাড়ল না। সে সাধারণের চোখের আড়ালে কেবল বই পড়ত। শুধু লেখাপড়ায় নয়, ধর্মেও শংকরের প্রচণ্ড ভক্তি ছিল। পাঁচ গাঁয়ের কোথায় রামায়ণী গান, কীর্তন, কথকতা হচ্ছে শংকর সে সব জায়গায় উপস্থিত হবেই।

শংকরের বয়স যখন বছর ষোল, তখন একবার তাদের গাঁয়ের সঙ্গে পাশের গাঁয়ের দারুণ মারামারি হয়। মারামারির সময় শংকরের বাবা মারা যান পাশের গাঁয়ের সেরা বর্শাচালক রতনলালের হাতে। শংকর যখন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেল তখন সে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে সে রতনলালকে নিজের হাতে মেরে বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেবে। শংকরদের বাড়ি ঝিলের ধারে। সে যখন একদিন ওপাশের গাঁয়ে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল তখন এপাশের গাঁয়ের লোকেরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। শংকরের বাবা একা পাঁচটাকে ঘায়েল করেছিলেন, কিন্তু শেষে ওই শয়তান রতনলাল তার বাবার বুকে বর্শা মারে। ওরা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। জমিদারবাবু তখন কাছারিবাড়ির দুটো ঘর তাদের থাকার জন্যে ছেড়ে দিলেন। ফিরে এসে সব শুনে শংকর প্রতিজ্ঞা করে।

পিতৃদত্ত জিনিসপত্রের মধ্যে শংকর পেলে বাবার বর্শাখানা। যা সামান্য কিছু সঞ্চিত জিনিসপত্র ছিল তাদের প্রায় সবই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। শংকর নাওয়া খাওয়া ভুলে গেল। হাতে বর্শা নিয়ে সে সব সময় ঘুরে বেড়াত বিলপারের তাল খেজুরের বনে, ভাঙা কালী মন্দিরের আনাচে কানাচে, নিম তেঁতুল গাছের জটলায়, বাঁশবনের কোণায় কোণায়। রাত্রিবেলাতেও দেখা যেত একহাতে বর্শা আর অন্য হাতে একটা ঝুলপড়া লণ্ঠন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কেটে গেল। শংকরের প্রায় পাগলের মতো অবস্থা হয়েছে। একদিন শংকর দেখতে পেল বিলের ওপারে বাবলা বনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পীতাভ আলোয় গাছের ফাঁকে লোকটার চেহারা রতনলালের মতোই মোটা বলে তার মনে হল। শংকর বর্শা তুলে তাক করে 'জয় মাকালী' বলে সেটা ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাতর আর্তনাদ নৈশগগনের বুক চিরে ছুটে গেল। দূরের আলোটা নিভে গেল। শংকর ছুটে গিয়ে দেখল বিরাট বর্শার সঙ্গে একটা লোক মাটিতে গেঁথে গেছে। পাশে একটা লণ্ঠন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ট্যাক থেকে দেশলাই বার করে লণ্ঠনটা জ্বেলে লোকটার মুখের ওপর ধরতেই সে চমকে উঠল। রতনলাল না? হ্যাঁ, রতনলালই তো। চারদিকের মাটি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যাক সে তাহলে এতদিনে পিতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। সাফল্যের আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ রতনলালের দেহটা সামান্য কেঁপে কেঁপে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মাটিতে গাঁথা বর্শাটাকে তুলতে গিয়ে সে একটা দারুণ অসুস্থতা অনুভব করলে। পা দিয়ে মৃতদেহটাকে সরিয়ে দিতেই তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়া লাল রক্তে বিলের নোনা মাটির খানিকটা আরও লাল হয়ে উঠল। একটা বিচিত্র অনুভূতি তার শিরায় শিরায় খেলে বেড়াতে লাগল। এতদিন সে বর্শাটাকে নিয়ে ঘুরছে, এমন মনের অবস্থা আর কোনোদিন হয় নি। জীবিত মানুষ আজ সে প্রথম মারল। বর্শাটায় ভর দিয়ে সে রতনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেঘের ফাঁকে তৃতীয়ার চাঁদ উঁকি মারল। দূরে বটগাছের জটলার মধ্যে সদ্য জাগ্রত শকুনছানার তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল। কলকল ছলছল করে ওদিকে বিলের জল গড়িয়ে যাচ্ছে। বাবলার বন কাঁপিয়ে হু হু করে নোনা বাতাস বইছে। কিছু দূরে বাঁশ বনের মধ্যে ঝরা পাতার ওপর কোনো জন্তুর চলাফেরার মচমচ খসখস আওয়াজ উঠছে। তার মধ্যে রতনলালের রক্তাক্ত মৃতদেহ বিলের নোনা মাটির ওপর অসহায়ভাবে পড়ে আছে।

হঠাৎ কি মনে হল শংকরের। ওই হাত দিয়ে রতনলাল কত মানুষই না খুন করেছে! কিন্তু কৈ, আজ তো ওই হাত সে নাড়তেও পারছে না। চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাঁ-করা মুখে এক দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন। ওর স্পন্দনহীন দেহের সঙ্গে আশেপাশের নিশ্চল মাটির কোনো তফাৎ নেই। শংকর অদ্ভুতভাবে হাসল।

নৈশ অন্ধকারের জট ছিঁড়ে একটা বড় বাদুড় ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল। একটা পাখি দীর্ঘস্বরে ডাকছে টি-ই-ই টি-ই-ই। হঠাৎ কতগুলো পদশব্দে শংকর চমকে উঠল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল কতগুলো সচল আলোকবিন্দু তার দিকে এগিয়ে আসছে। শংকর বুঝলে গাঁয়ের লোকেরা টের পেয়েছে। এখন পালানোর চেষ্টা করা বৃথা। সে বর্শা হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লোকগুলো এগিয়ে এলে সে বর্শা তুলে ওদের আক্রমণ করলো। আজ তার মাথায় খুন চেপে গেছে। পূর্বপুরুষের রক্ততৃষ্ণা তার সমস্ত দেহে আগুনের ঝড় তুলেছে। সামনের দু-তিনজন লোককে আহত করতেই সকলে পালিয়ে গেল। তার সারা শরীর থেকে উত্তেজনায় ঘাম ঝরছে। সে বিলের বড় বড় ঘাসের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে থাকল। সারারাত ওইভাবে বসে থেকে সে ভোরে গ্রামে ফিরে এল।

আত্মরক্ষার জন্যে শত্রুকে ঘায়েল করেছে প্রমাণিত হওয়ায় শংকরের জেল হল না। কিন্তু তারপর থেকে সে বার হত না। প্রায়ই গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকত। কেউ কাছে গেলে বলত, 'আচ্ছা ভাই, আমি বেঁচে আছি কি করে? আমি তো যখন তখন বর্শা দিয়ে তোমাকে মেরে ফেলতে পারি। আবার আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি তুমি আমায় বর্শা দিয়ে মেরে ফেলতে পার।'

শংকর মানুষ দেখলেই তেড়ে আসত। কিন্তু বাড়ির ছাগল, কুকুর, বেড়াল, গরু,

হাঁস নিয়ে খেলা করত। এদের সঙ্গে খেলা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলত, 'এরা পশু, এরা মানুষের অনিষ্ট করেন না।' রাস্তা দিয়ে লোক গেলে সে বর্শা তুলে চীৎকার করে উঠত, 'ওহে সরে যাও। তুমি অসহায়, আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি।' সে যখনই মানুষের এই অসহায়তার কথা বলত তখনই তার চোখে মুখে ফুটে উঠত এক করুণ অসহায়তার ছায়া।

তারপর শংকর তাড়ি খেতে আরম্ভ করে। যখনই সে বেশী তাড়ি খেত তখনই সে চোখ ওপরে তুলে বুক চাপড়াত আর বলত, 'যারা আমায় মানুষ ভাবে তারা নির্বোধ, তারা মানুষ নয়। ওগো, তোমরা আমাকে মার। আমি খুন করেছি, আমাকে শাস্তি দাও। আমার বুক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। যারা আমায় শাস্তি দিচ্ছে না তারা আমার পরম শত্রু।' তখন কেউ কাছে গেলে কাঁদত আর বলত, 'আমি অসহায়, আমাকে রক্ষা করো।'

নেশা ছুটে গেলেই সে আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করত। তখন কাউকে দেখলে আগেকার মতো বলত, 'তোমরা অসহায়, আমার কাছে তোমরা অসহায়। তোমরা এখানে এসো না। যেকোনো মুহূর্তে আমি তোমাদের মেরে ফেলতে পারি।'

একটু প্রকৃতিস্থ হলে সে বলত, 'ওহে, আমার শরীরের কুঠুরীর মধ্যে কে যেন প্রচুর বাতাস ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমার শরীরের ওজন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আমার ডানা গজাচ্ছে। আমি এখন উড়তে পারি।' হাত পা নেড়ে সে ওড়বার চেষ্টা করত। কখনও সে বলত, 'আমার হাত পা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আমি চাঁদ ছুঁতে পারি।' হাত বাড়িয়ে সে ঘরের ছাদ ছোঁওয়ার জন্যে লাফালাফি করত। একদিন ডাক্তারের কাছে সে হাজির হয়ে বললে, 'আমার বুকে কে যেন একটা গজাল বসিয়ে দিয়েছে, বার করে দিন।' আর একদিন পাঠশালার পণ্ডিত তিনকড়ি মুখুজ্জের পায়ে পড়ে সে বললে, 'আমার আত্মা সব সময় ডানা ঝাপটাচ্ছে, ওকে কি করে শান্ত করি বলুন?' পণ্ডিত মশাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, 'শান্ত হ্ শংকর। নিজে শান্ত থাকতে চেষ্টা কর। মনে জোর আন।' তখন সে মিনতিভরা গলায় অনুরোধ করলে, 'গুরুমশাই, সেই গল্পটা একবার বলুন। এক রাজা ছিল। তার ছেলে যখন ছোট তখন পাশের রাজ্যের এক রাজা সেই রাজার রাজ্য আক্রমণ করে তাকে বন্দী করলে। তারপর তাকে শূলে চড়ানো হল। রাজার একজন চাকর রাজপুত্রকে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষে বড় হয়ে রাজপুত্র পিতৃহন্তাকে হত্যা করে পূর্ব হত্যার প্রতিশোধ নিলে।'

জমিদারের কানে গেল শংকর পাগল হয়ে গেছে। জমিদার শংকরকে খুব ভালোবাসতেন। যা হোক, তিনি নায়েবকে বললেন লোক নিয়ে শংকরকে ধরে আনতে। শংকরকে ধরে তাঁর কাছে হাজির করা হল। শংকর জমিদারকে বললে,

'আমাকে ওরা ধরে রেখেছে আমি ইচ্ছে করে স্থির হয়ে আছি বলে। কিন্তু ইচ্ছে করলে সকলকে বর্শা দিয়ে মেরে ফেলতে পারি। আমাকে ভালো করে বেঁধে রাখুন।'

জমিদারের আদেশে শংকরকে কাছারী বাড়ীর একটা ঘরে আটকে রাখা হল এবং তিনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। শংকরের অনেক কাকুতি মিনতিতে বর্শাখানাও তার কাছে রাখার ব্যবস্থা হল।

একদিন দেখা গেল শংকর বর্শা দিয়ে তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললে যে তার এটা খুব ভালো লাগে এবং সে এতে পরম পরিতৃপ্তি পায়। এতে তার বুকের আগুনের জ্বালা কম হলে মনে হয় এবং সে অনেকটা সুস্থ থাকে। শেষে শংকর বর্শা দিয়েই এইভাবে আত্মহত্যা করে। বর্শা সে কখনও হাতছাড়া করতে দেয়নি।'

কথা শেষ করে মাধবলাল কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছল।

'শংকরের মৃতদেহ নিয়ে এক কাণ্ড ঘটল।' মাধবলাল বলতে লাগল, 'শংকরের মৃত্যুর পর কেউ তার দেহ ছুঁতে রাজী হল না। সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত, তাজা রক্ত চারিদিকে জমাট বাঁধা। বর্শাটা বুকে বেঁধা। কিন্তু তার মুখে একটা করুণ আত্মপ্রসাদের হাসি। দেখলেই আপাদমস্তক হিম হয়ে যায়। সবাই বলতে লাগল যে নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতার প্রভাবে মৃত্যু ঘটেছে। তাই, তারা কেউ তার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে চাইল না।'

গল্প শুনে গোয়েন্দা

রবিদাস সাহারায়

পিকলুর স্কুলের গরমের ছুটি পড়ে গেছে। তাছাড়াও পুরানো স্কুল—বাড়িটা ভালোভাবে মেরামত করার জন্য বাড়তি ছুটিও পাওয়া গেছে কয়েকদিন। কাজেই এখন তার লম্বা অবসর।

এই সময়টা কিভাবে কাটাবে সেই ভাবনাতেই বিভোর পিকলু। পড়াশুনা তো রোজ করতেই হবে। তাছাড়া সে ঠিক করেছে খেলাধূলা করে বা বাজে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট না করে বই পড়েই সময় কাটাবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত গল্প শোনার তার খুব শখ ছিল। ছোট বেলায় ঠাকুরমার মুখে শুনেছে রূপকথার গল্প। একটু বড় হবার পর সেই গল্প আর ভাল লাগেনি। তারপর পড়েছে ভূতের বই নিজে নিজেই। ভূতের বই অবশ্য এখনও ভাল লাগে। তবে গল্পগুলি কেমন যেন আজগুবি। কোন বুদ্ধির খেলা তাতে নেই। তাই গোয়েন্দা

গল্প তার কাছে খুব ভাল লাগে। চতুর গোয়েন্দা যখন খুঁজে খুঁজে আসল অপরাধীকে বার করে তখন কী যে আনন্দ হয় তার।

গোয়েন্দা গল্প পড়ার ওপর পিকলুর এখন ভীষণ লোভ। অথচ সেই বই পড়ার খুব বেশি সুযোগ তার নেই। কাকাবাবুর হুকুমে বাইরের পাঠাগার থেকে কোন গল্পের বই বাড়িতে আনা একেবারে নিষেধ। বাইরের বইয়ের ওপর কাকাবাবুর যে কেন এত রাগ তার কোন কারণ খুঁজে পায়না পিকলু। অথচ কাকাবাবুর দোতলা ঘরের আলমারি ঠাসা কত বই। কাকাবাবু নাকি অ্যাডভোকেট, তাই মোটা মোটা আইনের বই তাকে পড়তেই হয়।

পিকলু ভাবে, আমি যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকবো তখন আমি পড়বো অনেক মোটামোটা বই। বিদেশী গোয়েন্দার বড় বড় বইও হয়তো অনেক আছে। সেই সব বইও সাজানো থাকবে আমার আলমারিতে। চিনু কাকু বলেন ভালো, গোয়েন্দা হতে হলে নাকি অনেক পড়াশুনা করতে হয়।

চিনু কাকু হয়তো ঠিকই বলেন। মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তিনি। খুব ভাল গোয়েন্দা গল্প বলতে পারেন। তাঁর মুখেই সে শুনেছে গোয়েন্দা কিরীটি আর ব্যোমকেশ বক্সীর কীর্তি কাহিনী। এখন সেগুলোও যেন পুরানো হয়ে আসছে। এখন সে মাঝে মাঝে শুনছে এডগার অ্যালেন পো, আর্থার কোন্যান ডায়ালের শার্লক হোমসের গল্প। সেই গল্পগুলোও খুব মজাদার।

শুধু মজাদার নয়, শেখারও অনেক কিছু আছে।

সেই গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনটাকে ধীরে ধীরে গোয়েন্দা মন করে ফেলেছে পিকলু। এখন অনেক কিছুর মধ্যেই সে রহস্যের আঁচ দেখতে পায়। বাড়িতে অচেনা কেউ এলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে দেখে। কাউকে বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে লোকটি কাকে খুঁজছে। এভাবে খুদে গোয়েন্দা হিসাবে পিকলুর নাম এপাড়া ওপাড়া অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিন খুব ভোরবেলা পাশের গলির খগেন পথ দিয়ে যেতে যেতে কি একটা যেন পথ থেকে কুড়িয়ে নিল। তারপর তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। পিকলুর হঠাৎ তা চোখে পড়ল। সে ভাবল, জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে খগেন এদিকে ওদিকে তাকাল কেন? নিশ্চয় তাহলে জিনিসটা ওর নিজের নয়। সে ছুটে গেল খগেনের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি রে?'

শুধু ঐ একটা কথা । ব্যাস্! তাতেই খগেন হাত থেকে জিনিষটা ফেলে দিয়ে দিল ছুট।

পিকলু সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল, নিশ্চয়ই এটা কাকার ঘরের ছোট

আলমারির চাবি। কিন্তু এটা কেমন করে এখানে এল? সেটা এনে কাকাকে দিতেই তিনি বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, এটাই তো আমি এতক্ষণ খুঁজছিলাম। কোথায় পেলে?'

পিকলু বলল, 'ওদিকের পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে খগেন পালিয়ে যাচ্ছিল, আমিই ওর কাছ থেকে নিয়ে এলাম।'

কাকাবাবু বললেন, 'চাবিটা ঐ রাস্তায় গেল কেমন করে?...ও হরি, আমার মনে পড়েছে। ওটা আমার পকেটে ছিল, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কেমন করে পড়ে গেছে। ভাগ্যিস তুমি পেলে। নইলে কি অসুবিধেই হতো! থ্যাঙ্ক ইউ।'

দু'দুবার কাকাবাবুর কাছ থেকে থ্যাঙ্কস্ পেয়ে গর্বে পিকলুর বুকটা ফুলে উঠল। সে ভাবল, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খগেনকে দেখেছিলাম বলেই না চাবিটা পাওয়া গেল। চিন্তা ভাবনা করে কাজ করলে অনেক কিছু লাভ হয়।

ঠিক সেই দিনই চিনু কাকু এসে হাজির হলেন। হাতে করে নিয়ে এলেন এডগার অ্যালেন পোর একটা অনুবাদ করা বাংলা বই। বইটা দেখে পিকলু খুব খুশী। বলল, 'চিনু কাকু, এর থেকে একটা ভাল গল্প আমাকে পড়ে শোনাও না।'

চিনু কাকু বললেন, 'তুমি বইটা রেখে দাও, নিজে পড়ে নিও। সবই ছোটদের গল্প।'

পিকলু বলল, 'তুমি খুব রসিয়ে রসিয়ে পড়তে পারো, বলতেও পারো। একটা গল্প পড়ে শোনাও না।'

পিকলু নাছোড়বান্দা। তাই একটি গল্প তাকে পড়ে শোনাতেই হল। সেই গল্পটা শুনে গোয়েন্দা হবার সখ আরও বেড়ে যায় পিকলুর। সামান্য জিনিসকেও তুচ্ছ ভাবে না। চিনু কাকু বলেছেন, ছাইয়ের ভেতরেও অমূল্য রত্ন লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই কথাটা পিকলু কখনো ভুলে যায় না।

কয়েকদিন পরেই এল পিকলুদের বাইরে যাবার সুযোগ।

আসানসোল পিকলুর মাসির বাড়ি। সেই মাসির মেয়ের বিয়ে। তাই নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। পিকলু ভাবল, তার গোয়েন্দাগিরির কীর্তি বাইরেও এবার ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

আর সাতদিন পরেই বিয়ে! প্রায় একবছর আগেই এই বিয়ে হবার কথা ছিল। তখনই পিকলুর মা রমাদেবী বোনের মেয়েকে উপহার দেবার জন্য একটা নেকলেস গড়িয়ে রেখেছেন। বিয়েটা পিছিয়ে গেল তাই সেটা ঘরেই পড়ে আছে। কি সুন্দর কারুকাজ করা নেকলেস! এতদিন এটা দেবার সুযোগ হয়নি, কাউকে দেখাবারও সুযোগ হয়নি। সেজন্য রমাদেবীর মনটা খুবই খুঁতখুঁত করছে। এবার তাঁর সেই মনের সাধ মিটবে।

পিকলুর বাবা মহানন্দবাবুরও বাইরে যাবার শখ বহুদিনের। বাইরে গেলে শুধু

বেড়ানোই হয় না। আনন্দও হয়। তার উপর যাবার সময় পথে ভালমন্দ খাবারও সুযোগ ঘটে। বাড়িতে বসে খাওয়ার চেয়ে গাড়িতে বসে খাওয়ার মজাটাই আলাদা।

আসানসোলে যাবার সবচেয়ে ভাল গাড়ি হল কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস, বিকেল সাড়ে চারটায় হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। আসানসোলে পৌঁছায় রাত নটার মধ্যে। তাড়াহুড়ো করতে হবে না। ধীরে সুস্থে চান খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে যাওয়া যাবে। গাড়িতে টিফিন করার জন্য খাবার দাবারও করে নেওয়া যাবে বাড়ি থেকে।

এদিকে দুপুরে চান খাওয়া দাওয়ার পরই শুরু হল গাড়িতে নিয়ে যাবার জলখাবার তৈরির ধুমধড়াক্কা। পরোটা, বেগুনভাজা, তার ওপর হল খেজুর আর আমসত্ত্ব দিয়ে চাটনি। ওটা মহানন্দবাবুর খুব পছন্দ।

পিকলুর খুব আনন্দ। শুধু খাওয়া নয়, সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার মজাও কম নয়। কাকাবাবু আর কাকীমা অবশ্য যাবেন না। বাবা-মা, দিদি, ছোটভাই সবাই যাচ্ছে। সেদিন ভোরেই এসে গেছেন চিনু কাকু। তিনিও যাবেন কী মজা!

তিনটা বাজতেই যাত্রার তোড়জোড় শুরু হল। ভি আই পি সুটকেশ, ব্যাগ, বিছানাপত্র সবকিছু গোছানো হতে লাগল। পিকলু একটা গোয়েন্দা বইও নিয়েছে তার ব্যাগে। কাকাবাবু থাকলে হয়তো আপত্তি করতেন, কিন্তু বাবা কোন আপত্তি করলেন না। মা রমাদেবী উপহার দেবার নেকলেসটা ভি আই পিতে ভরবার আগে একবার দেখে নিলেন ওটা ঠিক আছে কিনা।

চিনুকাকু ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। ট্যাক্সিতে মালপত্র ওঠাবার সময় গুনে নিলেন সব সুদ্ধ কটা মোট আছে। স্টেশনে গিয়ে মালপত্র নামিয়ে আবার গুনে নেবেন। মহানন্দবাবুর হিসাবে খুব একটা ভুল হয় না। তবু একটা কাগজে মোট সংখ্যা লিখে নিলেন। পিকলু এবার যা করল তা দেখে মহানন্দ বাবুও অবাক না হয়ে পারলেন না। ট্যাক্সির নম্বরটা লিখে নিল পিকলু। চিনু কাকু বলে উঠলেন, 'সাবাস খুদে গোয়েন্দা।'

গাড়ি ছাড়ল প্রায় পৌনে পাঁচটায়।

এতক্ষণ মালপত্র ওঠানো নামানো, কুলি ও লোকজনের হইচই চেঁচামেচিতে সবাই খুব বিব্রত ছিল। এবার যেন একটু স্বস্তি পাওয়া গেল। মহানন্দবাবু বললেন, 'মালপত্রের দিকে সবাই একটু নজর রেখো। আজকাল চুরি ছিনতাই বেড়ে গেছে খুব।'

যে ভি আই পি তে নেকলেসটা আছে সেটা বাঙ্কের ওপর না রেখে রমা দেবী তাঁর কাছেই রাখলেন। স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন চলতে লাগল দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে দিনের আলোও মলিন হতে লাগল। শহরের শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়ে

গাড়ি চলতে লাগল গ্রামের ভিতর দিয়ে।

কুঝিক্ ঝিক্ কুঝিক্ ঝিক্। গাড়ি চলছে।

এখন আর আগের মতো শব্দ হয় না গাড়ি চলায়। ইঞ্জিনের চোঙ দিয়েও ধোঁয়া বের হয় না। তবু পিকলুর কানে যেন কুঝিক্ ঝিক্ শব্দ ভেসে আসছে। ঐ শব্দটা না থাকলে রেলগাড়ি চলার মজা কী।

মহানন্দবাবু বললেন, 'এবার জলখাবার খাওয়া যাক।'

নেচে উঠল পিকলুর মন। এই সময়টার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করছিল সে। মনে মনে ভাবছিল কখন খুলে যাবে মজার মজার খাবার ভরতি টিফিন ক্যারিয়ার।

চিচিং ফাক! চিচিং ফাক! খুলে গেল টিফিন ক্যারিয়ারের সব ঢাকনা। পিকলুর মা রমা দেবী, দিদি মালতী দুজনে মিলে খাবার সাজাতে লাগলেন। লোক তো কম নয়। বাবা, মা, দিদি, চিনুকাকু, ছোট ভাই কুট্টি ও পিকলু সবাই মিলে সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ ছয় জন। কারণ ছোট কুট্টিভাইটা আলাদা প্লেট ছাড়া খাবে না। হইচই কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। কাজেই ছয়টি প্লেটে খাবার সাজানো হচ্ছে।

অথচ ছটি প্লেট একসঙ্গে পাওয়াই মুশকিল।

পিকলু বলল, "আমাকে টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে করেই খাবার দাও।'

মহানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই ভাল। ওর তো আমিরী খাওয়া। ও খুঁটে খুঁটে যখন খাওয়া শেষ করবে ততক্ষণে আমরা আসানসোল পৌঁছে যাব।'

সেই সময়ে কামরার আরো অনেকেই জলখাবার খাচ্ছিলেন। গল্পগুজবও চলছিল অনেকের মধ্যে। এক ভদ্রলোক বললেন, কয়েকমাস আগেও এই গাড়িতে এই সময়ে ডাকাতি হয়েছিল। আমিও ছিলাম এই গাড়িতে। অবশ্য এই কামরায় নয়, অন্য একটি কামরায়।

সেই গল্প শোনার জন্য আগ্রহী হল অনেকেই। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাকাত আপনার কোন জিনিস নিয়েছিল?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'আমার শুধু হাত ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল। তবে অনেকের অনেক কিছু দামী জিনিস ডাকাতি হয়েছিল সেই কামরা থেকে।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'ধরা পড়েছিল সেই ডাকাত?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না মশাই। ডাকাত কি ধরা পড়ে? পুলিশের সঙ্গে যে তাদের আঁতাত রয়েছে।'

সেসব কথা মহানন্দবাবুর কানেও গেল। তিনি রমাদেবীকে বললেন, 'দামী জিনিসপত্র খুব সাবধানে রেখো। বলা যায় না কখন কি হয়।'

সন্ধ্যার একটু পরেই একটা স্টেশনে এসে গাড়ি ভিড়ল। পিকলু বাদে সবার খাওয়াই তখন শেষ হয়ে গেছে। বাসনপত্র ধুয়েও নিয়ে এসেছে লেভেটরির কল

থেকে। পিকলুর খাওয়া শেষ হয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। এঁটো কাটা ও মাংসের হাড় সহ বাটিটা রয়েছে তার হাতেই। যাই যাই করেও বাটিটা ধুয়ে আনার জন্য লেভেটরিতে যাবার সময় করে উঠতে পারেনি।

পিকলুর এই আলসেমি স্বভাবের জন্য বাড়ির অনেকেই তার উপর বিরক্ত। কেউ কেউ তাকে 'কুঁড়ের বাদশা' বলে পরিহাস করতেও ছাড়ে না। এঁটো বাটিটা হাতে নিয়েই কি যেন সে ভাবছে ভাবুকের মতো।

গাড়িটা কিছুক্ষণ আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সেই স্টেশন থেকেও কামরায় উঠেছে কয়েকজন লোক।

এমন সময় ঘটলো এক বিষম ব্যাপার। যাত্রীদের ভেতর থেকে গুঞ্জন শুরু হল—ডাকাত! ডাকাত! অমনি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল কামরার ভেতর।

পিকলুর মা ও দিদি চাপা কান্না শুরু করল। বেশি জোরেও চিৎকার করার উপায় নেই। ডাকাতরা ঢুকেই সাবধান করে দিয়েছে—'কেউ চেঁচামেচি করবে না; তাহলে বিপদ হবে। যার কাছে টাকা ও সোনা গয়না যা আছে সব দিয়ে দিন।'

পিকলুর হাত থেকে টিফিনের এঁটো বাটিটা পড়ে গেল। পড়ল তার পায়ের কাছেই। সেই এঁটো তার বাবার পায়েও কিছুটা ছিটকে গেল। তিনি মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'নোংরার যম এই ছেলেটা। কী ঘেন্না!'

এদিকে কয়েকজন ডাকাত এগিয়ে আসছে এদিকের যাত্রীদের দিকে। তাদের কারুর হাতে ছুরি, কারুর হাতে পিস্তল।

যাত্রীরা সবাই দামী জিনিসপত্র সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাদের কাছে টাকা পয়সা বেশি আছে তাদেরই বেশি ভয়। মেয়েরাও গায়ের গয়না লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিকলু তাকাল তার মায়ের দিকে। তিনি নিজের গলার সরু হারটা খুলে নিয়ে ভি আই পি সুটকেশ খুলে নতুন নেকলেসটা বের করতে উদ্যত হলেন।

জুয়েলারী দোকানের সুদৃশ্য ভেলভেটে মোড়া বাক্স থেকে সেটা তুলে নিলেন নিজের হাতে, এখন সেটা কোথায় লুকোবেন তাই ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর আর এক হাতে নিজের গলার পুরানো সরু হারটাও রয়েছে। খুদে গোয়েন্দা পিকলু ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, 'মা এগুলো আমার কাছে দাও, আমি লুকিয়ে রাখছি।'

রমাদেবী তখন একেবারে বুদ্ধিহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিছু ভাববারও তাঁর সময় ছিল না। পিকলু দুটি হারই মায়ের হাত থেকে নিয়ে নিল। সে চলে গেল নিজের জায়গায়। তারপর কি করল তা বোঝা গেল না।

ওদিকে তখন কামরার ভেতরে হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ডাকাতরা বলছে

কেউ কোন জিনিস লুকোতে চেষ্টা করবেন না। আমরা বাক্স পেঁটরা সবকিছু খুলে দেখব। চাবি বের করে রাখুন চালাকি করলে কেউ প্রাণে বাঁচবেন না।

যাত্রীরা ভয়ে ভয়ে টাকা পয়সা, হাতঘড়ি ও সোনাগয়না ডাকাতদের হাতে তুলে দিতে লাগল।

তাতেও ডাকাতদের মন ভরল না। চাবি নিয়ে বাক্স পেটরা সব খুলে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল।

এমন অবস্থা তখন চলছে—কারুর অন্য দিকে তাকাবার সময় নেই। সবাই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তবে ব্যাপার দেখে বোঝা গেল কেউ ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেল না। যাত্রীর কাছ থেকে কোন বাধা না পাওয়ায় ডাকাতদের সাহস খুব বেড়ে গেল। যথেষ্ট সময় পেয়ে যথেচ্ছভাবে লুঠতরাজ করতে লাগল তারা। পিকলুর বাবার চকচকে রূপোর নস্যির কৌটো, চীনুকাকুর হাত ঘড়ি, রমাদেবীর কানের দুল—এসব নিয়েও সুটকেশ ব্যাগ সব তছনছ করতে বাকি রাখল না।

এমন সময় গাড়ি ভিড়ল পরের স্টেশনে। হুইসেলের শব্দ হল। গাড়ির কোন বাঁশির শব্দ নয়, ওটা ডাকাতের সংকেত। সর্দারের হুইসেল শুনে গাড়ি থেকে হুড়মুড় করে নেমে গেল ডাকাতরা।

ডাকাতদের হুমকিতে এতক্ষণ কোন যাত্রী টু শব্দও করতে পারেনি। এবার সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। ছোট দেহাতী স্টেশন থেকে এসে হাজির হল দুজন রেল পুলিশ। স্টেশন মাস্টারও এলেন। তাঁরা যথারীতি ডাকাতির বিবরণ নিয়ে চলে গেলেন।

ডাকাতদের কোন হদিস পাওয়া গেল না।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনেক যাত্রীরই অনেক মূল্যবান জিনিস লুঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কারুর কিছু করার উপায় নেই। পিকলুর বাবা নিজের রূপোর নস্যির কৌটোটার জন্য খুব বেশি দুঃখিত নন। কিন্তু শুধু দুঃখিত রমা দেবীর পছন্দ করা দামী নেকলেসটার জন্য। কারণ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন ভি আই পি সুটকেশ খুলে ডাকাতরা ভেলভেটে মোড়া নেকলেসের বাক্সটা তুলে নিয়ে গেছে। তা ছাড়াও বড় কথা, বিয়েতে ঐ সুন্দর জিনিসটা দেওয়া হল না। বিয়ের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

চিনু কাকু বললেন, 'কী ডেঞ্জারাস ব্যাপার।'

মহানন্দবাবু রমাদেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম খুব সাবধানে দামী জিনিস লুকিয়ে রেখো। শুনলে না তো সে কথা! এখন দেখলে তো কী সর্বনাশটা হয়ে গেল।'

রমাদেবী বললেন, 'সাবধানে রাখলেও কি রেহাই পাওয়া যেত? ওরা তো বাক্সপেটরা খুলে, বিছানাপত্র তুলে সব তছনছ করে দেখেছে। আমি কান থেকে দুল খুলে না দিলে কান দুটোই ছিঁড়ে যেত। গাড়ির একটা মানুষও প্রতিবাদ করল না। এতগুলো পুরুষমানুষ কামরায় রয়েছে, সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল।'

চিনু কাকুও চিন্তিত। পুরুষ মানুষ হয়েও তিনি কিছু করতে পারলেন না।

রমাদেবী বললেন, আমারও কপাল মন্দ। এত সাধ করে নন্দিতাকে দেবো বলে নেকলেসটা গড়ালাম, এখন কী নিয়ে ওদের বাড়িতে উঠবো। আর এই কামরাতেই বা উঠলাম কেন? অন্য কামরায় উঠলে তো এই সর্বনাশটা হতো না।

এবার তার মনে পড়ল, হারটা তো তাঁর হাত থেকে পিকলু চেয়ে নিয়েছিল। তাঁর নিজের পুরানো হারটাও তো নিয়েছিল পিকলু। তখন ভয়ে হাত পা কাঁপছিল বলে মাথাও ঠিক রাখতে পারেন নি। তিনি পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, তুই হার দুটো নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারলি না? তাহলে তো কোন রকমে জিনিস দুটো রক্ষা পেত।'

পিকলু এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি। শুধু চুপ করে তার জায়গায় বসেছিল। সেও হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিল ডাকাতদের লণ্ডভণ্ড করা ব্যাপার দেখে। এবার পায়ের তলার দিক থেকে বের করে নিয়ে এল জলখাবারের এঁটো টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিটা।

সেটা দেখে নাক মুখ সিঁটকে চেঁচিয়ে উঠলেন মহানন্দবাবু—'আবার ঐ নোংরা জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছে! কুঁড়ের বাদশা এখনো নিজের খাবারের বাটিটা ধুতে পারে নি। আবার এসেছে সেটা নিয়ে তামাশা করতে।'

রমাদেবী বললেন, 'যা, ওটাকে নিয়ে বাথরুমের কলতলায় চলে যা। অকর্মার ধাড়ি।'

পিকলু কলতলার দিকে না গিয়ে এঁটো বাটিটা প্রায় মায়ের মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে এল। তাতে আরও রেগে গেলেন রমাদেবী। চেঁচিয়ে বললেন, 'এঁটোকাটা দিয়ে সব মাখামাখি করবি? ঘেন্নায় মরি! যা, সরে যা আমার সুমুখ থেকে।'

পিকলু বাঁ হাতের একটা আঙুল ঐ বাটিটার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'ঐ দেখো মা, এতে কি আছে।'

রমাদেবী বললেন, 'ওতে আছে তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু।'

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন রমাদেবী। তাঁর মুখ চোখের ভঙ্গি যেন বদলে গেল। তিনি পিকলুর হাতে ধরা বাটির মধ্যে একটা আধ খাওয়া পরোটার তলায় দেখলেন, ঝকঝক করছে সেই সোনার নেকলেসটা।

এঁটোকাটার নোংরার কথা তিনি ভুলে গেলেন। নিজের হাতে তুলে লুফে নিলেন

সেই নেকলেসটা।

মালতী বলল, 'মা, ওটার গায়ে যে মাংসের টুকরো লেগে আছে।'

রমাদেবী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলেন, 'রেখে দে তোর মাংসের টুকরো।'

নেকলেসটা তুলে নিয়ে রমাদেবী কপালে ঠেকালেন।

পিকলু বলল, 'তোমার হারটা নিলে না? ওটাও যে আলুর দমের সঙ্গে মিশে আছে।'

মালতীই এগিয়ে এসে মায়ের হারটা তুলে নিল। বলল, 'মায়ের হারটাও তা হলে ডাকাত নিতে পারেনি?'

মহানন্দবাবু এতক্ষণ থ হয়ে সব কিছু দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন বিখ্যাত জাদুকরের জাদুর খেলা দেখছিলেন। তবে বুঝতে পারলেন ভি আই পি সুটকেশ থেকে ভেলভেট মোড়া যে সুন্দর বাক্সটা ডাকাতদের তুলে নিতে দেখেছিলেন তাতে নেকলেশটা ছিল না। রমাদেবী সেটা আগেই কোথাও লুকোবেন বলে বাক্স থেকে বের করে নিয়েছিলেন। ডাকাতরা খালি বাক্সটাই নিয়ে গেছে।

চিনু কাকু পিকলুকে বললেন, 'তুমি তো তাজ্জব জাদুর খেলা দেখালে পিকলু। এই বুদ্ধিটা কোথায় পেলে?'

পিকলু বলল, 'তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি কাকু। তুমিই তো এড্‌গার এলেন পোর একটা গল্প আমাকে শুনিয়েছিলে। সেই চোরাই চিঠি নামে গল্পটা।'

চিনু কাকু বললেন, 'ও, সেই 'পারলয়েনড্ লেটার' গল্পটা?'

পিকলু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা শুনেই তো জানতে পেরেছি, ডাকাতরা সব গোপন জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, কিন্তু প্রকাশ্য জায়গায় বাজে জিনিস ঘাঁটতে যাবে না। মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখবার ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

চিনু কাকু আনন্দে পিকলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস তোমার গোয়েন্দা বুদ্ধি! তুমি নিশ্চয়ই বড় হয়ে ভালো গোয়েন্দা হতে পারবে।'
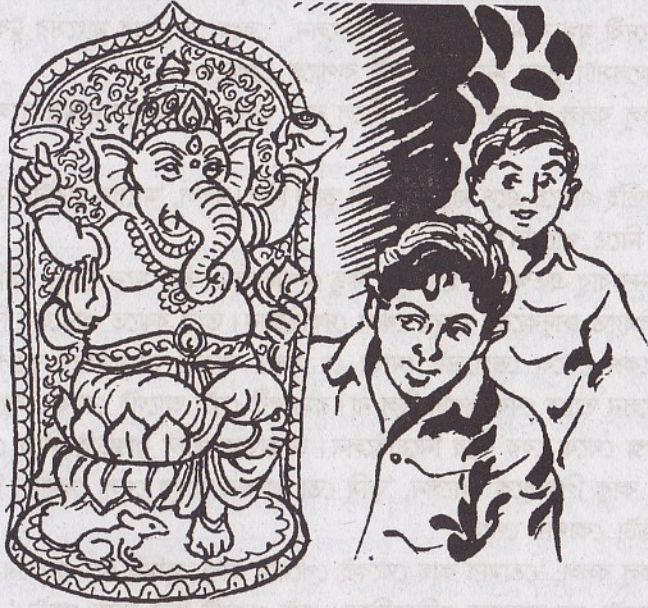
ছোট মামার গোয়েন্দাগিরি

কালিদাস ভদ্র

দিদিমার কাছে খবরটা শুনে আমি থ। শেষে কিনা গোয়েন্দা চণ্ডী রায়ের বাড়িতেই সোনার গণেশ চুরি! তাও পয়লা বৈশাখ হালখাতার ভর সন্ধ্যেবেলায়!

দিদিমা আবার বললেন,

—কীরে সুকু, তোর ছোটমামাকে বল! বলি বাড়ির একহাট লোকের মধ্যে বাইরের চোর আসবে কী করে? এ নিশ্চয় তোর বড় মামার কোনও মক্কেলের কাজ! হালখাতায় নেমন্তন্ন খেতে এসে সোনার অমন সুন্দর গণেশটাই হাতড়ে নিল। ছিঃ ছিঃ!

আমি বললাম,

—ছোটমামা কী করবে? পুলিশে খবর দাও।

—আঃ পোড়ারমুখো, তোর মাথাটাও ভাল হয়ে গেছে? পুলিশে খবর দেব কেন শুনি? তুই আর তোর ছোটমামা নাকি ঝানু গোয়েন্দা! দে না সোনার

গণেশটা খুঁজে।

—কেন, তোমরাতো ছোটমামাকে গোয়েন্দা বলেই মানতে চাওনা। দিনরাত্তির ছোটমামাকে গালমন্দ করছ। বড়মামা বলেন, ছোটর দ্বারা কিছু হবে না। শুধু শুধু বাজে সময় নষ্ট করছে!

—দ্যাখ তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না! তুই যাবি না আমি যাবো?

—বেশতো তুমিই যাও। তাহলে হয়তো ছোটমামা কেসটা হাতে নেবে! তবে হ্যাঁ ফী লাগবে!

—ফী? কিসের ফী?

—তদন্ত করার।

দিদিমার সাথে একটু খুনসুঁটি করে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম তিন তলার চিলেকোঠায় ছোটমামার ঘরে। টেবিলে ঝুঁকে ছোটমামা তখন মোটা একটা ইংরাজী বই থেকে কী যেন ডায়েরীতে লিখছেন। আমিও ছোটমামার কানের কাছে ঝুঁকে ঘটনাটা বলতেই ছোটমামা আঁতকে উঠলেন।

—সেকি! তুই সব ভাল ভাবে শুনেছিস তো?

—হু।

—বেশ, তবে প্রথম থেকে আস্তে আস্তে বল।

আমি পুরো ঘটনা প্রথম থেকে বলতে লাগলাম। আর একটা ডায়েরী খুলে ছোটমামা নোট নিচ্ছেন। মাঝে মাঝে আবার প্রশ্ন করছেন।

—বৃষ্টির আগে না পরে?

—পরে।

—বড়দার মক্কেলরা তখন কোথায়?

—বৈঠকখানায়।

—চেম্বারে...

—কেউ ছিল না।

—প্রথম কে জানতে পারল, গণেশটা নেই?

—দিদিমা।

—কখন?

—বৃষ্টি থামার পর দিদিমা সন্ধ্যা প্রদীপ দেখাতে গিয়ে দেখলেন মূর্তিটা বেদিতে নেই। অথচ মোহরটা বেদিতে একই রকম পড়ে আছে।

—খুব রহস্যময়।

—কী করে বুঝলে?

—দ্যাখনা যে গণেশটা চুরি করেছে তার হাতে সময় অল্প ছিল তাই শুধু গণেশ নিয়েই চম্পট দিয়েছে।

আমি বললাম,

—এও হতে পারে যে মোহরটা ছোট বলে চোখে পড়েনি!

—হু, হতে পারে। তবে চোর আবার আসবে।

—মোহর চোখে না পড়লেও?

—হু। কারণ এমন সোনার দামী মূর্তির সাথে আরও মূল্যবান জিনিস পূজোয় সাধারণত গৃহকর্তারা দেয়। এই রেওয়াজ চোরের জানা। সেগুলো নিতেই আবার আসবে। এই যেমন খুনের আসামী পরে আবার আসে প্রমাণ লোপাট করতে। অনেকটা এরকম বুঝলে বাছা সুকু!

ডায়েরীটা বন্ধ করে ছোটমামা এবার বললেন,

—চল, জায়গাটা দেখি। বৃষ্টির পরে হলে তো পায়ের ছাপ থাকার কথা! তুই ভাল করে দেখেছিস? পায়ের ছাপ পাস নি?

—না, আতস কাঁচে দেখেছি।

—তবে চোর বৃষ্টির আগেই হালখাতায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ঘাপটি দিয়েই ছিলো?

—ছোটমামা, আমার মনে হয় বড়মামার কোনও মক্কেলই কাজটা করেছে।

—হতে পারে।

—কেন?

—কারণ কেউ হয়তো ঠাকুর প্রণাম করতে ঢুকে সুযোগ পেয়ে ঠাকুরই গায়েব করে দিয়েছে।

ছোটমামার কথায় আমার মনেও বিশ্বাস হল, এটাই হয়েছে। চোর আর কেউ নয়, বড় মামারই কোনও মক্কেল।

ছোটমামা হঠাৎ বললেন,

—আচ্ছা সুকু, বড়দার মক্কেলরা কী এখনও সবাই আছে?

—হ্যাঁ, ঘটনাটা শুনে সবাই ঘরে রয়ে গেছেন। কেউ যায়নি।

—কেন?

—হয়তো ভাবছে গেলেই যদি পুলিশ সন্দেহ করে?

—পুলিশে খবর দিয়েছে নাকি?

—না, বড়মামা বললেন, আগে ছোটকে খবর দাও। ও যা ভাল মনে করে করবে। তাই তোমার মত না নিয়ে...

—আচ্ছা তোর বড়মামার সহকারীকে ডাকতো!

—কে, ভুলু বাবু?

—হ্যাঁ।

—সে তো বৃষ্টি থামলেই চলে গেছে।

—মানে?

—মানে গণেশ চুরি নিয়ে সবাই যখন হৈ হৈ করছে তখনই ভুলুবাবু বললে তার নাকি কী জরুরী কাজ আছে। তাই বলেই নাকি গেছে।

—অঃ!

—তুমি কী তবে ভুলু বাবুকে সন্দেহ করছ?

—আরে গোয়েন্দাদের সবাইকেই সন্দেহের তালিকায় রাখতে হয়। এ্যাই যেমন তোকে...

—কী? আমি মামাবাড়ির গণেশ চুরি করেছি? ছিঃ ছোটমামা, ছিঃ...আমি তোমার তোপসে। ফেলুদার তোপসে। এখন দেখছি তুমিই আমায় বিশ্বাস কর না। না, আজ থেকে আর তোমার সহকারী হয়ে আমার কাজ নেই। কালই আমি বাড়ি চলে যাবো। একটু আগে তোমার জন্যে দিদিমা আমায় কত কথা বললেন।

—কী বললেন?

—তুমি নাকি আমার মাথাটা খেয়েছ! আমার দ্বারাও কিছু হবে না। ঠিক আছে বাড়ি গিয়ে আমি নিজে একা একা প্রাকটিস করব। দেখি দাঁড়াতে পারি নাকি!

—দূর বোকা! তোর সাথে মসকরা করছিলাম। দেখলুম তোর বুদ্ধির দৌড়। যাক বল তো রান্নার ঠাকুর পরাণ, মালী দিবাকর তখন কোথায় ছিল, খোঁজ নিয়েছিস!

—হু, পরানদা রান্না করছিল। দিবাকরদা সিঁড়ির নীচের ঘরে রামায়ণ পড়ছিল।

—গুড, সব হিস্ট্রীতো ঠিক নিয়েছিস। এবার বলতো তুই কাকে সন্দেহ করিস?

—আমার প্রথম সন্দেহ বড়মামার মক্কেল প্রমোটর বীরেন্দ্র তেওয়ারী।

—কেন?

—তেওয়ারী গণেশের খুব প্রশংসা করে বলছিলেন অমন গণেশের আজকাল প্রচুর দাম।

বড়মামা কেন যে চেম্বারে ওটা রাখেন, যে কেউ গণেশটা নেওয়ার মতলব করতেই পারে। বিদেশের বাজারে অমন জিনিসের ভীষণ কদর!

—এ জন্যেই ওকে তোর সন্দেহ?

—কেন হবে না বল, প্রমোটর বলেই ওর সাথে মূর্তি চোর চক্রের যোগাযোগ থাকা সহজ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুলুবাবুই গণেশটা নিয়ে সরে পড়েছেন।

—আর কেউ?

—না, আর কাউকে তো তেমন সন্দেহ হয় না।

—ঠিক আছে, নীচে চল দেখি।

দু'জন তরতর করে নীচে নেমে বড়মামার চেম্বারে ঢুকলাম। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ছোটমামা এবার বৈঠকখানায় এসে মক্কেলদের উদ্দেশ্যে বললেন,

—আপনারা ইচ্ছে হলে বাড়ি যেতে পারেন। আসলে এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটলো যে বলার নয়। অথচ আপনারা সকলেই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন রায় মানে আমার বড়দার সম্মানিয় মক্কেল। অনেকেই বহুদিনের পরিচিত। বলা যায়

এবাড়ির সাথে দীর্ঘদিনের আত্মীয়তা। এবং আজকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথি। তাই যা হওয়ার তো হয়েছে শুধু শুধু পুলিশে জানিয়ে লাভ কী! সকলের সম্মান আছে, বিশেষ করে আদালতে বড়দার যা প্রতিপত্তি তাতে পুলিশে খবর দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। আপনারাও ঘটনাটা আর পাঁচকান করবেন না। মনে করুন এটা একটা দুর্ঘটনা।

প্রমোটর তেওয়ারী পরিষ্কার বাংলায় বললেন,

—আরে ছোটবাবু বলেন কী? আপনি হলেন গোয়েন্দা চণ্ডীচরণ রায়! আর আপনার বাড়িতে সোনার গণেশ চুরি? আর বলছেন ঘটনাটা চেপে যেতে? জানেন বিদেশে ঐ মূর্তির দাম কত? আপনি পুলিশে খবর করুন। আমাদের তল্লাসী নিক।

—না, না সে হয় নাকি? আপনাদের তল্লাসী নিতে পুলিশ ডাকব, ছিঃ ছিঃ!

—হবে না কেন শুনি? আমরা থাকতেই তো মূর্তিটা গায়েব হল! বাইরে থেকে নতুন কেউ তো আর আসে নি!

—যাক, যা হয়েছে ভুলে যান। আমি দেখছি।

ছোটমামার পীড়াপীড়িতে সবাই বিস্মিত হয়ে একে একে চলে গেলেন। ছোটমামা এবার বড়মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর দিদিমাকে। একে একে রাঁধুনী, মালী সকলকেই।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেই ছোটমামা হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দিদিমাকে বললেন,

—মা, খেতে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ছোটমামার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হলাম। এতবড় একটা ঘটনা ঘটলো অথচ কোন টেনশন নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার উপরে উঠতে উঠতে বললেন,

—সুকু তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে আয়। শুয়ে পড়বো।

খেয়ে দেয়ে আমি ছোটমামার ঘরে ঢুকতে কানে এল,

—নে তৈরী হ চটপট। রাত জাগতে হবে। পারবি?

—খুব পারবো।

ছোট মামা পিস্তলটা কোমরে গুঁজে চাদর মুড়ি দিয়ে বললেন,

—দ্যাখতো নীচে আলো জ্বলছে, নাকি নিভেছে!

ছাদে এসে ভাল করে দেখে নিয়ে বললাম, চেম্বারের পাশে বড়মামার ঘরটায় শুধু টিম টিম করে আলো জ্বলছে মনে হয়।

—চল, পা টিপে টিপে নাম। যেন শব্দ না হয়।

বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে আমরা মামা ভাগ্নে চেম্বারে সোফার নীচে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর খুট খুট, টুং টুং শব্দে চমকে উঠলাম। বেশ বুঝলাম ছোটমামার অনুমান ঠিক। চোর আবার এসেছে। পেন্সিল টর্চটা জ্বালাতে খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু ছোটমামার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হল। আবার খসখস, ঠংঠং শব্দ উঠল চেম্বারে। সহসা ছোটমামার ফেলা পেন্সিল টর্চের ক্ষীণ আলোয় বুক কেঁপে উঠল। অন্ধকারে আগুনের গোলার মত কী জ্বলছে! ছোটমামা পিস্তল তাক করেও ফায়ার না করেই চিৎকার করে উঠলেন,—সুকু আলো জ্বালতো, দেখি!

আমার হাতে বেশি পাওয়ারের পেন্সিল টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ধেড়ে ইঁদুরের চোখ। ইঁদুরটা ধানের আড়ি থেকে লাফিয়ে প্রাণপণে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ততক্ষণে চেম্বারে গলার আওয়াজ শুনে বড়মামা 'চোর চোর' চিৎকার করে লাঠি হাতে ঢুকলেন চেম্বারে। সুইচ জ্বেলে আলো জ্বালতেই দেখা গেল বড়মামার পেছনে রাঁধুনী, মালী সকলেই ঘোর ঘোর চোখে দাঁড়িয়ে। দিদিমা শুধু একা ঘরে, আসেন নি। ছোটমামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—তোর দিদিমাকে একবার ডাক।

বড়মামা বললেন,

—মাকে এত রাতে আর ডাকার দরকার কী? বয়স হয়েছে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নেই, থাক।

—না বড়দা, মাকে ডাকতে হবেই। মা ঘুমোন নি। আমি ফ্যালফ্যাল করে ছোটমামার মুখের দিকে তাকালাম, ঠিক তখনি অন্ধকার থেকে দিদিমা বেরিয়ে এসে বললেন,

—কী বলছিস বল? গণেশ চোর পেয়েছিস!

—হ্যাঁ, তবে তুমি যাকে চোর সাব্যস্ত করতে চাইছ, আসলে সে আসল চুরির ক্লু দিয়েছে।

—কী রকম?

—ধেড়ে ইঁদুর আসলে গণেশ চোর নয়, চোর ধানের আড়িতে গণেশ লুকোতে গিয়ে ধান উপচে পড়ে। আর সেই উপচে পড়া ধানের গন্ধে ইঁদুরটা আসে। এবং ইঁদুর আড়ির ধান খেতে গিয়ে দাঁতে সোনার গণেশ লাগে। ইঁদুরের দাঁতে টুংটাং শব্দ শুনে বুঝতে পারি গণেশটা ধানের আড়িতে লুকিয়ে রাখা আছে। অতএব মূর্তি যে সরিয়েছে সে চোর নয় এটা খুবই স্বচ্ছ। কারণ চুরির মতলব থাকলে হাত সাফাই করতই। এত ছোট মূর্তি নেওয়ার নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধা ছিল না তার।

বড় মামা বললেন,

—তবে কে এ কাজ করল?

ছোটমামা বললেন,

—যিনি করেছেন তিনি আমাদের বাড়িরই লোক তবে তিনি চুরি করার মোটিভে কাজটা করেন নি। করেছেন অন্য কারণে।

দিদিমা বললেন,

—কে সে?

—তুমি।

—আমি? কেন আমি এ কাজ করতে যাব?

—হ্যাঁ তুমি। সন্ধ্যারতির পর তুমি গণেশটা লুকিয়েছিলে। কারণ, আজ হালখাতার দিনে আমার একটা পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে তোমার মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠে। তোমার ইচ্ছে হল জানতে যে আমি সত্যিই প্রফেসনাল গোয়েন্দা হতে পারবো না মিছি মিছি সময় নষ্ট করছি। আর যদি গণেশ রহস্য বের করতে পারি তবে বড়দার অত নামী মক্কেলদের কাছেও আমি সহজে গুরুত্ব পাবো। প্রচারের এত সহজ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করতে চাইলে না। তাই সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গিয়ে পরিকল্পনাটা হঠাৎ করে ফেলেছ। ফলে ঘটনার একটা সহজ সূত্র ভুল করে দিয়ে দিয়েছ।

—কী সূত্র?

—পুলিশে খবর না দিয়ে আমায় ডেকে পাঠানো। অত মূল্যবান একটা জিনিস খোয়া গেল, আর তোমার মধ্যে তেমন কোন আকুতি নেই। হয় নাকি?

ছোটমামার কথা শুনে দিদিমার চোখের কোণে জল চিকচিক করতে দেখলাম। খুশিতে, না ছোট মামার জন্যে গর্বে বুঝতে পারলাম না।
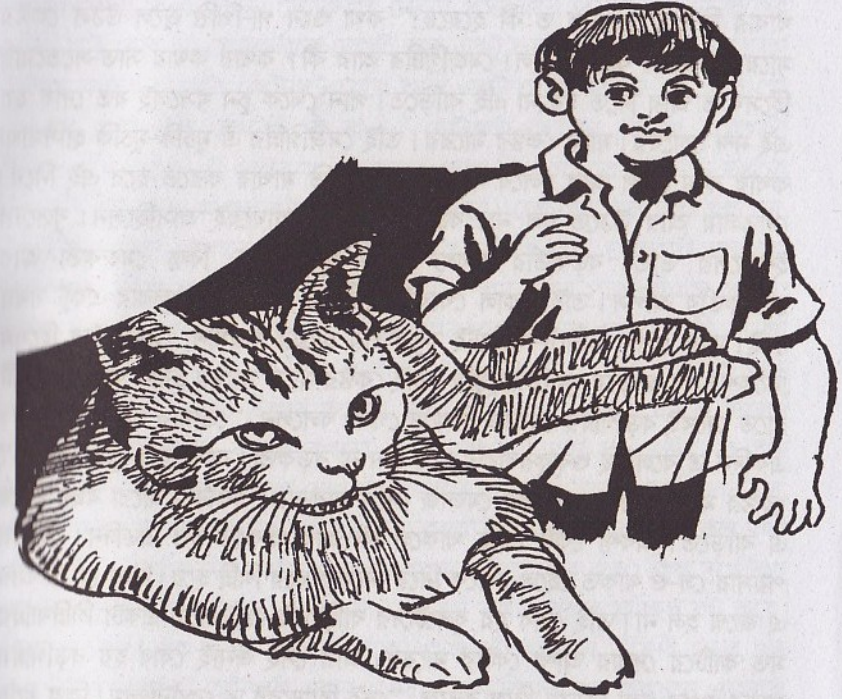
তদন্ত চলছে

কার্তিক ঘোষ

বুলটের মা, তিনি হচ্ছেন বাড়ির বড়গিন্নি। তাই কেষ্টর মা গজগজ করতে করতে বললে—"যাই, তেনাকে আগে বলে আসি। তারপর দেখব মুখপোড়াকে!" কিন্তু দোতলায় উঠতে যাবে কি একতলায় সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল মেজগিন্নির সঙ্গে। তবে ওঁকে বলে যে তেমন কোন সুবিধে হবে না, বোধ হয় কেষ্টর মা ভালই জানত। বাড়ির মধ্যে বড্ড ভালমানুষ এই মেজগিন্নি। একে থপথপে বাতের শরীর, তার উপর একটু বেশিরকম মায়া-দয়া। বলতে কি মেজগিন্নির জন্যেই ও মুখপোড়া হাড়হাভাতেটা লাই পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে আজকাল। সবই জানে কেষ্টর মা। তবু কি রাগ সামলানো যায় চট করে। তাই একহাতে আঁশবটি আর এক হাতে মাছের চুবড়িটা নিয়ে মেজগিন্নির মুখোমুখি হতেই বলে ফেললে ব্যাপারটা। কিন্তু হায় রে কপাল! শুনেই কি না হেসে ফেললেন মেজগিন্নি। শুধু বললেন, "যাগগে,

খাবার জিনিস খেয়েছে ত কী হয়েছে!" কথা শুনে গা-পিত্তি জ্বলে উঠল কেষ্টর মায়ের। যাকগে বললেই হল! মেজগিন্নির আর কী? কথায় কথায় সাত-সতেরোর হিসেব ত আর দিতে হয় না এই বাড়িতে। পান থেকে চুন খসলেই যত দোষ হয় এই নন্দ ঘোষের। মানে কেষ্টর মায়ের। তাই মেজগিন্নির ঐ মুচকি-মুচকি হাসিমাখা কথায় কান দিলে আর চলবে না আজকে। বাড়ি মাথায় করতে হবে এই নিয়ে। দোতলায় আর উঠতে হল না। বড়গিন্নি নেমে রান্নাঘরেই আসছিলেন। বুলটের ইশকুলের ভাত। বড়কর্তার অবশ্য কদিন ছুটি আছে, কিন্তু মেজকর্তা আর ছোটকর্তার অপিস। তাই সকাল থেকেই বাড়িটায় যেন দম ফেলবার একটু সময় নেই। তার ওপর মিনিটে-মিনিটেই বড়কর্তার চায়ের ফরমাশ, মেজকর্তার হিসেব নিকেশ। সব ছাড়িয়ে বুলটের দুষ্টুমি। তাই কেষ্টর মাকে মাছের চুবড়ি আর আঁশবটি হাতে দেখেই বড়গিন্নির মেজাজ বিগড়ে গেল। বললেন, "তোমার আবার কী হল? একদিন ত বলেইছি শুক্কুরবারটা মাছ খান না বড়কর্তা। ব্যস, সেই বুঝে কাটো।" কেষ্টর মা কি আর বড়গিন্নির মেজাজ দেখে ঘাবড়ায়। একটানা বারো বছর আছে এ বাড়িতে। অবশ্য কেষ্ট বেঁচে থাকলে কি আর থাকতে হত এতদিন। ছেলের পয়সায় সে-ও থাকত ছেলে-বৌকে নিয়ে নিজের ঘরে গিন্নি হয়ে। কিন্তু সে ত আর এ জন্মে হল না। তাই বোধ হয় বুলটেদের বাড়িতেই ছোটখাটো একটা গিন্নিবান্নির মত কাটিয়ে দেবার আশা কেষ্টর মায়ের। আর সেই জন্যই বোধ হয় বড়গিন্নির গলার ওপর গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, "সেই হিসেবেই ত কেটেছিলুম। কিন্তু ধুতে গিয়েই দেখি সেই পেটিটাই নেই!" পেটির কথা শুনেই মেজকর্তা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বড়গিন্নি আরো রেগে গেলেন তখন। বললেন, "মাছ কাটতে না-কাটতেই কি না একটা পেটি গায়েব হয়ে গেল তোমার সামনে থেকে।" কেষ্টর মা বললে, "তাহলে আর বলছি কী?" বড়গিন্নি আরো রেগে উঠলেন শুনে। গলাটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, "তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে না কি?" মেজকর্তা অমনি হিসেবের খাতাটা খুলেই ফড়ফড় করে বলে ফেললেন এক হপ্তার বাজার দর। নিজের ঘরে সকালের কাগজ পড়ছিলেন বড়কর্তা। কাগজ হাতেই নেমে এলেন। বুলটের অঙ্কটাও মিলছিল না সকাল থেকে। সে-ও দেখলে এই সুযোগ। শুধু কেষ্টর মা যখন মাছ কাটার কথাটা বলতে-বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে তখন ছোটকর্তা আস্তে-আস্তে নেমে এলেন দোতলা থেকে। হাতে একটা কলম আর নোটবুক।

বুলটেও জানে, ওর ছোটকাকা একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করেন মাঝে মাঝে। সে বছর বুলটের পুজোর নতুন একপাটি জুতো হারানো নিয়ে বাড়িময় যখন হৈ-চৈ আর হল্লার একশেষ তখনই কয়লার বাক্সোর কাছ থেকে বার করে দিয়েছিলেন ছোটকা। মায়ের জর্দার কৌটোটাও একবার অমনি বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল বাড়ি

থেকে। কেষ্টর মা-ও জানে। ছোটকর্তাই সেবার পাত্তা করে দিয়েছিলেন ম্যাজিকের মতন। তাই বোধ হয় ছোটকর্তাকে দেখেই বুকে একটু ভরসা পেল কেষ্টর মা। কান্না থামিয়ে বললে, "মাছটা কেটেকুটে রেখে আমি একটু দোক্তা মুখে দিতে গেছি গো দাদাবাবু....আর সেই তককেই কি না—" ছোটকর্তা বললেন, "চলো, জায়গাটা দেখতে হবে আগে—" কেষ্টর মা কলতলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখনো একমুঠো ছাই, আর মাছের আঁশ-কাটা পড়ে আছে। ছোটকর্তা বুলটেকে বললেন, "দেখ ভাল করে, ওখানে কোন পায়ের দাগ আছে কি না!" মেজকর্তা বললেন, "কমপক্ষে পঁচিশ গ্রাম এক পিস মাছের পেটির দাম এখন পাক্কা তিপ্পান্ন পয়সা! মুখের কথা!" মেজগিন্নি বললেন, "কী দরকার অত হাঙ্গামা করে। আমি না-হয় মাছ খাব না আজকে।" বড়গিন্নি আবার খেপে উঠলেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, মাছের হিসেব আমরা চাই।" ছোটকর্তা এবার ধমকে দিলেন সবাইকে— "গোলমাল করলে কখনো চোর ধরা যায় নাকি?" কেষ্টর মা প্রায় আগেভাগে নামই করে ফেলল চোখ মুছতে গিয়ে। বললে, "আমি বলছি দাদাবাবু, ওটা ঐ হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে মুখপোড়াটার কম্মো!" বড়কর্তা বললেন, "কার কথা বলছ?" বুলটে বুঝে নিল কেষ্টর মা কাকে ধরতে চাইছে চোর বলে। কিন্তু মুখে কিছু বললে না। ছোট্কা বকবেন। কেষ্টর মা বোধ হয় নামটা করতে যাচ্ছিল ফট করে। কিন্তু ছোটকর্তা এক দাবড়ি দিলেন তাকে। মেজকর্তা বললেন, "যে-ই হোক, খুন করা উচিত তাকে।" ছোটকর্তা এবার হাওয়ায় যেন কিসের গন্ধ শুঁকলেন একবার, তারপর বুলটের দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝতে পারছিস কোন পায়ের ছাপ?" বুলটে যদিও ওর বেড়ালটাকে খুবই ভালবাসে, তবু ছোট্কার ভয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ। বেড়ালের।" কেষ্টর মা অমনি আঁশবটি বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বললুম ত, ও পোড়ারমুখো ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে?" বড়কর্তার আর এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হল না। বেরিয়ে পড়তে হল বেড়ালটাকে খুঁজতে। মেজকর্তা বললেন, "ওকে আজ গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে তবে অপিস যাব।" বড়গিন্নি একটা ছেঁড়া চটের ব্যাগ খুঁজতে চলে গেলেন ভাঁড়ার ঘরে। কিন্তু বুলটের সেই সাদা ধবধবে গোঁফছাঁটা বেড়ালটাকে আর তখন খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। বুলটে ইশকুলে চলে গেল। কিন্তু মন পড়ে রইল বাড়িতে। আহা রে। বেচারি বেড়ালটা। দিনরাত কেমন মিউ মিউ করে ঘুরঘুর করত বুলটের পিছন পিছন। বিস্কুট দিত বুলটে। দুধমাখা ভাত দিত মাকে লুকিয়ে। মাছের কাঁটাও দিত তার সঙ্গে। তবু কি না আজ একটা সামান্য মাছের পেটি চুরি করে খেতে গেল! ইস! না খেলে কী হত শুনি? সব্বাই যে চোর বলছে এখন? সারাদিন তাই উসখুস করে ইশকুলে কোনরকমে কাটল বুলটের। বিকেলে ফিরে আবার শুনলে, এক বাটি দুধও নাকি কখন খেয়ে পালিয়েছে বেড়ালটা। বুলটে

কী খাবে এখন? মা রেগে কাঁই কাঁই করছেন বাপির ওপর। বাপিই যেন কোথথেকে একদিন বুলটেকে এনে দিয়েছিলেন ঐ বেড়ালটা! খুব ছোট্ট তখন। একেবারে তুলতুলে। ঠিক যেন সাদা উলের বল একটা।

কেষ্টর মা একলাই বাড়ি মাথায় করছে বেড়ালটাকে নিয়ে। অপিস থেকে ফিরেই মেজকর্তা এক বাটি দুধের দাম হিসেব করতে বসে গেলেন।

ছোটকর্তা সন্ধে বেলা ফিরেই একটা টর্চ আর নোটবুক নিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে পড়লেন মোড়ার ওপর। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ মেজকর্তার গলা পাওয়া গেল, "চোর! চোর!" বড়কর্তা ধড়মড় করে উঠেই সুইচ টিপে দিলেন। না। আলো জ্বলল না। বড়গিন্নি বুলটেকে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, "জানতুম, এত লোডশেডিং যখন, চোর না এসে পারে?" কেষ্টর মা কিন্তু সকালের সেই আঁশবটিটা নিয়েই অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বড়কর্তা দেশলাই পেলেন। কিন্তু মোমবাতি কোথায়? মোমবাতি? টর্চ নিয়ে নামতে ছোটকর্তারও দেরি হয়ে গেল। কারণ, ঘুমের ঝোঁকে শোবার সময় নোটবুকটা যে কোথায় রেখেছিলেন মনে পড়ছিল না। কিন্তু শেষ-মেষ সব্বাই যখন মেজকর্তার ঘরের সামনে হাজির হলেন, তখন চোর ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে। জানতে পেরে বুলটেও নেমে এল মায়ের সঙ্গে। কিন্তু খাটের তলায় কাঁচের ভ্যাঁটার মতন চোখ দুটো যার জ্বলজ্বল করছে, সেই কালো বেড়ালটা আবার কোথথেকে এল? কেষ্টর মা বললেন, "এই যে মুখপোড়া কালটা! খাটের তলায় ঢুকে সরের নাড়ু খেতে এসেছে?" বলেই আঁশবটিটা এমন ছুঁড়ে মারলে যে কালো বেড়ালটার কানে লেগে একটা চিনেমাটির ডিশ ঝনঝন করে ভেঙে গেল। মেজকর্তা তখন আর হিসেবের খাতাটা বার করতে গেলেন না। মুখেমুখেই হিসেব করলেন, ছ-ছটা সরের নাড়ু আর ঐ রকম একটা চিনেমাটির প্লেট—সাড়ে তিনের কমে হবে না!

কিন্তু ছোটকর্তা সব্বাইকে সরিয়ে দিয়ে যেই খাতায় একটা নোট নিতে গেলেন মোমবাতির আলোয়, অমনি বড়কর্তার পায়ের ফাঁক দিয়ে কেষ্টর মাকে টপকে সটকে পড়ল কালো বেড়ালটা। তারপর চার-পাঁচ দিন পরে হঠাৎ হৈ হৈ করে ছুটে এল একদিন বুলটে। এই ত, ফিরে এসেছে তার বেড়াল! কী মজা! কেষ্টর মা আহ্লাদে তখন আটখানা। "দেখুন দাদাবাবু, দেখুন, ওর সঙ্গে কেমন তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা!" "কী আশ্চর্য," চায়ের নেশা কেটে গেল বড়কর্তার। বললেন, "ও কোথায় ছিল তাহলে এ কদিন! কোথথেকেই বা ফিরে এল এমন সময়!" হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন ছোটকর্তাও। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না কাউকেই। আমি জানি, তদন্ত করছেন তিনি এখনো। অবশ্য খুব গোপনে। বুলটেও জানে না। তোমাদেরই শুধু বলে ফেললুম চুপিচুপি। সাবধান! তোমরা যেন আবার বলে দিও না কাউকে।

সাংকেতিক ভাষায় গোয়েন্দা

প্রীতি পালচৌধুরী

ঝড়-জলের রাত। বেশ ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কোথায়ও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক এক নিমেষে পথ-ঘাটগুলোকে দৃশ্যমান করে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের দুর্যোগের রাতে আমার কেন জানি না এক অদ্ভুত ধরনের খেয়াল চাপে। কেউ যখন রাস্তায় মাটিতে পা রাখতে ভয় পায় তখনই আমার অসম্ভব এক ইচ্ছা জাগে, ঝড়-জল মাথায় করে প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমার দেখতে ইচ্ছা করে প্রকৃতি কতখানি খেয়াল খুশীতে চলে। কেমন করে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে দুর্বার গতিতে সারা বিশ্বময় দাপিয়ে বেড়ায়। অনেকদিন আমি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই পথে বেরিয়ে পড়ি। তারপর এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াই। ট্রাম বাস বন্ধ না হলে ওতে চড়ে ভিক্টোরিয়া, গড়ের মাঠ, চৌরঙ্গীর রেড়্রোড্ দেখতে যাই। কখনো বাবুঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত মজাই না

উপভোগ করি। তবে আজকের আমেজটা একটু অন্যরকম ছিল। বেশ মনযোগ দিয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিলাম। বেশ লাগছিল। হঠাৎই আমার গুণধর কাজের ছেলেটি এসে মেজাজটা বিগড়ে দিল। বলল, দাদাবাবু এখন কি চা দেব? আমি ইনটারেস্টিং জায়গাটায় চোখটা রেখেই একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—হ্যাঁরে ভজুয়া তোর মাথায় কি গোবর পোড়া। জানিস না এমন বৃষ্টির দিনে আমার কি চাই? আমি কি এমন দিনে চা খাই? তোকে প্রতিদিনই নতুন করে বলতে হবে? ভজুয়া একটু ফাজিল ধরনের, ঠিক কাজটা করেও লোকের কাছে ধমক খেতে ভালবাসে। মজা করে রাগিয়ে দেয়। যেমন আমাকে দেয়। ভজুয়া ওর সামনের পোকা ধরা দাঁত দুটো বার করে হাসতে হাসতে বলে—দাদাবাবু এই ধরুন কফির কাপ, আর ফুলকপির বড়া, ধুমায়িত কফির কাপটা হাতে পেয়ে সত্যিই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—সাবাস্ ভজুয়া, যুগ যুগ জীও ভজুয়া, সত্যিই তোর জবাব নেই। কে বলে তোর মাথায় গোবর পোড়া। এখন তো দেখছি দার্জিলিং স্টোনে ভরা। এই সাইড টেবিলে রেখে কেটে পড়। আর আমায় ডিসটার্ব করিস না। কেউ এলে বলবি আমি বাড়ীতে নেই। এখন কেটে পড়। আমার পড়া গল্প বেশ জমে উঠেছে। আবার ভজুয়ার প্রবেশ। খুব নীচু গলায় বলে—দাদাবাবু একজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি অনেক করে বললাম আপনি বাড়ী নেই। উনি কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না। বললেন যতক্ষণ আপনি না আসেন উনি বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করবেন। এত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও লোকটা আমার কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে ওই বারান্দার বেঞ্চটায় এসে বসে রয়েছে। এখন বাবু কি করি? আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি? আপনি বাড়ীতে নেই। এখন আপনাকে দেখলে ও আমায় কি ভাববে, মিথ্যেবাদী ভাববে। দাদাবাবু লোকটা খুব জেদী আর রাগী। আমার কোন কথায়ই কান দিল না। খালি বলছে কখন মিঃ ঘোষ আসবেন? আমার যে ভীষণ দরকার। ওনাকে ছাড়া আমার চলবেই না। কখন যে...

এদিকে আমি মনে মনে ঠিকই করছিলাম হাতের গল্পটা শেষ করেই সোজা বেরিয়ে পড়ব। কোথায় যাব কি করব তার কোনই প্ল্যান ছিল না। কিন্তু এখন এই অপরিচিত লোকটার উপস্থিতি আমার সমস্ত প্রোগ্রাম ভেস্তে দিল, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওই হাঁদারাম ভজুয়ার উপর। বুদ্ধি বলতে ওর কিছুই নেই। মনে মনে ভীষণই ক্ষেপে গেলাম। আবার মনে মনে কৌতূহলও জন্মাল। কি দরকার ওই অপরিচিত লোকটার। দরকার থাকলে সোজা যেত অচীনের কাছে। আমার কাছে কেন মরতে এল? আমি ওকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি!

মনের ইচ্ছা মনে চেপেই বললাম—কি আর করবি ভজুয়া। যা লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আয়। তুমি আবার বেশী পাকামো করো না—যাও ঘরে নিয়ে

এস।

লোকটার চেহারাটা ভারী অদ্ভুত ধরনের, কি সুন্দর পোশাকের বৈচিত্র্য। মাথার টুপিটা খুব মজার, ওর কান মুখ সব ঢাকা। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। বাচ্চাদের বর্ষাতির মতো ওর বর্ষাতিটা। এ.বি.সি. লেখা। বুট জুতো পায়ে। লোকটি ঘরে ঢুকেই ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাতদুটো জোড় করে বলল—আপনিই মিঃ শঙ্খ ঘোষ? নমস্কার। আপনার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। আমি জানি আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারবেন। আপনি জানেন না আমি কি ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি।

আমি হাতদুটো জোড় করে তবু বললাম—আপনি বসুন। আপনি খুব ক্লান্ত। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তা ঠিক বলেছেন মিঃ ঘোষ। আমার মতো বিপদ যেন সাতজন্মের শত্রুরও না হয়। আপনি যদি দয়া করে আমার সব কথা শোনেন তাহলে অন্তত আমি বাঁচার আলো দেখব।

দাঁড়ান আগে এক কাপ গরম কফির ব্যবস্থা হোক, ওতে আপনার শরীরটা গরম হবে, মনটাও চাঙ্গা হবে। হ্যাঁ, এবার আপনি শুরু করতে পারেন।

লোকটি গলাটা বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করে...আমি হচ্ছি সিংহবাড়ীর নায়েব মশায়ের ছেলে। আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে ওই স্টেটের জমিদারীর সব দেখাশুনা করত। বলতে গেলে ওই বাড়ীতে আমি ছেলের মতোই মানুষ হয়েছি। জমিদার দুর্গা সিংহ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আর গিন্নীমা লতাবতী সিংহও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার বাবা ধ্রুব চৌধুরী শুধুমাত্র ওই বাড়ীর নায়েব ছিল না, বলতে গেলে ওই বাড়ীর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। সমস্ত ব্যাপারে বাবার সঙ্গে জমিদার বাবু আলাপ-আলোচনা করতেন। আসলে...জমিদারবাবু দুর্গা সিংহ আমাদের দক্ষিণেশ্বরে সুন্দর একটা বাড়ীও তৈরী করে দিয়েছিলেন। যতদিন বাবা নায়েব ছিল ততদিন আমরা ওই জমিদার বাড়ীতেই থাকতাম। বাবার মৃত্যুর পর আমার মা ও আমি ওই দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে গিয়ে উঠি। তবে জমিদার বাড়ীতে আজও আমার অবারিত দ্বার। গিন্নীমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। ওঁরা এত সন্তান ভালবাসতেন কিন্তু ওঁদের একটাও সন্তান হয়নি। সন্তানের জন্যে ওঁরা কত কি করতেন। তবে গিন্নীমা তাঁর বোনের ছেলেকে দত্তক নেন। ছেলেটির নাম সঞ্জীব। এতদিন ছেলেটি বিদেশে পড়াশুনা করতো। এই মাস দুয়েক হল এসেছে। জানেন মিঃ ঘোষ ছেলেটি বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। খুব একটা কথা বলে না। সব সময় আপন মনে থাকে। তবে দিনরাত বই হাতে বসে থাকে, দেখলে মনে হয় কারও ব্যাপারে ওর কোন নজর নেই। সব সময় উদাসীন। গিন্নীমা চান সঞ্জীব খুব কাছে থাকুক। মা বলে আদর করুক। না, না এসবের দিকে ওর মনই নেই। আমারতো

মনে হয় ওর মাথাটা ভাল কাজ করে না।

শুনেছিলাম গিন্নীমার বোন নাকি পাগল ছিলেন। পরে অবশ্য সঞ্জীবের বাবা-মা দুজনেই মটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তারপর থেকেই সঞ্জীব অন্যমনস্ক। কথা কম বলে। আমার ভয় হচ্ছে এই সঞ্জীবকে নিয়ে। ছেলেটির কখন কি হয়। গিন্নীমা নিঃসন্তান বলে ওঁর অন্য ভাইয়ের ছেলেরাও এই বাড়ীতে এসে বসবাস করছে। তাছাড়া জমিদারবাবুর দূর সম্পর্কের এক বোনের মেয়েও এখানে আশ্রিতা। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। গিন্নীমাও তাকে খুব স্নেহ করেন। তবে মেয়েটির সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করার অভ্যাস। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এই সব ব্যাপারেই ওর দৃষ্টি থাকে। চোখের দৃষ্টি বড় প্রখর।

এতক্ষণ ধরে আমি অর্জুন চৌধুরীর কথাগুলো একমনে শুনে যাচ্ছিলাম। এবার একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম, আমার কাছে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কি তা এখনও বুঝতে পারলাম না মিঃ চৌধুরী।

হ্যাঁ সব বুঝবেন। একটু ধৈর্য ধরুন, আমার এখানে আসার কারণ গত তিনদিন হল দুর্গা সিংহের বাগানবাড়ীতে ওঁর এক শালার ছেলে খুন হয়। তারপর নাকি ওঁর নামে একটা চিঠি আসে। তাতে নাকি সাবধানবাণী ছিল।

ছেলেটি খুবই ভাল ছিল। কোন সাতে-পাঁচে থাকতো না। খেলাধূলা নিয়েই ওর সময় কাটতো। তবে হঠাৎ ওই বাগানবাড়ীতে সে কেন গেল? ও খুনই বা হল কেন? এই প্রশ্ন জমিদারবাবুকে খুবই উত্তেজিত করে তুলেছে। ওঁর রাতের ঘুম ছুটে গেছে। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় মনমরা হয়ে বসে আছেন। আর গিন্নীমাতো কেঁদে কেঁদেই দিনরাত কাটাচ্ছেন। পুলিশকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ সব দেখেছে শুনেছে কিন্তু কিছুতেই খুনীকে ধরতে পারছে না। খুনী কে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে দুর্গা সিংহ তো মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দুর্গা সিংহ আমাকে কাছে ডেকে বললেন— পুলিশ এই খুনের কিনারা না করতে পারলে আমি অন্য পথ নেব। তখন আমিই আপনার কথা বললাম। উনি আপনার নাম শোনামাত্র আমাকে এই ঝড়-জলের রাতেই পাঠিয়ে দিলেন। তাইতো আমি এত কষ্ট করেও আপনার জন্যে অপেক্ষায় বসে ছিলাম। যাক দেখা হয়ে গেল। এবার আমার কাজ আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দুর্গা সিংহের কাছে হাজির করা। তাহলেই আমার কাজ আপাতত শেষ।

আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম—আপনি যার কাছে এসেছেন সে হচ্ছে এ্যাসিসটেন্ট মাত্র। আসল লোক হচ্ছে অচীন বোস। যেসব বিখ্যাত বিখ্যাত ডাকাতিও খুনের রহস্যের সমাধান করে থাকে সে হচ্ছে অচীন বোস। আর আমি হচ্ছি তার সঙ্গী। আমি ওকে ছাড়া যেমন চলি না, তেমনি অচীনও আমাকে ছাড়া চলে না। কিন্তু এই বৃষ্টিতে কি করে ওদের বাড়ীতে যাই। আপনার তো কষ্ট হবে।

অর্জুন চৌধুরী বলে ওঠে—না, না কোন রকম অসুবিধে হবে না। চলুন বেরিয়ে পড়ি। গায়ে বর্ষাতি থাকলে বৃষ্টি কোথায় লাগবে? আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে।

বর্ষাতি চাপিয়ে সবেমাত্র বের হতে যাব ঠিক তখনই ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ভজুয়া ফোনটা তুলেই বলল—অচীন দাদাবাবু ফোন করছে। আমিতো লাফিয়ে ফোনটা তুলেই বললাম—বস্ কোথা থেকে বলছ? একবার যদি দয়া করে এই অধমের বাড়ীতে চরণধূলো দাওতো খুশী হব। অচীনের গলার স্বর গম্ভীর। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলে—জানিস মনটা ভাল নেই। আমার বিশেষ পরিচিত একজন খুন হয়েছে। ছেলেটিকে আমি চিনতাম। হঠাৎই আমার নামে আজ একটা অদ্ভুত চিঠি এসেছে। চিঠির লেখাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বুঝতে পারছি না কিভাবে ছেলেটা খুন হল। যতদূর জানি ও খুব ভাল ছেলে। খুনটা হয় দুই দিন আগে। চিঠিতে এই কেস্‌টা টেক-আপ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে যে লিখেছে—তার কোন নাম নেই। শুধু লেখা, এই খুনের খুনীকে ধরতে পারলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। দেখা হলে অনেক কথা হবে। ভাবছি আজই সাহেবগঞ্জে আমাকে যেতে হবে। আমিতো উৎসাহে লাফিয়ে উঠে বলি—সে কিরে অচীন? এই ব্যাপারে তোকে আমিও হেলপ্ করতে পারি যদি এখানে আসিস্‌তো, এই একই ঘটনা নিয়ে একজন ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছে। তুই চলে আয়। অচীন একটু ইতস্তত করে বলে—না, আমার ব্যাপারটা গোপন রাখ। তোরাই বরং চলে আয়। না থাক। ট্রেনে যেতে যেতেই সব কথা হবে। তাহলে ষ্টেশনেই দেখা হচ্ছে। গুড্ বাই। খট্ করে লাইনটা কেটে যায়। আমার মনটা নতুন রহস্যের সন্ধানে আরও বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ষ্টেশনে এসে অপেক্ষা করছি কখন আমাদের অচীন বোসের দেখা পাব। অর্জুন চৌধুরী অস্থিরচিত্তে প্রায়ই বলতে থাকে—কি মিঃ ঘোষ উনিতো এখনও এলেন না। তাহলে কি...

সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে অচীন হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে বলে—কি মিঃ ঘোষ? আমি একটু হেসে বলি—আয় আলাপ করিয়ে দিই উনি হচ্ছেন অর্জুন চৌধুরী আই মীন্। না বলতে হবে না। সিংহ বাড়ীর এইতো। অর্জুন অবাক বিস্ময়ে অচীনের দিকে তাকিয়ে বলে—কি করে বুঝলেন যে আমি সিংহ বাড়ী থেকে। আপনার হাতের খামটা সেই কথাই বলছে। অর্জুন থতমত খেয়ে হাতের খামটার দিকে তাকিয়ে বলে—যা। এটা মিঃ দুর্গা সিংহ আমাকে নিজের হাতে লেটার বক্সে পোষ্ট করতে বলেছে। আর আমি কিনা ভুলেই গেছি। ফরম লেখাটা দেখেই বুঝলাম। অর্জুন একটু থমকে বলে—বাঃ! আপনার অদ্ভুত

বিচারশক্তি, সত্যিই প্রশংসা না করে পারছি না। এটা ঠিক আপনি আজ মেঠো পথে এসেছেন? কেন বলুন তো? বৃষ্টিতে ভিজলেও মাঠের উপর দিয়ে না এলে জুতোতে এখনও ঘাসসহ কাদা লেগে থাকতো না। ওরা রাত দশটায় ষ্টেশনে এসে নামে। সিংহ বাড়ীর গাড়ী ঠিক দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার এসে সেলাম ঠুকে বলল—চলিয়ে। আমি হেসে বললাম—তুমি স্বচ্ছন্দে বাংলা বলতে পার। কোন অসুবিধে নেই, এখানে আমরা সবাই বাঙালী। গাড়ীতে বসে অচীন নিজের মনেই বলল—বাঃ রাস্তাটাতো দারুন। দুইদিকে গাছের সারি। তার ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের আলো, কি মনোরম দৃশ্য। কিরে শঙ্খ কেমন লাগছে? অর্জুন একটু হেসে বলে—এতো বাবুর বসতবাড়ী। তবে বাগানবাড়ীর রাস্তা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। চাঁদনী রাতে দারুণ লাগে বাড়ীটা।—আপনি বুঝি প্রায়ই ওই বাড়ীতে যান?—হ্যাঁ না যাওয়ার কি আছে! ওখানেই থাকি। তার উপর বাবুর বলা আছে ওখানে গিয়ে সব খোঁজ খবর নিতে।

—তা খুনের খবরটা প্রথম কে পায়? আপনিই?

—তা বলতে পারেন আমিই। বাড়ীর কেয়ার টেকার অশোক পাণ্ডেই খবরটা দেয়। বলে, বাবুর জলসাঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে ওই অমল ওখানে মরে পড়ে আছে। কিভাবে? তা অত সব জানিনা, আমি এই খবর পেয়েই সোজা চলে আসি সাহেবগঞ্জে। বাবুকে খবর দিয়েই থানায় যাই, তারপর সাহেবগঞ্জে ফিরে আসি।—খুন কিভাবে হয়েছিল? আর পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে কি ছিল? ছুরিকাঘাতে না গুলিতে? অর্জুন একটু ইতস্তত করে বলে—আমি হচ্ছি ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী, এইসব বলতে গেলে খুব কষ্ট হয়। তারচেয়ে আপনি দুর্গা সিংহের কাছেই সব জানতে পারবেন। তাছাড়া ওই অমল খুব আত্মভোলা টাইপের ছেলে ছিল। ও যে খুন হতে পারে এটা ভাবাই যায় না। তবে কেন যে ও ওখানে গিয়েছিল সেটা আজও রহস্যজনক। তবে ওর গান বাজনার খুব সখ ছিল, তার সাথে ছবি আঁকারও। অচীন ফের প্রশ্ন করে—খুনটা কিসে হল? পোষ্টমর্টমের রিপোর্টতো বলছে কোন বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। বিষটা কেউ শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেরেছে। এ এমন মারাত্মক বিষ যাতে পাঁচ মিনিটও কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আমারতো মনে হচ্ছে কেউ ইনজেকশন দিয়ে খুন করেছে।—হ্যাঁ ঠিক তাই, কোথায় ওটা দেওয়া হয়েছিল কিছু বলতে পারেন?—ডাক্তারতো বলল ওটা কানের পাশে দেওয়া হয়েছিল।—বাঃ খুনীর খুব পাকা হাত! তাই না বলুন? অচীনের কথায় শঙ্খ হেসে বলে—দূর ছাড়তো, এখন বল কেসটা আমরা কিভাবে টেকআপ করবো। আমার কিন্তু বেশ লাগছে। অচীন শঙ্খকে থামিয়ে বলে—তোর ছেলেমানুষী সবসময় ভাল লাগে না। একটু সিরিয়াস হ। শঙ্খ চুপ করে যায়। বুঝতে পারে অচীন এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে

প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকে আর তার সাথে অর্জুনের সঙ্গে সমানতালে গল্প চালিয়ে যায়।

গাড়ীটা জোরসে ব্রেক কষতেই সকলের হুঁস ফিরে আসে। আমরা অর্জুনের পিছন পিছন এগোই। মিঃ দুর্গা সিংহতো আমাদের দেখে আনন্দে খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষণ্নতায় ভরে যায় ওঁর শরীর ও মন। শুধু নমস্কার বিনিময় করে বসতে বলেন। অর্জুন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়। দেখে মনে হল অর্জুন দুর্গা সিংহের খুব ভক্ত। কেমন যেন গদ্‌গদ ভাব। খুব বেশী বিনয়ী। দুর্গা সিংহ শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে বলে—কাল সব কথা হবে। আমার অনেক কথা বলার আছে। মনে হয় আমার কথাগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে। জানিনা এরপর টার্ন কার দিকে। খুব ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করছি। এই বাড়ীতে অভিশাপ নেমে এসেছে। এরপর কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। শুধু এইটুকু ভরসা যে আপনারা এসে পড়েছেন।

পরের দিন কয়েকজন নতুন মুখের সঙ্গে আলাপ হল। অচীন আর আমি নিজেদের মধ্যে গল্প করছি। হঠাৎ মনে হল জানালার বাইরে দুটো চোখ ওদের ঘরের সবকিছু লক্ষ্য করছে। অচীন আমাকে থামিয়ে বলল—কে ওখানে? ভিতরে আসুন না। কোন লজ্জা নেই। অচীনের এইসব কথা শোনার আগেই চোখ দুটো সরে গেল। অচীন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল আর বলল—আবার আসবে কোন চিন্তার কারণ নেই। বল কি বলছিলি? কথা বলার আগেই দুর্গা সিংহ নিজে এসে হাজির হলেন। আমি একটু লজ্জা পেয়েই বললাম—আপনি আবার কষ্ট করে উঠে এলেন কেন, বললেইতো পারতেন আমরা যেতাম।

দুর্গা সিংহ খুব সন্তর্পণে বললেন—এবার আমার কিছু কথা শুনুন ঃ প্রায় কয়েকশ' বছর আগে আমার পূর্বপুরুষদের রাজত্বে বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খেত। ওঁরা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মানুষ ছিলেন। তবে আমাদের পারিবারিক ঐশ্বর্য্য হচ্ছে লক্ষ্মীর গলার প্ল্যাটিনামের হার। আপনারাতো জানেন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু প্ল্যাটিনাম। ওই হারটা বোধ হয় পনেরো ভরি। দাদুর আমলে ওটা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতেই রাখা হতো, তবে শুনেছি ওটার উপর রাজা-রাজরাদেরও লোভ ছিল। তাই আমার বাবা ওটাকে কোথায় রেখে গেছেন তার হদিস আজ পর্যন্ত পেলাম না—তবে বাবা মৃত্যুর সময় আমার হাতে সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটা কাগজ দিয়ে গেছেন। আর বলে গেছেন ওটা যে পাবে তার কাছেই লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে থাকবে। তবে আমি এই সাংকেতিক ভাষার সঠিক মানে আজও বুঝে উঠতে পারিনি। আর ওটা পড়ে কোন মানেও খুঁজে পাইনা। আমি জানি ওতেই সব মানে আছে। বাইরের কাউকে দেখাতেও ভয় পাই। শুধু তোমাদেরই কাছে বলছি। একটা

বিদঘুটে লেখা আপাতদৃষ্টিতে যার কোন এক পয়সাও মূল্য নেই। তবে এই সাংকেতিক লেখাটার কথা এই বাড়ীর সবাই জানে। কিন্তু কোথায় আছে তা কেউ বুঝতে পারছে না। আজ মনে হয় ওর জন্যেই বোধ হয় অমলটার প্রাণ গেল। এই পর্যন্ত বলে দুর্গা সিংহ আর বলতে পারেন না।

অচীন একটু থেমে বলে—ওই সাংকেতিক লেখাটা আমায় দিন আমি ওটা নিজের চোখে দেখতে চাই।

অচীন কাগজটা পকেটে রাখে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে—ওটা এখানে না খোলাই ভাল। নিজের ঘরে গিয়ে দেখবোখন। দুর্গা সিংহ ফের বলতে শুরু করেন—আপনারা সবই শুনেছেন অর্জুনের কাছে। আমি নিঃসন্তান। তবে আমাদের দত্তকপুত্র হচ্ছে সঞ্জীব। ওর কোন দিকে লোভ নেই। দিন রাত পড়া, পড়ার কথা। যদি কখনো বিষয় সম্পত্তির কথা ওঠে তাহলে তো সঞ্জীব রেগে যায়। বলে, কেন তোমরা আমার জন্যে এত ভাবছ। আমি বিষয়-সম্পত্তি তেমন ভালবাসি না। তবে বাপী তোমার ওই সাংকেতিক লেখাটা দারুণ লাগে। যদি একবার মানেটা ধরতে পারতাম, তাহলেতো দারুণ একটা কিছু ঘটতো। এই নিয়েই ওর যত কথাবার্তা, তারপরই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। তবে ললিতা-মার সব বিষয়ে নজর। আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গে? নাহলে চলুন না। অচীন বাধা দিয়ে বলে—পরে হবে, আছি তো।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি অচীন একমনে কিসব দেখছে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে নিজেই দেখতে গেলাম। সাংকেতিক লেখাটা হচ্ছে এমন ঃ "South God Garden pot's answer before angle water Ocaen's cow-eye's side অথবা বন্ধুদের open's inside..." অচীন এটা নিজের নোট বইতে টুকে রাখে। তারপর বিড় বিড় করে আপনমনে বলতে থাকে—দক্ষিণ ঈশ্বর বাগানবাটির উত্তরপূর্ব কোণের জলসাঘরে গো-অক্ষের পাশে অর (Or) Geems খোলের ভিতর..."

পরের দিন দুর্গা সিংহ আমাদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর চললেন। সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবারও নিলেন, কারণ অচীন বলেছে আজ রাতটা ওরা বাগানবাড়ীতেই কাটাবে। গাড়ী ছুটে চলে সাহেবগঞ্জের ভিতর দিয়ে। সঞ্জীবও সঙ্গে চলেছে। বেশ ভাল ছেলে, মিষ্টিভাষী, মিষ্টি ব্যবহার। ওরও অদম্য কৌতূহল এই সাংকেতিক লেখনীটার উপর। অচীন আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শুধু এই তিনদিনেও ললিতাজীর দেখা মিলল না। সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে অচীন বলল—হয়তো ললিতাজী খুব লাজুক তাই না সঞ্জীববাবু? সঞ্জীব উদাসীনভাবে হেসে বলে—ওসব ব্যাপারে আমি তেমন আগ্রহী নই। ভাবছি কিছুদিন থেকে, বিদেশেই চলে যাব। শুধু বাপী আর মার জন্যে যেতে পারছি না, ওরা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কথার সাথে সাথে গাড়ীও তীব্র

গতিতে চলতে থাকে। বাগানবাড়ীটা সত্যিই দেখার মতো। দেখলেই মনে হয় জমিদাররা কিভাবে পয়সা উড়াতো। সমস্ত বাড়ীটা দেখতে দেখতে ওরা সর্বশেষে এসে ঢোকে জলসাঘরে। চারিদিকে ঝাড়লণ্ঠন, কত দামী দামী আসবাবপত্র। মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা, জলসাঘরে নাচার জন্যে একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে। নাচতে নাচতে কেউ উপর দিয়ে ভেতরে যাবে না। তারা সিঁড়ি দিয়ে নাচার ভঙ্গীমায় মাটির তলার ঘরে গিয়ে উঠবে। তবে মাঝখানে যে সিঁড়ি আছে তা বোঝার উপায় কারও নেই। প্রথম নজর পড়ল অচীনেরই। দুর্গাবাবুকে বলতেই উনি বুঝিয়ে বললেন সমস্ত ব্যাপারটা। পিয়ানোটার দিকে তাকিয়ে অচীন আনন্দে উল্লাসে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল—মনে হয় সব বুঝতে পারছি, জানি না কতখানি সফল হব।

দুর্গা সিংহ এই বাগানবাড়ীতে থাকতে একদমই ভালবাসেন না। বললেন—অচীনবাবু আপনারা যদি থাকতে চান থাকুন না। কোন অসুবিধে হবে না। তবে আমার মন এখানে থাকতে চায় না, লতাবতী, ললিতা সব ভয় পায়। পাছে যদি আবার কিছু ঘটে তাই...শেষ পর্যন্ত কথা হল সঞ্জীব আর আমি থাকবো। অচীন খুব একটা জরুরী কাজে দুইদিন বাড়ী ঘুরে আসবে। এদিকটা আমি সামলাব, অচীনকে প্রশ্ন করলাম কেন যাচ্ছে কিসের জন্যে? জানতাম অচীন কিছুই বলবে না। ও কোন কাজ করার সময় কোন কথাই বলতে চায় না, অন্য সময় ওর মতো মজাদার মানুষই হয় না। ললিতাজী একদিন এসে হাজির। খুব সহজভাবে আলাপও হল। ললিতা প্রথম আলাপেই বলল—পারলেন রহস্যের কোন সমাধান করতে? পারবেন না। আমি জানি পারবেন না, যদি পারেন তাহলে অমলের আত্মা শান্তি পাবে। সেদিনটা বেশ ভালই কাটল। সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। আমি আমার ঘরে শুয়ে। সঞ্জীবও আলাদা ঘরে শুয়ে আছে।

সঞ্জীবের ঘুম আসে না। বাইরের বারান্দায় আসে, পূর্ণিমার রাতে প্রকৃতির শোভা দেখতে কার না ভাল লাগে। সঞ্জীব হঠাৎ দেখতে পায় এক দীর্ঘদেহী মানুষ এই বাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসছে। সঞ্জীবের বুঝতে ভুল হয় না, মনে মনে ভীষণ উত্তেজনা। ভাবে তাহলে এই মূর্তিটাই সেদিন অমলকে খুন করেছিল। না আর এক মুহূর্ত নয় এখনই, হ্যাঁ এখনই ওকে ধরতে হবে। নইলে ও কোনোদিনই শান্তি পাবে না। তাই সঞ্জীব কোন রকম শব্দ না করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসে। আরে—জলসাঘরে মৃদু আলো কেন? তাহলে ওখানেই খুনী লুকিয়েছে, সঞ্জীব বাইরের জানালা দিয়ে দেখে একটা মানুষ সমস্ত ঘরটা তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজছে, আর প্রতিবারই হতাশ হয়ে মুখটা বিকৃত করে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে। সঞ্জীব কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ওর হাতে

রিভালবার, গুলি ছোঁড়ার আগেই ঘরের মানুষটা গর্জন করে উঠে এগিয়ে আসে সঞ্জীবের কাছে। সঞ্জীব চীৎকার করে ওঠে, একটা যন্ত্রণাকাতর চীৎকারে গোটা বাড়ীটা ছেয়ে যায়, কিন্তু ওকি, গুরুম, গুরুম, গুরুম, এই গুলির ঘায়ে ঘরের আলোটা নিভে যায়, গোটা বাড়ীটা জেগে ওঠে। আমি দৌড়ে নিচে নামি, অন্ধকারেই একটা চেনা হাতের স্পর্শ পাই, বুঝতে বাকী থাকে না এই সেই আমার একান্ত আপন জন। ফিস্‌ফিস্‌ গলায় প্রশ্ন করি—তুমি এত রাতে কি করে এলে? অচীন চেনা হাসিটা ছুঁড়ে বলে—এখন তো আসিনি, এসেছি বহুক্ষণ, এই বাড়ীটার আশেপাশেই বেড়াচ্ছিলাম, দূর থেকে তোমাদের দেখেছি, তবে এতক্ষণ অপেক্ষা না করলে খুনীকে ধরা যেত না। যাক এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আর মাথাব্যথা নেই, এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে শঙ্খ, চল শুয়ে পড়ি গিয়ে। আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি—জলসাঘরে সঞ্জীব পড়ে আছে। বেচারা হয়তো মারাই যেত, তুই না থাকলে কি যে হতো, আমি এই মুখ মিঃ সিংহকে দেখাতেই পারতাম না, কি ভাবতেন উনি কে জানে। অচীন ফের হেসে বলে—না সঞ্জীবের কিছুই হয়নি, ও ভালই আছে। ওটা ওর মনের ভয় ছিল। কিছু ঘটতো তবে ঘটতে দেওয়া হলো না, খুনী পূর্ণিমার রাতটা বড় ভালবাসে। তবে একটা কথা জেনে রাখ শঙ্খ খুনী আজ আমাদের ঘরেও আসবে। খুব সাবধান, একটু খেয়াল রাখিস। তোর যা কুম্ভকর্ণের ঘুম।

সত্যি বলতে কি যেমন কথা তেমনি কাজ। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা আমার চোখ জুড়ে নেমে এল। আর ওদিকে বেচারা অচীন সেই সাংকেতিক ভাষার কাগজটা নিয়ে টেবিলে বসে আপনমনে কি সব লিখতে লাগল। কতবার যে কাটছে আর লিখছে তার ইয়ত্তা নেই, একসময় ওর কঠিন মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, হয়তো বিপদ কেটে গেছে, যাক খুনী ভয়ে আসবে না, না এলেও ক্ষতি নেই। হঠাৎ জেগে দেখি অচীন বিছানায় নেই, তাহলে গেল কোথায়? এদিক-ওদিক খুঁজছি, না কোথায়ও নেই। অচীন নিঃশব্দে জলসাঘরে এসে ঢোকে, চারিদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে থাকে, অরগানটা ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, এক সময় অচীনের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে। অচীন হঠাৎ টের পায় পিছন থেকে কে যেন ওকে আক্রমণ করতে আসছে, ও এক মুহূর্তও দেরী না করে সোজা রিভলবার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মুখোমুখি। গোটা দেহটা সাদা কাপড়ে ঢাকা, তবে এরই মধ্যে চালাক খুনী আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে, অচীনকে ঘুষি মারার তাক করতে গিয়ে নিজের ঘুষিটাই গিয়ে পড়ল সাইডে টেবিলে। একটা অস্পষ্ট উঃ শব্দও বেরিয়ে এল। অচীন রিভলবারটা খুনীর দিকে তাক করেই বলল—আমি জানতাম তুমি ফের আসবে। কিন্তু ওটাতো ফেরত পাবে না। ওটা থানায় জমা পড়বে।

পরিচিত কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে বলে—ওই প্ল্যাটিনামের হারটা আমারই প্রাপ্য। আপনি হয়তো জানেন না আমার বাবা এই ব্যাপারটা জানতো কিন্তু কোনদিন ওই সাংকেতিক ভাষাটা বুঝতে পারেনি। তবে আমি এটা বুঝেছি ওই জিনিসটা এই ঘরেই আছে। ওটা আমারই পাওয়ার কথা। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না ওটা অন্য কেউ পাক। বাবা মৃত্যুর সময় বলে গেছে—তোর উপর ভরসা। ওটা তুই যদি উদ্ধার করতে পারিস তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো। আমি জানি ওই সাংকেতিক ভাষার মানে স্বয়ং জমিদার দুর্গা সিংহও জানেন না। আমাকে বহুদিন এটার সম্পর্কে কথা বলেছেন। বলেছেন কেন যে আমার বাবা অমনভাবে ওটা লুকিয়ে রেখে গেলেন। মনে হয় ওটা ভোগ করা আমার ভাগ্যে নেই। ওটা যে পাবে তার লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হয়ে উঠবে। এতখানি বলে খুনীর কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে আসে। করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে—মিঃ বোস, আপনি আমাকে বাঁচান। আমি এই নরক থেকে মুক্তি পেতে চাই। দয়া করে ওটা...তানাহলে আমি আমার পিস্তল চালাব। এখনও বলুন ওটা দেবেন কিনা। ওটা ফেরত দিন । অচীন রসিকতার সুরে বলে—কোনটা অর্জুনবাবু?

প্ল্যাটিনামের হারটা...ওঃ ওটা আপনি জানেন কোথায় আছে। এই ঘরেই তাই না মিঃ বোস? প্লীজ ওটা আমায় পেতে দিন। ওটা পেলে এই জীবনে আমার আর কোন কিছুই অপূর্ণ থাকবে না।—না অর্জুনবাবু ওটা আপনার প্রাপ্য নয়। ওটা পেতে পারেন শুধুমাত্র মিঃ দুর্গা সিংহ।

একটা হিংস্র চীৎকার বেরিয়ে আসে। না, না, কিছুতেই না। এত অনুরোধেও যখন অচীন ওর কথায় সায় দেয় না। তখন অর্জুন ওই অন্ধকারেই অচীনকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে প্রস্তুত হয়। আর কঠিন গলায় বলে চলে—ওটা আমি সঞ্জীবকে ভোগ করতে দেব না। ওটা আমার। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দে নিস্তব্ধ বাড়ীটা যেন চমকে উঠল। পর পর তিনবার গুলির আওয়াজ।

আমি জেগে গিয়েই অচীনের পিছু নিয়েছিলাম। নিঃশব্দে জলসাঘরের বাইরে জ্যোৎস্নার আলোয় সবকিছুই নজর রাখছিলাম। গুলির শব্দে বুঝলাম আর দেরী করা চলে না। পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার। তবে এটাও বুঝেছি অচীন অক্ষতই আছে। ওর সব কয়টাই মিস্ ফায়ার হয়েছে। না পুলিশদের খবর দিতে হল না। অচীন আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। মিঃ সামন্ত এগিয়ে আসে। ওদিকে কেয়ারটেকার অশোক পাণ্ডে, সঞ্জীব সবাই দৌড়ে নেমে এসেছে। সঞ্জীবের মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ। কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

অস্পষ্ট গলায় আমার পাশে এসে বলল—কি হয়েছে মিঃ ঘোষ?

আমি হেসে বলি—খুনী ধরা পড়েছে। আর কোন ভয় নেই সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় বলে ওঠে—সত্যিই ধরা পড়েছে। তাহলে খুনী...

একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের খুনীকে চিনতে কোন ভুল হবে না। খুবই পরিচিত। জলসাঘরের ঝলমলে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। সবাই বিস্ময়ে তাকায় খুনীর দিকে। সকলের চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়! এও কি সম্ভব! ততক্ষণে মিঃ দুর্গা সিংহ লতাবতী ও ললিতা সব এসে হাজির।

ললিতা রুক্ষমূর্তিতে ঘরে ঢুকে সকলের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি জানতাম এই খুনী। আমি জানি অমলকে ওই খুন করেছে। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দুর্গা সিংহ, ওকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দেয়। ললিতা শান্ত গলায় শুধু বলে—এতদিন ধরে আমি শুধু এই শয়তানটাকে খুঁজেছি, পাইনি। আজ হাতের মধ্যে পেলাম। প্লীজ আমাকে একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দাও। ওটা ওর দেহে ফুটিয়ে অমলের আত্মার মঙ্গল কামনা করব। তানাহলে অমলের আত্মা হয়তো শান্তি পাবে না। দাও আমাকে একটা অন্তত গুলি দাও নয়তো ওটা...

অচীন এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিল। এবার ললিতার খুব কাছে এসে বলে—আমি কিন্তু এই বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝেছিলাম—খুনী এই বাড়ীতেই থাকে। তাছাড়া ললিতাজী, আপনার চিঠিটাও যথাসময়ে পেয়েছি। তারপর অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। ওকে প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি। ওর চালচলন কথাবার্তায় সব কিছুতেই একটা উত্তেজনা অস্থিরতা দেখতে পেয়েছিলাম।

অচীন যেই ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা পকেট থেকে বার করে মিঃ সামন্তের হাতে দিয়ে বলেন—ওটা সবাই লক্ষ্য করুন। মারাত্মক সাপের বিষ। এই ওয়ান সি.সি দিলেই কোন মানুষ পাঁচ সেকেন্ড বাঁচতে পারবে না। অমল যার জন্যে কিছুই বলে যেতে পারেনি। অর্জুন কটমট দৃষ্টিতে অচীনের দিকে তাকায়, ওর চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। ছাড়া পেলে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মিঃ সামন্ত অর্জুনকে হাতে হাতকড়া পড়িয়ে জীপের দিকে এগিয়ে যায়। যাবার আগে মিঃ সামন্ত একবার অচীনের দিকে তাকিয়ে বলে—আচ্ছা মিঃ বোস এ খুনী হয়েও কেন আপনাদের সাহায্য চাইছিল। অচীন একগাল হেসে বলে—এটা খুনীর চালাকি। কারণ দুর্গা সিংহ খুনের তদন্ত করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া উনি ওর প্রতি খুব বিশ্বাসী ছিলেন। খুনী ভেবেছিল ওকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ ও এই বাড়ীরই একজন হয়ে থাকত। তবে ললিতাজী ওকে একদমই পছন্দ করতেন না। তবে মুখে সে কথা বলার মতো সাহসও ছিল না, কারণ ওঁর কথা কেউই বিশ্বাস করতো না। আর বেচারা অমল গানবাজনার জন্যই এই জলসাঘরে এসেছিল—কিন্তু অর্জুনের মন সন্দেহকাতর, সে ভাবল হয়তো ও ওরই মতো কোন কিছুর সন্ধানে এসেছে, যেই ভাবা তেমনি কাজ, তাছাড়া অর্জুন খুব ভাল ইনজেকশন দিতে

পারে। তার প্রমাণ দুর্গা সিংহ বলেছেন, ওঁর অসুখের সময় এই অর্জুনই নাকি ইনজেকশন দিত, এটাও আমার মনে প্লে করে। তারপর একদিন লুকিয়ে অর্জুনের বাড়ীতে যাই এবং ওর বাড়ীতে এই ধরনের নিড়িল দেখতে পাই, আমার সন্দেহটা তখন একেবারে পাকা হয়ে যায়। তারপর থেকেই ওকে আমি লক্ষ্য করতে থাকি।

জলসাঘরটা থমথমে, লতাবতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। ললিতাও খুব ক্লান্ত। দুর্গা সিং মাথায় হাত রেখে বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এ কি করে সম্ভব হল বলুনতো, ওই অর্জুনকে আমি ছোটবেলা থেকে ছেলের মতোই দেখতাম, ওকে খুবই স্নেহ করতাম। আর ওই কিনা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তবে এতদিন কি দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি? না, না এ আমি ভাবতেই পারছি না। হ্যাঁ তবে এখন মনে পড়েছে ধ্রুব নামে আমার নায়েব ছিল আমার বন্ধুর মতো, ওর মনোগত বাসনা ছিল আমি ওর ছেলেকেই দত্তক নিই। কিন্তু আমার স্ত্রী তাতে রাজী ছিল না। তবে এটাও ঠিক অর্জুন কোনদিনই সঞ্জীবকে ভাল চোখে দেখতো না। প্রায়ই বলতো সঞ্জীব আর পাঁচজনের মতো নরম্যাল নয়। কিন্তু সঞ্জীব ওর সম্পর্কে কোনদিনই কোন অভিযোগ করতো না। অবশ্য এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তেমন মাথাও ঘামাতাম না। তবে ললিতা-মা ওকে একদমই পছন্দ করতো না। আমি ভাবতাম ওটা ওর হিংসে, আমি আর আমার স্ত্রী মনে মনে দুজনেই ঠিক করেছিলাম ললিতার সঙ্গে অমলের বিয়ে দেব। তা আর হল না। এতখানি বলেই দুর্গা সিংহ থেমে গেলেন।

অচীন সবার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি কিন্তু আপনাদের ওই সাংকেতিক ভাষার মানে বুঝতে পেরেছি। দুর্গা সিংহ আঁতকে উঠে বলে—সত্যিই মিঃ বোস? পেরেছেন? এতো সাধারণ কথা নয়। আমি আমার শেষ বয়সেও যা পারলাম না, আর আপনি! আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন মিঃ বোস, এতো আমার স্বপ্নেরও অতীত। বলুন মিঃ বোস।

অচীন ফের ওই সাংকেতিক ভাষাটা পড়ে বলে "South God Garden pot's answer before angle water Ocean's cow eye's side অথবা বন্ধুদের open's inside, এটার বাংলা ও ইংরাজী করলে দাঁড়ায়। দক্ষিণ ঈশ্বর বাগানবাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোন জল সাগর গো-অক্ষের পাশে Or Geen আলোর ভিতর। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণের গবাক্ষের পাশে অরগানের খোলের ভিতর।"

প্ল্যাটিনামের হারটা এই অরগানের ভিতর আছে, খুললেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে মিঃ সিংহ, এই খবরটা অর্জুনও জানতে পেরেছিল। ও শুধু জানতো এই জলসাঘরে আছে, তবে কোথায় আছে সেটাই ও খুঁজে বেড়াত, কিন্তু যেদিন অমলকে দেখল সেদিনই ওর মনে সন্দেহ জাগে হয়ত অমলও ওরই মতো ওটা খুঁজছে, আসলে

বেচারা এসব কিছুই জানত না। তাই ওকে মরতে হল, তারপর সঞ্জীবের দিকে ওর নজর গেল, সঞ্জীব ওকে ধরার জন্যই এই ঘরে ঢোকে কিন্তু ওভাবে প্ল্যাটিনামের হারটার জন্যেই, তাই ওকে মারতে গিয়ে সফল হল না, ধরা পড়ল।

দুর্গা সিংহ সবার সামনে অরগানের ঢাকনা খুলে ফেলে। সত্যিই এতদিনের রক্ষিত ওই মহামূল্যবান প্ল্যাটিনামের হারটা বেরিয়ে পড়ে। ঝকঝকে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মারতে থাকে। ঘরের সবাই অবাক হয়ে ওঠার দিকে তাকিয়ে থাকে। দুর্গা সিংহ খুশী হয়ে অচীন আর শঙ্খকে জড়িয়ে ধরেন। আর বলেন—আপনাদের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ। এই ঋণ কি দিয়ে যে শোধ করব ভেবে পাচ্ছি না, বলুন কি পেলে আপনারা খুশী হবেন। অচীন দুর্গা সিংহের হাতদুটো ধরে বলে—শুধু আপনার ভালবাসা ও এই বাগানবাড়ীতে ইচ্ছামতো থাকা। ব্যস আর কিছু নয়। আর একটা কথা অমল আমার বন্ধুর মতো, ওকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। ওর খুনীকে ধরতে পেরে আমি নিজেই খুশী। আপনারা না ডাকলে আমি নিজেই হাজির হতাম। তবে আজ আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

কিন্তু মিঃ দুর্গা সিংহ ওদের কিছুতেই ছাড়েন না, দিন সাতেক আটকে রাখেন ও পুরস্কার হিসাবে বিশ হাজার টাকাও দেন।

রহস্য রজনীগন্ধার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভোরে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং রাত সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে-না-বাজতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই যে ঘুম ভাঙে, হাজার এপাশ-ওপাশ করলেও আর ঘুম আসে না। আমি তখন শয্যাত্যাগ করে কখনও ছাদে যাই, কখনও-বা বাগানে পায়চারি করি। এই সময় আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করে। আমার সবরকমের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য রাখহরি আছে। কিন্তু সে বেচারা তখন এমন অকাতরে ঘুমোয় যে, ওকে ডাকতেও আমার মায়া হয়। ছেলেমানুষ তো! আমি তাই নিজেই এক কাপ চা করে খাই।

আজ ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। তিনটেয়। কেন এমন হল? অথচ খুব একটা বেশি রাতেও ঘুমোইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের

একটু ব্যবস্থা করে যখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হল, ঘুম যখন ভাঙেই আর উঠতেও যখন হয় তখন এইভাবে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিলে কেমন হয়? মনে হওয়ামাত্রই আমার শরীরচর্চার সঙ্গে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিলাম।

ডেকে তুললাম রাখহরিকে।

ওকে দরজায় খিল দিতে বলে আমি বাইরে বেরোলাম। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চৈত্রের প্রথম। তবুও মনে হচ্ছে, যেন মধ্যরাত। পাখিরা সবে জাগছে। দু-একজন সাইকেল আরোহী টিং-টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে কোথায় যেন গেল। যে যেখানেই যাক, আমি আমার পথচলা শুরু করলাম।

মৌড়িগ্রাম এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুনভাবে তার চেহারা পালটাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে রথতলার দিকে চললাম। হাঁটাটা একটু রপ্ত হয়ে গেলে আরও দূরে খটির বাজার কিংবা প্রশস্তর দিকে চলে যাব। প্রশস্তর মূর্তি মহল্লা-বিখ্যাত।

মৌড়ি রথতলার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন হঠাৎই একটা বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম গেঞ্জি ও শর্টস পরা এক যুবক একজনের বাড়ির দোতলা থেকে কিছু একটা বেয়ে নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির গায়ের রং কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। ও যে চোর এবং চুরি করতে এসেছিল তা বোঝাই গেল।

আমি ধীরে-ধীরে সেই বাড়িটার দিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওপরের ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। বোধ হয় গরমের জন্য। আর বারান্দার সঙ্গে লোহার হুকে আটকানো একটা নাইলনের ফিতে বাইরের দিকে ঝুলছে। চোর পালাবার সময় এটা না নিয়েই চলে গেছে। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। আরে, এ যে প্রোফেসর এম.এল. বোসের বাড়ি! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু শুনেছি উনি অত্যন্ত গুণী মানুষ। হাওড়ারই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁর কোচিং-এরও নামডাক আছে খুব।

একবার ভাবলাম চোরটার পেছনে একটু তাড়া লাগালে হত! যদিও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠতাম না, তবু একটা শোরগোল ওঠানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, তখন আর কিছুই করবার ছিল না আমার।

আমি অনেকক্ষণ সেই জায়গাটায় পায়চারি করে আকাশ একটু ফরসা হলে প্রোফেসরের বাড়ির দরজায় নক করলাম।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

তারপর সদ্য ঘুমভাঙা এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাই?"

"প্রোফেসর বোস আছেন?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। তখন তো দেখা হবে না। বেলায় আসবেন।"

"ওকে একবার ডাকুন, ডেকে বলুন বাড়িতে চোর এসেছিল।"

মহিলা ভায়েই হোক, বা যে-কোনও কারণেই হোক 'ও মাগো' বলে আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

আমি আর কী করি, বাধ্য হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

রাখহরি বলল, "আজ এত ভোরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?"

"মর্নিং ওয়াকে। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজই আমি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে অত ভোরে একা ওইভাবে বেরনোটা কি ঠিক? কে কখন সন্ধান নিয়ে পিছু নেয়, তা কে বলতে পারে?"

"ও-ভয় করলে তো ঘর থেকেই বেরনো যাবে না রে! আজ শুধু হাতে গেছি। কাল থেকে তৈরি হয়েই বেরোব। যাক, তুই এখন বেশ জুতসই করে একটু চা কর দিকিনি।"

রাখহরি ওর কাজে গেল।

আমি ইজি চেয়ারটা বাইরের বাগানে এনে আমার প্রিয় রঙ্গনাগাছগুলোর কাছে গিয়ে বসলাম।

একটু পরেই কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে একটা দুঃসংবাদ ।

কাগজওয়ালা বলল, "জানেন তো চ্যাটার্জিদা, একটা খুব খারাপ খবর আছে আজ। কাগজে নেই অবশ্য খবরটা, তবে কালকের কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে।"

"কীরকম!"

"প্রোফেসর এম.এল. বোস খুন হয়েছেন।"

আমার তো আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, " সেকি কী!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, খুনি খন করে নীচের দিদিকে জানিয়েও গেছে। "

রাখহরি তখন চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমি কোনওরকমে ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

কাগজওয়ালা বলল, "এই ধরনের অজাতশত্রু মানুষের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে দেশের পরিস্থিতি কীরকম এবার বুঝতে পারছেন তো?" বলে চলে গেল।

আমি কাঁপা-কাঁপা হাতেচ টোস্ট কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। এই মুহূর্তে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল আমার । কেন যে ভোরবেলা সেই খুনিটার

পেনে ধাওয়া করলাম না, তা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আগাগোড়া ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার। তারপর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে আততায়ীকে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলতেই ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী বললেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আপনার এবং আততায়ীর মধ্যে দূরত্ব এতটাই ছিল যে, আপনি উদ্যম নিলেও ধরতে পারতেন না।"

"ঠিক তাই।"

"তবু খুনির চেহারার একটু বর্ণনা দিতে পারেন?"

"বেঁটেখাটো চেহারা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে ছিল।"

"মুখে বসন্তে দাগ ছিল কি?"

"দূরত্বের জন্য বোঝা যায়নি।"

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "মনে হয় চোর-গণেশ। ছোটখাটো যত চুরিটুরির প্রধান হচ্ছে ও। তবে কিনা এইরকম খুন-জখমের মতো জঘন্য অপরাধের কোনও রেকর্ড ওর নেই। আচ্ছা, লোরটাকে আর একবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?"

"না পারাই স্বাভাবিক। আমি যখন রথতলার বাঁকের মুখে এসেছি, ও তখন দড়ি বেছে ঝুপ করে নেমে পালাল।"

ত্রিবেদী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। চলুন একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

আমি বললাম, "যেতে তো হবেই " ত্রিবেদীজি। তবে একটা কথা, এই খুনের তদন্তটা কিন্তু আমি করব। আপনারা আমাকে হেল্প করবেন।"

"অন্তত এই একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনার সহযোগিতা আমাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাক্সেপ্টেব্‌ল।"

আমরা একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থলে চলে এলাম।

সেই দিদি তো আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এই তো! এই বাবুই আমাকে খবর দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর ওপরে গিয়েই দেখি এই কাণ্ড। আমি তো ভয়েই মরি। ভাবলাম উনিই বোধ হয় বাবুকে খুন করে আমাকে জানিয়ে গেলেন। এখন তো দেখছি উনি পুলিশেরই লোক।"

ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী এবং আমি বাইরের লোকজনের ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে গেলাম। নীচের কনস্টেবলরা ভিড় কন্ট্রোল করতে লাগল।

আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম মিঃ বোস মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে চেয়ারে বলে টেবিলের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে পড়ে আছেন, যাতে মনে হচ্ছে অত্যন্ত

ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি আছে। সম্ভবত এই ফুলদানিটা দিয়েই ওঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে আঘাত করা হয়। ওঁর হাতের মুঠোয় আছে একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলের ওপর একটা বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই এবং একটি 'সুইসাইড নোট'। একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর লেখা আছে 'আমিই খুনি'। লেখার নীচে ওঁর সই ।

রহস্যময় ব্যাপার। রহস্যময় এই কারণে যে, উনি যদি নিজের মাথায় ফুলদানি দিয়ে আঘাত করে থাকেন, তা হলে সেটা ওইভাবে টেবিলের ওপর থাকতে পারে না। সুইসাইড নোটে কেউ নিজেকে নিজের খুনি বলে লিখে রাখে না। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল ওই রজনীগন্ধা ফুলগুলো। এই ফুলগুলো ওঁর হাতের মুঠোয় এল কীভাবে?

এইবার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দেওয়া হল। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু স্টিলের আলমারিটাই যা লণ্ডভণ্ড। তার মানে খুনি যার লোভে এই কাজ করেছে তা পেয়ে অথবা না পেয়েই করেছে এই কাজ। ওই আলমারিতেই একটি খাতায় লেখা ছিল ওঁর সঞ্চয়ের হিসেবনিকেশ । প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো ইন্দিরা বিকাশ কিনেছিলেন উনি, তার একটিও নেই। জাতীয় সঞ্চয়ের কিছু কাগজ ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সেও প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। ব্যাঙ্কে এফ.ডি-র জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন, কিন্তু ফর্ম আছে, অথচ টাকা নেই। অর্থাৎ খুনি এটাকেও হাতিয়েছে। এই টাকাটা সম্ভবত কোনও পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জমা পড়তে চাচ্ছিল। খুনি সেটা জানত।

ত্রিবেদী বললেন, "কী বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি?"

"রীতিমত সন্ধানী চোর।"

"কিন্তু ওই সুইসাইড নোটের অর্থ কী?"

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে লেখাটা ওঁরই। কেননা ওঁর খাতাপত্র বা অন্য লেখাটেখা দেখে এই লেখার কোনও গরমিল পাচ্ছি না।"

এবার আমরা বারান্দার কাছে এসে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পরে আরও লক্ষ করে ঘরের ভেতর পর্যন্ত একই পায়ের যাওয়া আসার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। আততায়ী জুতো পরে আসেনি। সে এসেছিল ধুলোমাখা কালি পায়ে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ বোসবাবুর চেয়ারের কাছ পর্যন্ত আছে, তারপর আর নেই । তা হলে স্টিলের আলমারি ভেঙে জিনিসপত্রগুলো চুরি করল কে?

আমি ওঁর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতা ও ডায়েরিটা আদায় করে পুলিশক

বললাম, "আপনারা এবার আপনাদের কাজ করুন। আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

কাজের দিদি নীচের ঘরে বসে নীরবে চোখের জল মুছছিলেন। আমি গিয়ে বললাম, "অপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

উনি বললেন, "বেশ তো, করুন।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা ধরুন না কেন, বছর পনেরো।"

"আগে কোতায় ছিলেন? আপনার কে-কে আছে?"

"আগে দেষে ছিলাম। আমার কেউ নেই। গরিব মানুষ বিধবা। উনি আমাকে ওঁর চরণে ঠাঁই দেন।"

"বোসবাবুর কে-কে আছেন? এখানে অথবা দেশের বাড়িতে?"

"উনি তো আমারই দেশের লোক। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু বছর। কেননা যা যেখানে ছিল সবই বেচেবুচে দিয়ে এইখানে এসে বাড়ি করেছেন। ওঁরও কেউ কোথাও নেই। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে হয়নি। বউদিমণি মারা গেছেন ক্যান্সারে। তারপর উনি আর বিয়েও করেননি। তবে কিছুদিন ধরে বলছিলেন অবসর নেওয়ার পর থেকে তীর্থে-তীর্থে ঘুরবেন। তা কোন তীর্থে যে উনি চলে গেলেন বাবা, তা কে জানে?"

"আচ্ছা, সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে কি কারও মনোমালিন্য হয়েছিল? "

"না বাবা। সকলে ওঁকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত। "

"কাল উনি কখন ফিরেছেন? কতক্ষণ কাজ করেছেন? কে-কে দেখা করতে এসেছিল ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো কাল কলেজে যাননি। কী একটা বই লিখবেন বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীও আসেনি কেউ। বাইরের কেউও আসেনি দেখা করতে। শুধু ভোরবেলা আপনিই যা এসেছিলেন।"

কাজের দিদির কথায় একটু আলোর ইশারা পেলাম। অর্থাৎ সুইসাইড নোটের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হল। উনি তা হলে বই লিখতে যাচ্ছিলেন। আর সেই বইটার, অথবা সেই বইয়ের কোন গল্পের নাম নিশ্চয় 'আমিই খুনি'। হয়তো বা ওই ইংরেজি বইয়ের কোনও গল্পের অনুবাদ করতে বলেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে খুনি এসে তার ফায়দাটা লুটেছে। কিন্তু কীভাবে?

আমি আবার ওপরে উঠে এসে বোসবাবুর টেবিলেনর ওপর রাখা সেই ইংরেজি বইটার পাতা উলটেই এমন একটা গল্প দেখতে পেলাম, যার বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'আমিই খুনি'। বইটা ত্রিবেদীকে দেখাতে তিনিও চমতে উঠলেন। বললেন,

"আরে, তাই তো! আমরা তো এতক্ষণ ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে তখন একটাই দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল, খুনি কে? তার পায়ের ছাপ মৃতের কাছ পর্যন্ত গেল কিন্তু আলমারির কাছে নেই কেন? আর মৃতের হাতের মুঠোয় ওই রজনীগন্ধার অর্থ কী?

দুপুরবেলা ঘরে বসে নিজের মনে কত কী চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সূত্র ধরে এই তদন্তের কাজে কীভাবে এগোবে তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। আততায়ী একমাত্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি! বোসবাবুর সম্পত্তি হিসেবে লেখা খাতায় ষাট ভরি সোনার গয়নার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই গয়নাও মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে উধাও। অমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এমন অমূল্য সম্পদ লকারে না রেখে কেন যে ঘরে রেখেছিলেন, তা ভেবে পেলাম না। হয়তো-বা এইসবের প্রতি কোনও মোহ ছিল না, তাই।

যাই হোক, আমি যখন বসে-বসে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ত্রিবেদীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মিঃ চ্যাটার্জি, শিগ্‌গির একবার আসুন। বোধ হয় আপনারা খুনি ধরা পড়েছে।"

বোধ হয়? তবুও আমি এক মুহূর্ত বেঁটেখাটো চেহারার একজন লোককে লকআপে রাখা হয়েছে। এই চোর-গণেশ। লোকটাকে এই এলাকায় বহুবার দেখেছি। তবে নাম জানতাম না। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমাকে বাঁচান বাবু। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুযোগ পেলেই ছোটখাটো চুরিটুরি একটু-আধটু করে থাকি বটে, তবে এই সমস্ত খুন-খারাপির ব্যাপারে আমি নেই। দরকার হলে আপনারা পুলিশ-কুকুর আনান, দেখবেন সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শুধু আমি কেন, ওঁকে খুন করবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই।"

আমি চোর-গণেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললাম, "এ-লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। এর পায়ের সঙ্গে ওই ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ মিলছে না। তার এক পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল।"

এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল চোর-গণেশ, "কী বললেন বাবু, ছ'টা আঙুল ছিল? বাঁ পায়ে কী?"

ত্রিবেদী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ পায়ে। তুমি চেনো তাকে?"

"চিনি মানে? ওর জামার কলার ধরে এখনই ওকে টেনে আনছি আপনার কাছে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে শেষপর্যন্ত এই কাজ করল ও?"

"ও কে?"

"সুবল বাগ। ঘরামির কাজ করে। আমি এখনই টেনে আনছি ওকে। দু'নম্বর বস্তিতে ঘর ছাইতে গেছে ও।"

চোর-গণেশকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মারতে-মারতে যাকে নিয়ে এসে হাজির করল তার নাম সুবল বাগ।

সুবল প্রথমেই এসে ত্রিবেদীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর আমার পায়ে। বলল, "অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি চোর বটে, তবে খুনি নই।"

ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে কি সাধু?"

আমি ইশারায় ত্রিবেদীকে চুপ করতে বললাম।

সুবল বলল, "হুজুর, কাল অনেক রাতে বেগড়ি থেকে একজনের ঘর ছেয়ে খটিরবাজারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সুন্দরপানা এক ভদ্রলোকবাবু বারি দোতলা থেকে কী একটা বেয়ে নামল। তার কাঁধে ছিল একটা ঝোল-ব্যাগ। পায়ে মোজা। নীচে নেমেই জুতো পরে একটা ভটভটিতে চেপে কোথায় যেন চলে গেল। বাবুর ওপরে ঘরে তখন আলো জ্বলছে। আমি তখন ব্যাপারটা কী হল তা বোঝবার জন্য কাছে গিয়ে দেখি একটা নাইলনের ফিতে ওপর থেকে ঝুলছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হল। আমাদের মতো চোরের ফিতে ধরে ওঠে না, আবার ভটভটিও চাপে না। তাই কৌতূহলী হয়ে সেই ফিতে ধরে ওপরে উঠেই দেখি ওই কাণ্ড। বাবু টেবিলের ওপর হুমকি খেয়ে পড়ে আছেন। দু'চোখ বোজা। আস্তে করে দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝলাম বাবুর দেহে প্রাণ নেই। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মেঝেয় ফুলদানির জল। সেটাকে ঠিক করে রেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরে তখনও উত্তাপ আছে যদিও, তবুও উনি মৃত। আমি তখন আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কেননা দারুণ ভয়ে হাত-পা তখন কাঁপছে আমার। যদি কেউ নামবার সময় আমাকে দেখে ফেলে তা হলে আমাকেই খুনি ভাববে। তাই কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেঁচেও কি রেহাই পেলাম? আমার পায়ের ছাপের জন্য ধরা পড়ে গেলাম। বাবুরা বিশ্বাস করুন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললাম, "তুমি তখন ওই লোকটাকে নামতে দেখে চেঁচালে না কেন?"

"ভয়ে। কেননা ওই জোয়ান লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। তা ছাড়া ওইসব লোকের কাছে গোলাগুলিও থাকে।"

"তুমি তখন পুলিশে খবর দিতে পারতে।"

ত্রিবেদী বললেন, "যাক, এসব তো হল। এখন ওই বাবুর ঘর থেকে কী-কী জিনিস চুরি করেছিলে তুমি?"

"হুজুর, মা-বাপ। ওই খুন দেখেই আমার সব কিছু তখন মাথায় উঠে গেছে। তা ছাড়া, ওই সমস্ত নামীদামি লোকের ঘরে চুরি করবার মতো দুর্মতি আমার

হয় না বাবু। আসলে হয় কী, পেটে টান পড়লে তখনই....।"

যাই হোক, সুবলের অকপট স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কেননা ও মৃতের কাছ পর্যন্ত যে গিয়েছিল, সে-প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আলমারির কাছে ওর কোনও পদচিহ্ন ছিল না। চতুর খুনি মোজা পরে ঘরে ঢোকার ফলে তারও পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুবলকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধেবেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। বোসবাবুকে প্রথম শ্বাসরোধ করে, পরে মাথায় ফুলদানির ঘা দিতেই আঘাতজনিত কারণে মারা যান বোসবাবু। পুলিশ কুকুরও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনওরকম আলোকপাত করতে পারেনি আমাদের।

পরদিন সকালে আমি আবার বোসবাবুর বাড়ি গেলাম। কাজের দিদি তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। বললেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। এই অনাথিনীর একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। আমাকে কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। কেউ কোথাও নেই আমার। এই বাড়িতে একা আমি কী করে থাকব, কী খাব? আর শোনো, বউদিমণির গয়নার বাক্সটা নীচের ঘরে থাকত। তাই ওটা চোরে নিয়ে যেতে পারেনি। ও তুমি থানায় জমা দিয়ে দাও। ও আমি কতদিন আগলে রাখব বাবা? কার জন্য রাখব?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বউদিমণির গয়নার বাক্স আপনার কাছে থাকত কেন?"

"ওগুলো নীচের ঘরের আলমারিতে থাকত। তার চাবি আমার কাছে। আমি যে বাবুর মায়ের মতো, দিদির মতো ছিলাম বাবা। উনি যে আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন।"

কাজের দিদির এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। আজকের দিনে এমন নির্লোভ মানুষও হয়? এইজন্যই এই মহিলাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন বোসবাবু। আমি বললাম, "আপনার কোনও চিন্তা নেই দিদি। আপনি এই বাড়িতেই থাকবেন। পরে আপনার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেব। সেরকম হলে আপনি নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপর তলায় থাকবেন।" তারপর বললাম, "আচ্ছা, একটু মনে করে দেখুন তো, ওঁর এই বিষয়সম্পত্তির দাবি করতে পারে এমন কেউ কি কোথাও নেই?"

"আমার অন্তত জানা নেই বাব। তবে ওঁর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা কাশীতে ছিলেন। শুনেছি তিনিও মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকনবাবু একবার এখানে এসে এক রাত ছিলেন।"

"কতদিন আগের কথা?"

"এই তো গত মাসে। তা, বাবু ওঁকে কিছু টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন আর কখনও যেন এখানে না আসেন।"

"বাবু ওকে এখানে আসতে বারণ করলেন কেন? সে-ব্যাপারে কিছু কি জানেন?"

"না। তবে শুনেছি উনি বাবুকে এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে কাশীতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেরকম বাড়িও নাকি ওঁর সন্ধানে আছে। তা বাবু একদমই রাজি হননি।"

"আপনি ওদের কাশীর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?"

"না বাবা, তাও জানি না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "খোকনবাবু যা লোক দেখছি তাতে মনে হয় ওঁকে একটা খবর দেওয়া একান্তই দরকার। কেননা যদি কখনও এই বাড়ির দাবি করে উনি কোর্টে যান তখন কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

দিদি চোখের জল মুছে বললেন, "আমার আর মুশকিল কী বাবা? যাদের যা পাওনা তারা তাই নেবে। আমাকে দয়া করে থাকতে দেয় দেবে, না দেয় তোমরা কোনও একটা আশমে পাঠিয়ে দিয়ো আমাকে। শেষমেশ ভিক্ষে করব। তাও যদি না জোটে গঙ্গায় জল তো আছেই বাবা!"

আমি তখন দিদিকে বললাম গয়নার বাক্সটা দেখাতে। দিদি আলমারি খুলে বাক্স বের করে দেখালেন। ওই আলমারিতেও অনেক পুরনো কাগজ ও চিঠিপত্র ছিল। হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। চিঠিটা এসেছিল কাশীর পাঁড়েঘাট থেকে। চিঠিটা লিখেছেন নিশিকান্ত বসু। সম্ভবত ইনিই বোসবাবুর সেই দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা। চিঠিটা এই ঃ "বউমার মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আরও দুঃখ পেলাম তুমি দেশের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় বাড়ি কিনেছ বলে। তাই আমার অনুরোধ, যদি তুমি কাশীর এই বাড়িটা কিনে রাখো তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর আমি বেঁচে যাই ভাড়া গোনার হাত থেকে। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা বলেই বাড়িটা কিন্তু তোমার হয়ে যায়। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারিনি। আমার জীবনের এইটাই চরম ব্যর্থতা।"

আমি চিঠিটা পকেটে রেখে গয়নার বাক্সটা দিদিকে ফেরত দিলাম। বললাম, "এখনই এটা থানায় জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। সাবধানে থাকবেন। বাড়ির বাইরে যাবেন না। আর অচেনা কেউ এলে বাড়ির দরজা খুলবেন না।"

দিদি আমার কথায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে আবার বোসবাবুর ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। একমাস আগের একদিনের পাতায় লেখা আছে, "পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে খোকন এসে হাজির। প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। পরে পরিচয় দিতে চিনলাম। ও কাশীর একটি চার লাখ টাকার বাড়ির দালালি করতে এসেছে। আমাকে ওই বাড়িটা কেনবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। শেষমেশ ও আমাকে ওর নানারকম বিপদের কথা বলে দশ হাজার টাকা চাইল। আমি ওকে তাও দিলাম না। বললাম, আমার সব টাকাই এখন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসে ডবল ইনভেস্টমেন্ট-এ আছে। এমনকী, ওর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আলমারি থেকে কাগজপত্রগুলোও বের করে দেখালাম। তারপর হাজারখানেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলাম ওকে, এবং এও জানালাম, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন ও আমাকে এইভাবে বিরক্ত করতে না আসে।"

এই ডায়েরি পড়ে মনে-মনে আমি স্থির করলাম যেভাবেই হোক একবার কাশীতে গিয়ে ওই খোকনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ঠিকানা না থাকলেও পাঁড়েঘাটের ওদের সেই পুরনো বাড়ি থেকেই শুরু হবে আমার অনুসন্ধান। একান্ত খুঁজে না পাই তদন্তের কাজে গিয়ে বারাণসী ভ্রমণ তো হবে! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু ভাগ্য আমার এতই ভাল যে, কাশীযাত্রা আর করতে হল না। হঠাৎই সন্ধেবেলা এক অবাঙালি যুবক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে, "আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি? মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ....।"

"হ্যাঁ আমিই। আপনার পরিচয়?"

"আমার নাম শিবকুমার শর্মা। আমার বাড়ি বারাণসীতে। আমি সালকিয়ায় থাকি।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?"

"শুনলাম, আপনি নাকি মিঃ বোসের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করছেন। তা এই ব্যাপারে আমার বন্ধু খোকনবাবু একটু দেখা করতে চান। কেননা মিঃ বোসের ওই বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির ও-ই এখন একমাত্র দাবিদার।"

"আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

"বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"বাইরে কেন? ভেতরে নিয়ে আসুন।"

"আসলে এই মর্মান্তিক সংবাদে ও খুব ভেঙে পড়েছে। মাসখানেক আগে একবার ও এখানে এসেছিল। সেই শেষ দেখা।"

"ঠিক আছে। ওঁকে আসতে বলুন।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি অস্থির হলাম।

একটু পরেই শিবকুমার যাকে নিয়ে ভেতরে এল সুবল বাগের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল। ওরা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে বললাম, "আপনারই নাম খোকনবাবু?"

"হ্যাঁ, ভাল নাম রজনীকান্ত বোস।"

"কিন্তু আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ কী? আপনাকে চেনে এমন কেউ কি আছে এখানে?"

শিবকুমার বলল, "কেন, আমি আছি।"

"আমি তো আপনাকে চিনি না।" তারপর ওদের দু'জনের আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে বললাম, "আচ্ছা ওই বাড়িতে যে কাজের দিদি আছেন তিনি কি চিনবেন আপনাকে?"

খোকনবাবু বললেন, "তিচবেন না মানে? মাত্র একমাস আগে আমি ওই বাড়িতে এসে এক রাত কাটিয়ে গেছি, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবে কী করে? আমি এসেছিলাম দাদাভাইকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে কাশীতে নিয়ে যাব বলে। তা ওই মহিলার চক্রান্তেই সেটা হল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই মহিলাই সম্পত্তির লোভে খুন করিয়েছেন আমার দাদামণিকে।"

"কী এমন সম্পত্তি ছিল যে, তার লোভে মহিলা ওই কাজ করতে যাবেন?"

"কী ছিল না? সাড়ে তিন লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ। দু'লাখ টাকার 'কিষাণ বিকাশ', 'জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট'। ব্যাঙ্কে এফ. ডি.-তে লক্ষাধিক টাকা আর ছিল প্রচুর সোনার গয়না। ওই মহিলা সবকিছুই সন্ধান জানেন। তা ছাড়া দোতলা ওই বাড়িটার দামও নেহাত কম নয়।"

আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "ওরে বাবা, আপনি মাত্র এক রাত এই বাড়িতে থেকেই সবকিছু জানতে পেরেছেন?"

"আসলে উনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই বিশ্বাস করে এ-কথা আমাকে বলেছিলেন, এবং এও বলেছিলেন শিগ্‌গিরই উনি এই-সবই আমার নামে উইল করে দেবেন। এ-কথা জানতে পেরেই ওই মহিলা এই সর্বনাশটি ঘটিয়েছেন।"

"সর্বনাশ যে কে কীভাবে ঘটাল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু রজনীবাবু ওরফে খোকনবাবু, ওঁর ডায়েরি যে অন্য কথা বলছে। আপনার কথার সঙ্গে তো তা মিলছে না।"

"কী লিখেছেন উনি ডায়েরিতে?"

"সে-কথা নাই-বা জানলেন?" বলে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম,

"জাস্ট এ মিনিট। ছেলেটাকে একটু চা করতে বলে আসি।" বলে উঠে গিয়ে রাখহরিকে যা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও ঘাড় নেড়ে ওর কর্তব্যপালনে চলে গেল।

আমি আবার ঘরে এসে ওদের সামনে বসে বললাম, "বোসবাবুর মৃত্যুসংবাদটা আপনারা কীভাবে পেলেন?"

খোকনবাবু বললেন, "কেন, খবরের কাগজ মারফত পেয়েছি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

"বেনারসেই থাকি।"

"ওরে বাবা, আজকের কাগজে খবর পেয়ে আজই চলে এলেন?"

"না, না, আমি খবরটা পাই শিবকুমারের মারফত। ও-ই আমাকে ভোরবেলা ফোনে জানায়। আমি তখনই পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসি।"

"আজকের কাগজ তো ছ'টার পরে বেরিয়েছিল। আর বারাণসীতে পূর্বা এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোর পাঁচটা দশে। এটা কী করে সম্ভব হল?"

"আসলে ট্রেনটা আজ এক ঘণ্টা লেট ছিল কিনা?"

"বুঝলাম। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। আজ তো পূর্বা এক্সপ্রেস বারাণসী দিয়ে আসে না।"

"তা হলে কি বলতে চান আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"না, না, তা কেন? আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যে এই ঘটনার তদন্ত করছি এ-কথা আপনাদের কে বলল?"

খোকনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা, কাল থেকে সবার মুখেই আপনার নাম। সবাই বলছে অম্বর চ্যাটার্জি যখন তদন্ত করছে খুনি তখন ধরা পড়বেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। আজকের ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর বারাণসী থেকে এই সবে এখানে এসে পৌঁছলেন আপনি, অথচ কাল সকাল থেকেই এই খুনের তদন্ত আমি করছি বলে আপনি জেনে গেছেন!"

শিবকুমার বলল, "ও-কথা আমিই বলেছি ওকে।"

"আপনিও তো মশাই আজই কাগজ পড়ে জেনেছেন খবরটা। এখানে 'কাল' আসে কোত্থেকে?"

শিবকুমার চুপ করে গেল।

আমি খোকনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এখানে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওরে বাবা, পূর্বা এক্সপ্রেস দেখছি আজকাল বিমানেরও আগে আসে। যাক,

স্টেশন থেকে কিসে এলেন? হেলিকপ্টারে?"

"আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন? আমরা আমাদের স্কুটারে এসেছি।"

"আপনার জিনিসপত্র?"

"কিছুই আনিনি সঙ্গে।"

"বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন?"

"ঠিক তাই।"

এবার একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শিবকুমার। বলল, "শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বন্ধুটি সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন। এখন ওঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা সারা হয়ে গেল। আমরা কাল সকালে দেখা করব আপনার সঙ্গে। আজ তা হলে আসি, কেমন?"

"সে কী! আপনাদের জন্য চা করতে বললাম যে!"

"মাফ করবেন। আমরা কেউই চা খাই না।"

"তা হলে আমি যখন চায়ের কথা বললাম তখন আপনার না করলেন না কেন?"

ওরা দু'জনেই তখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আমি গলার স্বর কঠিন করে বললাম, "এখন কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না। তার কারণ, যে-রাতে বোসবাবু খুন হন সে-রাতে উনি কিছু মাত্র লিখে যেতে না পারলেও ওঁর হাতের মুঠোয় আমরা একগোছা রজনীগন্ধা পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি রজনী নামের কারও কথা উনি মরণকালে বলতে চেয়েছিলেন। আর এখন এই ঘরেও একজন রজনী আছেন। তিনি এমন এক রজনী যিনি এক মাস আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁর নাড়িনক্ষত্র জেনেছেন এবং যাঁকে উনি পছন্দ করেননি। গত রাতে খুনি যখন খুন করে পালায় তখন আমাদেরই পরিচিত একজন লোক খুব কাছ থেকেই তাকে দেখে ফেলে। তারও দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই রজনীর চেহারার জুতসই একটা মিল আছে। কাল রাতে খুনি পালাবার সময় একটা ভটভটি অর্থাৎ মোটরবাইক কিংবা স্কুটারে চেপে পালায়। আজ আপনারাও একটি স্কুটারে চেপেই এখানে এসেছেন।"

খোকনবাবু ও শিবকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

খোকনবাবু বললেন, "এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় আমিই খুনি?"

"ইয়েস। নাউ ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।" বলতে-বলতেই হাতে হাতকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ ত্রিবেদী। সঙ্গে আরও পুলিশ। এমনকী সেই সুবল বাগও। সে রজনীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই তো সেই লোক। একেই আমি

দেখেছি কাল।"

ত্রিবেদী বললেন, "একজনকে খুনের অপরাধে এবং অন্য জনকে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল।"

রাখহরি তখন দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার নির্দেশ সেই গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

আমি তখন খোকনবাবুকে বললাম, "কী রজনীবাবু, এই ব্যাপারে আর কিছু আপনার বলবার আছে?"

ক্লান্ত রজনী মাথা নত করে ঘাড় নাড়লেন।

"তা হলে আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করছেন তো?"

রজনীকান্ত অশ্রুসজল চোখে বলল, "হ্যাঁ। আমিই খুনি।"

শিবকুমারের দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

নীলার আংটি রহস্য

সুজিত কুমার নাগ

লোকটাকে অফিসে যাওয়ার পথে রোজই দেখতাম। যাদুঘরের পেছনে লাল বাড়িতে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সদর দপ্তরে আমার অফিস। যাদুঘরের সামনে চৌরঙ্গি রোড, উত্তর দিকে সদর স্ট্রিট চৌরঙ্গি থেকে বেরিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে গিয়েছে। সদর স্ট্রিটের ওপরে যাদুঘরের অফিস এবং আমাদের অফিসের প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথের লোহার গেটের বাইরে ফুটপাথের ওপরে লোকটি তার পোষা কুকুরকে নিয়ে থাকত। চটের স্তূপের ওপরে তার ও তার কুকুরের ছেঁড়া ময়লা বিছানা, বিছানার পাশে দুটি ভাঙা অ্যালুমিনিয়মের থালা ও গেলাশের পাশ কাটিয়ে যেতাম রোজ। শাম্মিকে নিয়ে এই আমার সংসার, লোকটি একদিন আমাকে বললে। শাম্মি ও আমি দুজনে

এখানেই থাকি। শাম্মি ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।

রান্না-বান্না করতে তো দেখি না তোমাকে, আমি বললাম। খাও কি?

সাহেব-বাড়ির খাবার। সামনের ঐ তিনতলা বাড়িতে তিনটি সাবেব-পরিবার থাকে, তা ছাড়া আশেপাশে অনেক সাহেব-মেম আছে, ওপাশের ডাস্টবিনের মধ্যে ওরা যা ফেলে দেয়, তা থেকে যা পাই তা দিয়ে আমাদের দুজনের পেট ভরে যায়। মাঝে মাঝে খুব ভাল খাবারও পাই। সামনের বাড়ির নিচের তলায় যে বুড়ি-মেমসাহেব থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর রান্নাঘরের বাড়তি খাবার আমাদের এনে দেন। তখন রীতিমতো ভোজ হয় আমাদের....

সেদিন এই বুড়ি লরা অরচার্ডকে দেখলাম সসপ্যানে করে চাওমিন ও মাংস নিয়ে এসে লোকটার অ্যালুমিনিয়ামের থালায ঢেলে দিতে।

একা তুমি খেও না। লোকটার থালায় খাবার ঢালতে ঢালতে লরা বললেন, শাম্মিকে খাইয়ে তবে খাবে তুমি। বুঝলে সামাদ আলি?

হ্যাঁ মেমসাহেব, সামাদ জবাব দিল। ওকে খাইয়ে তবে আমি খাই। আচ্ছা মেমসাহেব, এত সব খাবার আমাদের দিয়ে দিচ্ছ, তোমরা খাবে না?

আমি আর কত খাব বল? ভাই সিরিল আমাকে বলেনি যে তার বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, রাত্রে বাড়ি ফিরে কিছুই খায়নি। ভাল কথা, কাল রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছিল, তোমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের গাড়ি-বারান্দার নিচে তো যাওনি! এখানে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলে বুঝি! দেখ সামাদ আলি, তোমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগে তো ভেজো যত খুশি, কিন্তু শাম্মিকে কষ্ট দেওয়া চলবে না।

শাম্মিকে কষ্ট দেব কি, সে তো বৃষ্টি শুরু হতেই যাদুঘরের অফিসের বারান্দার তলায় গিয়ে হাজির হলো। ওর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম ওখানে।

লরা চলে যেতে সামাদ বললে, বড় ভালোমানুষ এই বুড়ি মেমসাহেব, গরিবদের ওপরে বড় দয়া ওনার। তবে আমার চেয়ে আমার কুকুরের ওপরেই ওনার দরদ বেশি। ওনার ভাই কিন্তু আমাদের একদম সহ্য করতে পারে না। লোকটা অবশ্য মেমসাহেবের নিজের ভাই নয়, তিনকুলে কেউ নেই বলে বুড়ি নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সামাদ ও শাম্মির পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি অফিসের দিকে যাচ্ছি, উত্তেজিত পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে ছুটতে ছুটতে এল সামাদ আলি।

সাহেব, ও সাহেব! উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল সামাদ, একটু দাঁড়ান.....

ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সামাদ আলি বললে, এই দেখুন স্যার, ডাস্টবিন

থেকে খাবার খুঁজে বের করতে গিয়ে কি পেয়ে গিয়েছি....

বলে ডান হাতের মুঠো খুলে সামাদ আমাকে যা দেখাল তা আমার চোখ দুটি ধাঁধিয়ে দেয়। সোনার আংটিতে বসানো বিরল শ্রেণীর রক্তমুখী নীলা।

কোথায় পেলে এটা? আমি প্রশ্ন করি।

ডাস্টবিনের মধ্যে। সামাদ আলি জবাব দিল। খুবই দামী পাথর, তাই না স্যার?

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাস্টবিনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জিনিসকে খাঁটি বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

তার মানে আপনি বলতে চান এই সোনা ও পাথর দুইই ঝুটো?

আমি কিছুই বলতে চাই নে, আমাদের টেস্টিং ল্যাবোরেটারিতে আছেন ডক্টর পরাঞ্জপে, যা বলার তিনিই বলবেন পরীক্ষা করে। চল আমার সঙ্গে....

সামাদ আলির সঙ্গে শাম্মিও চলল

এই সেই আংটি! আংটিটা দেখামাত্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ডক্টর পরাঞ্জপে। পরশুদিন এটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন মিস লরা অরচার্ড। খাঁটি নীলা। কিন্তু এটা আপনার হাতে এল কি করে?

আমার হাতে নয়, এসেছে সামাদ আলির হাতে, আমি জবাব দিলাম। সামাদ আলি ডাস্টবিন থেকে এটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

না, সামাদ আলি মিস লরা অরচার্ডকে খুন করে এই আংটিটা তাঁর আঙুল থেকে খুলে নিয়েছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ভাই সিরিল তাঁকে বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। ও পুলিশ খবর দেয়। লরার ফ্ল্যাটে থানার ওসি তাঁর দলবল ও ফোরেনসিক এক্সপার্টকে নিয়ে তদন্ত করছেন, খবর দিচ্ছি তাঁকে....

খবর পেয়েই এলেন থানার ওসি তিনজন সশস্ত্র পুলিস কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে। যাকে বলে 'বমালসুদ্ধ গ্রেপ্তার' তাই-ই করলেন তিনি।

দু'হাতে হাতকড়া পরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে সামাদ আলি। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বিশ্বাস করুন দারোগাসাহেব, খুন আমি করিনি। মাকে আমি খুব ছোটবেলায় হারিয়েছি, তাঁকে আমার মনেও পড়ে না, লরা মেমসাহেব আমার মায়ের মতো ছিলেন। মায়ের মতো কি, মায়ের চেয়েও বেশি। আমি ও শাম্মি রোজ তাঁর দেওয়া ভাল ভাল খাবার খেয়েছি, কাল রীতিমতো বিরিয়ানি খাইয়েছেন আমাদের। এই আংটি আমি ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। এই সাহেব সাক্ষী। বলে সে আমার দিকে তাকাল।

ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছিল সামাদ আলি আমার কাছে, আমি বললাম। তার ডান হাতের মুঠো খুলে দেখিয়েছিল আমাকে।

আপনি কি ওকে ওটা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিতে দেখেছেন? আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে পুলিশ ওসি ইদ্রিস খাঁ প্রশ্ন করেন।

না। আমি জবাব দিলাম।

রীতিমতো চালাক লোক এই সামাদ আলি। দেখ সামাদ, ঐ সাহেবের চোখে ধুলো দিতে পারলেও, আমার মতো দুঁদে দারোগাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মেমসাহেবকে খুন করে তাঁর নীলা-বসানো আংটিটা ডাস্টবিনে লুকিয়ে রেখে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে বের করার ভান করে আংটিটা বের করে এই সাহেবকে দেখিয়েছিলে।

একটা কথা মিস্টার খাঁ, ডক্টর পরাঞ্জপে বললেন। আংটির জন্যই মিস অরচার্ডকে খুন করা হয়েছে একথা ধরে নিচ্ছেন কেন! সামান্য একটা আংটির জন্য খুন একথা ধরে নিচ্ছেন কেন! সামান্য একটা আংটির জন্য খুন একথা কি ভাবা যায়! আংটি-চোরের পক্ষে ঘুমন্ত মিস অরচার্ডের হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

আংটির জন্য খুনের কথা সিরিল বলেছিল আমাকে, ইদ্রিস খাঁ বললেন। আংটি-চোর মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে ঘরে ঢুকে সিরিল দেখল তার দিদি মরে পড়ে আছেন এবং তাঁর আঙুলে নীলার আংটিটা নেই। সে মনে করে যে মিস অরচার্ডের চিৎকার থামাতেই চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। এই খুনী চোরকে হাতেনাতে ধরতে পেরে আমি খুশি।

হুজুর আমি চোর নই, খুনী নই, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামাদ আলি বললে। বিশ্বাস করুন হুজুর, ডাস্টবিনে আংটিটা খাবার খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি।

আংটিসুদ্ধ ধরা পড়ে গিয়ে তুমি যে চোর তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তুমি খুনী কিনা প্রমাণও হয়ে যাবে এখনই । চল আমাদের সঙ্গে।

সামাদ আলিকে ধরে বেঁধে মিস অরচার্ডের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান ইদ্রিস খাঁ ও তাঁর পুলিশ বাহিনী। ইদ্রিস খাঁয়ের নির্দেশমতো আমিও যাই তাঁদের সঙ্গে।

মিস অরচার্ডের মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর গলায় খুনীর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করছিলেন ডক্টর কল্যাণ বসুর ফরেনসিক ল্যাবোরেটারির বিজ্ঞানী সুবীর সিংহ। সামাদ আলিকে তাঁর দিকে এগিয়ে ইদ্রিশ খাঁ বললেন, খুনীকে ধরে নিয়ে এসেছি ডক্টর সিন্‌হা। মিস অরচার্ডের গলায় এরই হাতের আঙুলের ছাপ আছে বলে সন্দেহ করি। পরীক্ষা করে দেখুন।

আমাদের অনুসরণ করে মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল শাম্মিও। মিস অরচার্ডের মৃতদেহের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে তাঁর শিয়রে বসে কাঁদতে থাকা

সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুরু করে।

সামাদের এই নোংরা কুকুরটা এখানে কেন? সিরিল বিরক্তি মাখানো কণ্ঠে বললে, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিন মিস্টার খান।

পুলিশ বাহিনীর তাড়া খেয়েও সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে থাকে শাম্মি এবং উত্তেজিতভাবে ঘেউ ঘেউ করে যায়।

মিস্টার খান! উঠে দাঁড়িয়ে সুবীর সিংহ বললেন, আমি এই লোকটির হাতের ছাপ নেব, দয়া করে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

সিরিল স্মিথ তো মিস অরচার্ডের ভাই! ইদ্রিস খাঁ অবাক হয়ে তাকালেন সুবীরের মুখের দিকে। তাঁর হাতের ছাপ নেবেন কি মশাই!

মিস অরচার্ডের মৃতদেহে এই কুকুরটি ঐ লোকটার গায়ের গন্ধের হদিস পাচ্ছে। ভাই হলেই কি সন্দেহের বাইরে হবে!

পলায়মান সিরিলকে চেপে ধরে পুলিশ বাহিনীর দু'জন, সুবীর সিংহ তার হাতের ছাপ নিয়ে যা করণীয় করতে থাকেন।

পেয়েছি! খানিকক্ষণ বাদে সুবীর সিংহ বলে উঠলেন।

কি পেয়েছেন? হদ্রিস খায়ের প্রশ্ন।

খুনীর হদিস। সিরিল স্মিথই খুনী।

নীলার আংটি নয়, লরার টাকার লোভে সিরিল তাঁকে খুন করেছিল। লরার উইল অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর সিরিলের পাওয়ার কথা।

আচ্ছা সিরিল, কেন তুমি নীলার আংটিটা ফেলে দিলে? ইদ্রিস খাঁ সিরিলকে গ্রেপ্তার করতে করতে প্রশ্ন করলেন। এমন একটা চোখ ঝলসানো পাথর! ডক্টর পরাঞ্জপে বলেছিলেন, হীরের চেয়েও দামি....

অপয়া পাথর, সিরিল বললে। খুন হওয়ার আগের দিনই দিদিকে ওটা উপহার দিয়েছিলেন মিয়ানমার থেকে আসা তাঁর এক বন্ধু। ওটা পরেছিলেন বলেই খুন হলেন। কাজেই দিদি খুন হতেই আমার প্রথম কাজ হলো ওটাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেওয়া।
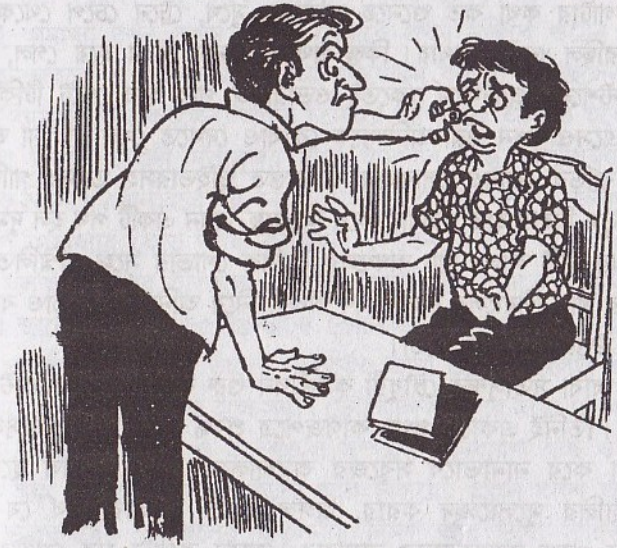
গার্ডেনভিলার রহস্য

জ্যোতির্ময় ঘোষ

"খুন না-করে অনিন্দ্যকে তো শয়তানগুলো গুম করেও রাখতে পারে? যেখানেই থাক, আমার বাচ্চু যেন প্রাণে বেঁচে থাকে। আমি যেন আমার মৃত্যুর আগে সত্যর ছেলের হাতে বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি। না হলে মরেও আমার শান্তি হবে না। কী মনে হয় তোমাদের, বাচ্চুটা বেঁচে আছে তো?" প্রায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কথাগুলো বলছিলেন গার্জেনবাবু। মনু, তনু, জ্যোতিদের কানে সব কথা ঢুকছিল না ভালভাবে। এসেছিল আনন্দ করতে। কতদিন ধরে ভেবেচিন্তে ভ্রমণসূচি তৈরি করেছিল ওরা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে অনিন্দ্যদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে। এই জায়গা কেন্দ্র করে তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন যাবে। তুম্বুনি যাবে, সুড়িচুয়া যাবে, সোজা চলে যাবে

দুমকা পর্যন্ত। দিন পনেরো বা প্রয়োজনে সপ্তাহতিনেক ঘুরেটুরে ফিরবে কলকাতায়।

জায়গাটার কথা কত শুনেছে অনিন্দ্যর মুখে, ট্রেনে চেপে থেকে হাজারটা প্ল্যান ঘুরছিল ওদের মাথায়। কিন্তু প্রথমেই মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল, মফস্বলের ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই ওভারব্রিজ পার হয়ে গেটে টিকিট দেখিয়ে বাইরে এসেও যখন ওরা অনিন্দ্যকে কোথাও দেখতে পেল না। না অনিন্দ্য, না তাদের বাড়ির কোনও লোকজন বা অন্তত ড্রাইভারসহ তাদের গাড়িটা।

বীরভূম-বিহার হাত ধরাধরি করে মিলেছে, এমন একটি পথ হল দুমকা রোড। সে-পথের মাটি লাল। রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক শোভার সঙ্গে সম্মিলিত সাঁওতাল পরগনার শাল-পিয়ালের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অনিন্দ্যর মুগ্ধতাও বাবার কাছে পাওয়া উত্তরাধিকারের মতো।

ওর বাবা সত্যসুন্দর চৌধুরী কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ফরেস্ট অফিসার হিসেবে। তিনিই একালে প্রথম কাগজপত্রে প্রবন্ধ লিখে তথ্য পরিসংখ্যানযোগ গবেষণা করে নানাভাবে সবুজের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। গাছগাছালির মূলোচ্ছেদ করার, জঙ্গল কেটে ফেলার অর্থ যে একালের মানুষের পক্ষে আত্মহননের নামান্তর, সোজা কথাটা সব শ্রেণীর মানুষকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টায় কম মেহনত তিনি করেননি।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিদেশেও তিনি জঙ্গলাকীর্ণ বহু জায়গা পরিদর্শন করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এই সূত্রেই তিনি অসমে ব্যাপক পরিক্রমা করেন।

কলকাতা-গুয়াহাটি যাওয়া-আসার বিমানভাড়া তখন খুব বেশি ছিল না। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানও তার বনসংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সপক্ষে তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করত, প্রয়োজন বুঝে তাঁর গবেষণামূলক কাজে আর্থিক সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিত।

সত্যসুন্দরের বাবা সুরুচিশোভনবাবু খুব সাধারণ অবস্থার মধ্যে থেকেও আদর্শবাদী ও রবীন্দ্রানুরাগী বাবার ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনের গোড়ার যুগের ছাত্রদের মধ্যে একজন হতে পেরেছিলেন, যাঁরা সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। বীরভূম-বিহারের সীমান্ত-ঘেঁষা এই শহরেই শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয় শিক্ষকের সেকালের সামান্য বেতনের বিনিময়ে চলে আসেন এবং থেকে যান। প্রকৃতিকে ভালবেসেই তিনি দুমকা রোডের প্রায় ওপরেই নামমাত্র দামে বিঘা দুই জমি কিনে ফেলেন, একটি বাড়িও ক্রমশ তৈরি করেন, বাড়ির মধ্যে বিচিত্র গাছগাছালি, ফুলফল এবং একটি পুষ্করিণী সমস্তই তাঁর বিচিত্র নিসর্গপ্রীতির ফল।

সত্যসুন্দর গুয়াহাটি অঞ্চলে বারবার যেতে যেতে জনৈক ব্যবসায়ী বন্ধুর উৎসাহ ও প্রেরণায় প্রথমবার গুয়াহাটির কাছে নীলাচল পাহাড়ে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে যাত্রা করেন। অম্বুবাচীতে মহামেলা আরম্ভ হয় সেখানে প্রতি বছর। সেই সময়েই কামাখ্যা দর্শন প্রশস্ত বলেও সেবারে প্রথম মন্দিরে ওঠেন সত্যসুন্দর।

সত্যসুন্দরকে তার ব্যবসায়ী বন্ধ অলোকমোহন বড়ুয়া বলেছিলেন, "এই যে আপনি কামাখ্যাদর্শন করলেন, অন্তত তিনবার আপনাকে আসতে হবে এখানে।" সে-কথা নিয়ে যুক্তবাদী সত্যসুন্দর মাথা ঘামাননি কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের সবাইকে তিনি পীঠস্থান বলে নয়, নিছক নৈসর্গিক সৌন্দর্য দর্শনের জন্যও দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যায় যেতে উদ্বুদ্ধ করতেন। বলতেন, ধর্ম বা পুণ্যের লোভে নয়, যেতে বলছি স্বদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতিকে জানতে, প্রকৃতির সাহচর্য পেতে। জানো তো, ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোচরাজ নবনারায়ণ ও চিল্লা রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেও জানা উচিত। বাংলার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে ভালভাবে বুঝতে হলে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থেকে তা সহজে হবে না, প্রতিবেশী রাজ্য ও প্রদেশগুলি সম্পর্কে ধ্যানধারণা স্বচ্ছ ও পড়াশোনা গভীর থাকা দরকার। অসম, ওড়িশা আর বিহারের প্রধান অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের অতুলনীয় নিসর্গ আর ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির অমূল্য ঐশ্বর্য।

সত্যসুন্দর ছেলেবেলায় অসংখ্যবার শুনেছেন তাঁর বাবার মুখে, "গুরুদেব আর ক্ষিতিমোহন আমাদের বলতেন, দেশ-দেখার চোখ চাই। না-হলে দেশের মানুষকে বুঝবে না। বুঝতে যদি চাও, সাধারণ মানুষের জীবনের দিকে তাকাও। গভীরে যাও।"

অনিন্দ্য যা-কিছু শুনেছে ছেলেবেলায় বা সত্যসুন্দর আর মা নীহারনলিনীর মুখে, সেই সবই সে দিনের পর দিন শুনিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় দুই সহপাঠী বন্ধু মনু আর জ্যোতিকে, আর মনুর দু'বছরের ছোট বোন তনুকে। দু'বছরের ছোট হলে কী হবে, কথায়বার্তায় বুদ্ধিতে আর তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞানে তনু ওর দাদা আর দাদার বন্ধু জ্যোতির থেকে কিছুমাত্র কম যায় না।

বাবা-মা দু'জনকেই নিতান্ত অকালে হারিয়েছে অনিন্দ্য। তাই বাবা-মা দু'জনের কাছে যা কিছু শুনেছে, শিখেছে ও সমস্তই অনর্গল বলে তার প্রিয় এই তিন বন্ধুকে।

দূর সম্পর্কের মামা গার্জেনবাবুই তার মা-বাবার শোচনীয় মৃত্যুর পরে একমাত্র অভিভাবক। তিন সদ্য দুর্ঘটনায় অনিন্দ্যকে হারিয়ে তার এই তিন বন্ধুকে কতকটা আঁকড়ে ধরলেও আসলে মানুষটি রীতিমত রাশভারী।

অনিন্দ্য অর্থাৎ বাচ্চুর বায়স যখন বারো তখনই কামাখ্যা পাহাড় থেকে গাড়িতে

নামতে গিয়ে এক বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় বাবা সত্যসুন্দর আর মা নীহারনলিনী মুখোমুখি একটা ট্রাকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একেবারে তালগোল পাকিয়ে বস্তুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

শেষের দিকে কামাখ্যা মন্দিরে প্রায় প্রত্যেক মাসে দু-চারদিনের জন্য যেতে থাকেন সত্যসুন্দর। মাঝেমধ্যে সস্ত্রীক। দু-তিনজন সাধক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সত্যসুন্দরের ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠে। দু-একজন সন্ন্যাসীকে অনিন্দ্য এই 'প্রান্তিক' নামের বাড়িতেও দেখেছে ছেলেবেলায়। দরজা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে বাবা যে কী এতসব কথাবার্তা বলতেন জীবনের শেষদিকে, তার খুঁটিনাটি জানার বয়স ও কৌতূহল কোনওটাই তখনও হয়নি অনিন্দ্যর।

বদলির চাকরিতে অনিন্দ্যর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছিল বলে সল্ট লেকে কেনা ফ্ল্যাটে নীহারনলিনী ছেলেকে নিয়ে থাকতে লাগলেন। সত্যসুন্দরকে ঘুরে ফিরে কলকাতায় আসতেই হয়। অনিন্দ্যর বয়স যখন বছরদশেক, তখন থেকেই সে সল্ট লেকের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। ভর্তি হল এ.ডি. স্কুলে।

কামরূপ কামাখ্যার গল্প শুনে-শুনে নীহারনলিনীও সেখানে যাত্রাসঙ্গিনী হতে শুরু করেন অনিন্দ্য একটু বড় হতেই ।

কামাখ্যাতেই নীহারের লতায়পাতায় দাদা অভিরূপের সঙ্গে দেখা যায় একবার সত্য আর নীহারের। অভিরূপ গুয়াহাটিতে কাঠের ব্যবসা করে যখন বেশ দাঁড়িয়ে গেছেন, তখন তিনি গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন গ্রামসম্পর্কিত ভাই অনুপমকে। অনুপম অল্পদিনেই ব্যবসাটা ধরে ফেলায় অভিরূপ নিশ্চিন্তচিত্তে সাধুসঙ্গ করতে থাকেন। জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত অভিরূপ নিজে বিবাহ-সংসার করার সময়ই পাননি। তিনি অনুপমের বিয়ে দিলেন গুয়াহাটিতেই দীর্ঘকালের বাসিন্দা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রী কাঞ্চনমালার সঙ্গে। তাদের একটিমাত্র সন্তান ছেলে কাজল, অনিন্দ্যরই সমবয়সী প্রায়। অভিরূপের সংসারে মন নেই, ব্যবসার ভার অনুপমের হাতে সঁপে তিনি কামাখ্যা পাহাড়েই একটি ছোট ঘরে আস্তানা পাতেন। লম্বা চুলদাড়ির মধ্যে চেনা মুখটিকে খুঁজে বের করতে খুব কষ্টই হয়েছিল নীহারের । তবু কথাবার্তা কিছুক্ষণ গড়াতেই জানা যায়, সত্যসুন্দরের অন্তরঙ্গ সাধুদের কেউ-কেউ অভিরূপকে ভালই চেনেন।

কিছুদিনের মধ্যেই অভিরূপের কাছে খবর আসে, তার সাধের কাঠের ব্যবসা অনুপম লাটে তুলে দিয়েছে। দোষ তারও ততটা নয়, যত বেশী স্ত্রী, কাঞ্চন আর ছেলে কাজলের। মা-ছেলে দু'জনেই বড় বেশি আধুনিক আর বিলাস-ব্যসনে রপ্ত। সংসার ছেড়ে এলেও অভিরূপের মনে খুব আঘাত লাগে। হাজার হোক, নিজের হাতে বহু কষ্টে তিল-তিল করে গড়ে-তোলা একটা কর্মকাণ্ড তো। কাজল আর

তার মায়ের সন্দেহ, অভিরূপ এমন কী পেলেন সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে, জমজমাট কাঠের ব্যবসা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি কামাখ্যা পাহাড়েই বসবাস শুরু করে দিলেন দীনহীনের মতো, একটা ঝুপড়ির মধ্যে। কাজল মায়ের পরামর্শে জেঠুর কাণ্ডকারখানা দেখতে আর বুঝতে কামাখ্যা পাহাড়ে মাঝে-মাঝেই অভিযান চালাতে লাগল।

মন ভেঙে গেল অভিরূপের সবকিছু দেখেশুনে। একবার সত্য আর নীহারের কাছে সেই ভাঙা মনের খবর প্রকাশও করে ফেললেন অভিরূপ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তখন ধরে বসল অভিরূপকে, "সাদা, আপনি আমাদের বীরভূমের বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকুন। সবকিছু দেখাশোনা করুন। আমাদের গার্জেনের মতো।"

সেই থেকে অভিরূপ হয়ে গেলেন গার্জেনবাবু। 'প্রান্তিক' লোকের মুখে মুখে গার্জেনভিলা। থাকতে লাগলেন শুধু নয়, ভালবেসে ফেললেন বীরভূম-সাঁওতাল পরগনার এই সীমান্ত অঞ্চলটিকে। এক নিসর্গ থেকে আর-এক নির্গে। সেখানে ছিল আত্মীয়দের বঞ্চনা, এখানে দূরাত্মীয়দের শ্রদ্ধা-প্রীতি। গার্জেনবাবু আর কামাখ্যা-পাহাড়ে যান না। কলকাতার ধোঁয়া, ধুলো ময়লা, ট্রামবাস জ্যামজমাট পরিবেশও তাঁকে টানে না। মাঝে মধ্যে দু'একদিনের জন্য সত্য আসেন। একবার-দু'বার নীহারও ঘুরে গেছেন শিশুপুত্রকে নিয়ে।

এইসব কথা টুকরো টুকরো শোনা যার কাছে, সেই প্রাণের বন্ধু অনিন্দ্য সত্যি গেল কোথায়? গুমখুন হল, নাকি তাকে গুম করে রাখা হয়েছে কোথাও? ভাবছিল আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল মৃদু গলায় মনু, তনু আর জ্যোতি।

মনু বলছিল, অনিন্দ্য এসেছিল এখানে গতকাল বিকেলে। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে। আমরা আজ বিকেলে। মাত্র ঘণ্টা দুই। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে এখানে পৌঁছলাম। কোথাও কোনও কথা শুনিনি পথে। অনিন্দ্য এখানে খুন হতে পারে না। গার্জেনমামা খুনের আশঙ্কা করছেন কেন? আবার ওকে গুম করে রাখার আশঙ্কাও উনি প্রকাশ করছেন।

"ধরো, এমনও তো হতে পারে, আশপাশে কোথাও বেড়াতে গেছে।" তনু বলল।

"গার্জেনমামাকে না বলে যাবে কেন?" মনুর প্রশ্ন।

জ্যোতি বলল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ছে? একটা বুড়ো মালী। চোখে দেখতে পায় না ভাল। ওই কোণে টালির ঘরে থাকে। তার চোখ ছলোছলো। মুখটা ভয়ে বিবর্ণ। কথাই বলতে পারছে না ভাল করে। আর হল ওই হাবার মা। মাত্র সপ্তাহ দুই আগে এই মহিলাকে এখানে সারাদিনের যাবতীয় কাজের আর রান্নাবান্নার জন্য রাখা হয়েছে। মহিলাকে দেখেশুনে কি খুব দুস্থ বলে মনে

হল? আর, হাবাকে তো এসে থেকে একবারও চোখেই দেখা গেল না।"

মনু বলল, "অনিন্দ্য যে ঘরটা থেকে কাল রাতেই উধাও বলে শুনলাম, সেই ঘরটা একবার ভাল করে দেখবি না জ্যোতি? যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়?"

জ্যোতি মুখটা কঠিন করে বলল, "গার্জেনমামার সঙ্গে গিয়ে এক ঝলক ঘরটা দেখেছি। বলছিস, চল। তবে ও ঘরে তেমন কোনও ক্লু পাবি মনে হচ্ছে না। আর আমি যা দেখতে চাইছি, গার্জেনমামাকে সেটা বলতেও রীতিমত অস্বস্তি লাগছে।"

"কী? কী দেখতে চাইছ তুমি জ্যোতিদা?" জিজ্ঞেস করে তনু।

"যে সুটকেসটা সঙ্গে এনেছে অনিন্দ্য।" ঋজু উত্তর জ্যোতির।

"কেন, কী হবে দেখে? মনটাই শুধু আরও খারাপ হবে তো?"

বোনের কথায় মনুও সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল। তবে মুখে বলল, "আমি বলছিলাম, ঘরের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখলে কিছু যদি পাওয়া যায়। ধর, যে বা যারা একে ধরে নিয়ে গেছে...

"ধরেই নিয়ে গেছে এবং জোর করে, তাই বা ধরে নিচ্ছিস কেন? এমনও তো হতে পারে, স্বেচ্ছায় যেতে পারে এমন কোনও জায়গার নাম করা হয়েছিল ওর কাছে। ও নিজেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। তারপর অবশ্য জোরজবরদস্তির প্রশ্ন উঠতেই পারে।"

এর পরের কথাগুলো বিড়বিড় করে কোনওভাবে বলল জ্যোতি, "আচ্ছা, অনিন্দ্য আদৌ এখানে কাল এসেছিল তো? মানে, আসার সুযোগই পায়নি এমন যদি হয়?"

মনু, তনু দু-ভাইবোনের চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভাবটা বড় আকারেই ফুটে উঠেছিল, এমন সময় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল ঘরের মধ্যে। দু'জনেই চুপ হয়ে গেল এবং ভাবলেশহীন মুখে তাকাল দরজার দিকে। গার্জেনবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার মুখে, কেউ তা খেয়াল করেনি। তিনিই বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল কিছুক্ষণ আগেই বাচ্চুর ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিলাম। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে পুলিশ অফিসার। তোমরা তার বন্ধু, তার ওয়েলউইশার, তোমাদেরও জানানো দরকার। তা ছাড়া শাস্ত্রবাক্যই তো আছে না, প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে...ইত্যাদি। তোমরা তো এখন আমার বন্ধুর মতোই।"

"কাল রাতে নিখোঁজ হয়েছে। আজ অন্তত সকালেই তো জানানো দরকার ছিল মামাবাবু। যাই হোক, তবু একটা কথা আছে। কলকাতা থেকে এস.টি.ডি.-তে আপনাকে ওর আর আমাদের এখানে আসার প্ল্যানটা জানিয়েছিল অনিন্দ্য দিনচারেক আগে। আমরা আজ এসেছি। ও বলেছিল, একদিন আগে এসে ও

এদিকটা গুছিয়ে রাখবে, স্টেশনে আমাদের রিসিভ করবে ইত্যাদি। কিন্তু ও যে এ-বাড়িতে পৌঁছে উধাও হয়ে গেছে কাল রাতেই, কথাটা আপনি পুলিশকে কীভাবে বিশ্বাস করাবেন? মানে, আমি প্রমাণের কথা বলছিলাম আর কি! পুলিশ তো বিনা প্রমাণে কোনও কথাই শুনবে না?

জ্যোতির কথা শুনে দু'চোখ কপালে তুলে গার্জেনবাবু, "ওরে বাবা, তুমি তো দেখছি একেবারে টিকটিকিদের মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করলে? মানে তোমার নিজেরই মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না কি যে, বাচ্চু এ-বাড়িতে আদৌ পা রাখেনি? মানে, আমার ভাগ্নে, আমিই তাকে চিনি না। বলো কী হে!"

জ্যোতি জিভ কেটে বিনীত গলায় বলল, "না, না, মামাবাবু। আসলে গত কয়েক বছর, মানে ওর মা-বাবার অপঘাত মৃত্যুর পরে আপনার সঙ্গে তো ওর দেখাই হয়নি। মাঝে-মধ্যে ফোনে কথা। ওর অসুস্থ পিসিমা আর ও, কেউ কাউকে ছেড়ে তো থাকতে পারে না। কাজের লোকজন থাকলেও পিসিকে আঁকড়েই তো ও আছে।"

"দ্যাখো জ্যোতি, ছেলেবেলায় আমি ওকে বারকয়েক তো অন্তত দেখেছি। ও-ও আমায় দেখেছে। সত্য আর নীহারের সঙ্গে অনিন্দ্য তো কামাখ্যা পাহাড়ে বেশ ক'বার গেছে। নিজের মামা না-হতে পারি, তাই বলে দু'জন দু'জনকে চিনতে পারব না, এটা কী ধরনের কথা হল?" বেশ একটু রেগে গিয়েই বললেন গার্জেনবাবু।

জ্যোতি লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। মনু, তনু ও জ্যোতির কথাবার্তার ভঙ্গিতে মনে হল বেশ অপ্রসন্ন। হাজার হলেও বায়োজ্যেষ্ঠ এবং অনিন্দ্যর গার্জেনমামা তো বটে।

এইরকম কথাবার্তার সময়েই জানা গেল, স্থানীয় থানার ও.সি. বীরেশ্বর বরাট এসে গেছেন। জ্যোতি নামটা শুনেই সচকিত হয়ে নিজেকে সামলে নিল এবং সেই সময়েই হাবার মা একগলা ঘোমটা টেনে দরজার মুখে দাঁড়াতেই ছিটকে বেরিয়ে গেলেন গার্জেনবাবু।

বরাটকে নিয়ে দোতলার বসার ঘরে আপ্যায়ন করলেন গার্জেনবাবু। থালাভর্তি মিষ্টি সাজিয়ে ঘরে ঢুকল হাবার মা। এই সময়ে জ্যোতি মনু, তনুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতে যেতেই প্রকৃতই চমকে ওঠে। হঠাৎ ঘোমটা কিছুটা ফাঁক হতেই ওর চোখে পড়ে যায় হাবার মা'র নাকের চাবিটা। সোনার মাঝখানে রক্তবিন্দুর মতো বহুমূল্যবান পাথর? ও কি হিরে?

তৎক্ষণাৎ গার্জেনবাবু কী বুঝলেন, তিনি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হাবার মা'র দিকে এগিয়ে যান।

চকিতে ও.সি. বীরেশ্বর বরাট জ্যোতির দিকে খুশিভরা অবাক চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বলবার উপক্রম করতেই জ্যোতির নিজের বদ্ধ ওষ্ঠে আঙুল চেপে পিতৃবন্ধু বরাটকে নিবৃত্ত করে। প্রথম পরিচয়ের ভঙ্গিতে নমস্কার করে দ্রুত বলে ওঠে, "আপনিই সার এখানকার ও.সি. মিঃ বরাট?"

প্রতি-নমস্কার করে বরাট বললেন, "আপনারা তিনজন হচ্ছেন অনিন্দ্যর বন্ধু, ফোনেই বলেছেন গার্জেনবাবু।"

জ্যোতি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আমাদের আপনি স্বচ্ছন্দে 'তুমি' বলতে পারেন।"

"ও, আপনাদের পরিচয় হয়ে গেছে। যাই হোক, মিঃ বরাট, সমস্তই তো ফোনে বলেছি আপনাকে। একটু কিছু মুখে দিয়ে আমার বাচ্চুসোনাকে উদ্ধার করে এনে দিল। সারা জীবন আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

"মিষ্টিটা থাক গার্জেনবাবু। আমার ছেলের বয়সী একটি ছেলে এভাবে আমাদের শহরে পা দিতে-না-দিতেই উধাও, এই অবস্থায় আমার মুখে কিছু রুচবে না। এখন চলুন, অনিন্দ্য যে-ঘরটায় ছিল, আগে সেই ঘরটা, ওর জিনিসপত্র আর আশপাশটা একটু দেখে আসি।"

গোটা বাড়ি আর আশপাশটা দেখে সবাই মিলে অনিন্দ্যর ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে জ্যোতি ঘরের দিকে তাকিয়েই তনুর দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কিছু কথা হল, মনু তা লক্ষ করে ঘরের দিকে আরও একবার তাকিয়ে বলেই ফেলল, "এ তো ভৌতিক কাণ্ড দেখছি। অনিন্দ্যর ব্যাগটা তো এই মিনিটদশের আগেও এখানে ছিল না। এখন এল কোথা থেকে?"

"তোমার চোখে না-পড়লেই তো ব্যাগটা উধাও হয়ে যেতে পারে না মনু।"—একটু কুপিত সুরেই বললেন গার্জেনবাবু।

ততক্ষণে সন্তর্পণে ব্যাগটা তুলে চৌকির পরে রেখেছেন ও.সি. এবং তাঁর ইঙ্গিতে তনু সেটার চেন আলগোছে টেনে খুলে ফেলেছে। লক না-থাকায় কোনভাবেই কোনও অসুবিধে হল না খুলতে। বড় কিট্স্ ব্যাগ্। জামা-প্যান্ট-তোয়ালে বেশ কিছুটা এলোমেলো হয়ে আছে।

ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল আরও দু'টি জিনিস। এক বাণ্ডিল বিড়ি আর দেশলাই এবং একটা পকেট-চিরুনি। তিন বন্ধুই জানে, অনিন্দ্য বিড়ি-সিগারেট খায় না, আর পকেটেও কোনও চিরুনি রাখার অভ্যাস তার নেই। বিশেষ করে চুল আঁচড়ানোর জন্য যে ব্রাশটা ব্যবহার করে, সেটাও যখন পাওয়াই গেল ব্যাগের মধ্যে।

ও. সি. বরাট তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কিছু একটা বুঝলেন। তিনি এসব জিনিস

সহ পুরো ব্যাগটাই কনস্টেবলকে দিয়ে নিজের জিপ গাড়িতে তুলে নিলেন এবং যাওয়ার সময় জ্যোতি, মনু, তনুদের বললেন, "তোমরা দু-তিনদিনের জন্য বেড়াতে এসে সত্যিই খুব ঝামেলায় আর মনোকষ্টে পড়ে গেলে। তবু বলছি, পুলিশের চাকরি করি তো! আইনের বাইরে যেতে পারি না। তোমাদের তিনজনকেই আমার সঙ্গে ঘণ্টা দু-তিনের জন্য একটু থানায় যেতে হবে। নিয়মমাফিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তো?"

এতক্ষণ খুব অস্বস্তিতে ছিলেনগার্জেনবাবু। এবার যেন একটু উৎসাহ বোধ করলেন। উদ্বেগের ভাব মুখেচোখে যথাসাধ্য ফোটাতে গিয়েও ঈষৎ জব্দ-করা খুশিতে বলে উঠলেন, "বরাট সাহেব, আমার বাচ্চুর ব্যাপারে শুধু দু-তিন ঘণ্টার জন্য কেন, আপনি যদি মনে করেন, আমাদের সবাইকে লক-আপেও রাখতে পারেন। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

"বিনা কারণে বা তুচ্ছতম কারণে কেন কাউকে লক-আপে রাখতে যাব বলুন গার্জেনবাবু। অনিন্দ্য এখানে বেড়াতে এসে এখান থেকে উধাও হল, তার মানে এই নয় যে, এই জায়গাটা বা বাড়িটা বা এখানকার কোনও লোকই এর জন্য দায়ী, সেইজন্যই ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গেও খুঁটিনাটি কথা বলা দরকার।"

গলাটা একটু নামিয়ে বললেন তারপর, "এখানখার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা। আর এসব ক্ষেত্রে আমরা কাউকেই সন্দেহের উর্ধ্বে বলে মনে করি না।"

এসব কথা বলতে-বলতে সবাই যখন নীচে নেমে এসেছেন, তখনই মনে হল, একতলায় রান্নাঘরের পাশের ঘরটা থেকে জ্যোতিদের বয়সী একটা ছেলে দ্রুত বেরিয়ে এসে বাইরে বেরনোর গেটের দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল।

বরাট জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে গার্জেনবাবু একটু যেন আমতা-আমতা করেই বললেন, "তবে কি হাবা ফিরে এল?"

বরাট বললেন, "হাবাকেও তো একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। ডাকুন না ওকে।"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজির পরেও হাবাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। বরাট নিজেই জিপ চালিয়ে থানার দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু জিপ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরে জ্যোতি বলল, "বরাটকাকু, গার্জেনবাবুর বাড়ির পেছন দিকটায় যাওয়া দরকার আমাদের। হাবাটাকে পাকড়াও করতে পারলে মনে হয় অনিন্দ্যর কোনও খবর মিলতেও পারে।"

"তোমার কথাই ঠিক মনে হয় জ্যোতি তবে দু-একটা জরুরি ফোন করা এবং গার্জেনবাড়িটা পুলিশ ফোর্স দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থার জন্য আমাকে একবার

থানায় যেতেই হবে।

এইসব কাজ সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই মনু-তনুসহ জিপটা গার্জেনভিলার পেছনের দিকের ঝোপঝাড়ের আড়ালে রেখে জ্যোতিকে নিয়ে রিভলভার হাতে বরাট গার্জেনভিলার পরে ঝুঁকে-পড়া একটি বটগাছের ডাল আশ্রয় ক'রে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মশার উপদ্রব চলতেই লাগল।

রাত একটু গভীর হতেই গার্জেনভিলার সব আলো নিভে এল। প্রধান প্রবেশ-পথেরটি ছাড়া। বরাট ও জ্যোতি সন্তর্পণে পাঁচিল পার হয়ে ফুলের বাগানের মধ্যে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ায় মুহূর্তের জন্য দ্বাররক্ষী সচকিত হলেও বিপদের আশঙ্কা ক্রমশ কেটে গেল।

হঠাৎ বরাট ও জ্যোতি তর্কাতর্কি শুনে আওয়াজ লক্ষ্য করে একতলায় একটা ঘরের পেছনে এসে দাঁড়ায়। নিশুতি রাত। ছোট্ট শহরসীমা ছাড়িয়ে এই বাড়ি। তারপর ঝোপঝাড়, জঙ্গল মতো। ঝনঝনিয়া পুল। একটি খরস্রোতা লম্বা খাল। তারপর সাঁওতাল পরগনার টিলাভর্তি প্রান্তর। যারা কথা বলছে, তাদের গলায় রাগ আর উত্তেজনা।

"তুই আমাকে না বলে ব্যাগটা ওখানে রাখনি কেন? তোর বিড়ি-দেশলাই ব্যাগে ঢোকাতে গেলি কেন? অনিন্দ্যকে খতম করার কথা ছিল। দায়িত্ব নিয়েছিলি। তাও পারলি না? ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে সন্দেহ ঢুকছে। ও.সি.টাও মনে হয় গোলমাল করতে পারে। তারই মধ্যে তুই এ-ঘর থেকে এমন সময়ে বেরোলি, যখন তোকে ওরা সবাই দেখে ফেলল। তোর বিষয়সম্পত্তি কী হবে? তুই সব নষ্ট করতেই শিখেছিস।"

আশ্চর্য এই, কথাগুলো বলছেন গার্জেনবাবু। বোঝা যাচ্ছে, বলছেন হাবাকে। কে হাবা? হবার কথা শুনে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

"তুমি তো আসল গার্জেনবাবুকে সরিয়ে গার্জেনবাবু সেজে বসে আছ। গার্জেনবাবুকে যেখানে রেখেছে, সেখানেই আমি অনিন্দ্যটাকেও জমা করে দিয়েছি। আর তো দুটো দিনের মামলা। সাঁইথিয়ার চৌরাশিয়ার কাছ থেকে টাকাটা নিয়েই কেটে পড়া। গার্জেনবাবু আর অনিন্দ্যকে সুরিচুয়ার সিধু মাঝির দল দুটো দিন আটকে রাখতে পারবে না? ডাক্তার আছে, ইনজেক্‌শন আছে। অত ভাবার কী আছে? আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও।"

"যদি ও.সি. ছোকরাদুটো আর মেয়েটাকে নিয়ে আবার আজ রাতে হানা দেয়, তখন কী হবে?"

তীক্ষ্ণ ও কর্কশ সুরে একটি নারীকণ্ঠের গর্জন শোনা গেল, "এক হাত ঘোমটা টেনে আমি ক'দিন রাঁধুনি সেজে বসে থাকব এই ফাঁকা মাঠে-জঙ্গলে?

গার্জেনটিরই বা কী হল? বাপ-ব্যাটা দুটোই হয়েছে বাক্যবাগীশ!"

"ধর্মভীরু বুড়োটা সেটা জমা দিয়ে বসেছে সরকারি হেফাজতে। এখন জমিবাড়ি বেচে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়া। আর দু-তিনটে দিন বড়জোর।"

দ্রুতপায়ে জ্যোতিসহ বরাট গার্জেনবাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসেই হুইস্‌ল বাজালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে গার্জেনবাবুর ছদ্মবেশধারী অনুপম, হবার মা অর্থাৎ তার স্ত্রী কাঞ্চন আর তাদের ছেলে হাবা সেজে থাকা কাজলকে পুলিশ গ্রেফতার করল। থানার গরাদের আড়ালে স্বামী-স্ত্রীকে জমা রেখে হাবাকে মারধোর করে জিপ চাপিয়ে জিপ ছুটল সুরিচুয়ার দিকে। সেখানে সিধু মাঝির ডেরায় গিয়ে তাকে নিয়ে পাতাল-কুঠুরিতে যেতেই চোখের জলে আর হাসিতে একটা সত্যিকারের মিলনদৃশ্য। বন্ধু অনিন্দ্য, জ্যোতি, মনু, তনুকে পেয়ে আনন্দে অধীর। গার্জেনমামা চার বন্ধুকে নিয়ে গার্জেনবাড়িতে ফিরে একটা উৎসবই করে ফেললেন। ও.সি. বরাট বন্ধুপুত্র জ্যোতির পিঠ চাপড়ে বললেন, "তুমি একদিন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-প্রধান হবেই।"

রায়ভিলার অভিশপ্ত নীলা

উজ্জ্বল মল্লিক

॥ ১॥

গভীর রাত। আপ বম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে আমি অর্থাৎ ঝুমুর দত্ত আর আমার পিসতুতো দাদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ রকিদা এবার চলেছি জব্বলপুরের পথে।

ঠিক জব্বলপুর নয়। ওখানে নেমে যেতে হবে ভেড়াঘাট। মার্বেল রকের ধারে। রায় ভিলার মালিক রণবীর লোক এসে আমাদের নিয়ে যাবে ওদের এস্টেটে।

মার্বেল রক। মানে শাদা মার্বেলের পাহাড়। নাম শুনেছি অনেকবার। এবার চাক্ষু, দর্শন হবে ভেবে আনন্দে মনটা হয়ে উঠেছে উচ্ছল।

হঠাৎ ঘুমটা গেল ভেঙে। কেউ যেন অতি সন্তর্পণে দরজায় টোকা দিচ্ছে! হ্যাঁ ঠিক তাই।

আবার শব্দ । ঠক ঠক।

রকিদার দিকে তাকালাম। ওপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তমনে হল। আমার কি দরজাটা খালা উচিত হবে? ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই শুনলাম রকিদার গলা। 'ঝুমি দাঁড়া। আমি খুলছি।'

'আরে তুমি কখন উঠলে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'তোরই সঙ্গে আমারও ঘুমটা ভেঙে গেছে। চুপ করে শুয়ে শুধু তোর সাহসটা দেখছিলাম।' বলে মুচক হাসল রকিদা।

নিচে নেমে এবার দরজাটা আস্তে করে খুলে একপাশে করে দিল রকিদা। লাঠি হাতে এক বুড়ো ভদ্রলোক একরকম আমাদের ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোকের চুলগুলো একদম শাদা। দাড়িটাও শাদা। পরনেও শাদা পাঞ্জাবী আর পায়জামা। ভদ্রলোক ঢুকে নিজেই দরজাটা টেনে বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, 'এমন মাঝরাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য সত্যিই খুব দুঃখিত মিস্টার সেন। কিন্তু এ ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না।' বলেই বসে পড়লেন।

'আমাকে আপনি চেনেন নাকি?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, অনেকের মতোই আপনাকে আমি চিনি। আর এই কি ঝুমি?'

পাল্টা প্রশ্নের জবাবে রকিদা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু এত রাতে আমাদের কুপে ঢুকলেন কেন?'

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা তো রায় ভিলার যাচ্ছেন?'

'সবই তো জানেন দেখছি। কি পরিচয় আপনার?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করল রকিদা।

'পরিচয় আমার যথাসময়ে পাবেন। শুধু জেনে রাখুন আমার নাম পরমেশ্বর রায়। এস্টেটের সম্পত্তিতে আমারও অধিকার আছে একথা আপনাকে একটু জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম। যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গাটাও বিশেষ সুবিধার নয়। যে কোনও সময় কিন্তু প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।' এতগুলো কথা বলার পর ভদ্রলোক হঠাৎই উঠে পড়ে বললেন, 'যাই, পরে আবার আসব' বলেই ভদ্রলোক হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

রকিদাও হাই তুলতে তুলতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'নে ঝুমি এবার ঘুমিয়ে পড়।'

'লোকটা তো সকালেও আসতে পারত রকিদা।' বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম

আমি।

'নিশাচরেরা রাতই আসে।' উত্তর দিল রকিদা।

সারা রাত ভালো করে ঘুম হল না। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। জানালাটা খুলে কাচটা নামিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম রায় এস্টেটের কথা।

এবার ফিরে যাচ্ছি একটু পূর্বের ঘটনায়।

গত রবিবার সকালে রকিদার বাড়িতে বসে ব্রেকফাস্ট করছিলাম। হঠাৎই কলিং বেলটা বেজে উঠল। একজন পিওন ধরনের লোককে দরজা খুলে দেখতে পেলাম। রকিদাও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা রকিদার হাতে একটা খাম দিয়ে ভাঙা বাংলায় বলেছিল, 'সেন সাব্। হামি হরদেও সিং। জব্বলপুরের রায় এস্টেটের মালিক রণবীর রায়ের কাছ হতে আসছি। হামাকে তুরন্ত ফিরে যেতে হবে। চিঠিতে সব কিছু লিখা আছে, নমস্তে'—বলে চলে গেল।

রকিদা খামটা ভালো করে দেখে বলেছিল খুবই বিত্তবান লোকের চিঠি ঝুমি। মনে হচ্ছে এবারও ভালোই রোজগার হবে।

চিঠিতে লেখা ছিল—

মহাশয়,

আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। আমি আপনার সাহায্য চাই। কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রী লতিকা রান্না করার সময় স্টোভ ফেটে মারা যায়। ওর হাতে আমাদের পারিবারিক একটা আংটি ছিল। খুবই পয়মন্ত আংটি। রক্তমুখী নীলা। কেউ কেউ বা বলত অভিশপ্ত। কিন্তু যাই হোক এ আংটি ধারণের পর থেকেই আমার ব্যবসার প্রচুর উন্নতি হয়। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর ঐ আংটি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আংটি আমাদের বাড়ি অর্থাৎ রায় ভিলাতেই আছে। সেইজন্যই আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার চিঠি পাবার পর যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আমাদের বাড়ি চলে আসুন। এখানকার সমস্ত খরচা আমি দেব। আপনি যেদিন আসবেন আমায় চিঠিতে জানাবেন। আমার লোক গিয়ে আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে আসবে। কবে আসছেন জানাবেন। নমস্কার নেবেন।

ইতি—
রণবীর রায়
রায় এস্টেট
ভেড়াঘাট, জব্বলপুর।

আবার ফিরে আসি ট্রেনের কামরায়। এলাহাবদ এল সকাল সাড়ে এগারোটার

সময়। এলাহাবাদে আমাদের লাঞ্চ দিয়ে গেল। ভাত খেয়ে হাত ধুতে যাচ্ছি দরজা খুলে—করিডোরে আবার দেখা হল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে। বললেন, 'জব্বলপুরে আর গেলাম না। এলাহাবাদে একটা কাজ আছে। তবে যথাসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' তারপর প্লাটফর্মে নেমে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জব্বলপুর পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি—তখনই দেখলাম এক ভদ্রলোক হেসে রকিদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য। 'মিস্টার সেন, আমি নিমাই ভদ্র। আপনাদের রায় ভিলার নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনি কি ওখানেই থাকেন?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, আমি ওখানকার ম্যানেজার কাম ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড বলতে পারেন।'

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তিনজনেই সামনে বসলাম। ড্রাইভার সীটে বসলেন নিমাইবাবু। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ পেরিয়ে রায় ভিলায় পৌঁছতে এক ঘন্টার বেশি লাগল না। কয়েক একর পাঁচিল ঘেরা জমির গেটে সাইনবোর্ডে লেকা রয়েছে 'রায় এস্টেট'। গেটে দারোয়ান ছিল। বাইরে জীপের হর্ন বাজানোর শব্দে দারোয়ান গেট খুলে দিল। লাল সুরকির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল জীপ। এক পাশে একটা কারখানা। 'ওটাই আমাদের কারখানা।' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন নিমাইবাবু।

গাড়ি গিয়ে তামল পুরোনো দোতলা একটা বাড়ির সামনে। শাদা মার্বেল পাথরে কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে রায়ভিলা।

ওপরের বারান্দায় মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। নিমাইবাবু বললেন, 'রণবীরবাবু। স্ত্রী মৃত্যুর পর বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।'

'আসুন ওপরে উঠে আসুন।' ভরাট গলায় বলে উঠলেন রণবীরবাবু।

পুরোনো দিনের বাড়ি। দোতলায় উঠেই দেখলাম রণবীরবাবু এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের নিচেই হবে। মাঝারি গায়ের রঙ। চুলগুলো অল্প পাকা। দেখে মনে হয় পত্নীর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

'ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো?' কথা বললেন রণবীরবাবু।

'না না কষ্ট কেন হবে। বেশ তো ভালোই লাগল। এমন একটা বেড়াবার জায়গায় আসতে পারা তো আমাদের সৌভাগ্য।' রকিদার কথায় মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ বিশ্রাম করুন। রামু মালপত্র আপনাদের ঘরে তুলে দিচ্ছে। রাতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সব কথা বলব।'

'ঠিক আছে', বলে আমি আর রকিদা আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছলাম। দিনের বেলা বুঝতে পারিনি। রাত বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পর রামু এসে বলল, 'বাবু আপনাদের ডিনার রেডি হয়ে গেছে।'

খাবার খেয়ে শুতে চলে এলাম বিছানায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

।। ২।।

দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দূর থেকে মার্বেল রক দেখা যাচ্ছে। কাল সন্ধেবেলায় ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। রকিদাও ঘুম থেকে উঠে কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাইনি। রকিদাই আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ঝুমি আজ রাতে পূর্ণিমার আলোয় আমরা বোটিং করতে যাব। পূর্ণিমার আলোয় তাজমহল দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে মার্বেল রক দেখার এ সুযোগ আর হাতছাড়া করছি না।'

'তাই নাকি সে তো খুব ভাল হবে।' বলে ফেললাম আমি।

রণবীরবাবু কাছাকাছিই ছিলেন কোথাও। আমাদের কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'কিছু ভাববেন না। আমাদের নিজস্ব বোটে আপনাদের ঘুরিয়ে আনব। এখন রেডি হয়ে নিন। নিচের বাগানে বসে চা খেতে খেতে কথা হবে।'

মুখ হাত ধুয়ে নিচে নেমে এলাম। রণবীরবাবু আগে থেকেই বসে ছিলেন। আমরা যেতেই রামু এসে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। খেতে খেতে রণবীরবাবু শুরু করলেন তার বক্তব্য।

'আমার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায় সুদূর বাংলাদেশ থেকে এইখানে এসে স্টোনের ব্যবসা শুরু করেন। এস্টেটের ঐ পাশে আমাদের কারখানা'—বলে আঙুল তুলে দেখালেন।

'হ্যাঁ, গতকাল আসবার সময় আপনার ম্যানেজারবাবু আমাদের দেখিয়েছেন।' রকিদা বলল।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলাম দারোয়ান রায় এস্টেটের দরজা খুলে দিচ্ছে। আর ভিতরে প্রবেশ করছে একটা জীপ। 'মনে হচ্ছে পুলিশের জীপ'—প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ ঠিক বলেছ।' রণবীরবাবু বললেন। জীপটা রায় ভিলার সামনে এসে থেমে গেল। ভেতর থেকে নামল একজন সুদর্শন পুলিশ অফিসার।

'আসুন মিস্টার ভার্গব।' বলে উঠলেন রণবীরবাবু।

'আমি কিন্তু এসেছি মিস্টার সেনের কাছে।' পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন মিস্টার ভার্গব।

'কলকাতার পুলিশের অফিসার ভাদুরী হালদার চিঠিতে আপনার কথা লিখে

জানিয়েছেন। আমি স্থানীয় থানার ও. সি.।

আপনি এত ভালো বাংলা শিখলেন কি করে?' প্রশ্ন করল রকিদা।'

'আমি কলকাতায় বহুদিন ছিলাম। ওখানকার কলেজেই পড়াশুনো করেছি।' উত্তর দিলেন মিস্টার ভার্গব।

'ভালই হল মিস্টার ভার্গব। আমি একবার লতিকা দেবীর রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। যদি ওখানে হারানো আংটিটা পাওয়া যায়। আপনি থাকলে ভালোই হবে। কি বলেন রণবীরবাবু?'

'হ্যাঁ, তখন থেকেই তো রান্নাঘর বন্ধ রেখেছি। আর খুলতে পারিনি।' রকিদার কথার উত্তর দিতে গিয়ে রণবীরবাবুর গলাটা কান্নায় ধরে এল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আসুন সবাই।'

বাড়িটার এক কোণে রান্নাঘর। বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

রণবীরবাবু তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করতেই বন্ধঘরের একটা চাপা গন্ধ নাকে এসে লাগল। চতুর্দিকে একটা ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। রান্নাঘরের চারদিকের দেওয়াল কিন্তু সুন্দর টালি দিয়ে সাজানো। টেবিলের ওপর স্টোভটা এখনও বসানো রয়েছে। একটা গোল প্লাস্টিকের বাটির মধ্যে বিভিন্ন রান্নার মশলা সাজানো রয়েছে। শুধু হলুদের বাটিটা উল্টে পড়ে গেছে। হলুদ লাগা চামচটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'বিস্ফারণের সময় লতিকাদেবী বোধহয় রান্নায় হলুদ মেশাচ্ছিলেন। তাই না রকিদা?' আমার প্রশ্নের উত্তরে রকিদা শুধু বলল 'গুড'।

'এই সমস্ত জিনিসে বোধহয় লতিকাদেবীর মৃত্যুর পর আর হাত দেওয়া হয়নি?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'না' তারপর থেকে আমি আর এই ঘরই খুলিনি। উত্তর দিলেন রণবীরবাবু।

রকিদা ঘরের চারিদিক ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'কি আশ্চর্য্য, আপনি তো বলেছেন স্টোভ ফেটে লতিকাদেবীর মৃত্যু হয়েছে?'

রণবীরবাবু বললেন, হ্যাঁ তাই তো জানি। বিকট একটা শব্দ শুনে আমি আর নিমাইবাবু ছুটে আসি। অনেকটা বোমা ফাটার মতো শব্দ। ঘরে এসে দেখলাম লতিকা ঘরের মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুখটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি দুজনে ধরে ওকে জীপে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পথেই ওর জ্ঞান হারিয়ে যায়। সেই জ্ঞান আর ফেরেনি। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যই লতিকাদেবীর মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তার রিপোর্ট দেন।'

'মিস্টার ভার্গব, আমি এই সমস্ত জিনিসগুলোকে একবার ফরেনসিকে বিশ্লেষণ করাতে চাই।' রকিদা বলল।

'ঠিক আছে মিস্টার সেন, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে যাব।' মিস্টার ভার্গব জানালেন। তারপর টুকিটাকি সমস্ত জিনিসগুলো একটা ব্যাগে ভরে ফিরে গেলেন।

।। ৩।।

রায় ভিলার নিজস্ব বোট 'চলন্তিকা'য় চেপে পূর্ণিমার রাতে আমরা দেকতে বেরিয়েছি মার্বেল রকের সৌন্দর্য। একটু আগেই রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সকলেরই গায়ে গরম জামা-কাপড় রয়েছে। তাও বেশ শীত করছিল। তবে শীতটা উপভোগ করতে বেশ ,ভালোই লাগছে। রণবীরবাবু নিজেই বোট চালাচ্ছেন। দূর থেকে রায় ভিলার ছাতের আলোটা দেখা যাচ্ছে। আঁকা-বাঁকা পথে বোট চলেছে। দু'ধারে মার্বেল রক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখান দিয়ে কুলু কুলু ধ্বনিতে বয়ে যাচ্ছে নর্মদা নদী।

মার্বেল রক কিন্তু মার্বেল পাথরের মতো শাদা নয়। ঈষৎ হলুদ রঙের। পূর্ণিমার আলোয় এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। গতকাল দূর থেকে দেখে মার্বেল রকের এই সৌন্দর্যের কিছুই বুঝতে পারিনি। পাহাড়ের মাথায় প্রকৃতির তৈরি গাড়ি, হাতি ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে রণবীরবাবু বললেন, 'লতিকার বড়ই প্রিয় ছিল এই জায়গা। প্রতি পূর্ণিমার রাতে আমরা এখানে বোটিং করতে আসতাম। আজ নিজেকে বড়ই একা লাগছে।' বলতে বলতে বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন রণবীরবাবু।

প্রসঙ্গ বদলাতে রকিদা এবার জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা নিমাইবাবু আপনার কত দিনের বন্ধু?'

'একদম ছোটবেলার বলতে পারেন। আমাদের সমস্ত উত্থান পতন ওঁর দেখা। খুবই সৎ লোক। বছর খানেক আগে আমাদের ম্যানেজার মারা যান হঠাৎই। তারপর থেকেই উনি দেখাশুনা করেন। উনি আমাদের এখানেই থাকা খাওয়া করেন।'

'ওনাকে কি আপনি মাইনে দেন?'

'হ্যাঁ, তা কিছু দিই বটে। তবে ভদ্রলোকের টাকা পয়সায় কোনও লোভই নেই। রক্তমুখী নীলা হারিয়ে যাবার পর কি বলব মাঝে মাঝেই আমার ব্যবসায় লোকসান হতে শুরু হয়। কয়েক মাস ওনাকে মাইনেও দিতে পারিনি। উনিও কিন্তু কিছু চাননি।'

'আপনার ব্যবসা এখন কেমন চলছে?'

'এখন মন্দাই যাচ্ছে বলতে পারেন। নীলাটা হারাবার পর মনের জোরও কমে গেছে।'

'নিমাইবাবুকে কি আপনিই চাকরি দিয়েছিলেন? নাকি ইনিই আপনার কাছে কাজ চেয়েছিলেন?'

'আসলে ম্যানেজারবাবুক মৃত্যুর পর চতুর্দিকে ঠিক চোখ রাখতে না পারায় ইনি নিজেই এসে আমায় বললেন, আমিই তো তোমার ব্যবসা দেখাশুনো করতে পারি। মাইনে যা হয় দিও। ছোটবেলার বন্ধু। কথা ফেলতে পারিনি। রাজি হয়ে যাই।'

'উনি আগে কোথায় চাকরি করতেন?'

'উনি এখানকার এক নামকরা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন।'

'আচ্ছা নীলা চুরির ব্যাপার আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'দেখুন নীলা যে চুরিই গেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। তবে আমার এক দূর সম্পর্কের শালা আছে সে প্রায়ই লতিকার কাছে আসত টাকার জন্য। নানা রকমের বদ নেশাও আছে ছেলেটির। লতিকাও তাই আর ওকে টাকা দিতে চাইত না। এই নিয়ে দু-একদিন ঘরের ভিতর ঝগড়া হতেও শুনেছি।'

'লতিকাদেবীকে এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করেননি?'

'আজ্ঞে না। আমি ওর মধ্যে মাথা গলাতে চাইনি।'

'কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করছি, লতিকাদেবী নিমাইবাবুকে কি চোখে দেখতেন?'

'ঠিক নিজের ভাই-এর মতো।' হেসে উত্তর দিলেন রণবীরবাবু। এও বললেন যে নিমাইবাবুও ওনাকে দিদির মতো শ্রদ্ধা করত। প্রতি ভাইফোঁটায় ফোঁটা নিতে যেতেন। এমন কি মারা যাবার দিনও দিদির হাতে খিচুড়ি খেতে চেয়েছিলেন।

'লতিকা দেবীর শালা কোথায় থাকে? একবার ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'হ্যাঁ যাবে। সকালে যখন ধূমাধার জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাব, তখন ওর বাড়িতে যাব। ও ওদিকেই থাকে।'

দেখতে দেখতে 'চলন্তিকা' আবার ঘাটে ফিরে এল। মর্বেল রক দেখে বাড়ি ফিরে এলাম রাত সাড়ে বারটার সময়। দারোয়ান দরজা খুলে দিল। নিচে থেকে দেখলাম নিমাইবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

'উনি কি এখনও জেগে থাকেন?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, প্রফেসার ছিলেন। পড়াশুনো করতে ভালোবাসেন। রাতে শুতে যেতে একটু দেরিই করেন।'

'গুড নাইট' বলে চলে গেলেন রণবীরবাবু। একটু পরে নিমাইবাবুর ঘরেও আলো নিভে গেল।

বোটিং করে আসার পর কেন জানি না খুব ক্লান্ত লাগছিল। দুজনে অন্ধকারে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ দূর থেকে টর্চের একটা আলো যেন রায়ভিলার আশেপাশে ঘুরছে বলে মনে হল। রকিদার দিকে তাকালাম। রকিদাও এক মনে আলোর দিকে দেখছে। এইবার দেখতে পেলাম। টর্চ হাতে কেউ একজন রায় ভিলার বাগানে হেঁটে যাচ্ছে।

রকিদা আমায় বলল, 'বুঝি তুমি ঘর বন্ধ করে থাক। আমি ফিরে এলে আস্তে করে খুলে দিবি। ভয় পাবি না। আমি দেখে আসি লোকটা কে?"

আমি দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে বসে ঘামাতে লাগলাম এই শীতের রাতেও।

ঘণ্টাখানেক পর রকিদা ফিরে এল। মনে এক রাশ চিন্তা। ফিরেই বলল, 'নে এবার ঘুমিয়ে পড়। লোকটা আর কেউ নয়। পরমেশ্বর রায়। রায় ভিলার আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়,। উদ্দেশ্যটা বের করতে হবে।'

কাল আবার কি ঘটবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

।। ৪।।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে মার্বেল রকের সৌন্দর্য দেখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম, 'কি খবর ঝুমি, কাল কেমন ঘুরলে?'

নিমাইবাবুকে দেখে বললাম, 'আরে আপনি দেখছি রাতেও দেরিতে ঘুমোন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।'

'হ্যাঁ বোন, আমি 'Late to bed and early to rise' নীতিতে বিশ্বাসী। জীবনের এতটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে নষ্ট করতে চাই না।' বলে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

'ভদ্রলোক তো খুব শিক্ষিত', তাই না রকিদা।

'হ্যাঁ। সব বিষয়েই পণ্ডিত। Jack of all trades বুঝতে পারলি।' হেসে ফেললাম আমি।

একটু পর রামু এসে বলল, 'বাবুদের ব্রেকফাস্ট রেডি হয়েছে।'

আমরা খেতে গেলাম। রণবীরবাবুও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। তারপর বললেন চলুন এবার বেরনো যাক।

ধুমাধার জলপ্রপাতের গর্জন আমরা দূর থেকে শুনতে পেলাম। কাছে গিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। এটাকে ঠিক জলপ্রপাত বলা চলে না। পুরো নর্মদা নদীটাই এখানে হঠাৎ পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে আছড়ে পড়ছে। মার্বেল রকের শুরুও এখান থেকে মনে হল। দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গেছলাম। রণবীরবাবু

এবার বললেন, 'চলুন যাই, এবার ঐ শালা দীপক বেটার কাচে।' সরু রাস্তা বেঁকে চলে গেছে। ভেতরে একটা ছোট গ্রাম। একটা চালাঘরের সামনে এসে রণবীরবাবু থামলেন। বাইরেই একটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে একটা লোক। বয়স বছর তিরিশ হবে। রণবীরবাবুই ডেকে ঘুম থেকে তুললেন। ঢুলুঢুলু চোখে ঘুম থেকে উঠে জিগ্যেস করল, 'কি ব্যাপার? হঠাৎ আমার বস্তিতে আসা কেন?'

'এরা কলকাতা থেকে এসেছেন। বেড়াতে বেড়াতে এগিকে চলে এলাম।'

'ও নমস্কার।' বলে দীপকবাবু সোজা তাকাল রকিদার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে নানা সন্দেহ। চেহারাটা লোফারের মতো। চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গেছে। চোয়ালটাও ঢোকা।

'আপনি লতিকাদেবীর ভাই?' প্রশ্ন করল রকিদা।

'হ্যাঁ, তবে নিজের নয়। ওনার এক সম্পর্কের কাকার ছেলে আমি। এখানে পড়াশুনা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারলাম না। তাই এখানে থেকে ব্যবসা শুরু করলাম। মার্বেল রকে নৌকা বিহার করার জন্য যে সিঁড়ি দিয়ে ঘাটের দিকে নামা হয়, তার ডানদিকেই আমার দোকান। নানা ধরনের সফ্ট স্টোনের পুতুল বিক্রি করি। আমার চলে যায় কোনও রকমে। সংসার এখনও করিনি। করার ইচ্ছেও নেই। কিছুদিন আগে শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বসেছি। তার ওপর দিদিকেও হারালাম।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হঠাৎ একদম চুপ করে গেলেন দীপকবাবু।

'যদি কিছু মনে না করেন দীপকবাবু আপাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই? দিদির ব্যাপারে।'

'ও বুঝেছি—আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন গোয়েন্দাগিরি করতে। কিন্তু পারবেন কি ঐ নীলা উদ্ধার করতে। ওটা অভিশপ্ত। হারিয়ে গেছে ভালোই হয়েছে'—বলে উঠলেন দীপকবাবু।

'দেখাই যাক না চেষ্টা করে। আপনি আমায় কি এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন? তাহলে রবিবার বিকেলে চায়ের একটা পার্টি দিচ্ছি আমি। রণবীরবাবুর বাড়িতে। আসবেন কিন্তু। কিছু নতুন খবর শোনাব।'

'নিশ্চয়ই যাব'—বললেন দীপকবাবু।

'অদ্ভুত লোক।' বললাম আমি।

'ঠিক বলেছ।' রণবীরবাবু উত্তর দিল। ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। বাড়িতে এসে দেখলাম রামু আর নিমাইবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেতেই বললেন, 'পুলিশ অফিসার মিস্টার ভার্গব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

কাছে যেতেই, মিস্টার ভার্গব রকিদাকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন। তারপর

অনেকক্ষণ দুজনে কি কথা হল জানি না। এক সময় মিস্টার ভার্গব চলে গেলেন। ওপরে ওঠার সময় একবার নিমাইবাবুর ঘরে রকিদা হঠাৎ ঢুকে পড়ল। পেছনে পেছনে এলাম আমিও। নিমাইবাবু ঘরে ছিলেন না। বাথরুমে গেছলেন। পাঞ্জাবিটা বিছানায় পড়ে আছে। ঘরদোর একদম অগোছালো। সিগারেটের একটা প্যাকেট বিছানায় পড়ে আছে।

'কি আশ্চর্য—নিমাইবাবু সিগারেট খান। অথচ জব্বলপুর থেকে ভেড়াঘাট আসার পথে ওনাকে একটাও সিগারেট খেতে দেখিনি।' সিগারেটের প্যাকেটটা একবার হাতে তুলে রেখে দিল রকিদা। তারপর বলল 'যথেষ্ট দামী সিগারেট। বুঝলি বুঝি, ভদ্রলোক ৫৫৫ সিগারেট খান। দামি সিগারেট বলে সকলকে এড়িয়ে একা একা খান।'

একটু পরে নিমাইবাবু ফিরলেন। আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে বললেন, 'কখন এসেছেন ঘরে, দেখতে পাইনি।'

'এই তো এইমাত্র এলাম। আপনাকে একটু বিরক্ত করব।'

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ভরতে ভরতে নিমাইবাবু বললেন, 'বলুন না কি বলবেন?'

'আপনার গরে তো নানা ধরনের বই দেখছি। Medical Science, Chemistry ছাড়াও দর্শন শাস্ত্রেও আপনার পড়াশুনো রয়েছে দেখছি।'

'হ্যাঁ আমি বিভিন্ন বিষয় পড়তে ভালোবাসি।'

'আপনি কোন কলেজে অধ্যাপনা করতেন?'

'আজ্ঞে এখানকার রয়্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলাম।'

'আচ্ছা রণবীরবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল?'

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা স্বরে উত্তর দিলেন নিমাইবাবু, 'ভালো নয়।'

'কেন?'

'ইদানীং রণবীরবাবুর ব্যবসা ভালো না চলায় উনি প্রায়ই লতিকাদেবীর গয়না বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করতেন। এই নিয়েও ওদের প্রায়ই ঝগড়া হোত। এমন কি মৃত্যুর আগের দিন রাতেও ওদের তুমুল ঝগড়া হয়। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় লতিকাদেবী কি আত্মহত্যা করলেন?'

'আর লতিকাদেবীর ভাই সম্পর্কে কি জানেন?'

'হ্যাঁ ওনার একজন ভাই আচে বটে, যে দিদির কাছে প্রায়ই আসত টাকার জন্য। দুদিক থেকে টাকার চাপে লতিকাদেবী খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলেন?'

'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে ঐ আংটি লতিকাদেবী ভাইকে দিয়েছিলেন?'

রকিদার প্রশ্নের উত্তরে নিমাইবাবু কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন,

'হতেও পারে। তবে ঐ আংটি তো লতিকাদেবী কখনও কাছছাড়া করতেন না। দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে যাবার পথে হাত থেকে খুলেও গিয়ে থাকতে পারে। কারণ তখন আমাদের কারোরই আংটির দিকে নজর ছিল না। পরে জানতে পারলাম রক্ত নীলা হারিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে' বলে রকিদা উঠে বলল, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। তবে রবিবার বিকেলে কিন্তু থাকবেন। কিছু নতুন তথ্য দিতে পারব।'

উঠে এলাম আমরা। রকিদা বলল, আজ রাতে আমি বাইরে খাব, বুঝলি ঝুমি। মিস্টার ভার্গবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে তুই খেয়ে শুয়ে পড়বি। কিন্তু ঘুমোবি না। রাতে ফিরলে আমায় দরজা খুলে দিবি। আজ একবার রয়্যাল কলেজে যেতে হবে। আর যেখান থেকে রণবীরবাবু শুনলাম টাকা ধার করতেন সেখানেও যাব।

।। ৫।।

বিকেলবেলা রণবীরবাবুর ড্রইংরুমে আমরা সবাই জড় হয়েছি। আমরা মানে আমি, রকিদা, রণবীরবাবু, নিমাইবাবু, দীপকবাবু, আর বাড়ির চাকর রামু। রকিদার মুখে শুনেছি মিস্টার ভার্গবও আসবেন। ভাবতে ভাবতেই মিস্টার ভার্গবের জীপ এসে হাজির হল।

'রকিদা বলে উঠল, আসুন মিস্টার ভার্গব। আপনার জন্যই সকলে অপেক্ষা করছি।'

এবার শুরু করল রকিদা, শুনুন সবাই। আজ আমি এমন একটা খবর শোনাবো যাতে সকলেই আপনার অবাক হয়ে যাবেন।'

'কি খবর?' প্রশ্ন করলেন রণবীরবাবু।

'রকিদার ঘোষণায় সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল। একজনের কিন্তু একটুও পরিবর্তন দেখলাম না। শুধু পকেটের ওপর হাতটা একবার বুলিয়ে নিল। লোকটি আর কেউ নয়। মরীয়া প্রকৃতির দীপকবাবু। এবার রকিদা শুরু করল—

'আমরা শুনেছি লতিকাদেবী খিচুড়ি বানাতে রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে। তারপরই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। সবাই ছুটে এসে দেখেন লতিকাদেবী রান্নাঘরে শুয়ে পড়ে ছটফট করছেন। এরপর হসপিটালে তাঁর মৃত্যু হয়। পথেই তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সে জ্ঞান আর ফেরেনি। সবাই জানতেন যে স্টোভ ফেটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেউ খেয়াল করলেন না যে স্টোভ যেমন ছিল, তেমনই আছে। পুরো অক্ষত অবস্থায়।'

'তাহলে লতিকার কিসে মৃত্যু হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলেন রণবীরবাবু।

'লতিকা দেবীকে খুন করা হয়েছে একটি বিস্ফোরকের সাহায্যে। যার নাম

'পিকরিক অ্যাসিড'। এটি দেখতে হলুদের গুঁড়োর মতো। কেউ ঠাণ্ডা মাথায় এটিকে হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। ফরেনসিক রিপোর্টে তাই পাওয়া গেছে। আগুনের কাছে আনলে এটিতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে খুনি এটা ভালো করেই জানত। লতিকাদেবী কিছুই বুঝতে পারেননি। রান্নায় হলুদ মেশাতে গেছলেন অন্যদিনের মতোই। আগুনের কাছে যেতেই ঘটে বিস্ফোরণ।'

লতিকাদেবীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কিন্তু একটি মানুষের লোভ। সামান্য লোভের জন্য মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে লতিকা দেবীর মৃত্যু তারই প্রমাণ।

রায়ভিলার এই ঐশ্বর্যের মূলে আছে একটি আংটি। সেটা হল রক্তমুখী নীলা। যা লতিকাদেবীর হাতে সর্বক্ষণ থাকত। ঐ আংটি পরলেই বড়লোক হতে পারব এই আশায় অনেকেই ঐ আংটি লতিকাদেবীর কাছে চাইত। দীপকবাবু আপনিও তো কয়েকবার চেয়েছিলেন? তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে দিদি তা দেয়নি। তবে বিশ্বাস করুন তার জন্য দিদিকে আমি খুন করিনি। নেহাতই বড়লোক হবার বাসনায় কিছুদিনের জন্য আংটিটা ওনার কাছে ধার চেয়েছিলাম।' দীপকবাবু বলে উঠলেন।

আবার কথা করল রকিদা—'আংটিটা হাতাবার জন্য খুনি প্রথমে লতিকাদেবীকে মোটা টাকার অফার দেয়। তাতেও উনি রাজি হননি। ওদিকে এ সমস্ত কথা রণবীরবাবুকে জানানো হলে তাকেও খুন করা হবে বলে শাসানো হয়। ভয়ে লতিকাদেবী কাউকে কিছু বলতেন না। এদিকে আংটির লোভ প্রবল হয়ে ওঠায় খুনি এবার অন্য পথ ধরে। রসায়ন শাস্ত্রে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বাড়ির যে কোনও জায়গায় যাবার অবাধ অধিকার ছিল তাঁর। তাই রান্নাঘরে ঢুকে 'পিকরিক অ্যাসিড' হলুদের মধ্যে মিশিয়ে আসতে খুনির কোনও অসুবিধাই হয়নি। আর জ্ঞানহীন লতিকাদেবীর হাত থেকে আংটিটাও খুলে ফেলেছিল খুব সহজেই।'

'এইবার রণবীরবাবু বলুন, আপনার তো একজন কাকা আছেন। যার কথা আমায় সম্পূর্ণ চেপে গেছেন। যে কিন্তু সব সময়ই আপনাদের রায় ভিলার আশেপাশেই নজর রাখে। লতিকাদেবীর এই আংটির আসল মালিক কিন্তু তিনি তাই না?'

মাথা নিচু করে রণবীরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ এই আংটি আসলে আমার কাকা পরমেশ্বর রায়ের। উনি ছিলেন অবিবাহিত। ঘর ছেড়ে প্রায়ই চলে যেতেন কোথায় কেউ জানত না। কয়েক বছর পর পর হঠাৎ এসে আবির্ভাব হতেন। আমার বাবা রামকিঙ্কর রায় একদিন ওনার ঐ আংটিটা চাওয়ায় উনি এটা দিয়ে বলেছিলেন, 'দিতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। যখন চাইব ফেরত দিতে হবে। বাবা রাজি হয়ে যান। আংটি বারণ করার পর আমাদের শুরু হয় চরম উন্নতি। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে

ওঠে। প্রচুর অর্থের মুখ দেখি আমরা। তারপর বাবার মৃত্যুর পর আমি ধারণ করেছিলাম ঐ আংটি। কিন্তু তারপরই শুরু হয় ব্যবসার ক্ষতি। একে একে সব কিছু হারাতে থাকি। তখন বাধ্য হয়ে একদিন একজন নামকরা জ্যোতিষীর কাছে যাই। তিনি দেখে বলেন, এই নীলা তোর সহ্য হবে না, এটা তুই তোর স্ত্রীকে ধারণ করতে বলবি। কি আশ্চর্য্য তারপর থেকেই কিন্তু আবার উন্নতি হতে শুরু করে। এর মধ্যে বহু বছর পর একদিন কাকা হঠাৎ ফিরে আসেন। আমার কাছে আংটি ফেরত চান। আমি দিতে অস্বীকার করি। উনি বলেন, যতই অর্থের মুখ দেখ না কেন, এই অভিশপ্ত আংটিতে কখনও পুত্র, কন্যার মুখ দেখবে না। এরপর কাকা চলে যান। তবে তাঁর কথাটাও কিন্তু সত্যি হয়েছে। আমার কোনও পুত্র বা কন্যা লাভ হয়নি।

'আপনার আংটি যে হারিয়ে গেছে, সে খবর কিন্তু কাকা পেয়ে গেছেন এবং বাড়ির আশেপাশেই গা ঢাকা দিয়ে আপনাদের ওপর নজর রাখছেন' রকিদা বলে উঠল।

'তাহলে আজ উনি আসছেন না কেন?' প্রশ্ন করল রণবীরবাবু।

'হ্যাঁ সেটাই ভাববার আছে।' তবে তার আগে একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছি। বলেই এগিয়ে গেল নিমাইবাবুর কাছে। আপনার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আমায় দিন তো।'

'এই নিন' বলে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে রকিদার দিকে এগিয়ে দিলেন নিমাইবাবু।

'না, না একটাতে হবে না। আমরা অনেকেই খাব। বলেই রকিদা এক ঝটকায় পুরো প্যাকেটটা নিমাইবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিল।'

'করছেন কি'—রাগ করেই বলে উঠলেন নিমাইবাবু।

'কিছুই না নিমাইবাবু। সেদিন খিচুড়ি খাওয়ার সখ তো আপনারই হয়েছিল তাই না? আপনারই অনুরোধে লতিকাদেবী খিচুড়ি বানাতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?'

'কারণ আপনি জানতেন যে খিচুড়িতে হলুদ বেশ কিছুটা। তাই ওর মধ্যে পিকরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজে বিস্ফোরক বানানোর জন্য অনেক আগেই আপনাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। এ সবই আমি জানতে পেরেছি। বিস্ফোরণের পরই লতিকাদেবীর হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়েছিলেন সবার অলক্ষ্যে। আবার এও জানতেন যে নীলা নিজের কাছে না রাখলে কোনও কাজই হবে না। তাই অনেক বুদ্ধি করে আংটি থেকে পাথরটা খুলে রেখে দিলেন এইখানে। আর সর্বক্ষণ তা পকেটে ভরে রাখতেন। কিন্তু এত করেও পারলেন না। ধরা

পড়ে গেলেন। আসলে নীলা কারো সয়, কারো সয় না। বলে একটা সিগারেট বের করে সবার সামনে মশলাটা বের করতে শুরু করল রকিদা। একটু পরেই মেঝেতে ঠক করে কি যেন একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে রকিদা বলল, দেখুন তো রণবীরবাবু, এই আপনাদের রক্তমুখী নীলা কিনা?'

'হ্যাঁ এটাই তো।' বলে উঠল রণবীরবাবু।

সবাই নীলা দেখতে ব্যস্ত। হঠাৎ দরজার দিকে এক পা এক পা করে পিছু হঠতে লাগল নিমাইবাবু। হাতে একটা রিভলবার। 'কেউ এগোলেই গুলি চালাব।' বলে দরজার কাছে চলে এলেন ক্রমশ। ঠিক তখনই পেছন থেকে এক বৃদ্ধ তার হাতের লাঠি দিয়ে নিমাইবাবুর পা-টা টেনে ধরল। আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। ছুটে এসে মিস্টার ভার্গব বললেন, 'নদের নিমাই, এবার হাত দুটো ওপরে তোলো তো বাছা।'

মাথা নিচু করে হাত তুললো নিমাইবাবু।

'এবার একে আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম মিস্টার ভার্গব। কোর্টে এর অপরাধ প্রমাণ করার ভার আপনাকে দিলাম।' রকিদা হেসে বলল।

আর বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরলেন রণবীরবাবু। বললেন, কাকা আমায় ক্ষমা কর। এই নাও তোমার নীলা। এ তো আমার সইবে না। তোমায় ফেরত দিলাম। আর একটা অনুরোধ এখন থেকে শুধু রায় এস্টেটেরই নয়, আমাদের পুরো সংসারে ম্যানেজারের দায়িত্বও তোমাকে দিলাম।'

'সাবাশ গোয়েন্দা ভাই। আমি অনেকক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। বলেছিলাম না ঠিক সময়ে আসব।' রকিদার দিকে ফিরে বলে উঠলেন বৃদ্ধ অর্থাৎ ট্রেনে দেখা আমাদের সেই পরমেশ্বর রায়।

'কলকাতায় যাবার আগে তুমি, ঝুমি আর আমি কয়েকদিন খাজুরাহো ঘুরে আসি বুঝলে রকি।'

'ঠিক আছে আপনাদের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমিই করে দেব।'

রণবীরবাবুর কথায় সবাই রাজি হয়ে গেলাম।

হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য

বনফুল

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে।

এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। আইনত যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব, ইঁহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মত সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কী! লোকটা কাল রাত্রি দশটা

পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কতরকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী হইল! মৃত্যুর কোন লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই! ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষত হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি তার কিছুদিন পরে বক্রেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কী লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন—এর প্রতিশোধ আমি নেবই! জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ওর মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।'

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত, ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরায় তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বক্রেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রসাদের সহিত বিষ ছিল....।

বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এইসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে, তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনা ভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ 'তুই যা, আমি আসছি এখন। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?'

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

।। ২।।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারের অভিমত। হরবিলাসের হৃদযন্ত্র দুর্বল ছিল, তাহা আরেকজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাঁহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই তিনি বেশ বাঁচিয়া ছিলেন! সহসা এমন কী হইল? থানার

দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সিদ্ধেশ্বর কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

'তুই প্রথমে কী করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?'

'বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উকি মেরে দেখলাম'—

'ও!'

ছোকরাটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল। ভদ্রলোক নাকি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন-সাতেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ-গোঁ করিয়া শব্দ করেন, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনো মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওখানে। ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই একে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাতে ঘুমের ঘোরে যেরকম কর, ভয় হয়!'—

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ঃ আপনার হার্ট খারাপ, তাই শ্বাস কষ্ট হয়।'

হরবিলাস বলিল, 'আমি তো তেমন টের পাই না।'

'আর কিছুদিন পরে টের পাবেন।'

'কী করব তাহলে?'

'মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার।'

'ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ তা পারব না মশাই।'

'জানালা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়।'

'বাইরে অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।'

হরবিলাস চুপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বললেন, 'আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।'

হরবিলাসের মাথায় শিয়রের গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রি ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাহার পর তিনি বেশিদিন ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসেনাই তো! কিন্তু কিরূপে?

'আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর কেউ কি এসেছিল?'

'আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।'

'পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?

'দিন পনের আগে।'

'কী বললে সে?'

'তা তো জানিনে বাবু, তবে অনেকক্ষণ ছিল।'

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

।। ৩।।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিলেন। উইলে ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতির বিক্রয়ের ভার লইবে। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকে গভর্মেন্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিতেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না! মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছেন।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ঃ আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো?'

বলিলাম, 'না রাগ করিব কেন, কী জানিতে চান বলুন।'

সে বলিল, 'আপনি কি কখনো পরস্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?'

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, 'ধরুন যদি করিয়াই থাকি।'

জ্যোতিষী বলিল, 'তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি তুচ্ছ করিবার মত নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক অ্যাসিড আনাইব। শুনিয়াছি ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক অ্যাসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাঁহার এ খেয়াল হইল কেন জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ঐ ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়ত না? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, আগে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?'

'তা পারতাম বৈকি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?'

'না, এমনি।'

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

'হার্টফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কী!

'তা বটে।'

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

|| ৪ ||

মাসখানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটীটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময়ে একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়া ছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে, বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং দোকানের ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পড়া যায়। কী মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কী ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটি সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল ঠিক এমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কী হয়? হয়ত কিছুই হইবে না। কিংবা হয়ত একটা গেঞ্জি বা কয়েকজোড়া মোজা বা ঐ ধরনের কিছু একটা আসিয়া পড়িতেও পারে। দেখাই যাক না কী হয়।

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল তাহা নহে, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে মনে হইতেছিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়ত হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

দিনদশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিস পত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

'আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।'

'ভি. পি.? ক-টাকার?'

'দশ টাকা পনের আনা।'

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল, সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহাস্যে স্বগতোক্তি করিল ঃ দেখা যাক কী এসেছে।

....অবিকল সেইরকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোনে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না।

তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকায় বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর।

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্রেশ্বর দলীর লোক।

সহসা একটি শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

ঘড়ি-রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দি জ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা কর্নেল সায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি?"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, "প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?"

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিছু-কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, "আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।"

"জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারনোর ঘটনা ভুলে গেছ।"

মনে পড়ে গেল। বললাম, "কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন । এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।"

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব! রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন, তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?"

কর্নেল বললেন, "সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মী প্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে । হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।"

ডাক্তারবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন।"

"হ্যাঁ। কিছু সূত্র অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল চোখধাঁধানো আলো ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডুপাত করছে।"

তারক ডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তারপর ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোলো জয়ন্ত! দেখি, কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।"

বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি।"

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পরদার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাচমাচু মুখে তিনি বললেন, "কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত । দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—"

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।"

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।"

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "বারবার টাইম ইজ মানি বলছেন। অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।"

কর্নেল হেসে ফেললেন। "ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?"

ভদ্রলোক ঝটপট আমাকে নমস্কার করে বললেন, "আপনিই সেই বিখ্যাত

সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি, কারণ টাইম ইজ মানি।" বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। "আগে আমার নামঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভুতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙ্গারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস । কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।"

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, "আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?"

"নাই। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতেই বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।"

"আপনার দাদার নাম কী?"

"আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।"

"তিনি বেঁচে নেই?"

"আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"সাহেবগঞ্জে আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক

বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, "পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!" ব্যাস! ওই শেষ কথা।"

"কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?"

"দাদার শেষকৃত করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে, বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতা বদলি করল?"

"আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।"

"ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?"

"ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ারটেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট কাঠের আলমারি—এইসব।"

"আর কিছু?"

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর তেমন কিছু—ও হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।"

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।"

"আমাকেও।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "আপনার ঘরের ভুতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?"

"প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।"

"উনি কী বলেছিলেন?"

"উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।"

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, "ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পর দিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।"

'ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার

বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।"

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

"ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।"

"তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?"

"তা হলে কোনও বোর্ডার-ধরুন, সেই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং!"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "নীচের ফ্ল্যাটের লিণ্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।"

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষ প্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

"টাইম ইজ মানি!" বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, "একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।"

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতশ কাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, "ডায়ালে কিছু

কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।"

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, "সত্যিই এটা নড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"কোনও আসবাব অনেককাল এক জায়গায় রাখলে মেঝেয় তার ছাপ পড়ে। পায়া দুটো সেই ছাপ থেকে সরে এসেছে।"

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, "আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এই আলমারিটা খুলুন।"

"খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।"

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন। তল্লাশ শেষ হলে উনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।"

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, "আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেটে ব্রোকার ছিলেন!"

"তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি!"

"আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।"

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?"

"আপনি ওঁকে ডাকুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আর্বির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল বললেন, "আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "চোরাই জিনিস! তার মানে?"

"মানে আপনারা ভালই জানেন! তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম

না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, "খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।" আমি ওকে পাত্তা দিইনি।"

"কিন্তু জিনিসটা কী?"

"খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, 'ওই লোকটাকে তাড়াও।' কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুণ্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।"

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "এসব কী বলছ প্রভাতদা। আমার দাদা—'

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।"

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বললেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?"

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, "এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।"

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, "তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।"

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?"

"সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?"

"আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।"

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে

উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, "দিন সাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।"

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, "সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?"

কর্নেল হাসলেন, "কারণ টাইম ইজ মানি।"

"কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।"

ডায়ালের কাচ খুলে আতশ কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, "এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যাণ্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরী'স সেভেনটি ফার্স্ট ব্যর্থ অ্যানিভার্সারি...."

চমকে উঠলাম। "কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার। এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?"

"ডার্লিং হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।' পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেট মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, 'টাইম ইজ মানি! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?'!'

সায় দিয়ে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, ওটাও ক্লিয়ার।"
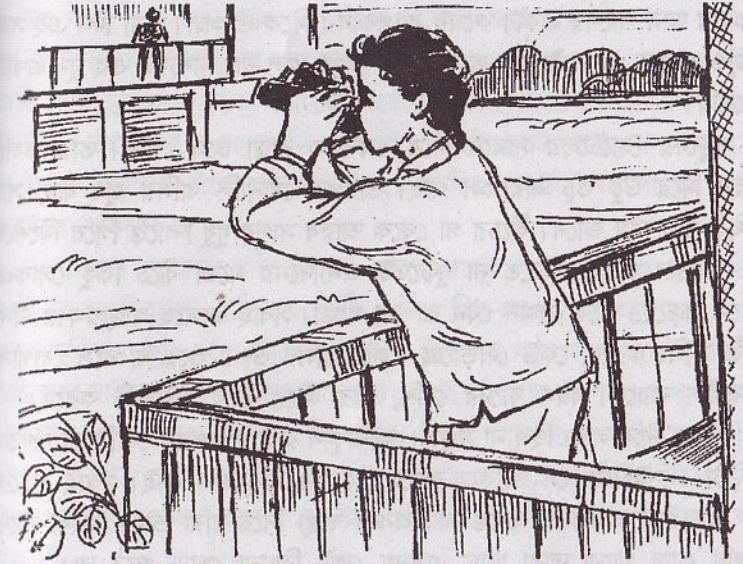
দুই বন্ধুর রহস্য কীর্তি

প্রফুল্ল রায়

যদিও সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বম্বে, যাব নতুন নাম মুম্বাই, দেশের পশ্চিম প্রান্তে বলে এখানে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। এই মুহূর্তে চারিদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে ঠিকই, আকাশের গায়ে আবছা আবছা আলোর ছোপও ধরেছে কিন্তু পঞ্চাশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

ছেলেবেলা থেকে সঞ্জুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। পাঁচটা বাজলে সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। হোটেলে তাদের ডবল-বেড রুমে অন্য একটা খাটে বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সে মেঝের কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে একটা বাইনোকুলার নিয়ে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে চলে এসেছিল। ক'দিন ধরে

ভোরের একটা দৃশ্য তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। এই নিয়ে তার নতুন বন্ধু রাজুর সঙ্গে মানে যার ভাল নাম রজত মেনন, অনেক কথাও হয়েছে। সঞ্জু একবার ডান পাশের একটা রুমের ব্যালকনির দিকে তাকাল। অন্য দিন এই সময় রাজুও ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ তাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ওর ঘুম এখনও ভাঙেনি।

সঞ্জুদের হোটেলের সামনে দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে। তার ওধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। তারপর সোনালি বালির জুহু বীচ, সারা পৃথিবী যার নাম জানে। বীচের গা থেকে আরব সাগর ধুধু দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অন্যদিনের মতো বীচে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। তবে কেমন যেন ঝাপসা মতো। সবাই এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। কেউ জগিং করছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বালির ওপর শুয়ে বা বসে যোগাসন প্র্যাকটিস করছে। বয়স যাদের বেশি, তারা ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে।

বীচের দিকে লক্ষ্য ছিল না সঞ্জুর। কোনাকুনি রাস্তার ওপারে যে বিরাট দশতলা বাড়িটা—সেইদিকে সে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। মুম্বাই শহরের ঘুম এত ভোরে কখনও ভাঙে না। অবশ্য স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ভাবে কিংবা যাদের জরুরি কাজ থাকে তারা ছাড়া এসময় কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বিরাট বাড়িটার একতলা জুড়ে একটা ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট দু'চারটে অফিস। ওপরের তলাগুলোতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের নানা জাতের মানুষ থাকে।

ক'দিন ধরে ভোরবেলার অস্পষ্ট আলোয় ক'টা লোককে দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জু। নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে তারা ব্যাঙ্কটার তিন দিক ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যাচ্ছিল। মিনিট পনের-কুড়ির বেশি তারা কোনও দিনই থাকেনি। একটা লম্বা জিপে করে ওরা আসত; আবার ওই গাড়িটাতেই চলে যেত।

আজ কিন্তু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করে তারা কখনও আসে না। সঞ্জু এবং রাজু, দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, লোকগুলোর মাথায় খারাপ কোনও মতলব আছে। ওরা যদি আর না আসে, ধরে নিতে হবে, তারা যা ভেবেছে সেটা পুরোপুরি ভুল।

সঞ্জুর বয়স চোদ্দ। এ বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডিটেকটিভ বইয়ের সে পোকা। তার স্বপ্ন শার্লক হোমস বা হারকুল পয়রোর মতো দারুণ দারুণ কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের সমাধান করা। মা-বাবা বলেন, আগে বড় হও, পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। বড় বড় ডিটেকটিভদের মতো সঞ্জু বাইনোকুলার,

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অপরাধীদের খোঁজে উঁচু উঁচু বাড়িতে ওঠার জন্য হুক-লাগানো মজবুত দড়ি—পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এমন অনেক কিছু কিনে ফেলেছে।

মা, বাবা, এক দিদি আর সঞ্জু—সব মিলিয়ে ওরা চারজন। বাবা অরিন্দম বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। হঠাৎ তাঁকে কলকাতা থেকে মুম্বাইতে বদলি করা হয়েছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে দিন দশেক আগে তিনি এখানে চলে এসেছেন। তাঁদের জন্য কোম্পানি পালি হিলে একটা ফ্ল্যাট দেবে। আপাতত সেটা রং করে, ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় সঞ্জুরা হোটেলে থাকবে।

সঞ্জুর বাবা যে কোম্পানিতে কাজ করেন, রাজুর বাবা রাধাকৃষ্ণ মেনন সেই একই কোম্পানির বড় অফিসার। উনি ছিলেন তিরুবন্তপুরমের অফিসে। সেখান থেকে অরিন্দম বসুর মতো তাঁকেও মুম্বাইতে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। তিনিও সঙ্গে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এসেছেন। একই হোটেলে তাঁদেরও রাখা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মেননরা সব মিলিয়ে তিন জন। তিনি, তাঁর স্ত্রী জানকী মেনন এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রাজু। পালি হিলে সঞ্জুরা যে ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠবে, তার পাশের ফ্ল্যাটটা দেওয়া হবে রাজুদের। সেটাও এখন ঝেড়েপুঁছে ফিটফাট করা হচ্ছে।

রাজু সঞ্জুরই বয়সী। সেও এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। মুম্বাই আসার পর দু'জনকে একই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জুর দিদি লেডি ব্রাবোর্নে বি.এ. ফাস্ট ইয়ারে পড়ত। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে তারও এখানকার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ক'দিনই বা সঞ্জুর মুম্বাইয়ে এসেছে! কিন্তু এর মধ্যেই রাজুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সারাদিন গল্প। হোটেলে আর কতক্ষণ থাকে! সামনের জুহু বীচে তো যায়ই। মুম্বাইতে বেড়াবার কি মোটে একটা জায়গা! আরও দূরে দূরে তারা চলে যায়। এয়ার-ইণ্ডিয়া পার্ক, এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত দেখে এসেছে। কাউকে না জানিয়েই গেছে। জানাতে গেলে মা-বাবারা একেবারেই রাজী হতেন না।

সঞ্জুর মতো রাজুও ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হবার কথা কখনও ভেবে দেখেনি। সঞ্জু যখন বলল, সে কলকাতায় দু'চারটে রহস্যের জট ছাড়িয়েছে এবং মুম্বাইতে এসে আরও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন রাজুর চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠেছিল। মুম্বাইয়ের রহস্যটা কী, রাজু জানতে চাইলে ভোরবেলায় সেই লোকগুলোর কথা বলেছিল সঞ্জু। রাজু

প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছে, সে-ও পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে সন্দেহজনক লোকগুলোকে লক্ষ্য করবে। তাকে বাদ দিয়ে সঞ্জু যেন কিছু না করে। সঞ্জু একজন সহকারী পেয়ে খুশি হয়েছিল।....

যে দশতলা বাড়িটার তলায় ব্যাঙ্ক সেদিকে তাকিয়েই ছিল সঞ্জু। সে বেশ দমেই গেছে। একটা রহস্য হাতের মুঠোয় চলে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ফসকে গেল। লোকগুলো যখন আসবেই না তখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং রাজুকে ডেকে নিয়ে এক পাক বীচে ঘুরে আসা যাক। সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ডানদিক থেকে রাজুর চাপা গলা ভেসে এল, 'ওই দেখ, সেই জিপটা আসছে—'

কখন ঘুম ভাঙার পর রাজু পাশের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি সঞ্জু। একটু চমকে উঠে সে লক্ষ্য করল, সত্যিই চেনা জিপটা ডানদিকের একটা বাঁক ঘুরে এধারে আসছে। বলল, 'এখন আর কোনও কথা বলো না। চুপচাপ দেখে যাও ওরা কী করে। আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি, একদম যাতে টের না পায়।'

রোজই এই কথাগুলো বলে সাবধান করে দেয় সঞ্জু। রাজু মাথা নেড়ে জানাল—আচ্ছা।

অন্যদিনের মতো লোকগুলো আজও ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল। আগে পাঁচজনের বেশি কখনও আসেনি। আজ দেখা গেল—সাতজন। সংখ্যাটা বেড়ে গেছে।

লোকগুলো নেমে ব্যাঙ্কের সামনে ভাগে ভাগে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে মনে অদৃশ্য লাইন টেনে ওদের জুড়ে দিলে একটা রেক্টেঙ্গল বা আয়তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বোধহয় পছন্দ হলো না। আবার অন্যভাবে দাঁড়াল। এবার লাইন টানলে ত্রিভুজের আকার নেবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় ভাল লাগল না। নিজেদের মধ্যে কী আলোচনার পর শেষপর্যন্ত পাঁচটা কোণ তৈরি করে দাঁড়ায়। তিন জায়গায় একজন করে, বাকি দু'জায়গায় দু'জন দু'জন। এবার কল্পিত লাইন টানলে পেন্টাগন বা পঞ্চভুজ হবে। খুব সম্ভব এই নকশাটাই লোকগুলোর মনে ধরল। তারা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে অন্ধকার প্রায় কেটে গিয়ে আরও একটু আলো ফুটেছে। রাস্তায় দু'একটা অটো, ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়েছে। বীচ ছাড়াও এধারে-ওধারে কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকগুলো যখন জিপে উঠতে যাবে, রাজু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সেই লোকটা না?' তার গলায় প্রবল উত্তেজনা।

রাজু যে লোকটার কথা বলল তাকে আগেও দেখেছে সঞ্জুরা। বার তিনেক জুহু বীচে। তা ছাড়া তাদের হোটেলের গায়ে যে পান-সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকসের দোকানটা আছে সেখানেও বেশ কয়েকবার। লোকটাকে মনে করে রাখার কারণ, যখনই পাশের দোকানটায় সে আসে, পর পর পাঁচ-ছ'বোতল কোল্ড ড্রিংকস খায়, তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় আঙুলের ফাঁকে রেখে টানতে থাকে। একসঙ্গে এত কোল্ড ড্রিংক আর দুটো সিগারেট খেতে আগে আর কাউকে দেখেনি সঞ্জুরা। মনে রাখার আরও একটা কারণ, তার নাকের পাশে একটা বড়, কালো, বেঢপ সাইজের জড়ুল রয়েছে।

যারা রোজ ভোরে ব্যাঙ্কটার সামনে এসে পরামর্শ করে কী সব দেখে যায় তাদের দলে এই লোকটাকে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সঞ্জু। দেখলেও চিনতে পারেনি। কেননা অন্য দিন ওরা যখন আসে তখন বেশ অন্ধকার থাকে।

আজ লোকটাকে দেখে রাজুর মতো সঞ্জুরও ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল। সে কিন্তু রাজুর মতো চেঁচাল না, নিচু গলায় বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

রাজু আর কিছু বলল না।

লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, জিপে উঠে সেদিকে চলে গেল।

জিপটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর রাজু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে?'

সঞ্জু বলল, 'ভাবতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে তুমি আর আমি বীচে যাব। হোটেলে বসে হবে না। কেউ শুনে ফেলবে। ফাঁকা জায়গায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।'

'ঠিক আছে।'

সকালের খাবার খেয়ে সাড়ে আটটায় দু'জনে জুহু বীচে চলে এল। এই সময়টা এখানে ভিড় কম থাকে। যারা স্বাস্থ্যের জন্য সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বীচে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ফিরে গেছে। বিশাল সমুদ্রতীর এখন প্রায় ফাঁকাই।

সঞ্জু আর রাজু জলের ধার ঘেঁষে বালির ওপর বসে পড়ল।

বর্ষাকাল বাদ দিলে বেশ শান্ত থাকে। এখন ছোট ছোট ঢেউ সকালের সোনালি আলো গায়ে মেখে বীচটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের দিক থেকে খুব জোরালো হাওয়া বইছে।

রাজু বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল; মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী?'

'ওরা ওই বড় বিল্ডিংটার কাছে কিছু একটা করতে চায়।'

'কী করতে?' 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জু বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আইডিয়া?'

'ওই জড়ুলওলা লোকটাকে খুঁজে বার করে যদি ওর ওপর নজর রাখি, বুঝতে পারব ওদের দলটা কী মতলব আঁটছে।'

'কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?'

সঞ্জু বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা এদিকেই কোথাও থাকে।'

রাজু বলল, 'এটা মনে হলো কেন?'

'তিন দিন আগে বিকেলবেলায় লোকটা আমাদের হোটেলের পাশের সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম।' বলে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'ওর পরনে কী ছিল মনে পড়ছে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজু জানাল, মনে নেই। কারণ সে ভাল করে লক্ষ্য করেনি।

সঞ্জু বলল, 'একটা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। কাছাকাছি না থাকলে ওরকম পোশাকে কেউ বাইরে বেরোয় না।'

রাজু বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানে এত হোটেল আর এত হাই-রাইজ বিল্ডিং; এ সবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে কী করে?'

'আরে বাবা, সারাক্ষণ কি আর লোকটা ঘরে বসে থাকবে? আমরা এখন অন্য কোনও দিকে বেড়াতে যাব না। বীচে আর এখানকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হোটেলগুলোতে গিয়ে ওর ডেসক্রিপশান দিয়ে খোঁজ করব। মনে হয় ওকে ঠিক পেয়ে যাব।'

'ধর, পেয়ে গেলে। তখন কী করবে?'

'সেটা এখনও ভাবিনি। আগে তো লোকটাকে পাই। তারপর দেখা যাবে।'

আলোচনা শেষ করে সঞ্জুরা কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করল কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। বীচ থেকে রাস্তায় যখন ওরা উঠে এল তখন মুম্বাই শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অজস্র মানুষ। অগুনতি গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। এর ভেতর থেকে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু সঞ্জুরা চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

দুপুরে হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। এবার ওরা হানা দিল হোটেলগুলোতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা হোটেলে গিয়ে রিসেপশানে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, এরকম কেউ আছে কিনা। সব জায়গাতেই ওদের বলা হলো—নেই। রোজই হোটেলে নানা ধরনের লোক আসছে। তাদের সবার চেহারা রিসেপশানের লোকেদের পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। তবে কারও মুখে একটা বিশ্রী জড়ুল থাকলে নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত।

এরপর দুটো দিন সকাল থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বীচ থেকে শুরু করে সামনের রাস্তা এবং সারি সারি দোকানগুলোতে গিয়ে দেখতে লাগল সঞ্জুরা। কিন্তু না, লোকটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এমন কি, ভোরের দিকে যে দলটা সেই ব্যাঙ্কটার সামনে এসে কী পরামর্শ করে, তারাও এই দু'দিন আসছে না।

রাজু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ, ওদের আর পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু বলল, 'আর দু'একদিন দেখা যাক। তারপর এ নিয়ে আর ভাবব না।'

আশ্চর্য, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে আবার দেখা গেল। সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খেতে এসেছে।

সঞ্জুরা বীচের দিক থেকে হোটেলে ফিরে আসছিল, দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রাজু কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলে, 'এখন একটা কথাও নয়। একদম চুপ।'

লোকটা অন্যদিনের মতো পাঁচ বোতল কোল্ড ড্রিংক খেয়ে, জোড়া সিগারেট ধরিয়ে জুত করে টানতে টানতে ডান পাশের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।

সঞ্জু চাপা গলায় বলল, 'ওকে ফলো করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'

রাজু বলল, 'আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে।'

সঞ্জু বলল, 'অত ভয় থাকলে আসতে হবে না। হোটেলে ফিরে যাও।'

'আরে না না, তোমাকে একা যেতে দেব না। যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

দু'জনে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পেছন পেছন চলল। তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরত্ব।

মিনিট চারেক হাঁটার পর একটা মাঝারি হোটেলের পাশ দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তাটা বড় নয়; সেটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি একই রকম দেখতে দুটো চব্বিশতলা বাড়ি। বাঁ দিকেরটার নাম 'আকাশগঙ্গা', ডান দিকেরটা 'পাতালগঙ্গা'।

সঞ্জুর লক্ষ্য করল, লোকটা 'আকাশগঙ্গা'য় ঢুকেছে। ওরা জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সে একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

পাশে আরও দুটো লিফট রয়েছে। দুটোর ওপর থেকে নিচে নামছে। রাজু বলল, 'যেটা আগে নামবে সেটায় উঠে লোকটাকে খুঁজতে হবে।'

সঞ্জু বলল, 'এই বিরাট হাই-রাইজে কোথায় হাতড়ে বেড়াবে! আগে জানতে হবে লোকটা ঠিক কোন ফ্লোরে গেল।'

রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানবে?'

'এদিকে এসো—'

লোকটা যে লিফটায় ঢুকেছিল, রাজুকে সঙ্গে করে সঞ্জু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লিফটের মাথায় লাল ইনডিকেটরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা ভাল করে দেখ।'

এক, দুই, তিন—এইভাবে সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু পনের নম্বরের লাল আলোটা কয়েক সেকেণ্ডের মতো জ্বলে রইল। তাপর সেটা নিভে ষোল-সতের পেরিয়ে আঠার নম্বরটা জ্বলে উঠল। এবং জ্বলতেই লাগল। মিনিট তিনেক পর আলোটা নিভে সতেরো, ষোল—এইভাবে সংখ্যা কমতে লাগল।

সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

রাজু বলল, 'না।'

'লিফটটা ওপরে উঠে পনের আর আঠার, মানে ফিফটিনথ আর এইটিনথ ফ্লোরে থেমেছিল। তারপর এখন নেমে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সঞ্জু বলতে লাগল, 'ওই লোকটা যখন ওপরে উঠছিল তখন সে একা ছিল না। লিফটে আরও কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের আমরা দেখতে পাইনি। লিফটটা দু' জায়গায় যে থেমেছিল সেটা অবশ্য জানতে পেরেছি। লোকটা হয় ফিফটিনথ, নইলে এইটিনথ ফ্লোরে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?'

রাজু বলল, 'ঢুকেছে। এখন কী করতে চাও?'

'দেখ কী করি—'

লিফটটা নিচে এসে থামতেই দু'জন বেঢপ চেহারার মোটা মহিলা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে নিয়ে সঞ্জু ভেতরে ঢুকে পনের নম্বর বাটনটা টিপে দিল। লিফটটা অটোমেটিক। আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরে উঠতে লাগল।

ফিফটিনথ ফ্লোরে এসে লিফটটা থামলে বাইরে বেরিয়ে সঞ্জুরা দেখল এখানে সবসুদ্ধ চারটে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনের দরজার গায়ে পেতলের ফ্ল্যাট-নাম্বার লাগানো রয়েছে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপল সঞ্জু। কেউ দরজা খুললেই

জিজ্ঞেস করল, এখানে অমিতাভ সেন নামে কেউ থাকে কিনা। সবাই জানাল, ওই নামের কাউকে তারা চেনে না।

সঞ্জু রাজুকে বলল, 'না, এখানে নয়। চল, এইটিনথ ফ্লোরে যাওয়া যাক।'

লিফটটায় চড়ে কখন অন্য কেউ নিচে নেমে গিয়েছিল, ওরা টের পায়নি। ওটার আশায় থাকলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। মোটে তিনটে তো ফ্লোর। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সঞ্জুরা ওপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পর রাজু হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটাই যে দরজা খুলে দেবে, সেটা নাও হতে পারে। হয়তো সে ভেতরের কোনও ঘরে বসে আছে; অন্য লোক দরজা খুলল।'

একটু চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'রাইট। তা হলেও চেষ্টা তো করতে হবে।'

রাজু এবার কিছু বলল না।

সঞ্জু বলল, 'এইটিনথ ফ্লোরটা দেখি। তখনও যদি পাওয়া না যায়, অন্যরকম প্ল্যান করতে হবে।'

'অন্যরকম বলতে?'

'লোকটা এ বাড়িতে যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাকে কখনও না কখনও বাইরে বেরুতে হবেই। যতক্ষণ না বেরুচ্ছে, আমরা গেটের কাছে ওয়েট করব।'

এইটিনথ ফ্লোরে, মানে বাংলার উনিশ তলায় এসে দেখা গেল এখানেও চারটে ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই বোধহয় একই রকম ব্যবস্থা।

প্রথম দুটো ফ্ল্যাটে কোনও হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল সঞ্জুর। পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। আজ ক'দিন ধরে এই লোকটাকেই পাগলের মতো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল সঞ্জুর। লোকটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে সঞ্জু যা বলেছিল, এখানেও তাই বলল।

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'অমিতাভ সেন কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে এই 'আকাশগঙ্গা'তেই থাকেন।'

'এই বাড়িতে সবসুদ্ধ বিরানব্বইটা ফ্ল্যাট। কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে বলা মুশকিল।'

যেন লোকটার পরামর্শ চাইছে, এমন একটা ভাব করে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলুন তো আঙ্কল?'

লোকটাকে যতটা ভীতিকর ভাবা গিয়েছিল, সামনাসামনি দেখে তেমনটা মনে হলো না। সে বলল, 'এক কাজ কর, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারের অফিস আছে। সেখানে যাও; ওরা বলতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছিল সঞ্জু। একটা সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল চোখে পড়ল। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না। লোকটা একাই কি এখানে থাকে? না, আরও লোকজন আছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সঞ্জু বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কল।'

লোকটা কিছু বলল না, অল্প হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর লিফটে করে নামতে নামতে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাভ সেন বলে সত্যি সত্যিই কেউ আছে নাকি?'

সঞ্জু বলল, 'জানি না।'

'ওটা তা হলে তোমার বানানো?'

'একজাক্টলি।'

'অ্যাকটিংটা এমন করেছ যে লোকটা ধরতেই পারেনি।'

রাজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে সঞ্জু বলল, 'লোকটা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার নাম্বারটা দেখেছিলে?'

রাজু বলল, 'হ্যাঁ। এইটিন বাই থ্রি।'

'গুড। ওটা ভুলো না।'

'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হলো না।'

'মুখ দেখে কি কার মাথায় কী ঘুরছে সবসময় বোঝা যায়!

রাজু আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক।'

সঞ্জু বলল, 'এখন আমাদের কাজ হলো, সারাক্ষণ লোকটাকে চোখে চোখে রাখা।'

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই পরদিন সকালে এলিফ্যান্টা কেভ দেখতে যেতে হলো সঞ্জুদের। বাবা এবং রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল, মানে রাজুর বাবা ওঁদের অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজু এবং সঞ্জুর যাবার ইচ্ছা ছিল না। মুম্বাইতে যখন থাকা হবে তখন পরে একবার কেন দশবার যাওয়া যাবে। এলিফ্যান্টা কেভ পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই লোকটার ওপর নজর না রাখলে দারুণ একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাবা বা আঙ্কলকে বলা গেল না, কী কারণে তাদের এলিফ্যান্টায় যাওয়া উচিত নয়। নিরুপায় হয়ে অন্য সবার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো সঞ্জুদের।

জুহু থেকে গাড়িতে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া। সেখান থেকে মোটর বোটে আরব সাগরের ওপর দিয়ে এলিফ্যান্টা কেভে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আদিগন্ত সমুদ্র, দূরে মুম্বাই হারবারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি সুবিশাল জাহাজ—এই সব দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

এলিফ্যান্টায় পৌঁছে পাহাড়-কাটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে গুহার ভেতর বহুকালের পুরনো সব শিবমূর্তি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় সঞ্জুরা। শত শত বছর আগে আমাদের দেশ শিল্পে-ভাস্কর্যে কিরকম উন্নতি করেছিল, এগুলো তারই প্রমাণ।

সবই দেখছিল সঞ্জুরা, কিন্তু সেই লোকটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। ওদের দু'জনের মাথায় তার চিন্তাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লোকটা সম্পর্কে ওরা এমন চাপা গলায় কথা বলছে যেন কেউ শুনতে না পান।

এলিফ্যান্টা দেখে ওরা যখন গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়াতে ফিরে এল, তিনটে বেজে গেছে। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ঠিক হলো, কাছাকাছি কোনও একটা ভাল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হবে। সঞ্জুদের গাড়িটা রয়েছে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার ওধারে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেলের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায়। খাওয়া হলে গাড়িতে করে তারা জুহুতে ফিরে যাবে।

মুম্বাইতে দুপুরে এবং সন্ধ্যেয় বেশ ক'টা খবরের কাগজ বেরোয়। একটা কাগজওলা চিৎকার করে বলছিল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাইতি। দশ আদমী মার্ডার হো গিয়া—তাজা খবর—'

লোকটার সামনে একটা নিচু টুলের ওপর প্রচুর কাগজ থাক দিয়ে সাজানো। তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমেছে। সবাই কাগজ কিনছে আর উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে।

ক'দিনের মধ্যে সঞ্জুর বাবার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আঙ্কলের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওঁরা গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনলেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা মানে করলে এরকম দাঁড়ায়। জুহুর একটা ব্যাঙ্কে আজ বেলা এগারোটার সময় বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে ছিল লাইট মেশিনগান। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দশজনকে খুন করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের ক'জন কর্মী। যারা টাকা তুলতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'জন মারা যায়। আহত হয়েছে পনের-ষোল জন। ডাকাতদের একজনকেও ধরা যায়নি। একটা জিপে করে তারা এসেছিল। নগদ তিরিশ লাখ টাকা আর ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রচুর গয়না লুট

করে সেই জিপেই উধাও হয়ে যায়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার এবং মৃত লোকগুলির ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি এর আগে নাকি মুম্বাইতে আর কখনও হয়নি।

রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

সঞ্জুর বাবা কাগজের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'আরে, ব্যাঙ্কটা তো আমাদের হোটেলের কাছে সেই দশতলা বাড়িটায়!'

উত্তেজনায় সঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাজুর কানে মুখ ঠেকিয়ে সে বলল, 'আমরা আজ এলিফ্যান্টা এলাম আর আজই ব্যাপারটা ঘটে গেল! এখন ওই জড়ুলওলা লোকটাকে পেলে হয়।'

রাজু কিছু বলল না। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জুহুতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গাড়ি থেকে মেমে সঞ্জু আর রাজু হোটেলের ভেতর গেল না, বাবা আর মায়েদের বুঝতে না দিয়ে ব্যাঙ্কটার কাছে চলে এল। চারদিকে প্রচুর পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও রাস্তার নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। এধারে-ওধারে মানুষের জটলা। ঘটনাটা ঘটেছে বেলা এগারোটায় কিন্তু এখনও সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার কি খোঁজ করবে?'

সঞ্জু বলল, 'না। আমাদের আবার দেখলে সন্দেহ করবে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'চল পুলিশ স্টেশনে যাই।'

রাজু চমকে উঠল, 'পুলিশ স্টেশনে! কেন?'

'আমরা ওই লোকগুলোর ব্যাপারে যা করেছি তার বেশি আর কিছু করা যাবে না। এখন যা করার পুলিশকেই করতে হবে। আমরা শুধু ক্লু দিয়ে ওদের সাহায্য করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমরা এরপর কিছু করতে গেলে বাবা-মা আঙ্কল-আন্টি টের পেয়ে যাবেন। তখন ডিটেকটিভ হবার মজাটা টের পাইয়ে ছাড়বেন।'

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। সেখানে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং দশ দশটা খুন নিয়ে কিছু একটা চলছে। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। তার মধ্যে কনস্টেবলরা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছে।

গেটের মুখে সঞ্জুদের আটকে একজন আর্মড গার্ড বলল, 'অন্দর যানা মানা হ্যায়।'

সঞ্জু হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল, অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে তাদের দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।

আর্মড গার্ড জানাল, এখন ভেতরে মিটিং চলছে। দরকার থাকলে সঞ্জুরা যেন পরে আসে।

সঞ্জুরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেতরে যাবেই, আর্মড গার্ড কিছুতেই যেতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে একটি মধ্যবয়সী, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, গম্ভীর চেহারার অফিসার বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এত হৈচৈ কিসের?'

সঞ্জু লক্ষ্য করল, বুকে মেটালের লম্বা ব্যাজে লেখা ঃ ইন্সপেক্টর চাপেকার। তিনি মারাঠি। আর্মড গার্ড মুখ খোলার আগেই সঞ্জু বলল, 'স্যার, আমরা অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, তিনিই অফিসার-ইন-চার্জ। ভীষণ ব্যস্ত আছেন, কথা বলার সময় নেই।

সঞ্জু বলল, 'যে কারণে আপনারা ব্যস্ত সেই ব্যাপারেই আমাদের কিছু বলার আছে।'

ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। দু'টি অল্প বয়সের ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা কী ব্যাপারে ব্যস্ত তা জানো?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর—'

সঞ্জুকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

সঞ্জু বলল, 'আমাদের যা বলার, শুধু আপনাকেই বলব।'

একটু ভেবে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ঠিক আছে।' সঞ্জুদের সঙ্গে করে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের বসিয়ে বললেন, 'বল—'

তারা ক'দিন আগে মুম্বাইতে এসেছে, জুহুর হোটেলে আছে, তাদের নাম সঞ্জয় বসু এবং রজত মেনন, ইত্যাদি জানিয়ে সেই লোকটা এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিয়ে সঞ্জু বলল, 'লোকটা কোথায় থাকে তাও আমরা জানি।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের। চোখ দুটো চকচক করছে। বললেন, 'কোথায়?'

'জুহুর 'আকাশগঙ্গা' বিল্ডিংয়ে। ফ্ল্যাট এইটিন বাই থ্রি।' বলে কীভাবে ঠিকানাটা যোগাড় করেছে তাও জানিয়ে দিল সঞ্জু।

মুখোমুখি বসে ছিলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। সঞ্জু আর রাজুর পিঠ চাপড়ে

দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড ওয়ার্ক ইয়াং শার্লক হোমস। একসেলেন্ট অবজারভেশন। তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব সাহায্য করবে।'

সঞ্জু বলল, 'স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আছে—'

'বল—বল—'

'আমরা যে ওই লোকগুলোর ওপর নজর রেখে, ফলো করে এই সব খবর যোগাড় করেছি, আমাদের মা-বাবারা জানতে পারলে একেবারে কেটে ফেলবেন। মানে এ সব—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কোনও মা-বাবাই চান না তাঁদের ছেলেরা খুনী-ডাকাতদের পেছনে ঘুরে বেড়াক। তোমাদের কথা মনে থাকবে।'

সপ্তাহ দুই কেটে গেল।

সঞ্জু আর রাজুদের পালি হিলের ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেছে। ওরা যেদিন হোটেল থেকে সেখানে চলে যাবে, তার আগের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সবাই মুম্বাই থেকে নব্বই মাইল দূরে পুনে শহরে ধরা পড়েছে এবং তাদের লুট-করা টাকা আর গয়নার বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের হোটেলে এসে হাজির। অফিস থেকে তার কিছুক্ষণ আগেই অরিন্দম আর রাধাকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার দুই ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। কফি খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ পুলিশের লোক কেন হানা দিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে।'

রাধাকৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, মানে—'

সঞ্জু আর রাজু মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সব ব্যাপারটা এবার জানাজানি হয়ে যাবে, ভাবতেই তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আমার এই দুই ইয়াং ফ্রেণ্ড আর তাদের মা-বাবাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছি। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না?'

রাধাকৃষ্ণ, অরিন্দম, জানকী, সঞ্জুর মা মণিমালা, তার দিদি রিনি—সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ইন্সপেক্টর চাপেকার এবার বললেন, 'আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, জুহুর ব্যাঙ্কে যারা ডাকাতি করেছে তারা দলবলসুদ্ধ ধরা পড়েছে। এই দুই ক্ষুদে শার্লক হোমসের সাহায্য না পেলে কিছুতেই ওদের অ্যারেস্ট করা সম্ভব হতো না।' তারপর কীভাবে সঞ্জুরা ডাকাতদের সম্পর্কে খবর যোগাড় করে তাঁকে গোপনে জানিয়ে এসেছে, তা তো বললেনই। আরও বললেন, ওদের দেওয়া সূত্র

ধরে 'আকাশগঙ্গা'য় তাঁরা ফাঁদ পেতেছিলেন। সেখানে ডাকাতদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ওই ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ছিল। তাকে থানায় ধরে এনে বেদম পেটাতেই ডাকাতদের পুনের ঠিকানা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং অরিন্দম ছেলেদের ওপর রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ওদের বকবেন না। যে কাজ ওরা করেছে সে জন্যে আপনাদের গর্ববোধ করা উচিত।'

অরিন্দম বললেন, 'ডাকাতগুলো টের পেলে কী হতো বলুন তো? কত বড় রিস্ক! সঞ্জু কলকাতাতেও এমন অনেক কাণ্ড করেছে—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ভেবে দেখুন ওরা না সাহায্য করলে ডাকাতেরা ভবিষ্যতে আরও কত ক্ষতি করত!'

অরিন্দম চুপ করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বলতে লাগলেন, 'আমার ইয়াং ফ্রেণ্ডদের মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম, আপনাদের জানাবো না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এত বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা অন্যায়। এবার একটা সুখবর দিচ্ছি।'

সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট সঞ্জয় আর রজতকে বড় অনুষ্ঠান করে খুব বড় একটা পুরস্কার দেবে। যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে, তারাও বিরাট কিছু দেবার কথা ভাবছে। খুব শীগগিরই আপনাদের কাছে এসে ওরা তা জানিয়ে যাবে। আজ তাহলে চলি—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার উঠে দাঁড়ালেন।

জাল ডিটেকটিভ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চাকরির উপর আজীবনকাল আমার ঘৃণা। বাবা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া আমায় কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; অনেক টাকা মূল্যে কয়েকখানা মূল্যহীন সার্টিফিকেট ক্রয় করা গিয়াছিল; আমি বি.এ.। বাবার ইচ্ছা আমি ডেপুটি ম্যাজিস্টরি পরীক্ষা দিয়া মফস্বলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসি। ডেপুটিগিরির সুখ আমার জানা ছিল; এক দিকে জেলার ম্যাজিস্টর, অন্যদিকে সেসন জজ, এই দুই নৌকায় পা দিয়া অনেক ডেপুটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে; শ্যাম ও কুল এ উভয়ই মধ্যে মধ্যে অরক্ষণীয় হয়। বি. এল. পাশ করিয়া মুনসেফি লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার ততদূর উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল না।....ওকালতির ঝঞ্ঝাট অনেক। আমি স্থির করিলাম, যাহাতে স্বাধীনতা আছে, সেই রকম কোনও কাজে লিপ্ত

হইব; 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—' আমি লক্ষ্মীলাভের আশায় বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিলাম।

বাবা তখন খাণ্ডোয়ায় তুলার কারবার করিতেন। কারবারে বেশ লাভ ছিল। আমি খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম; বোম্বের প্রসিদ্ধ গুজরাটি বণিক মানিকচাঁদ রতনচাঁদের সঙ্গে ভাগে সেখানে একটা 'এজেন্সি' খুলিবার সংকল্প ছিল।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি ন'টার পর মেলট্রেনে আমি একটা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে শত দীপ দীপ্ত বক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটিয়া চলিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে আমি গ্লাডস্টোন ব্যাগটায় ঠেস দিয়া সেই প্রভাতের একখানি প্রয়াগী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের নেটিভদের প্রতি যে একটু ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা উপেক্ষণীয় হইলেও, তাহার সহিত পরিচয় রাখা অকর্তব্য নহে।

দেখিলাম, গাড়িতে আর দুইজন আরোহী রহিয়াছেন, দুইজনই মারাঠা যুবক; একজনের পাগড়িটা গদির উপর পড়িয়া আছে; মাথার চারিদিকে সমান করিয়া কামানো, টিকিটা গোছা করা মস্ত লম্বা, চীনেদের মতো বেণী পাকানো নয়; বৃহৎ চন্দন চিহ্ন তখনও কপাল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; গায়ে একটা লম্বা কোট। যুবক একবার মুখ তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন; নীল চশমার সোনার ফ্রেম উজ্জ্বল গ্যাসালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি পূর্ববৎ বাহিরের 'চন্দ্রমাশালিনী যা মধু যামিনীর' দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর একজন যুবক সাহেবি পোশাক পরা; তিনি নিবিষ্টচিত্তে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো মোটা একটা বিকটাকার চুরুট জ্বলিয়া জ্বলিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণপূর্বক সাহেবের সংবাদপত্রে মনঃসংযোগের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

লোক দুইজন আমার সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। আমি বাঙালি মানুষ; গাড়িতে নতুন লোক দেখিলেই ফস করিয়া বলিয়া ফেলি, মশায়ের কোথায় যাওয়া হইবে? নিবাস এবং বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অনেক দিন 'আউট অব ফ্যাশন' হইয়া গিয়াছে; 'এটিকেট্' আইন জারি হইয়া নিবাস ও বাপের নাম প্রভৃতি অনেক শ্লীল জিনিস অশ্লীলের মতো পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপে, যাহাদের গৃহ এবং পিতার নাম উভয়েরই অভাব আছে, তাহাদের কাছে এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্লীল কৌতূহল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সাহেব হইয়াছি!

সুতরাং আমি চুপ করিয়া কাগজই পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে, যে যুবকটি কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি তাঁহার কাগজখানা হাতে লইয়া উঠিয়া

আসিলেন; ইংরাজিতে বলিলেন, মশায় আমায় এক্সকিউজ করিবেন; আপনার কাগজখানা বোধ করি পড়া হইয়াছে; আমরা পরস্পর কাগজ বদলাইতে পারি কি?

আমি হাসিয়া বলিলাম, অনায়াসে—মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার Bombay Herald নামক সংবাদপত্র আমার হাতে আসিল, আমার প্রয়াগী কাগজ লইয়া তিনি স্বস্থানে গিয়া বসিলেন।

কাগজখানা হাতে লইয়াই দেখিলাম এক কোণে একটা নীল পেনসিল দিয়া ইংরাজিতে লেখা আছে, আমি বোম্বের একজন ডিটেকটিভ; আমাদের অন্য সহযাত্রীটি বিট্টলরাও খারে। আপনি জানেন খারে কে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বোম্বে ওয়ারেন্ট রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার পূর্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে; বরহাউপুরের 'রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে' এ সকল কথা হইবে।

বিট্টলরাও খারে। বোম্বের প্রসিদ্ধ জহরত ব্যবসায়ী সাপুরজি জাহাঙ্গীরজির দোকান হইতে বিশ হাজার টাকা দামের একখানি হীরক যে চুরি করিয়াছে? চুরি, বাটপাড়িতে বোম্বে অঞ্চলে সে সময় কেহই বিট্টলরাওর সমকক্ষ ছিল না। আমার সঙ্গেও কিছু টাকাকড়ি ছিল; ভাবিলাম আচ্ছা বদমাইশের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠা গিয়াছে। মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইল, কাগজে মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না।

দুই-একবার বক্রদৃষ্টিতে বিট্টলরাওর দিকে চাহিলাম। প্রায় একমাস হইতে সে সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ডিটেকটিভ ঘুরিতেছে, হয়তো সে তাহার কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার চক্ষে চশমা, মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে তাহার কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; এমন কি আমি যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিনও Bombay Herald-এ তাহার সম্বন্ধে একটা প্যারা দেখিলাম; পুলিশের কর্তব্য কার্যে শিথিলতা দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ট্রেন স্টেশনে পঁহুছিল; পাঁচ মিনিট এখানে গাড়ি থামিবে। এখানে রিফ্রেশমেন্ট রুমে না জানি কি দায়িত্বভার ঘাড়ে পড়িবে! আমি ভারি চঞ্চল হইলাম। গাড়ি প্লাটফর্মে দাঁড়াইতেই সেই Bombay Herald-খানা পকেটে ফেলিয়া আমি ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম; অনতিবিলম্বে ডিটেকটিভ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ডিটেকটিভ যুবক অতি নিম্নস্বরে বলিলেন, খুব সাবধান। যাহাতে আসামির সন্দেহ হয়, এমন কোনও ব্যবহার করিবেন না। এখন পলাইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে। ভুসাওয়াল স্টেশনে বোধ হয় তাহার কোনও বন্ধু আসিয়া

জুটিবে; সে জব্বলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে খবর পাইয়াছি।

তাহা হইলে এখন কি করা কর্তব্য? আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বদমাইশের দল বৃদ্ধি হইবার আগেই তাহাকে আটক করা দরকার; ট্রেনে উঠিয়াই ইহাকে বাঁধিয়া বেঞ্চির নিচে ফেলিয়া রাখা যাইবে। তাহার পর ভুসাওয়ালে যদি তাহার কোনও বন্ধু আসে, তাহার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক হইলে তাহাকেও 'এরেস্ট' করিবার ব্যবস্থা করিব। আমি জানি না, বামাল কাহার কাছে আছে। এই বামালের জন্যই আমাদের অধিক চেষ্টা।

আমি বলিলাম, যদি এ গাড়িতে অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে, তাহা হইলে তো আমাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

ডিটেকটিভ উত্তর দিলেন, এ গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর সময় নাই, আমি চামড়ার একটা স্ট্র্যাপ কিনিয়া লই, বাঁধিতে দরকার হইবে; লোকটা ভারি জওয়ান। দরকার হইলে সাহায্য করিবেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, অবশ্য। ব্যাপারটা ক্রমে রোমান্টিক হইয়া উঠিতেছিল; এ যে আস্ত একখানা উপন্যাস!

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। আমরা প্লাটফর্মে বাহির হইয়া আসিলাম; গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ট্রেন ভুসাওয়ালে ক'টার সময় পৌঁছিবে?

গার্ড বলিল, বারোটা পাঁচ মিনিট। বুঝিলাম নিশীথ রাত্রে, এই দ্রুতগামী মেল ট্রেনের মধ্যে উপন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

বিট্টলরাও প্লাটফর্মে পদচারণা করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার সময় গাড়িতে লাফাইয়া উঠিল। ডিটেকটিভ ও আমি উভয়ে তাড়াতাড়ি একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। আমার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল; এখনি একটা ছোটখাটো যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। আমি ভাল করিয়া বিট্টলরাওর সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম; জোয়ানটি বড় কম নয়। ডিটেকটিভ লোকটা ক্ষীণকায়, আমিও তথৈবচ, দু'জনে তাহাকে পারিয়া উঠা দুষ্কর।

ট্রেন ছোট ছোট গোটা দুই-তিন স্টেশন পার হইয়া গেল। ডিটেকটিভ একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর জানালার কাছে আসিয়া এক লাফে বিট্টলরাওর উপর পড়িলেন; তাঁহার দুই হস্ত বিট্টলরাওর উভয় স্কন্ধে এবং তাঁহার জানুদ্বয় বিট্টলরাওর বক্ষের উপর চাপাইয়া দিলেন। বিট্টলরাও তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটে ফেলিবে, এমন সময় ডিটেকটিভ আমাকে বলিলেন—

শিগ্‌গির আসুন, রাসকেলের হাত দু'খানা আটকাইয়া ফেলুন।

আমি মুহূর্ত মধ্যে দৃঢ়বলে তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে ডিটেকটিভ মহাশয় পকেট হইতে আর একখানা রুমাল বাহির করিয়া বিট্টলারাওর মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন, রুমালে অত্যন্ত উগ্র ক্লোরোফর্মের গন্ধ। বিট্টলরাও প্রায় এক মিনিট কাল আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল; তাহার পর ক্লোরোফর্মে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডিটেকটিভ বলিলেন, নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইয়াছে। আপনি ঠিক সময়ে আমাকে সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই ও পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত। জানালা খুলুন, শীঘ্র খুলুন, নতুবা ক্লোরোফর্মের গন্ধে আমরা আবার এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িব।

তাই তো; আমার মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিয়াছিল; উৎসাহ ও উত্তেজনায় এতক্ষণ এ কথা মনেই ছিল না। আমি এক লাফে গাড়ির জানালা দরজা-খুলিয়া দিলাম। গাড়ির মধ্যে নৈশ বায়ুর অবাধ প্রবাহ আরম্ভ হইল।

ডিটেকটিভ বলিলেন, আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, চিরদিন তাহা মনে থাকিবে; আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট আপনার এই সহায়তার উল্লেখ করিতে পারি।

আমি আমার নাম বলিয়া বলিলাম, যদি আপনার কিছু কাজ করিয়া থাকি, সে কথা লইয়া আন্দোলন না করাই আমার কাছে ভাল বোধ হয়।

ডিটেকটিভ অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন; বলিলেন, আমাদের তস্কর বন্ধুকে আর এ ভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সম্ভব নয়; আসুন ধরাধরি করিয়া ইহাক বেঞ্চির পাশে নামাইয়া রাখা যাক।

বিট্টলরাও তখনও অজ্ঞান; তাহাকে নিচে নামাইয়া ফেলিলাম; ডিটেকটিভ তাঁহার কালো ব্যাগটা তাহার মাথার নিচে বালিশের মতো স্থাপন করিলেন। গাড়ির বাহির হইতে যাহাতে সহসা কাহারও তাহার প্রতি নজর না পড়ে, এজন্য একখানা কম্বল টাঙ্গাইয়া তাহাকে আমরা আড়াল করিয়া রাখিলাম।

আমি বলিলাম, চেতনা পাইলেই রাসকেল চেঁচাইতে আরম্ভ করিবে। ডিটেকটিভ হাসিয়া বলিলেন, তাহারও ব্যবস্থা হইবে, আমি উহার মুখ বাঁধিয়া দিতেছি। আপনার কোনও ভয় নাই।

রাত্রি বারোটার পর ট্রেন ভুসাওয়াল স্টেশনে পৌঁছিল। দেখিলাম প্লাটফর্মে সকলের আগে একজন মধ্যবয়স্ক মারাঠা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে; ভারি জোয়ান, গালপাট্টা, চোখ দুটো গোলাকার, দুটি ভাঁটার মতো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, সোনালি

আঁচলাটা স্টেশনের তীব্র আলোক ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

চক্ষুর নিমিষে আমার দিকে চাহিয়া ডিটেকটিভ মহাশয় বলিলেন, এ সেই, বিট্টলরাও যাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। আপনি গাড়ির মধ্যে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এ কামরা গার্ডকে বলিয়া রিজার্ভ করিয়া লইতেছি; এ লোকটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।

ডিটেকটিভ নামিয়া গেলেন। চোরের সঙ্গে একাকী গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। তাহার মুখটি বাঁধা বটে, কিন্তু যে রকম টানিয়া টানিয়া সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাতে তাহার শীঘ্রই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিল ... টা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল; আমি ডিটেকটিভকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম; গার্ডের গাড়ির কাছে গিয়া তাঁহাকে পাইলাম না; এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিলাম, লোকটার কোনও খোঁজ পাইলাম না ঠং ঠং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড বাঁশিতে ফুঁ দিল; আমি দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ দেখি নাই, সেই জমকালো পাগড়িওয়ালা জোয়ান লোকটা এই গাড়িতেই উঠিয়াছিল। কি সর্বনাশ! সে এক লাফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; আমার মুখের উপর একটা পাঁচনলা পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।

আমার ডিটেকটিভ বন্ধু গাড়িতে নাই; আমি নিরস্ত্র একা, সম্মুখে এই দুর্জয় জোয়ান সশস্ত্র, পাশে অর্ধচেতন বিট্টলরাও। মেলট্রেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম আর রক্ষা নাই; সমস্ত গাড়িখানা আমার চক্ষুর উপর ঘুরিতে লাগিল; নত মস্তকে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া কেহ এ পর্যন্ত বোধ করি এমন বিপদে পড়ে নাই। বিধাতার বিড়ম্বনা।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আগন্তুক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, বৃথা চিন্তা; নিজে যে ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহারই মধ্যে পা পড়িয়াছে। এখন আমি যাহা বলি শুন, অন্যথা করিলে মাথার খুলি এক গুলিতে উড়াইয়া দিব। আমার বন্ধুর মাথার দিকটা ধর, তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। পলায়নের চেষ্টা করিও না।

আমি জড়ের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিলাম। বিট্টলরাওর চৈতন্যোদয় হইল; সে শুইয়া শুইয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিতে লাগিল, আগন্তুক বলিল, কেমন আপাজি, বেশ সুস্থ হইয়াছে তো?

আপাজি কি বিট্টলরাওর আর এক নাম? আপাজি উত্তর করিল, কে ভাস্কর?

তুমি আসিয়াছ, বদমায়েসেরা কি ভাগিয়াছে?

না, একজন জালে পড়িয়াছে, আর একজন সরিয়াছে।

আপাজি উঠিয়া বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে পলাইল? পলাইবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে অনেক আগে লোকজন সঙ্গে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম।

ভাস্কর বলিল, আমি প্রথমে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াছিলাম; সহজেই বুঝিয়াছিলাম, বদমাশ বিট্টলরাও তোমার উপর কোনও রকম কৌশল খাটাইয়াছে! শেষে আমি যখন এই গাড়িতে তোমার অবস্থা দেখিলাম, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আসামি কিরূপে সরিয়া পড়িল বুঝিলাম না; তাহার সঙ্গী গাড়ি ছাড়িবার সময় আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে।

আমার কপালে ঘর্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। আপাজি কি বিট্টলরাও নহে? ইহাদের কথার কোনও মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম; বুঝিলাম ভিতরে একটা ভয়ানক রহস্য লুকানো রহিয়াছে।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। আমি আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, আমি কি একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছি। আপনারা কে?

ভাস্কর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, আমরা যে হই, সে খোঁজে আবশ্যক? তোমার ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তোমার নাম কি?

অন্য সময় হইলে হয় তো এরূপ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। কিন্তু তখন এ অপমানও পকেটস্থ করাই সঙ্গত বোধ হইল। আমি নাম ও নিজের ব্যবসায়ের পরিচয় দিলাম।

ভাস্কর বলিল, ও তো গেল পরিচয়, আসল পরিচয় দাও। দেখিতেছি তো বাঙালি, বিট্টলরাওর সঙ্গে কতদিন জুটিয়াছ? অনেক বাঙালি আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া কেবল নিজের মুখে কালি লেপিয়া বেড়ায়, তুমিও তাহাদের একজন। চোরাই মাল কোথায়?

এবার আমার বড় রাগ হইল; বলিলাম, তোমাদের এই রকম অভদ্র আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে জুতা মারিয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের কাছে চোরা মালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই লজ্জা হইয়া থাকে।

আপাজি বলিল, ভদ্রলোককে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয় না?—আপাজির স্বর গম্ভীর।

আমি বলিলাম, সে ক্লোরোফর্ম আমি দিই নাই, ডিটেকটিভ দিয়াছিল। বদমাশকে বাঁধিবার জন্য আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র; আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেই এরূপ কাজ করিতেন।

ডিটেকটিভ? কোন ডিটেকটিভ?

আমার সহযাত্রী বন্ধু, যিনি জব্বলপুর হইতে আসিতেছিলেন।

আমি বললাম, হাঁ, তুমি যাহাকে আপাজি বলিতেছ, ডিটেকটিভ আমাকে বলিয়াছে সে স্বয়ং বিট্টলরাও; তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডিটেকটিভ আমার সাহায্য লইয়াছিল; এখন তাহাকে পলাইতে দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে।

আপাজি বলিল, জাল ডিটেকটিভ! সে নিজেই বিট্টলরাও। আমি তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার সঙ্গ লইয়াছি; চোরা মাল তাহার সঙ্গে আছে জানি। পথের মধ্যে একা গোলযোগ করিলে তাহা হাতছাড়া হইতে পারে বলিয়া আমি ভাস্করকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে তোমার প্রিয় বন্ধু বোধকরি তাহা বুঝিয়া এই রকম করিয়া আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে তুমি প্রকৃত ব্যবসায়ী, জাল ডিটেকটিভ সহচর নও।

জাল ডিটেকটিভের স্বহস্তে নোট করা সেই Bombay Herald তখনও আমার পকেটে ছিল; আমি তাহা বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সেই নোট দেখাইলাম।

আপাজি বলিল, এ যথেষ্ট প্রমাণ নহে; তোমার নির্দোষিতার সন্তোষজনক প্রমাণ না দেখাইলে অব্যাহতি লাভের আশা নাই। তোমার ব্যাগ খোল।

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিতে গেলাম। উঠিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া তুলিয়াই তাহা নিচে ফেলিয়া দিলাম—আমি বসিয়া পড়িলাম!

আমার সর্বনাশ হইয়াছে! আমার ব্যাগটা জাল ডিটেকটিভ হাতে করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল!

আপাজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, একবার প্রতারণা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমাদের চোখে ধূলি দেওয়া অসম্ভব।

আমি বলিলাম, এ ব্যাগ আমার নহে, জাল ডিটেকটিভের। আমার ব্যাগটা সে কখন লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে দেখি নাই; আমার পাঁচ হাজার টাকা গিয়াছে।

আপাজি বলিল, এ বিট্টলরাওর ব্যাগ!—দেখি—সে তৎক্ষণাৎ একটা রিং সন্নিবদ্ধ এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া তাহার একটা দিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি কাগজপত্র উলটাইতেই সেই চোরা হীরকখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গ্যাসালোকরশ্মি নিপতিত হইয়া আমার ভীতিবিস্ময়সমাকুল চক্ষে প্রতিফলিত

হইতে লাগিল।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

ব্যাগ বদলানোটা বিট্‌লরাওর জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বে আসিলে আমাকে লইয়া পুলিশে একবার টানাটানি করিয়াছিল। সহজেই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হইল; বিচারক আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অশেষ দোষারোপ করিয়া আমায় মুক্তি দান করিলেন।

তাহার পর বিট্‌লরাওর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাসময়ে জাহাঙ্গীরজি তাঁহার হীরক ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ হাজার টাকা খোয়াইয়া আমার কেবল কাদা মাখাই সার হইল।

আজব গোয়েন্দার দেশে

আবুল বাশার

আবিরমামার মুখে ভূতের গল্প শোনা আমাদের চিরকেলে অভ্যেস। মামা মুখ বদলাবার জন্য আজ একটি নতুন প্রস্তাব দিলেন। চুনোর মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বললেন, "গোয়েন্দাগিরির চমৎকার গল্প বইয়ে পড়েছিস বিস্তর, কিন্তু চুনো, ম্যাজিক দেখিয়ে আততায়ী বা চোর ধরার গল্প তোদের জানা নেই। তাও ফের পি. সি. সরকারের ম্যাজিক নয়, সেটি হচ্ছে, যাকে বলে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'।

ব্ল্যাক ম্যাজিক? ইংরেজিতে একটা নতুন শব্দ শুনলাম এমন বলব না, তবে কথাটার আবছা মানে মনে নিয়ে মামার গল্প শোনা ঠিক নয়। মামাই বললেন, "পি. সি. সরকারের ম্যাজিক অনেকটাই বিজ্ঞানভিত্তিক, অলৌকিক কিছু নয়, তাতে কোনও অতিপ্রাকৃত ঘটনা থাকে না। একজন আধুনিক জাদুকর, তুকতাকে বিশ্বাস

করেন না। মন্ত্র মানেন না। বাণমারা, তুক করা, আত্মার কারসাজি, ভূতপ্রেত কোন কিছুই মর্ডান ম্যাজিকে আসে না। এমনকী 'ভোজবাজি' কথাটা আমরা ব্যবহার করি, কোনও কিছুকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করার জন্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ মন্ত্রতন্ত্র মানে, অলৌকিক ঘটনার দিকে তাদের ভয়ানক টান। 'সম্মোহন' শব্দটা নিশ্চয় শুনেছিস চুনো!"

আমাদের বোন কিরণ বলল, "আচ্ছা মামা, নজরবন্দি কাকে বলে?"

মামা নিঃশব্দে মিঠে হেসে বললেন, "সেটাই তো সম্মোহন রে। সাদা বাংলায় একটা কথা আছে 'গুণ করা' গুণ মানে জাদু। এটাই ব্ল্যাক ম্যাজিক। ইংরেজিতে Magus বলে একটা শব্দ আছে। প্রাচীন পার্শি পুরুতকে বলা হত মেইগ্যাস। Magus বলতে একজন জাদুকর জ্ঞানী ব্যক্তিকে বোঝাত, এই শব্দটা থেকেই Magi এবং তা থেকে Magian এবং শেষে Magcian শব্দ এসেছে। সম্মোহনসংক্রান্ত বিদ্যাই আসলে কালো জাদু। একজন অগ্নি উপাসক পুরোহিতের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই ছিল অলৌকিকত্ব এবং তিনি সম্মোহন বিদ্যাবলে মানুষকে অভিভূত করতে পারতেন। এই পুরুতরা ছিলেন স্বপ্নবিদ, এঁরা মানুষের স্বপ্নের নানারকম ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। এঁদের সম্বন্ধে বিশদ কিছু আর বলছি নে, পরে একদিন বলা যাবে। আজ আমি একজন বেঙ্গলি মেইগ্যাসের গোয়েন্দাগিরির একটা অকাট্য গল্প শোনাতে চাই।" বলে একটুখানি দম নেওয়ার জন্য থামলেন আবিরমামা।

মামা এবার রুপোর বুড়ো আঙুল প্রমাণ কৌটো থেকে আঙুলের চিমটি করে খানিকটা নস্য নাসিকার ছিদ্রে গুঁজে সাদা ধবধবে রুমাল নাকের ডগা রগড়ে মুছে সিধে হয়ে বসবেন। তাঁর চোখের ডিমে হালকা অশ্রু চিকচিক করে উঠবে। অতঃপর তিনি গল্পটা পাড়বেন, সব গল্পই মামার অভিজ্ঞতার গল্প। সংসারে যা ঘটেনি, মামা তা বলেন না।

মামা বললেন, "বেঙ্গলি মেইগ্যাস বলতে বাংলার এই জাদুকর-গোয়েন্দা ছিল পেশায় খেয়াদার পাটনি। ভৈরবের যে ত্রিমোহনী ঘাট, সেই ঘাটে খুঁটোবাঁধা একখানা ডিঙি ছিল গুণিলালের সম্বল। চরের জমি থেকে পাকা ধান আঁটি বেঁধে ওই ডিঙি করে পারে নিয়ে যেত গেরস্তরা, তা ছাড়া মানুষ-ছাগল-মুরগি সব ওই ডিঙি করেই পারাপার হত। গুণীর খেয়ায় চড়লে পয়সা দিতে হত না, দিতে হত ষান্মাসিক পাঁজা।

"পাঁজা কী মামা?" প্রশ্ন করলাম।

মামা রুমালে নাকের ডগা রগড়ে পকেটে রুমাল ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, "কথাটা হচ্ছে পাঞ্জা। হাতের পাঞ্জা যাকে বলে, এখানে ধরতে হবে মুঠোয় করে

যতটা ধরা যায়, তাই হচ্ছে পাঞ্জা বা পাঁজা। মুঠোয় যতটা সামগ্রী উঠল, ধান-গম-ছোলা-পাট তাই দিয়ে দাও গুণিলালকে। আসলে একমুঠো না দশ-বিশ মুঠো, সেটাই ধর্তব্য। ধান-পাটের সময় ধান-পাট, রবিখন্দের সময় ছোলা-গম—ছ'মাস অন্তর। মানুষ গুণীকে সাধ্যমতো দেবে, মুঠোভরে দেবে। তাই বলে, গুণীকে ভিক্ষে দিচ্ছ ভেবো না, সে তোমার ফসল পার করেছে, তোমাকে খেয়া দিয়েছে। তুমি তার ডিঙি করে ফসলের মাঠে গেছ, হাটে গেছ, মকদ্দমা করতে শহরে যাবে, ত্রিমোহনী পার হয়ে গঞ্জের সদরে বাস ধরবে, তার আগে ঘাটপারে যাবে, গুণীই তোমার পাটনি। দশ হাতা পাট, পাঁচসেরি হোটের ভর্তি ধান তুমি অন্তত দেবে, চৈতালি ফসলও দেবে হেটো মেপে।"

"হেটো কী মামা?"

"তা-ও জানো না! বেতের বোনা এক ধরনের পাত্র।"

"ও, আচ্ছা।"

"সবাই তো আর পাঁজা দেওয়ার ক্ষ্যামতা রাখে না। যারা দেবে না, তারা কি ঘাট পারে যাবে না? যাবে। তারা হল ফ্রি-সার্ভিসের প্যাসেঞ্জার। গুণীর হিসেব ছিল, সে সকলের কাছে পাঁজা চাইত না।" বলতে বলতে মামা আবার একদণ্ড চুপ করলেন।

আবিরমামা তারপর হঠাৎ বললেন, "গুণীর পেশা সম্বন্ধে, না, একে বলে উপজীবিকা, সে সম্বন্ধে সাত কাহন বলা যায়। এই মানুষটাই ছিল আমার ছেলেবেলার গ্রাম্য গোয়েন্দা, থানার দারোগা যা পারত না, গুণী সেই রহস্য ভেদ করতে পারত। খেয়া পারে যায় না, এমন মানুষ গ্রামে নেই। সবারই নাড়িনক্ষত্র জানত গুণী। তা ছাড়া সে ছিল স্বপ্নবিদ। শতডিহার পড়তি দমিদার অম্বরপ্রসাদ ওরফে মধুবাবু পর্যন্ত তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতেন। একবার মধু মজুমদার তাঁর বালাখানায় গুণীকে ডেকে পাঠালেন।"

এতক্ষণে বুঝলাম, গল্প শুরু হয়ে গেছে। মামা বললেন, "মধুবাবু গুণীকে ডেকে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, শোন গুণিলাল, আমার মনে হচ্ছে, তোকে একটিবার বাটি চালান করতে হবে বাবা। চোর লেগেছে। আমার হরিণ-ঘর থেকে শিং চুরি যাচ্ছে। বাঘের চামড়া পর্যন্ত চোট হয়েছে। স্বপ্ন দেখলাম, আমি মরে গেছি। মরে গিয়েও নিস্তার নেই, মরে গিয়েও আমার দৃষ্টি বেঁচে রইল, দেখলাম, গুপ্তঘরের দেওয়াল থেকে পয়জন টেস্টিং ডিশ কে একজন পেড়ে নামাচ্ছে। পি. টি. ডিশ চলে গেলে ডোরা বাঁচবে কী করে? তুই দয়া করে পারসি বাটি চালিয়ে দে গুণী! আমি তোকে এই এত পাঁজা দেব, উপরি পাবি।"

"বাটি চালান কী জিনিস? পি. টি. ডিশ?" চুনোর কান বিস্ময়ে খাড়া হয়ে

উঠেছে।

চুনোর কানের দিকে চেয়ে মামা বললেন, ''দাঁড়া সব বলছি। আগে মধু মজুমদারের কথা শুনে গুণী কী ডায়ালগ দিলে, বলে রাখি। বললে, বাটি চালিয়ে অর্থ-সামগ্রী নিতে পারব না বাবু। গুরুর মানা আছে। মন্ত্রসিদ্ধি করে বাটি হাঁকে, মাগনা তো চলে না, ধাক্কা দিয়ে চালানো পাপ, বাটি চলে বশীকরণে, মন্ত্রে। ওই যে গাছের শিকড়, ওই হচ্ছে ড্রাইভার। আপনি বুঝবেন বাবু, খাবারে বিষ পড়লে ডিশ ফেটে যায়, বাটির পেটে শিকড় রাখলে বাটি মাটির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। একে বলে আজ্ঞে দ্রব্যগুণ।''

চুনো বোধ হয় বাটি চালানের ম্যাজিক খানিকটা অনুধাবনের চেষ্টা করছিল। সে কল্পনা করছিল, একটি অদ্ভুত ধরনের দুধ-কাঁসার বাটি মাটির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পাঁচ আঙুলে ভর দিয়ে একটি হাত। গুণীর হাত। বাটির পেটে কিসের একটা শিকড়।

মামা বললেন, ''গল্পটা এবার আমি গুণীর হাতে ছেড়ে দেব। সে যেমন করে পারবে চালাবে।

''অম্বরপ্রসাদের কাছে পৌঁছতে অনেক ঘর এবং সরু বারান্দা পার হয়ে আসতে হয় ঘরের ভেতরে ঘর, ঘরের এক মস্ত গোলকধাঁধা। ডাকাত পড়লে, তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। প্রাসাদটা যেন একটা দুর্গ। মেয়েরাই ডাকাতদের আড়াল থেকে অতর্কিতে বাঁটিকাটা করতে পারে। ফলে জমিদার বাড়িতে ডাকাত পড়ার ঘটনা নেই। কিন্তু হরিণ-ঘর থেকে বাঘ-হরিণের চামড়া এবং হরিণের প্রশাখাময় শিং চুরি গেল কী করে! হরিণ-ঘরটা কোথায়?

''গুণী বলল, আপনি স্বপ্নে মারা গেলেন বাবু! আপনার দৃষ্টি মরল না। হরিণ-ঘরের দেওয়াল থেকে পি.টি. ডিশ পেড়ে নামানো হচ্ছে, দেখতে পেলেন। তা হলে চলুন, হরিণ-ঘরে গিয়ে দেখি ক'টা জিনিস চোট হয়েছে।

''আমি কি তা হলে বাঁচব না গুণিলাল?'' ককিয়ে জানতে চাইলেন মধুবাবু।

''কেন বাঁচবেন না বাবু। স্বপ্নের মধ্যে মরতে পারলে আয়ু বৃদ্ধি। তবে স্বপ্নে মৃতাবস্থায় দৃষ্টি সজাগ থাকলে অঘটন ঘটে, লাশ যা দেখে তার অনেক কিছুই ফলে যায়। আপনি ডিশ নামাতে দেখেছেন, ডিশ তা হলে নেমে গেছে।''

''গুণিলাল এক দফা কথা শেষ করেই ভয়ঙ্কর কুকুর ডোরার মুখের দিকে বাঁকা-তেরছা দৃষ্টিতে চেয়ে একটা ঢোক গিলল। বুকের ভেতরটা তার গুড়গুড় করে উঠল।

''গুণিলাল বুঝতে পারছিল বাবুর খাটের বিছানায় পড়ে থাকা লম্বা ত্যানার মতো ডোরা আসলে ত্যানা নয়, খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালে পিলে চমকে যাবে।

বাঘের মতো ম্রাউ করে গা মোচড়ায়, চোখ দু'টো ধকধক করে জ্বলছে।

''ঘরের দরজায় ঝুলছে ভারী পরদা। জানলা-কপাট বন্ধ। কোথা থেকে ক্ষীণ রেখার আলো এসে মেঝেয় পড়ে দিনের বেলাতেও ঘরের অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে তুলেছে। এই আঁধারে এসে দাঁড়ালে গা কেমন ছমছম করতে থাকে। মেঝেয় চোখ পড়ল গুণিলালের। সে বেশ অবাক হয়ে দেখল, একখানা ডিশ দু'ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছে, সেখানে খাবার ছড়ানো। গুণী বুঝতে পারল, ডিশের খাবারে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

''মধুবাবু বললেন, 'ডোরা ঘাড় নামিয়ে খেতে যাবে, এমন সময় ফট করে ফেটে গেল।''

''গুণী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'খেতে কে দেয়?'

''লবঙ্গ। প্রায় এক যুগ আমার সংসারে আছে। খুবই করিৎকর্মা। ভারী বিশ্বাসী মেয়ে। ডোরা ওর হাতে ছাড়া খায় না। আমার নির্দেশ আছে, লবঙ্গ ছাড়া কেউ যেন ডোরার খাবার বেড়ে না দেয়। বাড়ির বউদের পর্যন্ত এক্তিয়ার নেই। কোনও পুরুষ ওকে খেতে দেবে না। এক টুকরো বিস্কুট অবধি না।'

''লবঙ্গই খেতে দিয়েছিল?''

....হ্যাঁ। কাজের মেয়ে লবঙ্গ। বারো বৎসর আমার হেঁসেল ঠেলছে। আমার সৎ ভাই বিষ্টু মজুমদার, যাকে লোকে হাবিলদার বলে জানে, সন্ন্যেসি গোছের মানুষ, পুব পাড়ার ডিহিতে থাকে, ওইই তো এই লবঙ্গকে জোগাড় করে এনেছিল। কথা হচ্ছে লবঙ্গ বিষ মেশাবে, প্রত্যয় হয় না গুণিলাল।'

''আপনি তা হলে কাকে সন্দেহ করছেন?'' গুণিলালের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে খাটে হেলান দিয়ে বসে রইলেন মধু মজুমদার। তারপর ডোরার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'সন্দেহ কাকে করব? ডিশ ফেটে গেল দেখে লবঙ্গ ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বেলা গড়িয়ে গেছে, এখনও বেচারি খায়নি, মুখ শুকনো করে বসে আছে। ডোরাকে ভালও তো বাসে। বউগুলি তো রীতিমত স্তম্ভিত। কে কী করল বুঝেই পাচ্ছি না। তবে সন্দেহ নেই, ডোরাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। ও মরলে, আমিও মরব। চল তোকে হরিণ-ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।' বলে খাট থেকে গা তুলে উঠে দাঁড়ালেন অম্বরপ্রসাদ।

''প্রসাদ জমিদার উঠে দাঁড়াতেই ডোরাও খাটের ওপর উঠে দাঁড়াল, গা ঝাড়া দিল। গা ভর্তি বড় বড় সোনালি লোম, এত লোমশ কুকুর গুণী কোনও কালেই কোথাও দেখেনি। দেখেই মনে হয় স্বপ্নের কুকুর, যেন কোনও ম্যাজিকগুণে জন্ম নিয়েছে।

''কিন্তু পরদার তলায় মিলিটারি বুটপরা দু'খানি পা দেখে আঁতকে উঠল

গুণিলাল। 'ও কে?' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তখনই পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল হাবিলদার। তাগড়াই চেহারা। বাড়ি থেকে পালিয়ে মিলিটারিতে যোগ দিয়েছিল। ফিরে এসে আধা-সন্ন্যেসি হয়ে গেছে। মধুবাবুর কাছে পড়তি জমিদারির অংশ দাবি করেনি, বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে উদাসীন। একলা থাকে, বিয়েথা করেনি। এই মানুষটা এখনও গ্রামের পথে একাকী প্যারেড করে বেড়ায়, প্রতিটি ধাপ এত নিখুঁত মাপের যে, চোখে না দেখেও পথ দিয়ে যথাস্থানে চলে যেতে পারে। হাবিলদার আসলে ইদানীং অন্ধ। শোনা যায়, যুদ্ধে গিয়েই নাকি চোখে চোট পেয়েছিল। ধীরে ধীরে চোখের আলো নিভে গেছে। বছর দুই আগেও নাকি ঝাপসা দেখত। লেফ্‌ট-রাইট করতে করতেই ঘরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে এই অবধি চলে এল আজ। তাজ্জব মানুষ। সন্ন্যেসিই নয়, আধা পাগলও বটে।

"ঘরের ভেতরে ঢুকে এসে হাবিলদার বলল, 'লবঙ্গকে কি আমি নিয়ে যাব দাদা? বিষ দিক না দিক, কোনও মানুষই যখন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তখন ওকেও এখানে রাখা ঠিক হবে না। আমিই ওকে কাজ দিয়েছিলাম, আমি না দিলে, তুমি নিতে না। অতএব লবঙ্গ চলে যাক।' বলে অন্ধ মানুষটা চোখ পিটপিট করল বারকতক।

"মধুবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি তো ওকে কোনও সন্দেহ করিনি বিষ্টু, তুই কেন খামোকা গরম হচ্ছিস।'

"না, এটা আমার প্রেস্টিজ খানিকটা, কারণ আমিই ওকে দিয়েছিলাম। দ্যাখ, আমাদের জমিদারি প্রায় ফৌত হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাটবাট তো যায়নি। গণ্ডাগণ্ডা কাজের লোক, উঝি, কে কী সরিয়ে নিয়ে পালাবে বলা যাচ্ছে না। আমি চাইব, লবঙ্গ বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস রেখে চলে যাক। কী বল, গুণিলাল?"

"গুণিলাল বুঝল, সে যে মধুবাবুর কাছে এসেছে, তা কিন্তু গোপন নেই। মধুবাবু বললেন, 'তোর প্রেস্টিজ আবার খুব ঠুনকো বিষ্টু। তুই লবঙ্গকে দিয়েছিস তো কী হয়েছে! আমি ওকে অবিশ্বাস করিনি। কেন করব, ওই তো ডোরার আপন।"

"হাবিলদার এবার কিছুটা নরম হয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, লবঙ্গকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে এখান থেকে 'আউট' করতে পারলে কারও হয়তো সুবিধে হয়।"

"ঠিক বলেছিস বিষ্টু। আমারও তাইই মনে হয়েছে।"

"আচ্ছা দাদা, স্কুলের ডোনেশনের ব্যাপারে কী ভাবলে! দ্যাখো, এটাও কিন্তু প্রেস্টিজ। আমি পাগল-সন্ন্যেসি-হাবিলদার যাইই হই, লোকে স্কুলের জন্য চাঁদা চাইলে....যাকগে, আমিও কিন্তু জমিদার, আমি তোমার ভাই। আমার মর্যাদা গেলে, তোমারও থাকবে না। আমি আমার ভাগ থেকে ডোনেট করব। কখনও তোমার

কাছে কিছুই চাইনি।'

"বেশ, বেশ। দেব তো বলেছি।"

"কবে!"

"আগে বাটি চলুক, তারপর।"

"ওহ, চোর ধরবে! দ্যাখো গুণী, ভুল লোকের পায়ে যদি বাটি লাগাও, আমি তা হলে তোমাকে ছাড়ব না। বন্দুক হাতে করে সিধে চলে যাব। তোমাকে ডিঙির ওপর গিয়ে গুলি করে আসব। আমি সব দেখতে পাই, পা, আমি পা দিয়ে দেখি।" বলে বুটের প্যারেড করে শব্দ তুলে হাবিলদার চলে গেল।

"পাগল!' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অম্বরপ্রসাদ।

"তা দেখে গুণী বলল, 'হাবিলদার কিন্তু পাগল নয় বাবু। ওর ভাগ ওকে হিসেবে করে দিয়ে দেন। খুব গরম, গুমোর আছে। চলুন, হরিণ-ঘরটা দেখি।'

"হরিণ-ঘরে এসে দেখা গেল, দেওয়ালের দু'টি স্থান ফাঁকা। ডিশ নেই। একখানা ডিশ ফেটে গেছে, দু'খানা চুরি হয়েছে। শিং এবং ছালও কিছু চোট হয়েছে।"

"ডোরা আমার বডিগার্ড গুণী। ওর কাছে আমার সিন্দুকের চাবি আছে।' বলে দরজার দিকে চাইলেন মধুবাবু। মনে হল, পরদার ওপারে কিসের একটা ছায়া সরে চলে যাচ্ছে। ঘর ছেড়ে দ্রুত বাইরে ছুটে এল গুণিলাল। দেখা গেল, ছোটবউ একটা ঝাড়ন হাতে চলে যাচ্ছে, তার সম্মুখে কেউ হয়তো ছিল।

"গুণিলাল ভয় পাচ্ছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, এই প্রাসাদে চোর ঢুকছে। ডোরাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। ডোরার কাছে চাবি আছে, কিন্তু কীভাবে সেটা আছে, কোথায় আছে, ভেবে পাচ্ছিল না জাদুকর।

"দিনসাতেকের মধ্যেই পি.টি. ডিশ সমস্ত চোট হয়ে গেল। একদিন ঘোর সন্ধ্যায় মুখে অন্ধ হাবিলদারকে কারা মুখোশ পরে বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে কোথায় নিয়ে গেল। প্রাসাদে ডাক পড়ল গুণিলাল পাটনির। সে এসে পৌঁছতেই মধুবাবু বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে গুণী। তুই শিগ্‌গির বাটি চালিয়ে দে বাবা। ডোরার পায়ে লোমের তলায় দিয়ে বাঁধা সাঙ্কেতিক চাবি ছিনতাই হয়েছে। ক'দিন আমিই ওকে খেতে দিয়েছি। পি.টি. ডিশ নেই। এ ঘরে কে কখন ঢুকল বুঝতে পারছি না। ডাকাতরা বিষ্টুকে সাবাড় করে দিত, কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছে। কী হবে গুণিলাল?"

"পাটনি শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একবার লবঙ্গকে ডাকুন।"

"লবঙ্গ এল।"

"গুণী বলল, 'বউদের ডাকুন'।"

"বউরা এল। ভাইরা এল। কাজের লোকরা সব এল। হাবিলদার পর্যন্ত এল।"
"পাটলি হাবিলদারকে প্রশ্ন করল, 'কারা ওরা'?"
"কারা?"
"ওই যে আপনাকে বন্দুক উঁচিয়ে নিয়ে গেল।"
"কী করে বলব? চোখে তো দেখি না।"
"কোনও প্রশ্ন করেননি?"
"হ্যাঁ, তারা বলেছে, সরিষাপুরের ডাকাত।"
"বেশ। আপনার কাছে কী চাইল?"
'চাবি। কিন্তু আমি কোথায় পাব বল! মনে হচ্ছে, এ-বাড়িতে ডাকাত পড়বে। দাদা, তুমি আজই লবঙ্গকে বিদায় করো।'
"হঠাৎ গুনী বলে উঠল, 'কাল ভোরে বাটি চালান হবে। গাঁয়ে ঢেঁড়া দিন জমিদারবাবু। আমার মনে হচ্ছে চাবিটা পাওয়া যাবে।"
"কথা শেষ করেই পা বাড়ায় গুণিলাল। প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে বালাখানায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে পুনশ্চ উক্তি করে, 'লবঙ্গকে বিদায় করবেন না বাবু। ওকে একবার ফের ডাকুন তো!"
"কথা বলবে?" মধুবাবু জানতে চান।
"গুনী বলল, 'একটা কথা বলে যাই। আচ্ছা বাবু, চাবিটা দেখতে কেমন?"
"অম্বরপ্রসাদ বললেন, 'গোল চাকতি মতন। সরু আর শক্ত লাল আংটা বাঁধা। চাকতির গায়ে সংখ্যা আর সঙ্কেত লেখা আছে। যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে সংখ্যা-সঙ্কেত মিলিয়ে সিন্দুকের তালা ঘোরাতে হবে।"
"থাক, আর বলতে হবে না। আচ্ছা, ডোরাকে চান করাত কে? স্নানের সময় চাকতি ডোরার সোনালি লোমের ভেতর থেকে ডোর খুলে বার করা হত? ডোরাকে খাওয়ানোর সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিত কে? আপনি?"
"না, লবঙ্গই দিত।'
"লবঙ্গকে ডাকুন।'
"লবঙ্গ ভিড় ঠেলে সম্মুখে এল। তাকে দেখেই গুনী বলে উঠল, 'তুমি এক সন আগে আমার ডিঙি করে করে পার হয়েছ লবঙ্গ। তারপর এই সাতদিন আগেও একদিন সরিষাপুর গেলে? যাওনি?'
"মধুরকুল গেলাম। মায়ের কাছে একবেলার জন্যে।'
"সরিষাপুরে কে আছে তোমার?'
"আমি মধুরকুলের মেয়ে।'
"তুমি কিন্তু সরিষাপুরে গিয়েছিলে। যাওনি? ঠিক আছে, কাল তোমার সঙ্গে

কথা হবে, তুমি তা হলে লবঙ্গ নও?
"সে কী গুণিলাল! আমিই আমি নই! তোমার কি মাথা খারাপ হল গুণিলাল! তুমি মানুষকে এতদূর অপদস্থ করতে পারলে! হায়, মানুষকে মানুষ গণ্যি করে না। তুমিই কিনা বাটি চালিয়ে মানু, ধরবে! দেখুন হাবিলদারবাবু, কী বলে লোকটা! হায় হায় রে! আমি কোথায় যাব, কী করব!' বলে ডকুরে কেঁদে উঠল লবঙ্গ। ছাতা হাতে গুণীকে মারবার জন্য তেড়ে এল বিষ্টু মজুমদার মধুবাবু তারে বাধা দিয়ে বললেন, 'বিষ্টু, ঘটনা সন্দেহজনক। কথা বার করবার জন্য সত্যমিথ্যা জেরা করে মানুষ। গুণী বললেই লবঙ্গ কিন্তু দারুচিনি হয় না। তুমি সংযত হও, ছাতা নামাও!' দাদার ধমকে বিষ্টু নিরস্ত হল।
"পরের দিনই হাটে ঢোলশহরত হল। সমস্ত দিগরের মানুষ জেনে গেল, শতডিহার ফৌত জমিদার মধুবাবুর বালাখানায় বাটি চালিয়ে চোর ধরা হবে। চাই কি ডাকাতও ধরা পড়তে পারে।
তল্লাটের মানুষ ভেঙে পড়ল গুণিলালের বাটি চালান দেখতে। গুণিলাল কেবলই ভাবছিল অন্ধ মানুষ হাবিলদার ওরফে বিষ্টুবাবু কা করে তার মাথায় ছাতার বাঁট তুলে মারতে গেল? বিষ্টু মজুমদার কি দেখতে পায়? প্রশ্ন গুণী করেনি। মনে মনে ভেবেছে।
"বালাখানা লোকে লোকারণ্য, বালাখানা উপচে জনস্রোত পথ পর্যন্ত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—গুণী প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার কাঁধের থলেতে পার্শি বাটি রয়েছে। রয়েছে বাটি চালানের শিকড়।
"শিকড় রাখা হল বাটির পেটে। আঙুল দিয়ে বাটির ওপর ভর দিল গুণিলাল। এবার বাটি এগোবে। থানা থেকে দারোগাও তাঁর দলবল নিয়ে এসে মানুষের স্রোত ঠেকিয়ে রেখে গুণীর কাজের সুবিধে করে দিচ্ছেন। এই বাটি মাটির ওপর দিয়ে ঘষে ঘষে এগিয়ে যাবে। অপরাধীর পায়ের কাছে এসে থামবে।
"বাটি চলতে শুরু করল। ডোরা এগোচ্ছে গুণির পিছু পিছু। যেন সে-ও চোর ধরতে বার হয়েছে। যেন সে বুঝতে পারছে, তার লোমের তলে লুকনো চাবিটা গাপ হয়েছে। তাকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে। সে মরলে, মধুবাবুও আর বাঁচবেন না।
"ডোরা এক সময় গুণীর কানের কাছে মুখ ঠেলে এনে বলল, "তুমি কী করে বুঝলে লবঙ্গ আসলে লবঙ্গ নয়, অন্য কেউ? আমি তো গন্ধ শুঁকে ধরেছি। বলো তো, লবঙ্গর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেচারিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিই, বলি, তুমি কে গো?'
"গুণী বলল, 'দাঁড়া ডোরা। গন্ধ শুঁকে ধরলেই তো হবে না, অকাট্য প্রমাণ

দিতে হবে। আগে বাটিটা লবঙ্গর পায়ে গিয়ে পৌছক। লোকে দেখুক, কীসে থেকে কী হচ্ছে!'

"সত্যি-সত্যিই লবঙ্গর পায়ের কাছে এসে বাটিটা থেমে গেল। লবঙ্গ তো ভয়ে কাঠ হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আজ কিন্তু বিষ্টু মজুমদার অন্ধেরই মতন চুপ করে রইলেন।

"গুণী বলল, 'আমি গুণলাল পাটনি, খেয়া দিই ত্রিমোহনী ঘাটে। তুমি কি ঘাট পারে যাও?'

"না।' বলে উঠল লবঙ্গ।

"আচ্ছা বেশ। তুমি কে? প্রশ্ন করল গুণী।

"উত্তর এল, 'লবঙ্গ।'

"তোমার চোখ ক'খানা?'

"দু'খানা। দুইটা চোখ। তুমি কি কানা নাকি?'

"বেশ। কান দুটি?'

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

"সবাই দুইটা-দুইটা? হাত দু'খানা? জবাব দাও।'

"কী দিব? আমি কি দুর্গা? আমি লবঙ্গ। দুইটাই হাত, দুশখানা পাব কোথা?'

"পা?"।

"তা-ও দুইখানা। সবাই দেখছে।'

"পিত্যেক হাতে কয়টা আঙুল?'

"পাঁচ।"

"পায়ে? ডান পায়ে কয়টা আঙুল?"

"পাঁচ। তুমি মশকরা করছ গুণিলাল!"

"না। বাঁ পাখানা দেখাও। কয়টা আঙুল? শাড়ির তলা থেকে বার করো পা।"

"হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল গুণিলাল, 'পা দেখাও। বার করো। দেখি কয়টা আঙুল। খেয়াপারে এই পা আমি দেখেছি। তুমি লবঙ্গ নও। এই দেখুন, বড়বাবু। আসুন, বাঁ পায়ে ছয়টা আঙুল। এ লবঙ্গ নয়। এর নাম দারুচিনি লবঙ্গ-দারুচিনি দুই বোন। যমজ। অবিকল এক দেখতে। পার্থক্য শুধু আঙুলে।'

"থানার বড়বাবু ছুটে এসে বাঁ পা বাড়িয়ে ধরা দারুর আঙুল দেখলেন। বাস্তবিক ছ'টা আঙুলই বটে। মধুবাবুও দেখলেন এবং শিউরে উঠলেন।

"জমিদারবাড়ির বধূরা আঙুল দেখে হতবাক। গুণিলাল বলল, 'এক সম আগে, এই দারুই ঘাট পারে যাওয়ার সময় বলেছিল, তার পায়ে ছ'টা আঙুল। কারণ নৌকায় ওঠার সময় আমি সেই পা দেখে ফেলি। দারু বলেছিল, তার

এক বোন মধুরকুলে থাকে। তার পাঁচটাই আঙুল। আমি থাকি সরিষাপুরে। পায়ে তফাত, গায়ে মুখে এক। সাতদিন আগে লবঙ্গ জামিদারি ছেড়েছে। নৌকায় উঠে বসলে, আমি তার বাঁ পায়ে লক্ষ করি, পাঁচটাই আঙুল। সকালে গেল লবঙ্গ, বিকেলে এল দারু। আচ্ছা, আপনি কি এ-ঘটনা জানতেন বিষ্টুবাবু!' বলেই বাটির দিকে চাইল গুণিলাল। বাটি নড়ে উঠল।

"বাটি নড়ে উঠে চলতে শুরু করল। দ্রুত বেগে ধেয়ে এসে হাবিলদারের পায়ের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"চাবিটা আপনার কাছেই আছে হাবিলদারবাবু। দিয়ে দেন। দারু আপনাকে সঙ্কেত-চাবি দিয়েছে। সিন্দুকের আশরফি মোহর আপনি আত্মস্মাৎ করতে চান।'

"না। চাবি আমার কাছে নেই গুণী। ডাকাতরা নিয়ে গেছে।'

"চাবি আপনার কাছে ছিল?"

"চুপ করে রইল বিষ্টু মজুমদার । মধুরবাবু এগিয়ে এলেন, 'শেষে তুই ডাকাতি করলি বিষ্টু? চাইলে কি আমি দিতাম না?"

"না, তুমি কিছুই দিতে না দাদা! আমি বাধ্য হয়ে দারুকে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু চাবি আমার কাছে নেই। সরিষাপুরের ডাকাতরা নিয়ে গেছে। চল দেখচ্ছি, কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে চাবি কাড়ল। ধাপ গুনে যাব। আসুন ও.সি সাহেব, ডাকাতদের আস্তানা দেখবেন।'

"হঠৎ গুণী প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বিষ্টুবাবু! দারুকে আপনি সরিয়ে দেওয়ার জন্য এত পেড়াপিড়ি করছিলেন কেন?"

"কেন করব না! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়েছে। আমাকে চড় মেরে চাবি কেড়ে নিয়েছে দারুর লোকেরা। কী ভুলই না করেছি দাদা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অত্যন্ত নীচ, লোভী।' বলে অন্ধ বিষ্টু মধুর পায়ে পড়ল।

অন্ধ হাবিলদার চলেছে ডাকাতদের আস্তানা দেখাতে। ধাপ গুনে তার কাজ। পুবে এত ধাপ, দক্ষিণে এত ধাপ, পশ্চিমে এত এবং উত্তরে এত। এভাবে পৌছনো গেল পুরনো জমিদারির বাগানে। ধাপ গুনে একটি মস্ত কোটরঅলা কাঁঠাল গাছের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিষ্টু।

"বিষ্টু বলল, 'এখানে খুঁজে দেখুন। এখানেই কোথাও পি.টি. ডিশ হয়তা লুকনো আছে। ডাকাতরা আমাকে মেরে চাবি কেড়ে নিল।'

"কোটরে কী আছে! পুলিশ সেখানে উঠে পি.টি. ডিশ পেড়ে নামিয়ে আনল। চাবি সেখানে নেই।

"জনস্রোত বাগান অবধি এসেছিল। একজন পুলিশ দারুকে বাগান পর্যন্ত

পাকড়ে টেনে এনেছিল।

"গুণিলাল দারুকে বারবার জেলা করতে লাগল—'বল, কোথায় চাবি?' দারু মড়াকান্না কাঁদতে লাগল, কিছুই বলতে পারল না। কেবলই একটা কথা তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছিল, 'লবঙ্গ আমাকে বলেছিল, ডোরাকে খেতে দিয়ে বারবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিবি, নইলে বেচারি খেতে চাইবে না। লবঙ্গর দোষ নেই দারোগাবাবু। হাত বুলাতে গিয়ে চাবিটা হাতে ঠেকল গুণিলাল! না হলে পাপ হয় না।'

"মধু মজুমদার চরম আশ্চর্য হয়েছেন। বললেন, 'এই ডিশ তুইই সরিয়ে রেখে কাজ ফতে করলি দারু? কে জানত, লবঙ্গ-দারুচিনি দুই বোন, যমজ । আঙুলের তফাত। দে দারু, চাবি দে।'

"কোথা থেকে দেবে দারুচিনি! বাগান থেকে ফিরে যাচ্ছিল জনস্রোত এবং পুলিশ। হঠাৎ পেছনে দেখা গেল, ডোরা বিষ্টুর ওপর মারাত্মক তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিষ্টুর জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন করে দিল। আঁচড়ে দিল নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে দিল। দেখতে দেখতে অর্ধনগ্ন বিষ্টুর কোমরে ডোরে বাঁধা লাল আংটার সাঙ্কেতিক চাবি চোখে পড়ে গেল। হাবিলদার পালাচ্ছিল, তার পালানোর ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, লোকটা অন্ধ নয়।

"মধুরবাবুর পায়ে তখনও ধরে পড়ে আছে দারু। ডুকরাতে ডুকরাতে বলে চলেছে, 'লবঙ্গর কোনও দোষ নাই বাবু! ওকে তাড়িয়ে দিও না, ভালবেসেও মানুষ কুকুরের গায়ে হাত বোলায় জমিদারবাবু। লবঙ্গ কিছু জানে না গুণী!' গুণী বলল, 'বাটির শেকড়েও সে-কথা লেখা আছে দারুচিনি।'"

সোনার পরীর মূর্তি রহস্য

নির্মলেন্দু গৌতম

সকালবেলা থানার সামনে পড়ে থাকা একটা অ্যামবাসাডার উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই গাড়ি নিয়ে যখন মাথা ঘামাচ্ছিলেন থানার অফিসার-ইন্-চার্জ ঠিক তখুনি পরিতোষ সামন্তর নিরুদ্দেশ হবার খবর নিয়ে ছুটতে ছুটতে থানায় এলো পরিতোষ সামন্তর বাড়ির দারোয়ান ব্রজকিশোর। গতকাল সন্ধ্যের পর ঝড়জলের মধ্যে নিজের গাড়ি চালিয়ে নিজেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন পরিতোষ সামন্ত। ব্রজকিশোরের ধারণা পরিতোষ সামন্তর সাঙ্ঘাতিক রকম কোন বিপদ ঘটেছে। না হলে তিনি এতোক্ষণে ফিরে আসতেন। থানার সামনে পড়ে থাকা অ্যামবাসাডার-এর সঙ্গে পরিতোষ সামন্তর একটা যোগ আবিষ্কার ক'রেই অফিসার-ইন-চার্জ তাকে নিয়ে এলেন গাড়ির কাছে। গাড়িটা দেখে প্রায় লাফিয়েই উঠলো ব্রজকিশোর।

বললো, 'এই তো তাঁর গাড়ি! ইস্, কাদায় এক্কেবারে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। গাড়িটাকে কোথায় পেলেন স্যার।'

গাড়িটা কোথায় পাওয়া গেছে জানিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ একবার ভালো ক'রে ব্রজকিশোরের মুখটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'এবার চলো, পুরো ঘটনাটা বলবে। কোন কথা লুকোবার চেষ্টা করবে না।' ব'লে ব্রজকিশোরকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই পুরো ঘটনাটা বলে ফেললো ব্রজকিশোর। বলাটা খানিকটা এলোমেলো হলো সেজন্যই। কিন্তু অফিসার-ইন্-চার্জের তা ঠিকমতো বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হলো না।

ব্রজকিশোরের বক্তব্য ঠিকভাবে দাঁড় করালে এরকম হয় ঃ

গতকাল সন্ধ্যে থেকেই আকাশে ঝড়ের মেঘ জমে উঠেছিল। সন্ধ্যের পর সেই মেঘ ছেয়ে ফেলেছিল গোটা আকাশটাকে। রাত হ'তেই শুরু হয়েছিলো তুমুল ঝড় বৃষ্টি। ওরকম ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে ব্রজকিশোর পেছন দিকে তার ঘরে চলে যায়। পরিতোষ সামন্তই তাকে সে কথা বলে দিয়েছেন। গতকাল রাতে ঝড়বৃষ্টি আর মেঘের ডাক শুরু হতে ব্রজকিশোর তার ঘরে চলে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে রান্নাবান্নাও সেরে নিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি থামতেই বাইরে এসে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল ব্রজকিশোর। চাতালে দু'দিন ধ'রে দাঁড় করানো পরিতোষবাবুর গাড়িটা নেই। বড় গেট হাঁ ক'রে রয়েছে। গাড়িটা সাধারণতঃ গ্যারেজেই তোলা থাকে। কিন্তু দু'দিন ধ'রে সেটা চাতালেই দাঁড় করানো ছিল। বড় গেটের একটা চাবিও চেয়ে নিয়েছিলেন পরিতোষবাবু। দু'টো চাবি আছে বড় গেটের। দুটোই থাকে ব্রজকিশোরের কাছে। সেই চাবি কি হঠাৎ কোথাও বেরোবেন বলে চেয়ে নিয়েছিলেন পরিতোষবাবু? কিন্তু ঝড় জলের মধ্যে তাকে না জানিয়ে কোথায় যাবেন তিনি? না, এরকমভাবে কখনও তিনি বাইরে যাননি। সাধারণতঃ রাতে তিনি গাড়িও চালান না। ঝড় জলের জন্যেই বোধহয় গাড়ির শব্দ পায়নি ব্রজকিশোর। বাড়িতে একাই থাকেন পরিতোষবাবু। তার এইরকমভাবে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে কারো কাছে জিজ্ঞেস ক'রে নেবার সুযোগও নেই।

ওপরে পরিতোষবাবু ঘরের কাছে এলে আলো নেভানো বন্ধ ঘর দেখে ব্রজকিশোর স্পষ্টই বুঝেছিল, পরিতোষবাবু এমন কোন খবর পেয়েছেন টেলিফোনে যে কোন কিছু ভাববার আর সময় পাননি। হয়তো খবরটা পাবার জন্য অপেক্ষাও করেছিলেন। সেজন্য গাড়িটা দু'দিন ধ'রে চাতালে রেখে দিয়েছিলেন, গেটের একটা চাবিও চেয়ে নিয়েছিলেন ব্রজকিশোরের কাছ থেকে। তবু মনের ভেতর একটা দুশ্চিন্তা ব্রজকিশোরকে ব্যস্ত ক'রে তুলছিল। সারারাত জেগেই কাটিয়ে দিয়েছিল ব্রজকিশোর। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে সোজা চলে এসেছে থানায়।

ব্রজকিশোরের বলা পুরো ঘটনাটা একবার ঠিকঠাক গুছিয়ে ভেবে নিয়ে অফিসার-ইন্-চার্জ উঠে পড়লেন। বললেন, 'চলো, আমি নিজেই একবার যাবো পরিতোষবাবুর বাড়িতে। সরেজমিনে একবার দেখে না এলে হবে না।' ব'লেই ব্রজকিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। বাইরে থানার জিপ দাঁড়িয়েছিল। বাইরে এসে দু'জন কনস্টেবল আর ব্রজকিশোরকে নিয়ে উঠে পড়লেন জিপে। পরিতোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে বাড়ির চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। তারপর ব্রজকিশোরকে নিয়ে উঠে এলেন ওপরে। পরিতোষবাবুর ঘর ভেতর থেকে যে বন্ধ নয়, দরজাটা ঠেলতেই তা বোঝা গেলো।

'এটাই আমি ভেবেছিলাম—' বলে পরিতোষবাবুর ঘরে ঢুকে পড়লেন অফিসার-ইন্-চার্জ। তারপর ঘুরে ঘুরে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে থাকলেন ঘরটাকে।

ঘরের মধ্যে নানান রকমের আসবাবপত্র রয়েছে। বেশ দামীই সেগুলো। জানালার পাশেই মস্ত বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কাগজপত্র, টাইপরাইটার মেসিন, বই ইত্যাদিতে ঠাসা সেই টেবিলের ওপরটা। অফিসার-ইন্-চার্জ এগিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে ওলটপালট করলেন কাগজপত্রগুলো। কিছু কিছু কাগজ পড়ে দেখলেন। না কোথাও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবার ব্যাপারে কোন সূত্র পেলেন না। কি ভেবে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা টানলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখলেন ডাকে আসা একটা খাম। কেন জানি তার মনে হলো, এই খামটা থেকে কোন খবর পাওয়া যেতে পারে। খামের ওপর পরিতোষবাবুর নাম ঠিকানা টাইপ ক'রে লেখা। খামের ওপরে ডাকের ছাপটা দেখলেন। কলকাতা সাতাশ থেকে তিন দিন আগে পোস্ট করা হয়েছে খামটা। গত পরশুদিন তিনি খামটা পেয়েছেন। দ্রুতহাতে খামখানা খুলে চিঠিখানা বের করলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। টাইপ ক'রে লেখা চিঠি। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই তিনি পড়ে ফেললেন চিঠিখানা। পড়েই লাফিয়ে উঠলেন। পরিতোষবাবুর নিরুদ্দেশ হবার সঠিক কারণটা তিনি খুঁজে পেয়েছেন এবার। বুঝতে পারলেন, পরিতোষবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়াটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়।

যে চিঠিখানা লিখেছে, সে তার নাম লেখেনি। চিঠিখানা এরকম ঃ 'প্রিয় পরিতোষবাবু, আমি যে কোন মুহূর্তে আসবো। চিঠি পাবার পর আর বাইরে বেরোবার চেষ্টা করবেন না। টেলিফোনও করবেন না কাউকে। যদি আমাকে আমার কাজটি করতে বাধা দেন, তাহলে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। সে যাওয়াটা খুব সুখের হবে না আপনার পক্ষে। যে জিনিসটির জন্য আমি যাচ্ছি আপনার কাছে, সে জিনিসটি এখন আপনার কাছে সবচাইতে দামী। জিনিসটি আমার জন্য বাইরেই রাখবেন। আমার যেন সময় নষ্ট না হয়। ইতি।' পুনশ্চঃ গাড়িটা চাতালেই রাখবেন। তার মানে কিছু একটা মূল্যবান জিনিস ছিল পরিতোষবাবুর

কাছে মূল্যবান জিনিসটাই নিতে এসেছিলো কেউ। পরিতোষবাবু বাধা দিয়েছিলেন। তার ফলে পরিতোষবাবুর পক্ষে ভালো হয়নি। কিন্তু চিঠিখানা নিয়ে কেন থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি পরিতোষবাবু?' সত্যিই তাহলে চিঠি পেয়ে ভয়ে থানার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেননি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলো ব্রজকিশোর। তার দিকে ফিরে অফিসার-ইন্-চার্জ বললেন, 'আচ্ছা, দু'দিন কি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোননি পরিতোষবাবু?' ব্রজকিশোর বললো, 'না'।

দু'দিন কি পরিতোষবাবু চিন্তিত ছিলেন? ফের জিজ্ঞেস করলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। ব্রজকিশোর একথার উত্তর দিতে পারলো না। তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না অফিসার-ইন্-চার্জ। চিঠিখানা পকেটে পুরে তিনি বেরোলেন ঘর থেকে। এই মুহূর্তে আর কিছু করবার নেই তাঁর। থানায় গিয়ে এখন পরিতোষবাবুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো মুশকিল। নানান দিক থেকে পুরো ঘটনাটাকে ভাবতে ভাবতেই তিনি থানায় ফিরলেন। অফিসার-ইন্-চার্জের কাছেই অমল পুরো ঘটনাটা শোনা হতো না। থানায় যাওয়া আসা করতে করতেই অফিসার-ইন্-চার্জের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে অমলের। অমল যে শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়, রহস্য-টহস্য নিয়েও যে মাথা ঘামায়, অফিসার-ইন্-চার্জ তা জানেন। সেজন্য রীতিমতো খাতিরও করেন অমলকে। পুরো ঘটনাটা শোনাবার পর চিঠিখানা অমলকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'পরিতোষবাবুর উধাও হ'য়ে যাওয়া সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় বলুন তো?'

'আপাততঃ আপনার যা মনে হচ্ছে, আমারও তাই মনে হচ্ছে।' একমুহূর্ত ভেবে অমল বললো।

অফিসার-ইন্-চার্জ বললেন, 'তাহলে একটা প্রশ্ন করবো?'

'করুন।' অমল সহজ গলায় বললো।

অফিসার-ইন্-চার্জ বললেন, 'পরিতোষবাবুর ঘরে একটা টেলিফোন আছে। তিনি ঘর বন্ধ ক'রে টেলিফোন করলে কেউ টের পেতো না। তবু তিন টেলিফোন করেননি কেন থানায়?'

'বোধহয় বেশী রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হয়তো ভেবেছিলেন, পুলিশ এলে আরো অনেক বেশী বিপদ ঘটবে তাঁর।' অমল বললো। কি যেন ভাবলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। তারপর বললেন, 'যে মূল্যবান জিনিসটির জন্য তাঁর এই বিপদ, সে জিনিসটি রক্ষা করবার চেষ্টার জন্যই কি তাঁর থানায় যোগাযোগ করা উচিত ছিলো না? তা না করে তিনি তাঁর গাড়িটাকে পর্যন্ত চাতালে সাজিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

কথাটা শুনেই চমকে উঠলো অমল। তাইতো, এর মধ্যেই তো পুরো রহস্য লুকিয়ে আছে। নড়ে চড়ে বসলো অমল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ডুবে গেলো ভাবনার মধ্যে। কিছু একটা বুঝি খেলে গেলো মাথায়। অফিসার-ইন্-চার্জের দিকে তাকিয়ে বললো। 'এ প্রশ্নের উত্তর এখন দেবো না। তবে এই প্রশ্নটার মধ্যেই সম্ভবতঃ তাঁর উধাও হ'য়ে যাবার রহস্য লুকিয়ে আছে।'

'সেটা কি রকম?' কৌতূহলে, উত্তেজনায় টান টান হ'য়ে উঠলো অফিসার-ইন্-চার্জ।

'সম্ভবতঃ কাল আপনাকে সেটা বলতে পারবো।' অমল বললো। নানান কথা ভাবতে ভাবতে আরো কিছু সময় অফিসার-ইন্-চার্জের সঙ্গে গল্প ক'রে উঠে পড়লো অমল। থানা থেকে বেরোবার সময় পরিতোষবাবুর কাদায় মাখামাখি গাড়িটা একবার দেখে নিলো অমল। স্পষ্টই বোঝা যায়, অনেকটা রাস্তা কাদায় জলে গাড়িটা ঘুরেছে।

কাল সকালবেলা একবার পরিতোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে ব্রজকিশোরের সঙ্গে কথা বলে আসতে হবে। আজ এখুনি একবার গেলে হতো। ভাবলো অমল। কিন্তু আজ বাড়ি ফিরে জরুরী একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে থাকলো অমল। রাত্তিরে একটা টেলিফোন পেলো অমল। থানা থেকে অফিসার-ইন্-চার্জ টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন ধরতেই তিনি বললেন, 'পরিতোষবাবু এইমাত্র ফিরেছেন। এখন থানায়। আপনাকে এক্ষুনি একবার আসতেই হবে।' হিসেবটা তাহলে মিলে গেছে। মনে মনে কথাটা ভেবেই অমল বললো, এক্ষুনি আসছি।'

টেলিফোন নামিয়ে কোনরকমে পোশাক পাল্টে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিলো অমল। তারপর সোজা চলে এলো থানায়। অফিসার-ইন্-চার্জের সঙ্গে বসেই কথা বলছিলেন পরিতোষবাবু। অমল ঢুকতেই শ্রান্ত ক্লান্তভাবে তিনি অমলের দিকে তাকালেন। রিপোর্টার হিসেবেই অফিসার-ইন্-চার্জ তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অমলের।

পরিতোষবাবুকে দেখে এই মুহূর্তে ভারি কষ্ট হচ্ছে অমলের। জামা প্যান্ট গাড়িটার মতোই কাদায় মাখামাখি হ'য়ে আছে। এলোমেলো হ'য়ে আছে চুল। জামা প্যান্টও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। পায়ে জুতো নেই। চোখের কোণ কালো হ'য়ে আছে। মুখে একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরিতোষবাবু থানায় এসে যা যা বলেছেন, অফিসার-ইন্-চার্জ পুরোটাই বলে ফেললেন অমলকে। ঝড়ের সন্ধ্যায় পরিতোষবাবু থানায় এসে যা যা বলেছেন, অফিসার-ইন্-চার্জ পুরোটাই বলে ফেললেন অমলকে। ঝড়ের সন্ধ্যায় পরিতোষবাবুর ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ ক'রে বসেছিলেন।

চিঠিখানা পেয়ে সত্যিই ভয়ে কোথাও বেরোননি দু'দিন। থানায়ও খবর দেননি। গাড়িটা চাতালেই রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন তাকে সামনে পেলে যে ক'রেই হোক ঠেকিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে যে মূল্যবান জিনিসটি আছে সেটি একটি সোনার পরীর মূর্তি। মূল্যবান পাথর দিয়ে তাঁর অলঙ্কার গড়ানো। একটা বড় হীরে বসানো তার মাথার মুকুটে। সেই হীরের দাম এখন লাখ টাকার ওপর। পরীটা পরিতোষবাবুদের পারিবারিক জিনিস। কিন্তু এখন সেটা কার কাছে থাকবে এ নিয়ে সমস্যার তৈরি হয়েছে। উত্তরাধিকারী হিসেবে দাদার বড় ছেলে দাবী করেছে পরীটার ভাগ। ছোট ভাইয়ের মেয়েও দাবী করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত পরীটা বিক্রি ক'রে দেবার ব্যাপারটাই ঠিক হয়েছে। যিনি এটি কিনবেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বড় ভাইপো আসবে। তার সঙ্গে বসেই টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক হবে। যিনি মূর্তিটা কিনবেন, তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়েছে।

এসব ব্যাপার তাদের পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ জানে না। ঝড়ের সময় দরজায় টোকার শব্দে তিনি ভেবেছিলেন, দারোয়ান ব্রজকিশোর কিছু বলতে এসেছে। ওরকম ঝড়ের সন্ধ্যায় আসল লোকটি আসবে, এটা তিনি ভাবতেই পারেননি। লোকটি ঘরে ঢুকতেই তাঁর বুকের ওপর পিস্তলটি চেপে ধরেছিলো। তারপর তাকে দিয়েই লকার খুলিয়ে তুলে নিয়েছিলো পরীর মূর্তিটা। মূর্তিটা নেবার সময় প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অসুরের মতো লোকটির শক্তি। তাই কিছু করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। সেই বাধা দেবার জন্যই পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে বাইরের চাতালে এনেছিল লোকটি। তাঁর গাড়িতেই তাঁকে তুলে নিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো তা বুঝতে পারেননি পরিতোষবাবু। তাছাড়া গাড়ির কাঁচ ছিল বন্ধ। সামনের কাঁচের ওপর এতো জল পড়ছিল যে রাস্তাও ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলেন না পরিতোষবাবু।

একটানা গাড়ি চালিয়ে সেই লোকটি একটা নির্জন ঝিলের ধারে এনে তাঁকে নামিয়ে জোর করেই ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ঝিলের জলে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পাড়ে উঠে এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। ভোরবেলা জ্ঞান ফিরে আসতে কোনরকমে পথ চিনে হেঁটেই চলে এসেছেন। পকেটে যেমন বাসে ফেরার পয়সা ছিল না, তেমনি বিনা ভাড়ায় বাসে ফিরতে গেলে লোকজন পাগল ব'লেও নামিয়ে দিতে পারতো বাস থেকে। এতো রাত পর্যন্ত পেটে শুধু জল ছাড়া আর কিছু পড়েনি। লোকটির চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন পরিতোষবাবু তাতে লোকটিকে ভয়ঙ্কর লোক ব'লেই মনে হয়। লোকটির বাঁ গালের ওপর একটা জড়ুল আছে। বৃষ্টির ভেতরেও সে নীল কাঁচের চশমা পরেছিলো। ওরকম চেহারার লোক পরিতোষবাবু জীবনে কখনও দেখেননি। পুরো গল্পটা অফিসার-ইন-চার্জের মুখে

শোনার পর অমল ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকা গলায় বললো, 'বলুন কি মনে হচ্ছে আপনার?'

'মনে হচ্ছে লোকটি পরিতোষবাবুর ভাইপো অথবা যিনি পরীমূর্তিটি কিনতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠানো লোক।' অফিসার-ইন-চার্জ বললেন। অমল বললো, 'কেন?'

'ভাইপো পরীর মূর্তি বিক্রি করার ব্যাপারে আসবার কথা জানিয়ে নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখতে চেয়েছে। লোকটি কিনতে চেয়ে সন্দেহের বাইরে রেখেছে নিজেকে। এই মুহূর্তে এরা দু'জন ছাড়া আর কেউ পরীমূর্তিটি নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না।' অমল কথাটা শুনলো। হাসলো একটুখানি। তারপর বললো, 'এদের দু'জনের কারো লোকই নয় সে।'

চমকে উঠলেন অফিসার-ইন্-চার্জ। অসহায় ভাবে অমলের দিকে ফিরলেন পরিতোষবাবু।

'কথাটা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন।' ফের বললো অমল। অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, 'তাহলে?'

'সেটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। পরিতোষবাবু, আপনার কি ধারণা বলুনতো?' শেষ কথাটা পরিতোষবাবুকে বললো অমল।

পরিতোষবাবু অসহায়ভাবে বললেন, 'এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।'

'তাহলে আপনাকে কতকগুলো প্রশ্ন করি। দেখবেন, ধারণাটা স্পষ্ট হ'য়ে যাবে।' সহজ গলায় বললো অমল।

পরিতোষবাবু বুঝি ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু অবাক হলেন অফিসার-ইন-চার্জ। একমুহূর্ত থেমে বললো, 'এভাবে একটা ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা থাকলে প্রথমেই সবাই দারোয়ানকে সতর্ক ক'রে দেয়। আপনি কি তা করেছিলেন।'

'না, মানে—' কিছু একটা বলতে গিয়েও বুঝি বলতে পারলেন না পরিতোষবাবু।

অমল আর মানেটা শুনতে চাইলো না। বললো, 'আপনি ধ'রে নিয়েছিলেন লোকটির হাতে পরীর মূর্তিটা তুলে দিতেই হবে। বলুন, ঠিক বলেছি কি না।'

'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।' পরিতোষবাবু আরো বুঝি বিপন্ন হলেন।

'খুব সহজ ব্যাপার এটা বোঝা। মূর্তিটাকে রক্ষা করবার জন্য আপনার যা যা করা প্রয়োজন ছিলো, আপনি তার কিছুই করেননি। লোকটিকে যে ঠেকাতে পারবেন না একা, সেটাও আপনি জানতেন। কারণ যে লোকটি আসবে, সে যে তৈরি হয়েই আসবে, সেটাও আপনার অজানা নয়। তার জন্য দারোয়ানের কাছ থেকে বড় গেটের চাবিটা পর্যন্ত নিয়েছিলেন। এবার বলুন, বুঝতে পারছেন কি না।'

অমল গুছিয়ে বললো।

কোন উত্তর দিতে পারলেন না পরিতোষবাবু। অফিসার-ইন-চার্জের মুখের দিকে তাকালো অমল। অমল যে কি বলতে চাচ্ছে তিনিও বুঝি তা বুঝতে পারছেন না।

'আচ্ছা, আপনার গাড়িটা যে ঠিক থাকবে, আর মূর্তিটা নিয়ে যাবার সময় যে সেই গাড়িতে আপনাকেও নিয়ে যেতে পারবে, এটা কি ক'রে সে আগে থেকেই ভেবে ফেলেছিলো?' অমল রীতিমতো গুছিয়ে জিজ্ঞেস করলো এবার।

মুখ নীচু ক'রে অসহায় উত্তেজনায় বুঝি হাঁপাতে থাকলেন পরিতোষবাবু। অমল আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। তার আগেই পরিতোষবাবু প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'প্লিজ, আমি এখন ক্লান্ত। পরে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো।'

অমল স্থিরভাবে তাকালো পরিতোষবাবুর দিকে। তারপর বললো, 'আপনাকে আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না।'

অমলের কথাটা বুঝি বুঝতে পারলেন না অফিসার-ইন্-চার্জ। অমল এবার মনে মনে গুছিয়ে ফেললো পুরো ব্যাপারটা। তারপর বললো, 'এই প্রশ্নগুলো থেকে কি বোঝা গেলো বলুন তো?'

পরিতোষবাবুর দু'চোখে অসহায়তা ফুটে উঠলো। চেয়ারসুদ্ধ বুঝি তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন এবার।

অমল বললো, 'আপনি চিঠি-পাঠানো লোকটিকে মূর্তিটি দিতেই চেয়েছিলেন। কারণ চিঠির কথা কাউকে জানাননি। গাড়ি বের করতে হবে ব'লে গেটের একটা চাবি চেয়ে রেখেছিলেন ব্রজকিশোরের কাছ থেকে। ঘুণাক্ষরেও বিপদের কথাটা ব্রজকিশোরকে বলেননি। আর—'

'আমি তাকে মূর্তিটা দিতে চাইবো কেন?' বিপন্ন গলায় বললেন পরিতোষবাবু। অমলকে পুরোকথা শেষ করতে দিলেন না।

'পুরো মূর্তিটাই তো তাহলে আপনার হবে।' অমল বললো সঙ্গে সঙ্গে। লাফিয়ে উঠলেন পরিতোষবাবু। বললেন, 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'এবার তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, সেই চিঠি পাঠানো লোকটি আপনি নিজেই!' অমল সহজ গলায় বললো।

'সেকি, আমি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে এসব করতে যাবো কেন!' আত্মরক্ষার জন্য দারুণ রকম চেষ্টা করতে থাকলেন পরিতোষবাবু।

'তাহলে যে আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না। ভাইপোকে মূর্তিটা ভাগ দেবার জন্য আর বিক্রিও করতে হবে না মূর্তিটা। ভয় নেই, চিঠিটা যে আপনারই নিজের হাতে টাইপ করা এবং নিজেরই মেসিনে, তা প্রমাণ করতে আমাদের একটুও সময়

লাগবে না। চিঠির কাগজ আর খাম যে আপনার নিজেরই, সেটাও প্রমাণ হ'য়ে যাবে। কারণ এ চিঠিতো অন্য কাউকে দিয়ে আপনি টাইপ করাতে পারেন না। টাইপ করবার সময় অন্য কোন জায়গা থেকে কাগজ আনবার প্রয়োজনও সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আপনার মাথায় আসতে পারে না। অমল একটানা কথাগুলো বললো।

অফিসার-ইন্-চার্জ এতোক্ষণে বললেন, 'ঠিক, আপনার টেবিলের ওপর আমি একটা টাইপ রাইটার মেসিন দেখেছি।' অমল পরিতোষবাবুর দিকে খানিকটা ঝুঁকে এবার বললো, 'কোন অপরাধী অপরাধ ক'রে থানার কাছাকাছি কখনই আসে না। না আসবার কারণ তার অবচেতন মনের ভয়। এক্ষেত্রে অপরাধীর পক্ষে গাড়িটা কোন নির্জন জায়গায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়াই উচিত ছিলো। অথচ থানার সামনে সে গাড়িটা ফেলে রেখে গেছে। এটাও আপনার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।'

অফিসার-ইন্-চার্জ অবাক হয়ে বললেন, 'কি ক'রে?'

'গাড়িটা কোন নির্জন জায়গায় ফেলে এলে গাড়িটার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। থানার সামনে ফেলে রাখলে তাড়াতাড়ি পুলিশের নজরে পড়বে আর গাড়িটা থানার পাহারাতেই থাকবে। অপরাধবোধ পরিতোষবাবুর মধ্যেও আছে। কিন্তু তিনি তো জানেন, যেভাবে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে সাজিয়েছেন, তাতে তাকে কেউ অপরাধী ভাববে না।' ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলো অমল।

অসহায় পরিতোষবাবুর মাথা এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। অমল অফিসার-ইন্-চার্জের দিকে তাকিয়ে বললো, ''গাড়ির স্টিয়ারিঙের ওপরের আঙুলের ছাপ দেখলেই বোঝা যাবে গাড়িটা পরিতোষবাবু চালাচ্ছিলেন কিনা।'

'আঙুলের ছাপ নিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোতে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অফিসার-ইন্-চার্জ বললেন সঙ্গে সঙ্গে। মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন পরিতোষবাবু। অভিমানে, দুঃখে অসহায়ভাবে কান্নাঝরা গলায় বললেন, 'আপনি রিপোর্টার নন্, গোয়েন্দা। আগে যদি জানতাম তাহলে কখখনো থানায় আসতাম না।'

মুহূর্তের জন্য থেমে ফের বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক লোক আপনি। যাযা করেছি, ভেবেছি, সব ধ'রে ফেলেছেন।' 'আরো একটা জিনিস ধ'রে ফেলেছি। সোনার পরীর মূর্তিটা আপনার কাছেই আছে।' চাপা কৌতুকে বললো অমল।

'থাকবেই তো। আমাদের পরিবারের জিনিস তো আমার কাছেই থাকবে। এই যে দেখুন-'বলেই জামার ভেতর থেকে অসাধারণ সেই সোনার পরীমূর্তিটি বের করলেন পরিতোষবাবু।

'দারুণ জিনিসটা তো!' মুগ্ধ গলায় বললো অমল।

অফিসার-ইন্-চার্জ বললেন, 'এরকম একটা মূর্তির জন্য আপনি যা করেছেন,

তা কখনোই অন্যায় নয়।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষবাবু বললেন, 'যদি অন্যায় না হয়, তাহলে গাড়িটা আমায় দিয়ে দিন। আমি চলে যাই। মূর্তি নিয়ে আর কখনো এরকম ঘটনা ঘটাবো না। অন্ততঃ অমলবাবু থাকতে। এভাবে আর এখানে বসে থাকতে পারছি না। সারাদিন এই পোশাক পরে এভাবে থাকা যায়!'

অফিসার-ইন্-চার্জ আর অমল এবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। সত্যি, আর না হেসে পারে দু'জন!!
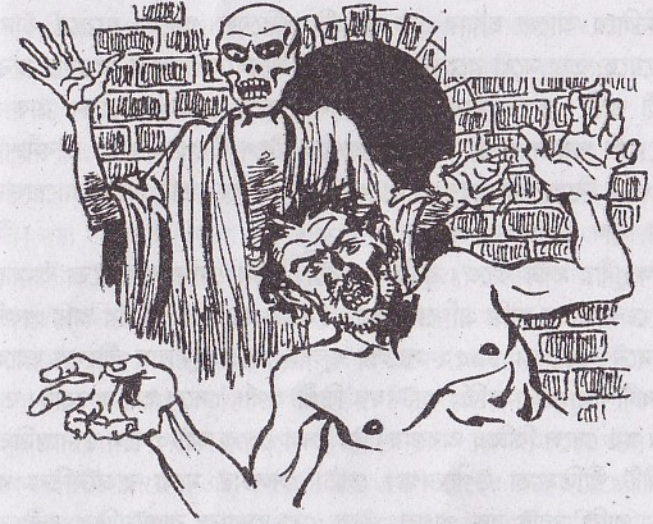
যক্ষপুরীতে গোয়েন্দা

শহীদুল্লা কায়সা

বন্দীর রাত্রি। কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না। প্রহরগুলো ভারী পাথরের মতো চেপে থাকে বুকের উপর। গেরস্তবাড়িতে যেমন করে হাঁস মুরগী গুলোকে বেলা ডুবতে না ডুবতেই খোঁয়াড়ে পুরে দেয় তেমনি করে সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটাতেই আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গারদের মধ্যে।

সময় ভক্ষণ করার সম্ভাব্য সকল উপকরণই মজুদ। ক্যারাম-তাস-দাবা, বই পড়া, আড্ডা মারা সবই চলে। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সময় বড় আস্তে চলে। মনে হয় রাত্রিগুলো নিষ্করুণ দীর্ঘ। জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে নয়টা বেজে গেল। এরই মধ্যে মনে হয় নিশুতি রাত্রির প্রেত নেমে এসেছে এই যতু-গৃহে। কুয়াশা ঢাকা চাঁদের আলো যেন মৃতের উপর কাফিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁচু বট গাছটির যে ছায়া দেখা যায় হঠাৎ মানুষ বলে ভ্রম

হয়। অদূরে তীব্র সার্চলাইটের আলোকে কেন্দ্র করে সহস্র পতঙ্গের মৃত্যু তাণ্ডব চলছে। আমার জানলার সামনে সেই সার্চলাইটের তির্যক রশ্মি কুয়াশাচ্ছন্ন ফিকে জোৎস্না, বটের ছায়া, সরু রাস্তাটির লাল সুরকী, সবুজ ঘাসের নাতিদীর্ঘ চত্বর সব মিলিয়ে আলো ছায়ার এক মায়াবি পরিবেশ। আলো রয়েছে, চাঁদ রয়েছে, ঘর রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মানুষ। সেই মানুষকে পাহারা দেওয়ার জন্য রয়েছে সিপাহী শান্ত্রী। তবুও মনে হয় এ যেন ভুতুড়ে রাজ্য। সারাক্ষণ এক মরণযজ্ঞ চলছে। কী ভয়াল শক্তি সারাক্ষণ প্রাণকে টিপে টিপে মারছে। জীবনীশক্তি পলে পলে শুষে নিচ্ছে। মানুষের আত্মাকে পীড়ন করছে। তাই এতো আয়োজন। এতো আলো, চাঁদ জ্যোৎস্নার কাফিন।

যক্ষপুরীর ঘণ্টা বাজে। রাত্রি এগারটা। স্টীম রোলারের মতো আমাকে পিষে পিষে জেলখানার রাত্রি এগিয়ে চলেছে। সাড়ে ছয় বছর পূর্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়লো। ১৯৫২ সালের জুলাই মাস। মুসলিম লীগের জালেম শাহী যুগ। বন্দীশালাগুলো ভর্তি। আটনম্বর ডিগ্রী অর্থাৎ সেলে আটক আছি। তার আগে ছিলাম ছয় সেলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ছয় সেল থেকে আট সেলে স্থানান্তরিত হওয়ার কাহিনীটি রীতিমতো উপভোগ্য। গোটা সেলটার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী মাত্র দু'জন। বাকি সবাই বদ্ধ পাগল। একে তো অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় মন মেজাজ খারাপ। খেলবার ব্যবস্থা নেই, বেড়াবার বন্দোবস্ত নেই, সেলের দেয়ালের মধ্যেই কুঠুরীগুলোর সামনে তিন হাত চওড়া দশ হাত লম্বা একটুখানি সিমেন্টের চত্বর। সেই চত্বর থেকে এক ফালি আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখবার জো নেই। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে আটক থেকে মন যায় হাঁপিয়ে, একটু বাতাস, একটুখানি আলোর জন্য সে কী আকুতি। লাল ইঁটের দেয়ালে আঘাত খেয়ে চোখ আসে ফিরে। একটি সবুজ পাতা অথবা সেলের বাইরের সবুজ ঘাসের উপর একবার দৃষ্টিটুকু বুলিয়ে আনার জন্য গেট পাহারার প্রতি কতো আকুল আবেদন করতাম। সে আবেদন ব্যর্থ হতো।

এর উপর ছিল পাগলগুলোর নিত্য নৈমিত্তিক অত্যাচার। খেতে বসেছি চট করে দৌড়ে এসে তরকারীর বাটিটা নিয়ে চলে গেল। বসে আছি হঠাৎ দিগম্বর হয়ে নাচতে শুরু করলো। কুঠুরীর বাইরে গিয়েছি, ফিরে এসে দেখলাম সেই ফাঁকে সমস্ত বিছানাপত্র ডুবিয়ে রেখেছে চৌবাচ্চার মধ্যে। এমনি হাজারো ধরনের উৎপাত প্রতিদিনই লেগে থাকতো।

বিভিন্ন পাগলের বিভিন্ন ধরনের উৎপাত চলতো। একজনের নাম ছিল গোলাম হোসেন। তার এই হাসি এই কান্না। হাসি কান্নার মাঝে সারাক্ষণ হিন্দী সিনেমার গান চলতো উচ্চস্বরে। আর একজনের নাম ভুলে গেছি। তার বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু

হাসি। কখনো মিহি কণ্ঠে, কখনো উচ্চস্বরে, কখনো বা নিঃশব্দে।

তৃতীয় পাগল ছিল জনৈক মাদ্রাজী সাধু। সাধু বলছি তার গৈরিক বসনের জন্য। ইনি ছিলেন চির মৌন। বোমা মারলেও তার মুখ দিয়ে কদাচিত কথা বের হতো না। তিন পাগলের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সত্বেও পাগলামি আর উৎপাতের ক্ষেত্রে তাদের জাত ধর্ম ছিল এক। একসাথেই তারা মারামারি করতো। একসাথেই আমাদের উপর হামলা করতো।

সেলের নিঃসঙ্গতা আর পাগলের উৎপাতে অচিরেই আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আমরা অন্যান্য রাজ বন্দীদের সাথে ওয়ার্ডে থাকতে চাইলুম। কর্তৃপক্ষ গররাজী। দয়া দরবারে বিফল হয়ে রাজবন্দীদের একমাত্র অস্ত্র অনশনের নোটিশ দিলুম। নোটিশ দিয়ে দু'জনে খাবার বন্ধ করে দিলুম। সারাদিন না খেয়ে রইলুম। কারাপালদের কারো টিকিটি দেখলুম না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় জমাদার এসে খবর দিল আমাদের দাবী মঞ্জুর। বিছানাপত্র বেঁধে আমরা অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে মিলিত হবার জন্য মহা ফুর্তিতে ইয়ার্ডের দিকে রওয়ানা হলুম। কিন্তু গিয়ে পৌছালুম আট নম্বর সেলে। সেখানে অতিরিক্ত কারাপাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, এই ব্যবস্থাটি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য হয়েছে। তারপরই আমাদের ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে বেড়াবার অধিকারটুকু তারা আমাদের দেবেন। আট সেলের বাইরে আমরা সকালে আধা ঘণ্টা এবং বিকেলে আধা ঘণ্টা বেড়াতে পারবো। সেদিনকার ঐ নিষ্ঠুর কৌতুকে একচোট হেসে নিয়েছিলুম।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিভীষিকা হলো আট সেল। ফাঁসির ডিগ্রী, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের এখানে রাখা হয়। সেলের সংলগ্ন ফাঁসির মঞ্চ। জেলখানার অধিবাসীরা এই ডিগ্রিটিকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখে। পুরানো কয়েদীরা নূতন কয়েদীদের মনে ভীতির সঞ্চার করার জন্য এই ডিগ্রীর কথা বলে। জমাদার-সিপাহী কয়েদীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য এই ডিগ্রীর নাম করে শাসায়। এই ডিগ্রীকে কেন্দ্র করে নানা সম্ভব অসম্ভব গল্প প্রচলিত আছে। জেলে ঢুকলে পুরানো কয়েদীদের মুখে ঐ সব গল্প শুনতে হয়। এই ডিগ্রীতে যারা যায় তারা নাকি আর জ্যান্ত ফিরে আসে না। এই ধারণাটা নূতন কয়েদীদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়। ইয়ার্ডে না যেতে পারলেও অনশনের ঠেলায় কারাকর্তৃপক্ষের নেক নজরে পরলুম। সেই নেক নজরের ফলে মৃত্যু গুহাটি দেখে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল। বেশ একটু রোমাঞ্চ অনুভব করলুম। লক্ষ্য করলুম সেলটির আশেপাশে কোন আবাসগৃহ নেই। পেছনে দেওয়াল। সামনে কাঠের কারখানা। ডান পাশে ফাঁসির মঞ্চ। বা-পাশে গুদাম। সামনের কারখানা ঘরটির ছাদ ছাড়িয়ে একটি উঁচু

বটগাছ। সেই গাছের ডালেডালে কাক, শকুন আরো বিভিন্ন ধরনের পাখির বাসা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। আমরা কয়েক জন ছাড়া আশেপাশে জন-মানুষের সাড়া নেই। কিন্তু কাক শকুনের কোলাহলে বট বৃক্ষটি সজাগ। ফাঁসীর মঞ্চটি এক নজর জরিপ করে দরজার ভিতরে আসছি এমন সময় আমাদের বুড়ো ফালতু সুবু মিঁয়া চোখের ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিলে। হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে খুব নিচু কণ্ঠে অন্তরঙ্গ হয়ে বললে একটু সাবধানে থাকবেন সাহেব। রাত্রে জিন প্রেত আসে। তারপর সুরা ইয়াসীনের প্রথম দু'টি লাইন আবৃত্তি করে বললে যখনই ভয় আসবে মনে তখুনি এই কলোমটা পড়বেন। সুবু মিঁয়ার ভীত সন্ত্রস্ত চোখ মুখ দেখে মায়া হলো। সাহস দিয়ে বললাম ও সব বাজে কথা, কুসংস্কার। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে হাত মুখ নাড়তে নাড়তে জবাব দিলো, বলেন কি সাহেব। অমন কথা মুখেও আনবেন না। তার সাথে তর্ক বৃথা। আলোচনাটার ইতি টেনে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে। আসুক না জিন প্রেত তখন দেখা যাবে। সুবু মিঁয়া হাল ছেড়ে দিয়ে সুরা ইয়াসীন পড়তে পড়তে চলে গেল খাবার ভাগ করতে। সেলের মধ্যে ঢুকে সত্যি গাটা ছমছম করে উঠলো। মনে হলো বহুদিনের পরিত্যক্ত কোন পোড়োবাড়িতে এসে পড়েছি। জানালাবিহীন কুঠুরীগুলো কবরের মতোই ক্ষুদ্র আর ভয়াল। আমার মতো বেঁটে লোককেও ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলো মাথা ঝুঁকিয়ে। নীচু ছাদটির দিকে তাকালে মনে হয় যে, কোন সময় বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বে গায়ের উপর। কুঠুরীতে গিয়ে যখন দেখলুম ঘরে বসে এক টুকরো আকাশ দেখারও কোন উপায় নেই। তখন কান্না পেলো। এই মৃত্যু গুহায় কেমন করে দিন কাটাবো? কতোদিন এই কবরে জীবনমৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে? দুঃসাহসের শরণাপন্ন হলুম। যখনই দুর্যোগের মুখে পড়েছি তখুনি দেখেছি মনের এই দুঃসাহসী সত্তাটি আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এই সত্তাটি সহজাত কিনা জানি না। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে এর অস্তিত্ব অনুভব করি না। কিন্তু অন্ধকার দুর্যোগে আশা দীপের মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে। এই সত্তার কোন আকরিক রূপ বা ব্যাকরণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। মনের এই বিশেষ অবস্থায় সুতীব্র ঘৃণা আর দুঃসাহস মিলিয়ে বিপদকে তুচ্ছ করতে শেখায়, দেহে শক্তির ছন্দ জাগায়। সেই শক্তি দেবতার আরাধনা করতে করতে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলুম। হঠাৎ গোলাম হোসেনের হাউ মাউ কান্নায় বেরিয়ে আসতে হলো। দেখলুম গোলাম হোসেন তার সেলের সামনে হাত পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর উঁচু রবে বিলাপ করছে—হাম নেহি যায়গা, হাম নেহি যায়গা।

যারা পাগল তারা যে কখনো ভয় পেতে পারে এটা আমার জানা ছিল না। আমাদের তিন পাগল আজ সত্যি ভয় পেয়েছে। যে মুখগুলি হরদম ত্রিভুবনের

শ্রাদ্ধ করে চলতো বিকেল থেকে তাদের মুখে টু শব্দটি নেই। নীরব পাগলটি কম্বল মুড়ি দিয়েছে। অনেক কষ্টে গোলাম হোসেনকে শান্ত করে তার বিলাপের হেতুটি জানা গেল। সে সেলে ঢুকে বিছানাপত্র গুছাচ্ছিল। বাতি তখনো জ্বলে নি। কুঠুরীর মধ্যে আবছা অন্ধকার। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে তার পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে লোকটা এগিয়ে এলো। গোলাম হোসেন কাঁধের উপর তার তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলে। ভয়ে কাঠ গোলাম হোসেন ধপ্ করে বসে পড়লে। দেখলে একটি মিশকালো নরদেহ ধীরে ছাদ সমান উঁচু হয়ে তার কাধে হাত রাখলে। গোলাম হোসেন কিছু বলতে যাবে এমন সময় নরদেহ বিকট এক ফালি দাঁত বের করে হি হি করে হেসে উঠলো। সেই হাসির ধাক্কায় গোলাম হোসেন ছিট্‌কে বাইরে এসে পড়েছে। এখন সে বায়না ধরেছে ঘরে যাবে না। সে আমার ঘরে শোবে।

চোখ রাঙ্গিয়ে কপটরাগ দেখিয়ে বললাম—ব্যাটা দিব্বি গল্প বানিয়ে বলছে, আবার এদিকে পাগল সেজেছে। চোপ্‌রাও। প্রত্যুত্তরে গোলাম হোসেন আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়লে—নেহি বাবুজী, হাম সাচ বোলতা, কারা ঘরমে ফাঁসীকা ভূত আয়া থা। হামকো মার ডালেগা। মার ডালেগা। আমার ঘরে তাকে নিয়ে যাবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পা জোড়া ছাড়িয়ে নিলুম। দেখলুম গোলাম হোসেনের রক্তহীন মুখে মৃত্যুভয়। মৃত্যুকে পাগলও ভয় করে।

জমাদার সিপাহীর সাহায্যে গোলাম হোসেনকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমরাও যে যার কুঠুরীতে ঢুকে পড়লুম। সংক্ষিপ্ত খানাপিনা সেরে বিছানায় হেলান দিয়ে জিন পরীর প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের হাল্কা ঢেউ কচ্চিৎ এসে ছড়িয়ে পড়ছে কুঠুরীর মধ্যে। বাইরে ঘুটঘুটি অন্ধকার। আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু'চারটি তারা। অখণ্ড নীরবতার মাঝে বটপাতার খস্‌খস্, পাখির ঝাপটা, গুদামের টিনে আঘাত খাওয়া বাতাসের ভাঙ্গা কান্না যেন অন্ধকার রাত্রিকে প্রাণের সন্ধান দিচ্ছে। গোলাম হোসেনের চীৎকার বন্ধ। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই টেনে মন লাগাতে চেষ্টা করলুম। সারা দিনের উপোস আর মানসিক শ্রান্তিতে শরীর ভেঙ্গে এলো। বেশীক্ষণ বইয়ে মনোযোগ দিতে পারলুম না। ঘুমঘোর চোখে মশারীটা ফেলতে যাবো এমন সময় দমকা হাওয়ার টানে টেবিলের আয়নাটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল। আর এক দমকায় বই পুস্তকগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়, মশারীর দড়িটা গেল ছিঁড়ে। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে লেগেছে। লৌহ কপাট খট্ খট্ করে নড়ে উঠলো। বিছানাপত্র তছনছ হয়ে গেল। বটের ডালে পাখিকুলের সুখনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। বাসাগুলো ছিটকে পড়লো গুদামের ছাদে আমাদের সেলের দরজায়। আশ্রয়হীন পাখিদের আর্ত

চীৎকারে, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে আট ডিগ্রীর আবহাওয়াকে আরো ভয়াল করে তুললো। সাথে সাথেই শুরু হলো গোলাম হোসেনের চীৎকার। সে কী কানফাটা চীৎকার। সিপাহী সাহেব ইঁধার আও। হাম মরজাতা, হামকো বাঁচাও। ঝড় উঠলো। ঝড়-বৃষ্টির তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথেই নামলে বৃষ্টি।

দু'টি দমকাতেই ভিজে চুপসে গেলুম। এক একটি ঝাপ্টা আসে আর সবকিছু ভিজিয়ে দিয়ে যায়। মেঝেটি ভিজে গেল। বিছানাপত্র, বই পুস্তক সবই ভিজে একাকার। এরই মধ্যে বাতিটি গেল নিবে। তারস্বরে সিপাহী সাহেব, জমাদার সাহেব সকল সাহেবেরই আরাধনা করলাম। কিন্তু ঝড়ের তান্ডবের মুখে আমার সেই চীৎকার ভেসে গেল। সিপাহী জমাদার কারো সাড়া নেই। পাশের সেল থেকে জ্ঞানবাবু চীৎকার করে বার বার কি যেন বলছিল। পানির ঝাপ্টা থেকে কান দুটোকে রক্ষা করার জন্য দু'হাত চেপে ধরলুম। চোখ বুজে লৌহ কপাটের শিকের উপর মুখ রেখে জ্ঞান বাবুর কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলুম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে তাঁর ক্ষীণ আওয়াজের অর্থটি বুঝতে পেরে নিজের বোকামিতে লজ্জা পেলুম। তাড়াতাড়ি খাট থেকে গদিটি নামিয়ে নিলুম। দেখলাম নারিকেল ছোবড়ার আধ হাত পুরু গদিটির উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভিজে। নীচের ভাগ পর্যন্ত পানি এখনো পৌঁছাতে পারে নি। সেই গদিটি সেলের দরজার উপর লম্বালম্বি খাড়া করে দিয়ে বৃষ্টির ঝাপ্টা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলুম। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু কেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত মাথায় খেললো না ভেবে অবাক হলুম। কিন্তু অচিরেই নিশ্চিন্ত আরামের স্বপ্নটি গেল ভেঙ্গে—বাতাসের ধাক্কায় গদিটি ধপ্ করে মাথার উপর এসে পড়লো। প্রথম ধাক্কাটি সামলে নিয়ে গদিটি আবার দরজার উপর খাড়া করে দিয়ে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিলুম। পিঠ দিয়ে গদিটি দরজার শিকের উপর চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। ফলটা বিশেষ উপভোগ্য হলো না। ঝড়ো হাওয়ার দমকে দমকে গদিটির সাথে সাথে আমি পেন্ডুলামের মতো সামনে পিছনে কসরৎ করতে লাগলুম। বৃষ্টির দাপট থেকেও রেহাই পেলুম না। দরজার তুলনায় গদির প্রস্থটি ছোট হওয়ায় একটু ফাঁক হয়ে থেকে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মতো বৃষ্টি এসে ক্ষতবিক্ষত করছিলো শরীরের বাঁ-দিকটা। বাম কান আর বাঁ বাহুটির সমস্ত চেতনা লুপ্ত হলো। ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে উঠলো তখন মাথায় আর একটি নূতন বুদ্ধি খেলে গেল। লোহার খাটিয়াটি তুলে গদির উপর চেপে দিয়ে ভিজে মেঝের উপরই ক্লান্ত দেহটি ছড়িয়ে দিলুম। রাত্রি বারোটার সময় ঝড়ের প্রকোপ কমলো। বৃষ্টিও আরো ঘণ্টাখানেক চলে থেমে গেল।

হাক ডাক করে এবার সিপাহীজীকে পাওয়া গেল। তার কাছ থেকে আগুন নিয়ে একটি বিড়ি ধরালাম। পর পর তিন চারটি বিড়ি টেনে দেহটিকে একটু চাঙ্গা করে সেই গভীর রাত্রে বিধ্বস্ত ঘরটি পুনঃ সংস্কারে লেগে গেলুম। চামড়ার সুটকেসটি পানি খেয়ে ফুলে উঠেছিল। কিন্তু ভিতরের কাপড়গুলো শুকনোই ছিল। কাপড় বদলিয়ে খাট যদি যথাস্থানে ফিরিয়ে আনলুম। ঘুমের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম একটি কম্বলও শুকনো নেই। সব চাদরই ভিজে। অগত্যা ঘুমকে বিদায় জানিয়ে দরজার সামনের জায়গাটুকু মুছে নিয়ে বসে বসেই রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা করলুম। বাইরের প্রকৃতি শান্ত ছেলের মতো নিস্তব্ধ। কে বলবে একটু আগে এত বড়ো ঝড়ের তান্ডব বয়ে গিয়েছে। বটের ডাল থেকে কখনো কখনো এক আধ ফোঁটা বৃষ্টির পানি গুদামের টিনের ছাদের উপর টপ করে পড়ে রাত্রির মৌনতা ভঙ্গ করছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বৃষ্টি আসে ফিরে। আকাশের তারাগুলো প্রথম রাত্রির তুলনায় উজ্জ্বলতর। সেই অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেদিন একটি কথাই বার বার মনে হয়েছিল কয়েদখানার নিঃসঙ্গ সেল জীবন অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। বন্ধু-সাথীতে সমগ্র জেলখানাটিই ভর্তি। অথচ এই দুর্যোগের রাত্রিতে কেউ কাউকে দেখতে পারছে না। একটি প্রয়োজনের হাত নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এগিয়ে দিতে পারছে না। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতম নির্যাতন আর যে কিছু হতে পারে ভাবা যায় না। বন্দীজীবনের ভয়ংকর অভিশাপ এই সেলজীবন।

সেই ঝড়ো রাত্রির সাথে আজকের রাত্রির কোন তুলনা হয় না। এই শীতের রাত্রে কম্বল গায়ে দিয়ে হ্যারিকেন সামনে রেখে লিখছি। লেখার ফাঁকে ফাঁকে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আলোকিত পৃথিবীর ছবি প্রতিচ্ছবিগুলো মুখ তুলে দেখছি। আজ কেন সেই অন্ধকার দুর্যোগ রাত্রির কথা মনে পড়লো? দুই রাত্রির মধ্যে কোন সাদৃশ্য রয়েছে কি? হয়তো আছে। যক্ষপুরীর ঘণ্টা বাজে। এক দুই তিন চার। বন্দী শিবিরের একটি রাত্রি খসে পড়লো। আর একটি প্রভাত নেমে এলো।

পুরস্কার পাঁচ হাজার ডলার

সুজন দাশগুপ্ত

সকালে আড্ডা দিতে নীচে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে যেতেই একেনবাবু একগাল হেসে বললেন, "ভালই হল সার, আপনি এসেছেন। মিস্টার রাজ সিং একটু আগে ফোন করেছিলেন, উনিও আসছেন।" রাজ সিং, মানে দ্য গ্রেট ডিটেকটিভ রাজ সিং?" আমি একটু ঠাট্টা করেই প্রশ্নটা করলাম। হ্যাঁ সার। ওঁর হাতে নাকি একটা কমপ্লিকেটেড কেস এসেছে। যাই হোক, এই ফাঁকে রাজা সিং সম্পর্কে একটু বলে নিই। উনি হলেন ম্যানহ্যাটানের সবেধন নীলমণি ভারতীয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সবেধন নীলমণি বলছি এইজন্য যে, যদিও একেনবাবু পেশায় একজন ডিটেকটিভ, এবং আপাতত প্রমথর সঙ্গে ম্যানহ্যাটানেই থাকেন, কিন্তু উনি কলকাতা পুলিশের—লোক। ছুটি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। ক্রিমিনোলজি বিষয়ে রিসার্চ করতে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ মাঝেমধ্যে ওঁর সাহায্য নিলেও, ডিটেকটিভ

এজেন্সি চালাবার লাইসেন্স ওঁর নেই। ম্যানহ্যাটানে লাইসেন্সধারী ডিটেকটিভ বলতে একমাত্র রাজ সিং-ই। পেশা এক হলেও, চেহারা ও হাবভাবে রাজ সিং হচ্ছেন একেনবাবুর কনট্রাস্ট। একেনবাবু হলেন পাতলা টিংটিঙে, বেঁটে দি গ্রেট! শুধু চেহারা নয়, ওঁর কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই অত্যন্ত আন-ইমপ্রেসিভ! আর রাজ সিং ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, ফুরফুরে, চুল ফিটফাট। দেখলেই মনে হয়, হ্যাঁ, এ না হলে আর নিউ ইয়র্কের গোয়েন্দা! তবে এই রাজ সিং-এর আবার একেনবাবুর ওপর অগাধ ভক্তি! কমপ্লিকেটেড কোনও সমস্যা এলেই উপদেশ নিতে ছুটে আসেন। আমি আর প্রমথ মাঝে-মাঝে একেনবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করি, অ্যাডভাইস শুড নট বি ফ্রি, ফেলো কড়ি মাখো তেল। কিন্তু কে কাকে বোঝায়! খুব চাপাচাপি করলে একেনবাবু বলেন, কী করি সার, ইন্ডিয়ান ব্রাদার যে।" আসলে রাজ সিংয়ের চেহারা আর রোলচালই সব। বাইরের গ্ল্যামারটা কেটে যেতেই ধরা পড়ে যে, হি উড নট ওভার বার্ডনড ব্রেন। আর বোকাসোকা বলেই আমার ধারণা, একেনবাবু ওঁকে খানিকটা স্নেহ করেন। রাজ সিংহের অফিস যদিও ম্যানহ্যাটানে, উনি থাকেন নিউইয়র্কের পূর্ব প্রান্তে, লং আইল্যান্ডে। তাই আসতে-আসতে প্রায় এক ঘণ্টা হল। মুখ দেখেই বুঝলাম ভারী চিন্তিত। সঙ্গে একটা ভিডিও টেপ এনেছিলেন। সেটা টেবিলের ওপর রেখে ঘোষণা করলেন, লাইফ ইজ টাফ! প্রমথ যথারীতি ইয়ার্কি করল। বলল, কী সিংজি, মনে হচ্ছে আপনি একটা গ্রেট ভিডিও মিস্ট্রি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন?"

রাজ সিং প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হলেও ওঁকে কেউ বড় কোন ব্যাপারে ডাকে না। নর্মালি উনি যেসব কাজ করেন, সেগুলো নিতান্তই সাদামাঠা। যেমন কাউকে ফলো করে সে কী করছে না-করছে তার রিপোর্ট দেওয়া, সুপার মার্কেটে কেউ শপ লিফ্‌ট, অর্থাৎ জিনিস চুরি করছে কি না দেখা, ইনসিওরেন্সের দাবিদাওয়া নিয়ে তদন্ত করা, এইসব। প্রমথর গ্রেট ভিডিও মিস্ট্রি' কথাটার মধ্যে যে একটা খোঁচা ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য। রাজ সিং কিন্তু কথাটা গায়ে মাখলেন না। একেনবাবুকে বললেন, মিস্টার সেন, আই অ্যাম ইনট্রাবল্‌, মাই রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক।" প্রমথ ফিসফিসিয়ে বাংলায় আমাকে বলল, শুনছিস, রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক! করিস তো দারোয়ানগিরি!" চুপ কর ছোটলোক? আমি চাপা স্বরে প্রমথকে ধমক লাগালাম। একেনবাবু এদিকে অমায়িকভাবে বলছেন, কী যে বলেন সার, কে আপনার রেপুটেশন কেড়ে নেবে!" না, মিস্টার সেন। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। আই গট দ্য বিগেস্ট ব্রেক অব মাই কেরিয়ার অ্যান্ড আই সিমপ্লি রুইনিং ইট। সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আমাকে বিরাট একটি ক্রাইম সল্‌ভ করতে ডেকেছে। ইট ইজ এ ফাইভ ডে কন্ট্রাক্ট—আউট অব হুইচ থ্রি ডেজ আর অলরেডি

গন অ্যান্ড আই অ্যাম নো হোয়ের নিয়ার দ্য সলিউশন দ্য ওয়ার্স্ট অব অল, প্রত্যেকদিন আমার চোখের সামনে দা ক্রাইম ইজ গেটিং কমিটেড।'' দাঁড়ান সার, দাঁড়ান। আগে এককাপ চা খান।'' টি-পট থেকে চা ঢালতে-ঢালতে একেনবাবু বললেন, তারপর একটু গুছিয়ে সহজ করে ব্যাপারটা বলুন।'' রাজ সিংয়ের কাছ থেকে যেটা উদ্ধার করা গেল, সেটা হচ্ছে এই যে, গত সপ্তাহে রাজ সিং হঠাৎ একটা ফোন কল পান সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার ক্লিফোর্ড জনসনের কাছ থেকে। মিস্টার জনসন ওঁকে বলেন যে, উনি সন্দেহ করছেন যে, ওঁর অফিসের এক টেলার কোনও একটা লোকাল ক্রাইম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, আর এ-ব্যাপারে উনি রাজ সিংয়ের সাহায্য চান। মিস্টার জনসন ফোনে এর বেশি কিছু বলতে চাননি। ঠিক হয় যে, পরদিন ন'টার সময় রাজ সিং মিস্টার জনসনের অফিসে গিয়ে দেখা করবেন। পরদিন ন'টায় যখন রাজ সিং জনসনের অফিসে গিয়ে পৌঁছন, তখন দেখেন মিস্টার জনসন ছাড়াও ব্যাঙ্কের সিকিউরিটির হেড জ্যাক সাইপ্রাস ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। অফিসের দরজাটা বন্ধ করে মিস্টার জনসন বললেন, ইসুটা একটু সেন্সেটিভ। তাই আমি ফোনে আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে চাইনি। জ্যাক এটা নিয়ে প্রায় এক মাস হল ইনভেস্টিগেট করছে। কিন্তু ওর ওপর সিটি সেন্ট্রালের সবক'টা ব্রাঞ্চের সিকিউরিটির দায়িত্ব। ওর পক্ষে ফুল টাইম এতে দেওয়া সম্ভব নয়। ফর দিস রিজন, আই ওয়ান্ট ইউ টু কমপ্লিট দ্য ইনভেস্টিগেশন।'' রাজ সিং বললেন, প্রব্লেমটা কী?'' প্রব্লেম হল, প্রায় মাসখানেক ধরে এই অঞ্চলে মাগিংটা খুব বেড়ে গেছে।'' উত্তরটা দিলেন জ্যাক সাইপ্রাস। এ-দেশের মাগিং হচ্ছে আমাদের দেশের ছিনতাই'। আচমকা আক্রমণ করে বা ভয় দেখিয়ে পয়সা ও দামি জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া। যাই হোক, জ্যাক সাইপ্রাসের কথাটার তাৎপর্য রাজ সিং ঠিক ধরতে পারলেন না। বললেন, নিউ ইয়র্কের সব জায়গাতেই তো মাগিং বেড়েছে। দ্যাট্স ট্রু। কিন্তু এখানে সমস্যাটা একটু অন্য। আমরা কমপ্লেন পেয়েছি এবং পুলিশের কাছেও বেশ কিছু কেস এসেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, মাগিং ভিকটিমের অনেকেই হচ্ছে যে এই ব্যাঙ্কের কাস্টমার। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বেরোবার একটু পরেই তারা রাস্তায় মাগ্ড হচ্ছে।''

এটা শুনেও রাজ সিং বিস্মিত হননি, কারণ মাগাররা ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখতে পাবে কারা ব্যাঙ্ক থেকে বেরোচ্ছে। যারা বেরোচ্ছে, মোস্ট লাইকলি তাদের কাছে টাকা আছে, নইলে তারা ব্যাঙ্কে আসবে কেন। কিন্তু জ্যাকের পরের কথাটা শুনে উনি বুঝতে পারলেন সমস্যাটা কোথায়? আমরা যখন তদন্ত শুরু করলাম, জ্যাক সাইপ্রাস বললেন, তখন দেখলাম শুধু তারা মাগ্ড হচ্ছে,

যারা অনেক টাকা সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ভিকটিমই টাকা তুলছে মিস সিলভিয়া জোন্স বলে একজন টেলারের কাছ থেকে। কিন্তু প্রব্লেম হল যে, আমাদের কোনও ধারণাই নেই, কেন এটা ঘটছে। আই পার্সোনালি অবজার্ভ্ড হার ফর এ ফুল ডে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই লক্ষ্য করিনি।'' মিস্টার জনসন বললেন, বাট উই আর শিওর যে, সামহাউ সিলভিয়া গুন্ডাগুলোকে জানাচ্ছে কে মোটা রকমের ক্যাশ উইথড্র করছে। দ্যাট্স দ্য ওনলি এক্সপ্লানেশন। এখন আপনাকে মিস্টার সিং খুঁজে বের করতে হবে যে, কী করে সিলভিয়া গুণ্ডাদের ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছে! হাউ ইজ শি কম্যুনিকেটিং উইথ দেম? বাট ইউ মাস্ট হারি। কারণ, একবার যদি খবরের কাগজের লোকরা জানতে পারে যে, আমাদের কাস্টমাররা মাগারদের টার্গেট, তা হলে আমাদের বিজনেসের কী অবস্থা হবে—সেটা তো বুঝতেই পারছেন!'' তা পারছি,'' রাজ সিং উত্তর দিলেন, কিন্তু কাজটা নেওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে।'' কী প্রশ্ন?'' নিউ ইয়র্কে এত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর থাকা সত্ত্বেও আমাকে আপনি সিলেক্ট করলেন কেন?'' ভেরি সিম্পল। যেহেতু আপনি একজন ইন্ডিয়ান, সিলভিয়া বা ওর গুন্ডা বন্ধুরা কল্পনাও করবে না যে, আপনি ডিটেকটিভ। বিকস্ ইট ইজ র‍্যাদার অ্যান আন ইউজুয়াল প্রোফেশন ফর অ্যান ইন্ডিয়ান। দ্যাট, আই বিলিভ, উইল মেক ইয়োর জব সিম্পলার। তাই না?'' ''মে বি,'' রাজ সিং বললেন, তবে আমার চার্জ কিন্তু দিনে পাঁচশো ডলার প্লাস এক্সপেন্স। আর কাজটা কমপ্লিট করতে পাঁচ দিনও লেগে যেতে পারে।'' রাজ সিং নর্মালি এত চার্জ করেন না। কিন্তু শাঁসালো মক্কেল, ট্রাই করতে দোষ কী! দ্যাট্স ফাইন উইথ আস।'' ক্লিফোর্ড জনসন উত্তর দিলেন। এই হল মোটামুটি ঘটনা। রাজ সিং একেনবাবুকে বললেন, এবার বুঝতে পারছেন তো আমার সমস্যাটা।'' হ্যাঁ সার, মনে হচ্ছে বুঝেছি। অর্থাৎ গত তিনদিনে ইউ হ্যাভ ফাউন্ড নো ক্লু।'' এগজ্যাক্টলি। আমি সিলভিয়াকে খুব ক্লোজলি ওয়াচ করেছি। ইনফ্যাক্ট, যদি কখনও অন্যমনস্ক হয়ে কোনও কিছু মিস করে থাকি, সেইজন্য জ্যাক সাইপ্রাসের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা ভিডিওগুলোও স্টাডি করেছি।'' সেটা কী সার?'' একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। কিসের কথা বলছেন, সিকিউরিটি ভিডিও?'' হ্যাঁ সার।'' অপনি জানেন না বুঝি।'' রাজ সিং একটু অবাক হলেন। নিউ ইয়র্কে সব ব্যাঙ্কে ভিডিও ক্যামেরা লাগানো থাকে। যারা টেলারদের কাছে গিয়ে টাকা নিচ্ছে, তাদের সবার ছবি ক্যামেরাতে ওঠে। এইজন্যই ব্যাঙ্ক-ডাকাতি আজকাল অনেক কমে গেছে।'' অ্যামেজিং কান্ট্রিসার, ট্রুলি অ্যামেজিং।'' একেনবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন। এনি ওয়ে,'' রাজ সিং পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। নাউ আই ডোন্ট নো হোয়াট

টু ডু নেক্সট!" প্রমথ বলল, এটাই বুঝি আপনার সিকিউরিটি ভিডিও?" রাইট। দেখবেন?" রাজ সিং একেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন। কী জানি সার, একেনবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, ভিডিও দেখে কি আর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব।" তা বলে দেখতে ক্ষতি কী," বলে প্রমথ টেবিল থেকে টেপটা তুলে ভিডিও প্লেয়ারে ঢোকাল। ছবির কোয়ালিটি বিশেষ ভাল নয়। তবে মোটামুটি চেহারাগুলো বোঝা যাচ্ছে। রাজ সিং এক্সপ্লেন করে বললেন, ওরিজিনালি অন্য ফরম্যাটে তোলা। ভি এইচেস-এ কনভার্ট করতে গিয়ে ডেফিনেশানটা একটু লুজ করেছে।" একেনবাবু আবার এসব টেকনিক্যাল টার্মগুলো বোঝেন না। বললেন, হোক না ডিফরমেশন, তবু দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সিচুয়েশনটা আমায় একটু বুঝিয়ে দিন সার।" শিওরলি," রাজ সিং বললেন। টেলারদের দেখতে পাচ্ছেন তো, ওই যে চারজন, যারা কাউন্টারের উলটো দিকে পাশাপাশি বসে আছে?" হ্যাঁ সার, দেখতে পাচ্ছি।" বাঁ দিক থেকে কাউন্ট করে থার্ড পার্সন হল সিলভিয়া জোন্‌স। আই সি সার," টিভি স্ক্রিনের দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, যার চুলগুলো লাল মতো?" ইয়েস।" জায়গাটা এত ফাঁকা কেন সার, প্রত্যেক টেলারের সামনে মাত্র একজন করে কাস্টমার?" ফাঁকা নয়, প্রচন্ডই ভিড়, কিন্তু ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের জন্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না," রাজ সিং উত্তর দিলেন। নর্মালি, ভিড় হলে কাস্টমাররা কাউন্টার থেকে একটু দূরে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে। টেলারের সঙ্গে একজন কাস্টমারের কাজ শেষ হলে লাইনের প্রথমে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার জায়গায় যায়। ফলে টেলারের সামনে ধাক্কাধাক্কি হয় না। কাস্টমারদের ওই লাইনটা ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের বাইরে পড়ে গেছে।"

আপনি কোথায় ছিলেন সার?" কাস্টমারদের লাইনের অন্য সাইডে একটা পাটাতনের মতো আছে। সেখানে সিকিউরিটিগার্ড ও কয়েকজন কর্মচারী বসে। প্রথম দু'দিন সেখানে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। গতকাল মিস জোন্‌সের ঠিক পেছনে বুক কিপারদের একটা টেবিল আছে, সেখানে ছিলাম।" তার মানে সার, আপনি চারজন টেলারকেই ভাল করে দেখতে পারছিলেন।" অ্যাবসলুটলি। শুধু দেখা নয়, সবার কথাও শুনতে পারছিলাম।" একেনবাবু বোধ হয় আর-একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রমথ বলে উঠল, আরে, ওটা কী হল?" আমিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলাম। একজন কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিলভিয়া হঠাৎ কানে হাত দিলেন। রাজ সিং বললেন, কানে হাত দেওয়াটা তো? এটা ওর মুদ্রাদোষ। আমারও প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু প্রতিদিন কতবার যে উনি কানে হাত দিয়ে দুল ঠিক করেন, তার ইয়ত্তা নেই!" দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজে ব্যাপারটা নাকচ করবেন না," প্রমথ বলল। দেয়ার মে বি সাম সিক্রেট

কোড। ধরুন, গুন্ডাদের সঙ্গে ওঁর একটা আন্ডারস্ট্যানডিং আছে যে, প্রত্যেকবার নয়, শুধু তিনবারের বার কানে হাত দেওয়াই হল আসল সিগন্যাল। সে ক্ষেত্রে যেই উনি থার্ড টাইমস্ কানে হাত দেবেন, সঙ্গে-সঙ্গে গুন্ডারা সেই কাস্টমারকে ফলো করবে। রাজ সিং এ নিয়ে বোধ হয় খুব একটা চিন্তা করেননি। তাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, না, না, জ্যাক সাইপ্রাসও বলেছিলেন যে, দুল ঠিক করার সঙ্গে মাগিং ভিকটিমের কোনও সম্পর্ক নেই।" একেনবাবু বললেন, সার, মিস জোনস্ কি শুধু বাঁ হাত দিয়েই কানের দুল ঠিক করেন, না মাঝে-মাঝে ডান হাতও ব্যবহার করেন?" রাজ সিং কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, ইয়েস, দুটো হাতই ব্যবহার করতে দেখেছি।"

দেন দেয়ার আর মোর কোডিং পসিবিলিটি", প্রমথ বলল। যেমন ধরুন, যে-মুহূর্তে উনি হাত চেঞ্জ করবেন, সেটাই হবে ইন্ডিকেশন। ফর এগজাম্পল, উনি বারবার বাঁ হাত দিয়ে দুল ঠিক করছেন। একবার হঠাৎ ডান হাত দিয়ে করলেন, সেটাই হবে গুন্ডাদের ক্লু!" আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, এই পসিবিলিটিগুলো রাজ সিংয়ের মাথায় খেলেনি। কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বলে, সেগুলো ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছেন না! হাজার হোক, প্রমথর কী ক্রেডেনশিয়াল? এদিকে উনি হচ্ছেন একজন লাইসেন্সধারী ইনভেস্টিগেটর!" এমন সময় একজন মোটাসোটা কাস্টমার সিলভিয়া জোন্সের কাছে দাঁড়াতেই রাজ সিং বলে উঠলেন, এই যে লোকটাকে দেখছেন মিস্টার সেন, এ হচ্ছে একজন মাগিং ভিকটিম।" শোনামাত্র আমরা সবাই নিঃশব্দে মিস জোন্সের মুভমেন্ট স্টাডি করতে শুরু করলাম। লেনদেন শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাস্টমার চলে গেলেন। দেয়ার ইজ নাথিং, অ্যাবসলুটলি নাথিং, যেটা আমার মনে হল সাসপিশাস! সিলভিয়া কানের দুল ঠিক করলেন না, কোনও স্পেশাল মুভ লক্ষ্য করলাম না, এভরিথিং ইজ কমপ্লিটলি নর্মাল!" দেয়ার গোজ ইয়োর কোডিং থিয়োরি, আমি প্রমথকে খোঁচা দিলাম। নট সো ফাস্ট", প্রমথ বলল, হয়তো কানে হাত না দেওয়াটাই হল আসল সিগন্যাল।" কিন্তু সেটাও সত্যি নয়। কারণ, ঠিক পরের জনের বেলাতেও, সিলভিয়া ওয়াজ অ্যাজ নর্মাল বিফোর!" নাউ মাই থিয়োরি ইজ গন," প্রমথ স্বীকার করল। আনলেস দ্য কোড ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড।" আমি তো আগেই বলেছিলাম," রাজ সিং বললেন। মুশকিল হল সার, ভিডিওটা টকি নয়, মানে নো সাউন্ড," একেনবাবু বললেন। দ্যাট্স ট্রু। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিস্টার সেন, আই ডিড নট ফাইন্ড এনিথিং ইন হার ভয়েস হুইচ ইজ সাসপিশাস।" উনি কি সার নর্মাল ভাবেই সবার সঙ্গে কথা বলছিলেন?" ইয়েস। ইনফ্যাক্ট শি সাউন্ডেড মোর নর্মাল দ্যান আদার্স।" একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে

বললেন, মোর নর্মাল মানে কি সার?'' হোয়াট আই মিন, অন্যান্য টেলারের মতো উনিও, কাস্টমার সামনে এসে দাঁড়ালে বলছিলেন, মে আই হেল্প ইউ, এবং কাজ শেষ হওয়ার পর, থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান্ড হ্যাভ এ প্লেজেন্ট ডে। কিন্তু সেটা মোটেই আর সবার মতো যান্ত্রিকভাবে নয়। ওঁর কথার মধ্যে একটা ফ্রেন্ডলিনেস ছিল। এমন কী কাজের ফাঁকে-ফাঁকে উনি হাসিমুখে কাস্টমারদের সঙ্গে গল্পও করছিলেন।'' একটু ভাবুন সার, উনি কি কথার ফাঁকে এমন কিছু কাউকে বলেছিলেন, সেটা অন্য কাউকে বলেননি? অনেক সময় যেগুলো আমাদের খেয়ালও হয় না সার, যেমন, সবাইকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে শুধু একজনকে 'থ্যাঙ্ক ইউ সার' বলা? বা ওই জাতীয় কিছু?'' নো। আই অ্যাম শিওর। আমি খুব মন দিয়ে ওঁর প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। দেয়ার গোজ অ্যানাদার ওয়ান,'' রাজ সিং বলে উঠলেন, আর-একজন মাগিং ভিকটিম!'' নাঃ, রাজ সিং ইজ অ্যাবসলুটলি রাইট, দেয়ার ইজ নো ক্লু! আর তখনই আমার মাথায় সম্ভাবনাটা ঝিলিক দিল, হোয়াট অ্যাবাউট এ ট্রান্সমিটার? যদি মেয়েটা একটা সিম্পল রেডিয়ো ট্রান্সমিটার কোমরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, আর তাতে একটা পুশ বাটন থাকে, যেটা অতি সহজে টাকা গুনতে-গুনতে কনুই দিয়ে প্রেস করা যায়। দ্যাট্স অল হোয়াট ইজ নিডেড! গুন্ডাদের একজনের কাছে নিশ্চয় একটা হ্যান্ড হেল্ড রিসিভার আছে। মেয়েটা পুশ বাটন টিপলেই রিসিভারের ইন্ডিকেটর লাইটটা ব্লিঙ্ক করবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে গুন্ডাটা দেখতে পাবে, কে বড় অঙ্কের ক্যাশ উইথড্র করছে!''

আমি আমার থিয়োরিটা বলতেই রাজ সিং বললেন, সেটাই জ্যাক সাইপ্রাস প্রথমে ভেবেছিলেন। তাই উনি একটা ছুতো করে বেরোবার আগে টেলারদের একটা সারপ্রাইজ সিকিউরিটি সার্চ করেন। কিন্তু কারও কাছে কিছু পাওয়া যায়নি।'' প্রমথ আমায় খোঁচা দিল, দেয়ার গোজ ইয়োর থিয়োরি, ডাউন দ্য ড্রেন!'' মিস জোনস্ কতদিন হল কাজ করছেন সার?'' একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। মাসতিনেক। চারজনের মধ্যে মিস জোন্স আর-একজন হল নতুন। বাকি দু'জন দু' বছর ধরে কাজ করছে।'' হু ইজ দ্য আদার ওয়ান সার?'' আই অ্যাম নট শিওর'' রাজ সিং উত্তর দিলেন। একেনবাবু দেখলাম ঘন-ঘন পা নাচাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী, কিছু বুঝলেন?'' আই হ্যাভ এ সাসপিশান সার।'' হোয়াট ইজ দ্যাট?'' রাজ সিং খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন। আই সাসপেক্ট দ্যাট উই আর লুকিং অ্যাট এ রং পার্সন।'' তার মানে?'' আমি আর রাজ সিং প্রায় একসঙ্গে প্রশ্নটা করলাম। ধরুন সার, একজন নয়, এই কনস্পিরেসিতে দু'জন টেলার ইনভলভড্। একজন হচ্ছেন মিস জোনস্, আর দ্বিতীয়জন হলেন, মিস জোন্সের পাশে যে দু'জন বসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন। যখনই কেউ এসে

অনেক টাকা তুলছে, মিস্ জোন্স ওঁর পার্টনারকে হয় কাগজ পাস করে, নয় পায়ে একটা খোঁচা দিয়ে সেটা জানাচ্ছেন। দ্যাট্স নট ডিফিকাল্ট, কারণ সবাই একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন! কিন্তু ভেবে দেখুন সার, কী দারুণ স্ট্র্যাটেজি! আমরা সন্দেহবশত শুধু মিস জোন্সকেই দেখছি। আর-একজন নিশ্চিন্তমনে সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছেন!'' মাই-গড!'' রাজ সিং মুগ্ধ হয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, হোয়াট এ ক্লেভার প্ল্যান! তার মানে, উই শুড লুক অ্যাট আদার্স ফর শোইং শাইন্স।'' আই থিঙ্ক সো সার।'' এক্সেলেন্ট, আই অ্যাম গোইং টু ডু দ্যাট।'' রাজ সিং দারুণ খুশি হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমি জানতাম আপনার কাছে এলে একটা হদিস হয়ে যাবে! ভাল কথা মিস্টার সেন, আপনাদের সকলকে একদিন লাঞ্চে নিয়ে যেতে চাই। ইউ আর অলওয়েজ সো কাইন্ড অ্যান্ড হেল্পফুল।'' একেনবাবু অ্যাজ ইউজুয়াল, আরে ছি ছি, না', বলতে যাচ্ছিলেন। প্রমথ বলল, ফাইন, হাউ অ্যাবাউট মানডে।'' বেশ তো, আসুন না। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে কয়েকটা ভাল খাবার জায়গা আছে, তার একটাতে যাওয়া যাবে'খন।'' এই বলে রাজ সিং বিদায় নিলেন। চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল, উনি ভিডিওটা ফেলে গেছেন। যাক, সোমবার নিয়ে গেলেই চলবে।

সোমবার দিন সকালে আমার ক্লাস ছিল। ক্লাসের পর অনেক সময়েই ছাত্রদের অনেক প্রশ্ন থাকে। সেটা শেষ করে সময়মতো আমি লাঞ্চে পৌঁছতে পারব কি না বুঝতে পারছিলাম না। তাই স্কুলে যাওয়ার আগে আমি একেনবাবুকে বলে গেলাম, আমার জন্য সাড়ে এগারোটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পোর্ট অথরিটি টার্মিনালের সামনে অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে যদি না যাই, তা হলে যেন আমাকে ছাড়াই ওঁরা লাঞ্চে যান। একেনবাবু অবশ্য একটু ঘ্যানঘ্যান করলেন, কিন্তু শেষমেষ মেনে নিলেন। আগে থেকে ব্যাপারটা ঠিক করে রেখে ভালই হয়েছিল, কারণ সেদিনই পিলপিল করে ছেলেমেয়েগুলো ঘরে এল। সকলের হাজার গন্ডা প্রশ্ন। ফ্রি লাঞ্চ তো মিস করলামই, সব কিছু চুকোতে-চুকোতে প্রায় একটা। আমি বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে প্রমথর কাছে শুনলাম রাজ সিং নাকি ভীষণ আপসেট, কারণ একেনবাবুর থিয়োরি টোটালি ফেল মেরেছে। প্রমথ অবশ্য যোগ করল যে, রাজ সিংয়ের যা বিদ্যেবুদ্ধি ও অবজারভেসন পাওয়ার—সেটা সত্যি নাও হতে পারে। যাই হোক, একেনবাবু আসেননি। রাজ সিংকে অত্যন্ত বিচলিত ও আশাহত দেখে মরাল সাপোর্ট দিতে সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে গেছেন। একেনবাবু সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরলেন, তখন আমি আর প্রমথ নিউজ শুনতে বসেছি। সিকিউরিটি ভিডিওটা টেবিল থেকে তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সার, আপনার ভিডিও প্লেয়ারটা একটু চালাব?'' শিওর। কিন্তু কী ব্যাপার, নিউজ

শুনবেন না?” শুনবসার, একটা জিনিস চেক করে এক্ষুনি আসছি।” বলে ওপরের তলায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেলেন। যখন নেমে এলেন, তখন লোক্যাল, ন্যাশনাল—দুটো নিউজই শেষ, মানে, প্রায় এক ঘণ্টা পরে। প্রমথ জিজ্ঞেস করল, কী মশাই, কী করছিলেন এতক্ষণ ধরে!” কিছু না সার, আসলে মিস্টার সিং এত ঝামেলায় পড়েছেন! তাই ভিডিওটা আবার একটু দেখছিলাম সার, যদি কোনও ক্লু বেরিয়ে যায়!” ধন্য আপনার বন্ধুপ্রীতি!” প্রমথ ধমকের সুরে বলল, জানেন, আপনার এই রাজ সিং গত চারদিনে কম-সে কম দু' হাজার ডলার পকেটে পুরেছে! ফর গডস সেক, লেট হিম আর্ন হিজ ওন মানি!” তা তো বটেই সার,” একেনবাবু অপরাধী মুখ করে বললেন। আমি প্রমথকে বললাম, কেন ওঁকে জ্বালাচ্ছিস? উনি হচ্ছেন কর্মযোগী! নিজের কাজ উনি করে যাবেন, অর্থপ্রাপ্তি হোক বা না হোক! কী বলেন একেনবাবু, ঠিক কিনা?” কী যে বলেন সার। সামান্য একটু সাহায্য...।” যাক, ওসব কথা”, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিস্ট্রি সল্‌ভ হয়েছে? শুনলাম আপনার থিয়োরিও নাকি ফেল?” হ্যাঁ সার, কালকেরটা ফের। তবে এবার আর-একটা থিয়োরি ট্রাই করছি।” আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রাজ সিংয়ের ফোন। একেনবাবুর খোঁজ করছেন। একেনবাবু ফোন ধরবার জন্য উঠতেই খেয়াল করলাম যে, ওঁর চেয়ারে একটা কাগজ, আর তাতে ২০, ১০০, ৫৫, ১২০, ৪০, ১১০, ৫৩, ১৩০....ইত্যাদি অনেক সংখ্যা লেখা! তাদের মধ্যে আবার ৫৫ আর ৫৩-র চারদিকে একটা করে গোল আঁকা! কী হাবিজাবি লিখেছেন কে জানে! একেনবাবু ফোন তুলে বললেন, আই গট দ্য টাইম সার ফ্রম ফিফটি সেকেন্ডস টু ওয়ান মিনিট। তবে সাউন্ড নেই বলে কিছুটা সার গেস ওয়ার্ক করেছি।” রাজ সিং কী বললেন শুনতে পেলাম না, কিন্তু একেনবাবু বললেন, দ্যাট্‌স ইট সার, উই গট ইট! সিম্পল, বাট ও ক্লেভার প্ল্যান।” রাজ সিং বোধ হয় আবার কিছু একটা বললেন। উত্তরে একেনবাবু বললেন, ইউ শুড থ্যাঙ্ক বাপি বাবু। উনি কথাটা না তুললে আমার ব্যাপারটা স্ট্রাইক করত না। ঠিক আছে সার, কাল বিকেলে তা হলে দেখা হবে। বাই সার।” একেনবাবু ফোন নামিয়ে রাখতেই প্রমথ প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার বলুন তো? বাপিটা এত থ্যাঙ্ক ইউ পাচ্ছে কেন, হোয়াটস গোইং অন? আমাদের থিয়োরিটা কনফার্মড হয়ে গেল সার?” ওয়েট এক মিনিট, আমাদের থিয়োরি বলতে কোনটা?” আমি বলে উঠলাম, কালকের থিয়োরিগুলো তো সব ফেল মেরেছে বললেন, তার মানে....।” বলছি সার বলছি, একটু সবুর করুন। আপনিও সার একেবারে প্রমথবাবুর মতো অবুঝ হয়ে পড়ছেন। মনে আছে সার, সকালে আপনি বলেছিলেন সাড়ে এগারোটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে যদি আপনি না আসেন, তা হলে আমরা যেন চলে যাই।” তা বলেছিলাম।”

সেটা শোনামাত্রই আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টাইম সার, টাইম হচ্ছে সিমপ্লেস্ট ওয়ে টু পাস ইনফরমেশন। আপনি বললেন, ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যে না এলে আমি আর আসব না। ইট ইস এ পারফেক্ট মোড অব কমিউনিকেশন, বিকজ উই অল হ্যাভ আওয়ার ওয়াচ। বুঝতে পারছেন তো সার? সত্যি কথা বলতে কী, এর সঙ্গে মাগিং-এর কী সম্পর্ক, আমার কাছে তখনও ক্লিয়ার নয়।” একেনবাবু বলে চললেন, এবার খেয়াল করুন সার, কাস্টমার এলে মিস জোন্‌স বলছেন, মে আই হেল্প ইউ। তারপর কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলছেন, থ্যাঙ্কইউ অ্যান্ড হ্যাভ এ প্লেজেন্ড ডে। প্রশ্ন হচ্ছে, মে আই হেল্প ইউ। তারপর কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলছেন, থ্যাঙ্কইউ অ্যান্ড হ্যাভ এ প্লেজেন্ড ডে। প্রশ্ন হচ্ছে, মে আই হেল্প ইউ' আর থ্যাঙ্ক ইউ'-এর মধ্যে যে সময়টা, কুড দ্যাট বি ইউজ্‌ড টু সেন্ড এ মেসেজ? আই ফাউ' দ্যাট হোয়াট প্রিসাইজলি ওয়াজ ডান! টাইম-গ্যাপটা যদি পঞ্চাশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিটের মধ্যে হয়, তা হলে কাস্টমার অনেক টাকা তুলেছে। সেটা না হলে জাস্ট ইগনোর ম্যান। বুঝতে পারছেন সার?” ও বুঝুক না-বুঝুক, আমি বুঝেছি,” প্রমথ বলল। জলবৎ তরলম!” কাগজের নম্বরগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সেটাই ভিডিও থেকে চেক করছিলেন নাকি?” ইয়েস সার, যে-দুটো কেস মিস্টার সিং বলেছিলেন, সে-দুটোই এক মিনিটের খুব কাছাকাছি। তবে শব্দ ছিল না বলে এগজ্যাক্ট টাইমটা বের করা অসম্ভব। কিন্তু অন্য কাস্টমারদের ক্ষেত্রে সময়গুলো বেশ কিছুটা বেশি বা কম। মিস্টার সিং বলেছিলেন না যে, মিস জোনস্ কাস্টমারদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গল্পগুজব করতেন। আমার ধারণা সার গল্পগুজব করেই উনি টাইমিংগুলো ঠিক-ঠিক রাখতেন। এনি ওয়ে সার, আজকের মাগিং রিপোর্ট থেকে মিস্টার সিংও থিয়োরিটা কনফার্ম করলেন। পরদিন রাজ সিং এসে পুরো রিপোর্ট দিলেন। ছদ্মবেশী পুলিশ রাজ সিংয়ের কাছ থেকে ক্লু নিয়ে প্রসপেকটিভ মাগিং ভিকটিমদের ফলো করে দু'জন মাগারকে গ্রেফতার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি থেকে মিস জোন্‌সকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ সিং আমাদের না বললেও পরে শুনেছি, ম্যানহাটানের মাগিং মিস্ট্রি সল্‌ভ করার জন্য ক্লিফোর্ড জনসন নাকি রাজ সিংকে ওঁর প্রাপ্য টাকা ছাড়াও আরও পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার হিসেবে দিয়েছেন!

দরজার ওপারে মৃত্যু

সিদ্ধার্থ ঘোষ

সব খুন-খারাপির সুরাহা হয় না। কিন্তু তার মানে ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান খুনিরাই শুধু রেহাই পায় তা নয়। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত অপকর্মের নায়কও অনেক সময় অবিশ্বাস্যভাবে ধরা পড়ে। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি বা টায়ার পাংচারের এক-আধটা অপ্রত্যাশিত ঘটনাও সব ছক ভেস্তে দিতে পারে। কিংবা ঠিক সময়মতো মিহির ঘটকের আবির্ভাব।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পর ঘরের দরজা-জানালা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করেও রেহাই পায়নি। শেষ পর্যন্ত টেপরেকর্ডারের শরণাপন্ন হয়েছে। বাইরের কোলাহলের চেয়ে এক পরদা জোরে সরোদ আর সেতারের যুগলবন্দী। দেবতারা মেয়ে ও পুরুষ নির্বিচারে নানা গুণের অধিকারী হয়েও সবাই কালা হয়ে গেলেন। কীভাবে তাই নিয়ে একটা গবেষণা শুরু করা যায় কি না ভাবছিল মিহির। বিশ্বকর্মার মতো

ডাকসাইটে যন্ত্রবিশারদ তো অন্তত নিজের জন্যে একটা হিয়ারিং এড্ তৈরী করতে পারতেন! তা হলে নিশ্চয় আজ স্পিকার ফাটিয়ে রেকর্ডগুলো বাজত না।

লোডশেডিংয়ের একমাত্র উপকারিতার কথা ঠিক সাড়ে আটটায় টের পেল মিহির। অন্ধকারে যে এত শান্তি কে জানত। তিনটে বাড়ি পেরিয়ে চার তলার ফ্ল্যাটে একটা চামচ খসে পড়লেও এখন শুনতে পারে সে।

ভ্যাপসা গরম না থাকলে হয়তো ইজিচেয়ারে ঘুমিয়েই রাত কেটে যেত। এখনও কারেন্ট আসেনি। এতক্ষণে খেয়াল হল জানলাগুলো বন্ধ। তৃতীয় জানালাটা খুলে পেছন ফেরার আগেই গায়ের রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ তাকে শিউরে দিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সেই শব্দ। শুরু না হতেই যেন শেষ। একেবারে আশপাশের ব্যাপার নয়। পাড়ার প্যাণ্ডেলে মাইক চললে শুনতেও পেত না। কিন্তু দূর থেকে ভেসে এলেও ভয়াবহতা একটুও কমেনি। আতঙ্কে ভরা যেন একটা প্রতিবাদ। নিশ্চয় ব্যর্থ প্রতিবাদ। মুহূর্তের ব্যবধানে পর পর জোরালো হুইসেলের আওয়াজ পরিস্থিতিটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল।

টর্চের আলোর রিস্টওয়াচে দেখল দশটা পঁচিশ। চটিতে পা গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মিহির। একফালি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাববার চেষ্টা করছে শব্দটা কোত্থেকে এল। ওদের রাস্তা থেকে নিশ্চয় নয়। লোডশেডিং হলেও অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে। কোনও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই পথটায়।

ঘরে ঢুকে চাবিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিচ্ছে, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ কানে এল। ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটা কথাও।

মিহির পেছন ফিরে তাকাবার আগেই তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। দুটো গলা শুনেই চিনেছে। ক্লাবের ছেলে। দলে অবশ্য পাঁচ-ছ'জন আছে।

"মিহিরদা, শিগগির!"

"জগুবাবু...."

"একেবারে শেষ!"

সকলে মিলে ছুটতে শুরু করেছে। মিহির ভাবে, হুইসেলের শব্দ শুনেই বোঝা উচিত ছিল যে, পাড়ার ভলান্টিয়াররা টহল দিচ্ছিল। কিছুদিন ধরে বেজায় চুরি শুরু হয়েছে এ-পাড়ায়। নাইট গার্ডের ব্যবস্থা চালু করেছে ক্লাবের ছেলেরাই। তাও প্রায় দিন দশেক হল। নাইট গার্ডরা রাস্তায় ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েছে ঘটনাটা। তিন তলার ওপর থেকে জগু বাবু ছিটকে পড়েছেন রাস্তার ওপরে।

মিহিরের বাড়ির ঠিক পেছনের রাস্তায় জগবন্ধু রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছবার আগেই আলো এসে গেল। একটা স্ট্রিটল্যাম্পের আলো পড়েছে জগবন্ধুর লণ্ডভণ্ড দেহের ওপর। খালি গা, ধুতিটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। শরীরটা ডান পাশে কিছুটা কাত

হয়ে আছে, একটা পা দুমড়ে রয়েছে আর একটার নীচে। বেশ কয়েকজন গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার হালদার নিচু হয়ে বসে পরীক্ষা করছেন।

দেখেই বোঝা যায়, করতে হয় তাই করা। জগুবাবুকে আর বাঁচাবার কোনও উপায় নেই।

হালদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিহিরবাবু! সরি...."

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?" মিহির জিজ্ঞেস করল।

হালদার বললেন, "আমার বাড়ি থেকেই ওরা খবর দিয়েছে। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স। স্পট ডেড। আমি তো মিনিট তিনেকের মধ্যে এসেছি। কিছু করার নেই।"

সমীর মিহিরের হাত টেনে বলল, "ওই দেখুন, তিনতলার দরজাটা খোলা, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে!"

দু'পা পিছিয়ে এসে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল মিহির।

দোতলা বাড়ি। তিনতলায় শুধু একটা ঘর। মোটর গ্যারাজের মালিক জগবন্ধু রায় বছর ছয়েক হল বাড়ি তৈরি করে এখানে বাস করছেন। কিন্তু বাড়ির কাজ শেষ করতে পারেননি। বাইরের দেওয়ালে কোথাও প্লাস্টার নেই। দোতলা ও তিনতলার কয়েকটা দরজার সামনে লোহার শিকগুলো শুঁড় বার করেই জানান দিচ্ছে যে, এসব জায়গায় বারান্দা হওয়ার কথা ছিল। জগবন্ধু কোথা থেকে মরণঝাঁপ দিয়েছেন সেটার হদিশ পাওয়ার জন্য গোয়েন্দার চোখের প্রয়োজন নেই। তিনতলার ঘরটার দরজা খোলা, আর তার সামনেই একটা লোহার শিক থেকে ঝুলছে একফালি সাদা কাপড়। জগবন্ধুর পড়ার সময় ধুতিটা আটকে গিয়েছিল।

ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। মিহির বলল, "দীপক, ডেডবডি যেন কেউ টাচ না করে!"

"আমরা কর্ডন করেই রেখেছি।"

অরুণ বলল, "বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। প্রচুর কলিং বেল টিপেছি। সাড়া পাইনি।"

"তা ছাড়া পুরো বাড়ি তো ঘুটঘুট করছে।" সমীর জানাল।

"ইন ফ্যাক্ট, আমি আজ এই রাস্তায় তখন টহল দিচ্ছিলাম। বলতে গেলে দুশো গজের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটেছে। অবশ্য আমার চোখের সামনে নয়, পেছনে।" কথাগুলো বলতে-বলতেই যেন গা শিরশির করে দীপকের।

মিহির বলল, "আচ্ছা! তারপর কী করলি তুই?"

"পেছন ফিরেই হুইসল দিয়ে ছুটে এলাম। না না, টাচ করিনি। তারপর অবস্থা দেখে বরাবর হুইসল দিতে লাগলাম। তখনও একবার বাড়ির দিকে ভাল করে

দেখেছি। কোনও ঘরেই কোনও আলো ছিল না।"

হাতের ইঙ্গিতে দীপক, অরুণ ও সমীরকে নিয়ে রাস্তার অপর পারে অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে সরে এল মিহির।

"তুই তা হলে জগুবাবুর পড়ার পরমূহূর্ত থেকেই বলতে গেলে বাড়ির সামনে রয়েছিস?"

"হ্যাঁ মিহিরদা।"

"কাউকে বেরোতে দেখিসনি বাড়ি থেকে?"

"কেউ না। তা ছাড়া মিনিটখানেকের মধ্যেই আমাদের পুরো পার্টি এসে পড়েছে। তারপর আলোও এসে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকার থাকলেই বা কী। ওই তো সদর দরজা। আর পাঁচ হাতের মধ্যে...."

"বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য অন্য কোনও পথ নেই?"

অরুণ ও সমীর সমস্বরে জানিয়ে দেয়, "নেই।"

খানিকটা যেন আপন মনেই বলে মিহির, "এক, যদি কোনও জানলা-টানলা খুলে কোনও জায়গা দিয়ে...."

সমীর বলে, "মিহিরদা, মনে হচ্ছে তোমার যেন একটা কিছু সন্দেহ হয়েছে। সুইসাইড নয়?"

মিহিরের হয়েই দীপক যেন উত্তর দিল, "জগুবাবুর চিৎকারটা....প্রচণ্ড একটা ভয়...."

ঠিক এই কথাটাই ঘুরছিল মিহিরের মনে আত্মহত্যা করার সময়েও মানুষ শেষ মুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু জগুবাবুর আর্তনাদটাকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার সময়েই বরং এমন একটা আর্তরব গলা চিরে বেরিয়ে আসাটা স্বাভাবিক। আবার অন্যদিকে শরীরটা যেভাবে পড়ে রয়েছে, ঠিক পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার মতো ভঙ্গি নয়। সেক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়াটাই প্রত্যাশিত। অবশ্য ধুতিটা ফেঁসে গিয়েছিল শিকের সঙ্গে, তার জন্য যদি এক....

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিহির বলল, "পুলিশ আসার আগে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বাড়ির ভেতর যতক্ষণ না ঢোকা যাচ্ছে...."

"না মিহিরদা, পুলিশ আসার আগেই বোধ হয় ঢুকতে পারা যাবে। শিউশরণ জগুবাবুর ভাগনেদের ডাকতে গেছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।"

মিহির ঠোঁট থেকে সিগারেটটা সরিয়ে ভুরু উঁচু করে তাকাল অরুণের দিকে।

"চার ভাগনে মিলে আজ যাত্রা দেখতে গেছে। ওই মহাপূজা সমিতির ওখানে। শিউশরণ পাশের রায়দের বাড়ির ড্রাইভার। ও জানত। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি নিয়ে

ছুটেছে খবর দিতে।

অরুণের কথা শেষ হওয়ার আগেই মোড়ের মাথায় গাড়ির হেডলাইট বাঁক নিল। পর পর দুটো গাড়ি আসছে। পুলিশের জিপ নয়।

গাড়ি থামার আগেই মিহির এক ঝটকায় সিগারেটটা ফেলে অভ্যাসবশত পা দিয়ে সেটা পিষতে-পিষতেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল, তারপর বলল, "দীপক, অরুণ—আগে আমি ওই বাড়িতে ঢুকব। তোরা দুজন শুধু আমার সঙ্গে থাকবি। তোরা ওদের চিনিস বলেই বলছি। আর সমীর, তুই বাইরের দরজায় থাকবি। পুলিশ এলে বলে দিস।"

সবাই ক্লাবের ছেলে। না হলে এত সহজে তাদের হুকুম উপস্থিত লোকে মানত না। দীপক ও অরুণ প্রায় টেনে এনেছে অমলকে। তারই কাছে বাড়ির চাবি। বাকি তিন ভাই বাইরে রয়েছে? মিহির বলেছে, একজন সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট।

অমলের মুখে কোনও কথা নেই।

এখনও সে হতচকিত। পুরো ব্যাপারটা যেন উপলব্ধি করতে পারছে না। যন্ত্রের মতো নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে।

ইয়েল লকে চাবি ঢুকিয়ে দরজার পাল্লা ঠেলামাত্র খুলে গেল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অমল হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকের সুইচ বোর্ডে দুটো সুইচ টিপছে।

একফালি প্যাসেজের সামনে একটা ঘর আর এই প্যাসেজের ডান ধার দিয়েই উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি।

চারধারে চোখ বুলিয়ে মিহির জিজ্ঞেস করল, "একতলা ও দোতলায় কি আপনারা চার ভাই থাকেন?"

অমল বলল, "না, আমরা সবাই দোতলায় থাকি। একতলায় শুধু একটা বসার ঘর ব্যবহার করা হয়। বাকি সব বন্ধ আছে।"

"বন্ধ মানে কি চাবি দেওয়া?"

"না, ছিটকিনি।"

"দোতলায় আপনারা কি নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়েছিলেন?"

"না, না, তালা দেওয়া নেই। শুধু বাইরে থেকে বন্ধ। বাড়িতে আছে কে! কাজের লোকও তো নেই।"

"বেশ!" সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করতে-করতেই মিহির বলল, "শোন অরুণ, তুই একতলা, আর দীপক তুই দোতলাটা ইন্সপেক্ট করে আয়। প্রত্যেকটা ঘর, বাথরুম, সব দেখবি। কোথাও কোনও জানলা বা দরজা খোলা আছে কি না।"

অরুণ তড়বড় করে বলল, "যেখান দিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ পালাতে পারে...."

"হ্যাঁ। সেইটাই উদ্দেশ্য। চলুন, অমলবাবু, আমরা সোজা তিনতলায় যাই।"

অমলকে অনুসরণ করে সিঁড়িতে উঠতে মিহির শুনল আপন মনে বিড়বিড় করছে অমল, "ভাবা যায় না! ভাবা যায় না! অসম্ভব।"

মিহির জিজ্ঞেস করল, "জগুবাবু কি তিনতলাতে থাকতেন?"

"হ্যাঁ!" সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিহির বুঝল এ সেই জাতের একজন যাকে খুঁচিয়ে প্রশ্ন না করলে কিছু জানা সম্ভব নয়।

"আপনার মামার আত্মহত্যা করার কী কারণ থাকতে পারে।"

"ব্যবসাটা কিছুদিন তেমন ভাল যাচ্ছিল না।"

"আর কিচ্ছু নয়?"

"আমি তো জানি না।"

"কিন্তু আপনি তো আজ বেশ অবাক হয়েছেন দেখলাম!"

"হ্যাঁ, হয়েছি। উইলসন কম্পানি আমাদের বহুদিনের বড় কাস্টমার। তারা অন্য গ্যারাজে চলে যাওয়ায় মামা একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা বলে...."

তিনতলায় পৌঁছে ছাতের দরজার ছিটকিনি খুলল অমল। একফালি ছাত পেরিয়ে একপাশে জগুবাবুর ঘর।

মিহির বলল, "মামাকে একেবারে তিনতলায় আটকে রেখে সবাই মিলে যাত্রা শুনতে বেরিয়ে গেলেন?"

"মামাকে খাবার দিয়ে রোজই রাত্তিরে আমরা ছাতের দরজা বন্ধ করে নীচে নেমে যাই।"

জগুবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছে মিহির দেখল, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

"বন্ধ!" বলল মিহির।

অমল এগিয়ে এসে চাবির তোড়া থেকে একটা ঢুকিয়ে দিল ইয়েল লকে। একটা আধপ্যাঁচ, তারপরে একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল।

অমলকে বাধা দিয়ে মিহির নিজে প্রথম ঢুকল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। উলটো দিকের দেওয়ালে সেই ভয়ঙ্কর দরজাটা যেন আবছা একটা আলোর আয়তক্ষেত্র। রাস্তার আলো সরাসরি ঘরে ঢোকার কোনও সুযোগ নেই। ঘরের দুটো জানলা খোলা কিন্তু তাতে দুর্ভেদ্য লোহার গ্রিল্।

"আলো জ্বেলে দিন।" বলল মিহির।

আলো জ্বালার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দীপক আর অরুণ ধুপধাপ করে ঘরে এসে ঢুকল। একতলা-দোতলা মিলিয়ে পাঁচটা জানলা খোলা ছিল কিন্তু প্রত্যেকটাতেই পদ্মফুলওলা এমন লোহার গ্রিল যে সেখান দিয়ে কারও ঢোকা বা বেরনো সম্ভব

নয়।

ঘরের বাঁ দিক চেপে একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ওরা। তারই ঠিক বিপরীতে পশ্চিমের দেওয়ালে দরজা দিয়ে পড়ে গেছেন জগবন্ধু। ঘরটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সেই ভাবেই লম্বা করে পাতা রয়েছে খাটটা। খাট না বলে পালঙ্ক বলাই ভাল। প্রাচীন কালের কারুকার্যওলা বিশাল চেহারার বাংলা খাঁট। ঘরের জানলাগুলো শুধু উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে। পুব এবং পশ্চিমে দুটো করে দরজা। যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে তার ডান পাশের দরজাটি বাথরুমের। পশ্চিমের দেওয়ালের দ্বিতীয় দরজাটি বন্ধ রয়েছে। তার সামনে এলোমেলো ও ময়লা জামাকাপড় ভরা একটা আলনা। একটা কাঠের আলমারি, ছোট্ট তেপায়া একটা টেবিল আর খাটের নীচে কয়েকটা স্টিল ট্রাঙ্ক। আর আছে দরজার পাশেই কয়েক জোড়া জুতো। ঘরের শ্রীহীন দশাটা বেশ চোখে পড়ে।

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিহির লক্ষ্য করল, মশারির ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় কোন দিক দিয়ে জগুবাবু নেমেছিলেন। মশারির ওই একটা পাশই শুধু গোঁজা নেই, ঝুলে পড়েছে।

খাটের পাশ ঘুরে আলনাটার সামনে এসে দাঁড়াল মিহির। জামা-কাপড়ের স্তূপের পেছনে দরজাটা শুধু ছিটকিনি তুলেই বন্ধ নয়, আড়াআড়িভাবে ইংরেজি এক্সের একটা শুধু রেখার ভঙ্গিতে কাঠ আঁটা। ভুলক্রমেও যাতে এই দরজা কেউ না খোলে। পশ্চিমের দুটো দরজা—তার কোনওটার সামনেই বারান্দা তৈরি হয়নি।

অভিশপ্ত দরজাটাকেও একইভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জগবন্ধু আজ নিজের হাতে সেটিকে মুক্ত করেছেন। তার প্রমাণও চোখের সামনে। দরজা-আঁটা কাঠটা এক পাশে দাঁড় করানো আর মেঝের ওপর গড়াচ্ছে একটা স্ক্রু ড্রাইভার।

চার হাত-পায়ে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে একটু চোখ বোলাতেই মিহির চারটে মরচে ধরা স্ক্রুয়েরও সন্ধান পেয়েছে। দরজার ফ্রেমের ওপর দু' পাশে দুটো করে স্ক্রু লাগানো ছিল। স্ক্রুয়ের চেহারা দেখে মনে হয় বয়সে তারা এই বাড়ির চেয়ে ছোট নয়।

দীপক আর অরুণ নিঃশব্দে অনুসরণ করছে মিহিরকে। অমল দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

মিহির স্ক্রুগুলো মেঝের ওপর যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বলল, "কেউ কোনও জিনিস ভুলেও যেন টাচ করবেন না, তা হলে পুলিশে অকারণে হইচই বাধাবার একটা সুযোগ পাবে।"

মিহিরের পেছনে ছায়ার মতো রয়েছে তার দুই চেলা। কোন দিকে তাকাচ্ছে, কী দেখছে—সবটাই নীরবে অনুধাবনের চেষ্টা।

মিহির তেপায়া টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট-বড় নতুন ও ধুলো-মলিন শিশি-বোতলের স্তূপ। হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিকের অরণ্যে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ রসভঙ্গ করছে। লাল পলিথিনের ঢাকনার নীচে গেলাস ভর্তি জল। তার পাশেই জগুবাবু স্টিল-ফ্রেমের চশমা।

বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকল মিহির। আলোর সুইচটা বাথরুমের ভেতরে ডান দিকে। ছোট্ট বাথরুম কিন্তু খুব পরিষ্কার। দেখে মনে হওয়ার কথা, জগুবাবু নিজের ঘরের চেয়ে বাথরুমের বেশি যত্ন নিতেন।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল। তারপরেই কলিং বেলের ডাক। মিহির বলল, "অমলবাবু, আপনি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিন। মনে হচ্ছে পুলিশ এসে গেছে।"

অমল পেছন ফিরতেই মিহির বলল, "আপনার ভায়েদেরও এবার ডেকে আনুন ওপরে।"

চোখের ইঙ্গিতে দীপক ও অরুণকে অপেক্ষা করতে বলেছে মিহির। এবার অমলের কান এড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "দ্যাখ তো, ঘরের কোথাও টর্চ বা মোমবাতিটাতি আছে কি না! কোনও জিনিসে কিন্তু হাত নয়!"

বোঝা গেল পুলিশ আসার আগেই কাজ সারতে চাইছে। মিহির নিজেও উঁকিঝুঁকি মারতে-মারতে হঠাৎ খাটের পায়ের কাছে এসে যেন নিশ্চল হয়ে গেল। দীপক জিজ্ঞেস করল, "কী হল মিহিরদা?"

"নাঃ, তেমন কিছু নয়। খাটের পায়াটা দেখছি নড়ে গেছে। পুরনো দাগ বেরিয়ে পড়েছে পাশ দিয়ে।"

"এই যে, একটা হ্যারিকেন এখানে!" অরুণের গলায় আবিষ্কারের আনন্দ। "কিন্তু চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না—না, তেল নেই। একেবারে খটখটে। কেরোসিনের গন্ধ পর্যন্ত নেই।" অরুণ চার হাত-পায়ে ঝুঁকে পড়ে নাক বাড়িয়েছে কিন্তু হাত দেয়নি।

মিনিট দুয়েক সময় পেয়েছিল ওরা যথেষ্ট। ঘরে বা বাথরুমে কোনও টর্চ বা মোমবাতি নেই। দীপক বলল, "আচ্ছা, বিছানাটা তো দেখা হয়নি? বালিশের নীচে...."

মিহির ঘার বাঁকিয়ে দীপকের মুখের দিকে তাকাল। কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "যাক গে, থাকলেও কিছু যায় আসে না। টর্চের কাজ সেরে বালিশের তলায় রেখে তারপর জগুবাবু লাফ মারলেন...."

"আপনারা এখানে কী করছেন, অ্যাঁ?" দু'জন সেপাই সমেত থানার বড়বাবু ঘরের দরজার কাছ থেকেই ধমকে উঠলেন। রুক্ষ বিরক্ত স্বর। সদুত্তর না পেলেই

চালান করে দেবেন এক্ষুনি, এরকম একটা ভাব।

মিহির ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, "আসুন, আসুন মিস্টার বোস। আমরা মন দিয়ে আত্মহত্যার বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করছি।"

"আরে মিস্টার ঘটক! আপনি এসেছেন সেটা তো জানতাম না। ভাবলাম পাড়ার ছেলেরা আবার এসব ব্যাপারে কেন মাথা গলাচ্ছে!" মিস্টার বোস এখন নিশ্চিন্ত।

মিস্টার বোসের হাসিভরা হ্যাণ্ডশেক থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই ইলেকট্রিক শক খাওয়া লোকের মতো চেঁচিয়ে উঠল মিহির, "না! এক্কেবারে না।"

সবাই তটস্থ। মিহির ধমক লাগাল, "একদম ছোঁবে না!"

একটি অতি উৎসাহী সেপাই মাটির ওপর পড়ে থাকা স্ক্রু ড্রাইভারটাকে কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য সবে নিচু হয়েছিল।

মিস্টার বোস বললেন, "মনে হচ্ছে, অল রেডি আপনি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেয়েছেন?"

মিহির বলল, "দুর্গন্ধ!"

"আপনি কি মশাই এর মধ্যেও খুন-খারাপি সাস্‌পেক্ট করছেন নাকি! এ তো সিম্পল কেস অব সুইসাইড।"

"সুইসাইড? হ্যাঁ, তা ঠিক—আত্মহত্যা। তবে খুব কি সরল ব্যাপারটা?"

মিস্টার বোস কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। "কই অমল-বিমলদের তো দেখছি না? কোথায় গেল?" মিহির জিজ্ঞেস করল।

"আপনি ওদের তলব করেছিলেন বুঝতে পারিনি। আমিই উঠতে দিইনি। বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

"ভালই হয়েছে। চলুন, আমরাও নীচে যাই। এই ঘরটা আপাতত পাহারাদারের জিম্মায় থাকুক। আমি শুধু আপনার পারমিশন নিয়ে একটা জিনিস নিচ্ছি।" মিহির কয়েক পা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের ডগাটা ধরে সেটাকে সন্তর্পণে তুলে নিল।

মিহিরের নির্দেশে একতলার বসার ঘরেই ঢুকেছে সকলে। অরুণ ও দীপকের সঙ্গে এখন সমীরও যোগ দিয়েছে।

"মিস্টার বোস, আপনার উপস্থিতিতেই আমি কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"সার্টেনলি! চার ভাইকে কি একসময়ে ডাকব, না, আলাদা করে?"

"না, সকলের আগে শিউশরনকে ডেকে পাঠান। পাশের বাড়ির ড্রাইভার। ওদের চার ভাইকে যে বেরোতে দেখেছিল আজ।"

শিউশরন পেল্লাই কুর্নিশ ঠুকে ঘরে ঢুকল।

"বোসো শিউশরন।" বলল মিহির, "তুমিই তো অমলবাবুদের একটু আগে যাত্রার আসর থেকে ডেকে এনেছ? কী করে জানলে ওরা ওখানে রয়েছে?"

শিউশরন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ভাঙা বাংলায় জানাল যে, চার ভাই ওর চোখের সামনেই গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে। তারপর ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করায়। কমল জিজ্ঞেস করে, "কী শিউশরন, যাত্রা শুনতে যাবে নাকি? চলো আমাদের সঙ্গে। মহাজাতি সমিতিতে জমাটি পালা।"

মিস্টার বোস প্রশ্ন করেন, "চার ভাই গাড়িতে ছিল, তুমি দেখেছ?"

"জি সাহাব!"

"হয়তো চারজন লোক ছিল কিন্তু তার মধ্যে একজন..."

শিউশরনের ভঙ্গি বিনীত হলেও বক্তব্যে অটল।

"ঠিক ক'টায় ওরা বেরিয়েছিল?" মিহিরের পরবর্তী প্রশ্ন।

"আট বাজকর পঁচ্‌চিশ।"

"বাবা, তুমি যে একেবারে স্টেশনের ঘড়ির মতো হিসেব দিচ্ছ।" মিস্টার বোসের রসিকতায় কান না দিয়ে মিহির বলে, "তোমাকে কি বাবুরা কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, ক'টা বাজে?"

এবারে শিউশরন অবাক হয়, "লেকিন আপ কেইসে..."

"সেই জন্যই তোমার স্পষ্ট মনে আছে। ঠিক আছে শিউশরন। ধন্যবাদ।"

শিউশরনের বেরনো আর বিমলের প্রবেশের ফাঁকে মিস্টার বোস মন্তব্য করলেন, "মনে হচ্ছে অ্যালিবাই একটা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সত্যিই ওরা চারজন যাত্রার ওখানে এতক্ষণ ছিল কি না..."

বাধা দিয়ে সমীর বলল, "ওটা নিয়ে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কম-সে-কম জনা-চারেকের সঙ্গে এরই মধ্যে কথা হয়েছে যারা প্রত্যেকে বলেছে, ওরা যাত্রা দেখছিল। আটটা পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ থেকে শিউশরন ডাকতে না যাওয়া অবধি সারাক্ষণই..."

মিহির হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আমাদের এখানে তো লোডশেডিং ছিল, ওখানে যাত্রা হচ্ছিল কী করে?"

"পাশের পাড়া হলেও ওটা বোধ হয় অন্য ফেজে।"

দরজায় টোকা দিয়ে বিমল ঘরে ঢুকল। বেশ আদবকায়দা রপ্ত করেছে। চুলের বাহার ও পোশাকের পরিবর্তন সত্ত্বেও ভাইয়ে-ভাইয়ে মুখের মিল ধরা যায়। বয়সের ফারাক বেশি নয়। ছাব্বিশ কি আঠাশ।

"জগুবাবুর মৃত্যুতে আপনারা চার ভাই-ই শুধু লাভবান হবেন, তাই না?"

মারকুটে ব্যাটসম্যানের মতো শুরু করল মিহির।

বিমল ম্লান হেসে বলল, "আমরা ছাড়া তো মামার আর কেউ নেই।

প্রথম প্রশ্নের খেই ধরে জগুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু কিছু জানা গেল। রীতিমত স্ট্রাগ্‌ল করেছেন জীবনে। ট্রাক ড্রাইভার থেকে মেকানিক, তারপর নিজের গাড়ি ও গ্যারাজ। বিয়ে করার আর সুযোগ হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই চার ভাইকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের গাঁ থেকে। নিজের ভাগনেও নয়। কোন দূর সম্পর্কে পিসতুতো দিদির ছেলে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে মিহির বলল, "আপনারা তো সাড়ে আটটা নাগাদ আজ বেরিয়েছেন। জগুবাবুর সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়?"

"এই ধরুন, বেরোবার মিনিট পাঁচেক আগেই। ওঁর খাওয়ার থালাটা আনতে গেছলাম। মামা সাড়ে সাতটার মধ্যেই রোজ খাওয়া সেরে নেন।"

"আপনাদের বাড়িতে তো কাজের লোক নেই। রান্নার..."

"না, না—রান্নার লোক সব খাবারদাবার বেড়ে ওই সাতটা নাগাদ চলে যায়। আমাদের মধ্যেই কেউ পরে গিয়ে থালা-বাসন নিয়ে আসে। মামা নীচে খেতে নামেন না।"

"আচ্ছা, আপনি যখন আজ থালাটা আনতে যান, জগুবাবুর কথাবার্তায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল? উনি নিশ্চয় জেগেই ছিলেন তখনও?"

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল বিমল, নিচু গলায় চোখ নামিয়ে বলল, "তখন তো আর বুঝিনি, এখন মনে হচ্ছে।" একটু থেমে যোগ করল, "মামা বলছিল, ব্যবসাটার দিকে আর-একটু মন দে, বুঝলি? সবাই মিলে..."

মিহিরের গলাটাও এবার ব্যথিত শোনাল, "সত্যিই বোঝা দুষ্কর। লোকে কী অর্থে কখন কোন কথাটা বলে! আচ্ছা, রাস্তার দিকের ওই সাঙ্ঘাতিক দরজাটা নিশ্চয়ই বন্ধই ছিল তখন? না হলে তো ঘরে ঢোকা মাত্রই আপনার চোখ পড়ত, তাই না?"

"বন্ধ ছিল বইকী। বাড়ি তৈরি হওয়ার পর থেকে যেটা কখনও খোলা হয়নি, হঠাৎ..."

"না, ধরুন, শুধু কাঠের টুকরোটা খোলা রয়েছে কিন্তু পাল্লা দুটো বন্ধ। ভাল করে ভেবে বলুন।"

একটু সময় নিল বিমল, তারপর দু-তিনবার জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, আমার স্পষ্ট মনে আছে পুরো বন্ধ ছিল। হ্যাঁ, বন্ধ।"

বিমলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল মিহির। মিস্টার বোসের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর ইন্টারভিউয়ের দরকার নেই। তবে ওই অধিকন্তু ন

দোষায় না কী যেন বলে, তারই খাতিরে নিয়মরক্ষা করব।"

বিমলকে যে-প্রশ্ন দিয়ে প্রথম আঘাত করেছিল, বাকি তিন ভাইকেও তাই করেছে মিহির। অবশ্য উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া এক হয়নি। একজন রেগেছে, একজন বিস্মিত হয়েছে আর শেষজন ব্যথিত। মিহির জনে-জনে বাকি তিন ভাইকে আর-একটি শুধু প্রশ্ন করেছে, "রাস্তার দিকের দরজাটা কি খোলা ছিল?" সকলেই বলেছে, না, তবে তারা মামার ঘরে শেষবারের মতো ঢুকেছে বিভিন্ন সময়ে। বিমল থালা নিয়ে আসার পরে নির্মল ঢুকেছিল যাত্রা দেখতে বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে। সেও জোর দিয়েই বলেছে যে, দরজায় কাঠ সাঁটা ছিল। না হলে, ঠিকই চোখ পড়ত তার।

চতুর্থ ভাইকে বিদায় করার পর মিহির বলল, "মিস্টার বোস, আসল কাজ খতম। তবে অদূর ভবিষ্যতে বিচারকদের তুষ্ট করার জন্য দুটি দায়িত্ব আপনি হয়তো পালন করতে পারেন। এক, এই স্ক্রু ড্রাইভারের হাতলের ছাপটা পরীক্ষা। দুই, কমলকে লক-আপে ভরে আপনাদের একটু ব্যবস্থা করা। স্বীকারোক্তি।"

মিস্টার বোস একটু অবাক হয়েও প্রশ্ন করলেন, "হাতের ছাপের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সবাইকে ছেড়ে কমল কেন?"

"এই চার ভাইয়ের মধ্যে ওইটাই সবচেয়ে ভিতু-দুর্বল প্রকৃতির। ইন্টারোগেশনের মধ্যেই সেটা..."

মিহিরের প্রথম কটু প্রশ্নবানের তাৎপর্য এবার সকলেই বুঝেছে।

দীপক জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু মিহিরদা, ওরা তো সবাই যাত্রা দেখছিল। জগুবাবুকে কে ঠেলে ফেলল তা হলে?"

"কেউই ঠেলে ফেলেনি। জগুবাবু স্বয়ং ওই দরজা দিয়ে নীচে...না, লাফ মেরেছেন বলব না, বলব, পড়ে গেছেন।"

মিহিরের নির্দেশে চার ভাইকেই এবার একসঙ্গে ডেকে আনা হয়েছে ঘরে। অমল সবচেয়ে সপ্রতিভ। চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল। লাফিয়ে উঠল মিহির, "বসছিস কী? দাঁড়িয়ে থাক! ওই দেওয়ালে পিঠ রেখে! যা!"

মিহিরের রুদ্রমূর্তি দেখে প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিল অমল। চারভাই যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন। মিহির তাদের সামনে দিয়ে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা টহল দিতে-দিতে ছেঁড়া-ছেঁড়া বাক্যে একের-পর-এক রহস্যের দরজা খুলে চলেছে।

"প্রথম সন্দেহ ওই আর্তরব। যা আত্মঘাতী মানুষের পক্ষে বেমানান। দ্বিতীয় সন্দেহ, লোহার শিকে কাপড়ের ফালি। শুধু তাই নয়, জগুবাবু পড়ার সময় ওই শিকে ধাক্কা খেয়েছেন। তা না হলে ওইভাবে তিনি পড়তেন না। যে আত্মহত্যা

করবে, সে ওটা বাঁচিয়েই করবে। তৃতীয় সন্দেহ, অমল আমাদের নিয়ে জগুবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছে নির্দ্বিধায় চাবি ঢুকিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিল। দরজায় ইয়েল লক। ভেতর থেকেও তো জগুবাবু বন্ধ করে রাখতে পারতেন। তা হলে চাবি ঘুরিয়েও খুলত না। এতটা নিশ্চিত হল কী করে? বিশেষ করে এরকম দুর্ঘটনার পর? নেক্সট, এবার আর সন্দেহ নয়, প্রমাণ। যে-দরজা জগুবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা আঁটা ছিল একটা কাঠের ফালি দিয়ে, স্ক্রু লাগিয়ে। মরচে ধরা চারটে স্ক্রুও রয়েছে, রয়েছে একটা স্ক্রু ড্রাইভারও। কিন্তু—"

হঠাৎ চার ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল মিহির। না, কোনও বিকার নেই তাদের। মিহির আবার শুরু করল, "কিন্তু এতদিনের পুরনো স্ক্রু, অন্ধকারের মধ্যে খুললেন জগুবাবু, তবু তাতে কোনও আঁচড়ের চিহ্নটি নেই। একবারও হাত ফসকে স্ক্রু ড্রাইভার স্লিপ করেনি বা স্ক্রুয়ের মাথায় স্ক্রু ড্রাইভার বসাবার চেরা ঘাটটার বাইরে পড়েনি।"

"মামাবাবুর মতো মেকানিক..."

অমলের ঔদ্ধত্যকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল মিহির, "কিন্তু বিশ্বকর্মাও অন্ধ হলে হাতড়াতে বাধ্য। সাড়ে আটটা থেকে লোডশেডিং। ঘরে কোনও মোমবাতি বা টর্চ নেই। চশমাটা রয়েছে টেবিলে। আত্মহত্যার সব ব্যবস্থা করার পর কেউ নিশ্চয় চশমাটা ঘরের আর-এক প্রান্তে টেবিলের ওপর খুলে রেখে আসে না।"

আবার অমলের অচঞ্চল গলা শোনা গেল, "মনে হচ্ছে ঘরে একটা হ্যারিকেন..."

"আছে, কিন্তু একফোঁটা তেল নেই। বহুদিন হাত পড়েনি। এর থেকে কী দাঁড়াচ্ছে তা হলে ব্যাপারটা? এই চার মক্কেলই আজ যাত্রা দেখতে বেরোবার আগে সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। হয় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন মামাকে, তারপর ওই দরজাটি খোলা কিংবা জগুবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ার পর—বাই দ্য বাই, ওই দরজার ছিটকিনিটাতেও দেখবেন তেল দেওয়া হয়েছে। এটা নিশ্চয় আত্মহত্যাকারীর..."

মিস্টার বোস উঠে দাঁড়ান, "ঘটক! মিহির!" উত্তেজনায় সম্বোধনটাও ঠিকভাবে করতে পারেন না। "সবই মানছি কিন্তু সাড়ে দশটার সময় জগুবাবু যখন..."

মিস্টার বোসের দিকে পেছন ফিরে মিহির চার ভাইয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে একমুখ হাসি নিয়ে বলল, "সত্যি, বাংলা খাটের বেজায় ওজন। ও জিনিস আপনারা একসঙ্গে চার জনে হাত না লাগালে ঘোরাতে পারতেন না।"

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে কমল মেঝের ওপর পড়ে গেল!

"কি বলেছি? হত্যাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল চরিত্র।"

মন্তব্যের সঙ্গে একটা সিগনিফিকেন্ট ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিল মিহির থানার বড়বাবুর

কাছে।

"প্লিজ, মিহির, শেষ করুন।" মিস্টার বোসের অনুরোধ।

"জগুবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর তার খাটটাকে এই চার খুনে মিলে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আপনি ওপরে গিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, যে ঘুরিয়ে বসাবার পর খাটের চারটে পায়া ঠিক দাগে-দাগে মেলেনি—মেঝেতে পুরনো দাগের সঙ্গে একটু ছুট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি বুঝেছেন এবারে? জগুবাবু হোমিওপ্যাথির ভক্ত হলেও ডায়েবিনিজ খান, তার মানে তিনি ডায়েবিটিক। চশমা খুলে শোন। রাত্তিরে নেচারস কলে তাঁকে উঠতেই হেয়। আজও উঠেছিলেন, এবং অভ্যাসবশত, খাটের বাঁ দিক দিয়ে নেমে, সামনেই বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি খুলে...কিন্তু আজ তিনি তাঁর হিসেবে সব ঠিক করলেও যে-দরজাটা খুলেছিলেন সেটা বাথরুমের নয়, মৃত্যুর..."

"মাই গড়! মাই গড়!" কুড়ি বছরের পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মিস্টার বোস বিচলিত। দীপক, অরুণ ও সমীরের কথা না বলাই ভাল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় মিস্টার বোসের ফোন পেল মিহির। স্ক্রু ড্রাইভারে জগুবাবুর হাতের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে। অর্থ জলবৎ। পাঁচ-ছ' বছরের পুরনো স্ক্রু খোলার জন্য যেরকম হাতের মোচড় ও চাপ লাগে তাতে হাতের ছাপ সব ঘষটে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার কথা। জগুবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁর হাতের ছাপ বসিয়ে নিয়েছিল খুনিরা স্ক্রু ড্রাইভারের হাতলে।

দুই গোয়েন্দা দারোগা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মালদা থেকে কলকাতায় রাত্রিবেলা রকেট বাসে ঝড়ের বেগে চলেছি। হঠাৎ বাসটা দাঁড়িয়ে গেল, মানে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সশস্ত্র একদল ডাকাত বাসে উঠল, তারপর তারা কি করল, পরে বলছি। কিন্তু এই ডাকাতির পরই আমাদের বিহারের পূর্ণিয়া জেলার (আজকাল কাটিহার জেলার) মণিহারী গ্রামের বিহারী দারোগা অযোধ্যাপ্রসাদ ঝা-এর কথা মনে হলো। সবাই তাঁকে কড়ে খাঁ বলে ডাকত। এই কড়ে খাঁ নামের একটা ইতিহাস আছে। মণিহারীতে তখন একটি মাত্র দুর্গাপূজা খুব ঘটা করে হতো। এই পূজো বাঙালী, বিহারী, হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে করত। দুদিন থিয়েটার হতো। একদিন বাংলা, একদিন হিন্দী, আর একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন দারোগা অযোধ্যাপ্রসাদ ঝা স্টেজে উঠে দুহাতের দু'টি কড়ে আঙুল দিয়ে দুটো ভারি সাইকেল শূন্যে তুলে ধরে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তার পরদিন 'দেবলাদেবী' নাটকে খিজির খাঁর পার্ট করে

সবাইকে মাত করে দিয়েছিলেন। তারপরে গ্রামের রসিক ডাক্তারবাবু অযোধ্যাপ্রসাদের নাম পাল্টে কড়ে আঙুল দিয়ে সাইকেল তোলার জন্যে কড়ে এবং খিজির খাঁ পার্টের খাঁটা তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দারোগাবাবুর নতুন নামকরণ করলেন কড়ে খাঁ।

সত্যিই স্বাস্থ্যবান ছিলেন দারোগাবাবু। ছ'ফুটের উপর লম্বা। ঠোঁটের উপর মধ্যম ব্র্যাকেটের মতন পুষ্ট কালো গোঁফ, মাথার চুল ছোট ছোট করে কদমছাঁট করে কাটা, পিছনে গিঁট মারা ছোট্ট একটি টিকি। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, খেতেও পারতেন বেশ। আমের দিনে সকালের জল খাবার ছিল গোটা দশ বারো বড় বড় হিমসাগর আর বোম্বাই আম। এক একটা আম কামড়ে হেঁট হয়ে খেতেন। সামনেই একটা গামলায় খাঁটি ঘন দুধ। তাতে কড়ে খাঁর হাত মুখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আমের লাল হলুদ রস পড়ে দুধের গামলাটা গোধূলি আকাশের মতন হয়ে যেত। গামলায় প্রায় দু'সের মোষের দুধ থাকত। সব আমগুলি পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে দু'হাতে দুধের গামলাটি তুলে নিমেষের মধ্যে চোঁ চোঁ করে শেষ করে দিতেন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে পেটে হাত বুলিয়ে হিন্দীতে বলতেন 'কুছ হুয়া', মানে কিছু হলো। মণিহারীতে প্রচুর আম আর দুধ। সুতরাং সেই সময় কড়ে খাঁর প্রাতরাশের কোনো অসুবিধা হতো না। অন্য সময় প্রাতরাশ—দহিচুড়া। এক সের চিঁড়ে আর দু'সের মোষের দুধের টক দই। অনেক নিমন্ত্রণ বাড়িতে পুরো খাবার পর উনি খুব তৃপ্তি করে একশ'টা বড় বড় রসগোল্লা বা লেডিকেনি খেয়েছেন।

কিন্তু মানুষটার মধ্যে দুটো বিপরীত সত্তা ছিল। এমনি খুব আমুদে। গ্রামের ফুটবল মাঠে উনি খেলতেন, রেফারিং করতেন, থিয়েটারের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু কড়ে খাঁ নামটা আরেক দিক থেকে সার্থক। মানুষটা খুব কড়া ছিলেন। একরোখা গোঁয়ার টাইপের লোক ছিলেন। নিজের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁকে হাস্যাস্পদও হতে হয়েছে। মণিহারী গ্রামে সিনেমা ছিল না। ট্রেনে ওখান থেকে কাটিহার যেতে ঘণ্টাখানেক লাগত। কাটিহারে কোনো ভাল সিনেমা এলে, গ্রামের অনেকে সন্ধ্যের ট্রেনে কাটিহারে গিয়ে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে, রাত্রিটা ওয়েটিং রুমে থেকে, ভোরের ট্রেনে মণিহারী ফিরে আসত। কাটিহারে এলো 'অচ্ছুৎ কন্যা' ছবি। সবাই দেখতে যাচ্ছে। কড়ে খাঁকে সেই রসিক বাঙালী ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন দারোগাবাবু, দেখে আসি।

—থানা কে দেখবে? কড়ে খাঁ হিন্দীতে বলেন।

—আরে হাবিলদার সাহেব তো আছেন।

ডাক্তার বুঝিয়ে বলেন।

শেষে কড়ে খাঁ, ডাক্তারবাবু, আর কয়েকজন কাটিহারে সিনেমা দেখতে গেলেন।

সিনেমা থেকে রাত্রে ফিরে কড়ে খাঁ ওয়েটিং রুমে ঢুকে নিজের জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি খুলে আলনায় ঝুলিয়ে দিয়ে খালি গায়ে শুধু আণ্ডারওয়ার পরে শুয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু সাবধান করে দিলেন, চুরি হয়ে যেতে পারে!

কড়ে খাঁ আশ্চর্য হয়ে বলেন—হামারা চিজ্ চোরি হোগা!

তারপর যা বললেন তা বাংলায় হয়, কড়ে খাঁর নামে সমস্ত পূর্ণিয়া জেলা কাঁপে।

ভোরে কড়ে খাঁ উঠে নিজেই রাগে কাঁপতে লাগলেন, তাঁর জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি সব চুরি হয়ে গেছে। ঐ ছ'ফুট লম্বা। বিশালকায় কড়ে খাঁ খালি গায়ে শুধু একটা আণ্ডারওয়ার পরে প্রায় দিগম্বর হয়ে ট্রেনে করে মণিহারী ফিরলেন।

ওদিকে গ্রামের জমিদারের ম্যানেজার জ্ঞানবাবুর বাড়ি সিঁদ কেটে চুরি হলো। দারোগাবাবু গিয়ে দেখেই, প্রথমেই রাত্রে যে চৌকিদারের ডিউটি ছিল তাকে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বলেন, তুম ক্যা করতা থা—বদমাশ।

তারপর দারোগাবাবু গম্ভীরভাবে সামনে দাঁড়ানো লাল পাগড়ি পরা কনস্টেবলকে বলেন, চল ছেদির বাড়ি। ছেদি নামকরা সিঁধেল চোর।

ছেদির বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, ছেদির বৌ বলছে, ছেদির শরীর খারাপ, ঘুমুচ্ছে।

'তবিয়ৎ খারাপ' কড়ে খাঁ খেঁকিয়ে হেঁট হয়ে ওর ছোট দরজা দিয়ে প্রায় অন্ধকার খুপরির মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত ছেদির পিঠে মারেন এক লাথি। ছেদি হায়রে মারে বলে উঠে পড়ে। দারোগা পুলিশ দেখে আঁতকে ওঠে। কিন্তু সে ঝানু চোর। নিমেষে সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বীকার করে। কড়ে খাঁ তখন ছেদির মোটা টিকি ধরে তুলে বললেন—বল ম্যানেজারবাবুর গয়নার বাক্স কোথায় রেখেছিস? বলেই বেদম প্রহার। ছেদির গোটা-তিনেক ছেলেমেয়ে। তারা চীৎকার করে কাঁদে। ছোট মেয়েটা বাপকে খুব ভালোবাসে। বাপকে বাঁচাবার জন্যেই আঙ্গ ল দিয়ে সভয়ে পেছনের কচুবনটা দেখিয়ে দেয়। সেখানেই গয়নার বাক্স পাওয়া গেল। ছেদিকে দারোগাবাবু কোমড়ে দড়ি বেঁধে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে পূর্ণিয়া কোর্টে চালান করে দিলেন। ছেদির ছেলেমেয়ে আর বৌটার কি কান্না! দারোগাবাবু হুঙ্কার দেন—চোপ রও। সবাইকে পুঁতে ফেলব।

বলে দানবের মত রক্তচক্ষু দেখিয়ে চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ পর দেখা গেল, সেই কড়ে খাঁ চলেছেন, পেছনে সেই চৌকিদার। তার মাথায় একটা ঝুড়ি। ঝুড়িতে প্রায় সের পাঁচেক চাল, তার উপর আলু, বেগুন, পটল। চৌকিদারের হাতে একটা বোতলে সরষের তেল। ডাক্তারবাবু কড়ে খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?

কড়ে খাঁ গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—ছেদির বাড়ি।

—ছেদির বাড়ি?

—হ্যাঁ, ওর তো জেল হয়ে গেছে। ওর ছেলেমেয়ে বৌ শুনলাম না খেয়ে মরছে। তাই এই চাল ডাল তরকারি দিয়ে আসছি। যত সব ঝঞ্ঝাট।

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, আমার ছ'ফুট লম্বা কড়ে খাঁকে আরও অনেক বড় মনে হতে লাগল।

ওই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে একবার ডাকাতি হয়েছিল। ডাক্তারবাবু জানালা দিয়ে বন্দুক ছুঁড়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলেন। ডাকাতদের গায়ে অবশ্য বন্দুকের গুলি লাগেনি। কড়ে খাঁ থানা থেকে ডাক্তারবাবুর বন্দুকের আওয়াজ শুনেই নিজে খালি গায়ে একাই বন্দুক টোটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন এবং ডাকাতদের দুজনকে গুলি করে ঘায়েল করলেন। অন্য ডাকাতেরা পাল্টা আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু গ্রামের অন্য সব লোক লাঠি, বল্লম, বন্দুক, সড়কি নিয়ে এসে পড়ায় ঐ দুটো ঘায়েল হওয়া ডাকাতকে ফেলে তারা পালিয়ে গেল। তারপর আমরা শুনেছি, ঐ ডাকাতদের বিরাট দল। কিছু বড় বড় লোকও ওদের পিছনে আছে। তার পরদিন একটা ভিন গাঁয়ের নাম লম্বা লোক এসে গোপনে কড়ে খাঁকে বলল—আপনি ঐ ঘায়েল করা লোক দুটোকে ছেড়ে দিন। আর আপনি এই পাঁচ হাজার টাকা (আজকালকার দিনে ওটা পঞ্চাশ হাজার টাকা) নিন। কড়ে খাঁ কথাটা শুনে, সেই নাক লম্বা লোকটার নাকে যেইনা এক ঘুষি ঝাড়ল, সে লোকটার নাকটা ঝুলে শুঁড়ের মতন হয়ে গেল। তাকেও হাজতে পুরে ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেন, তার নাকটা ড্রেস করার জন্যে।

আমি আবার ফিরে আসি যেখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করেছিলাম। মানে মালদা থেকে কলকাতা বাসে যাচ্ছি, হঠাৎ বাসটা থামিয়ে কয়েকটা ডাকাত উঠল। তখন বোধহয় রাত্রি দুটো।

আমরা প্রথমে ভাবলাম, কয়েকটা প্যাসেঞ্জার উঠছে। তারপর দেখি, পরপর পুলিশ উঠছে। খাঁকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, মাথায় লাল টুপি। ওদের সঙ্গে একজন উঠল, যার পরনে জিনের ফুল প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, চোখে গগ্‌লস্, মাথায় কালো টুপি, হাতে রিভলবার। সেই লোকটা রিভলবার উঁচিয়ে বললে—যার কাছে যত টাকা, গয়না, ঘড়ি আছে সব এখুনি দিয়ে দিন।

একটা সপ্রতিভ প্যাসেঞ্জার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, কেন দেব?

—না দিলে জান দিতে হবে।

এবার বুঝলাম, এরা প্যাসেঞ্জার নয়, পুলিশ নয়, ডাকাত। দু'জন ভদ্রমহিলা আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শিশুরা ঘুমুচ্ছিল, উঠে পড়ল। ডাকাতদের লিডারের নির্দেশ মতো দুটো ডাকাত দুটো থলে নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে হুকুম করছে—দাও।

বাধা দেওয়া বৃথা। সবাই ভয়ে ভয়ে যার কাছে যা ছিল আস্তে আস্তে ঐ ডাকাতের থলেতে দিল, সেই অজ্ঞান মহিলাদের ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। তারা সবিস্ময়ে দেখে, সামনের মহিলাটি তাঁর চুড়িগুলো খুলে দিচ্ছেন। আমার কাছে শ'পাঁচেক টাকা ও একটা পুরনো টিসট রিস্টওয়াচ ছিল, খুলে দিয়ে দিলাম।

পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ডাকাতরা প্যাসেঞ্জারদের সমস্ত মালকড়ি নিয়ে নিল। এইবার ডাকাতদের সর্দারটা বললে—গোণ, কত টাকার মাল আছে।

একটা ডাকাত টাকা গুণতে লাগল, আর একটা ডাকাত ঘড়িগুলোর নাম দেখে এবং গয়নাগুলো সোনা, রূপো, কি গিল্টি, সেই বুঝে একটা ছোট ক্যালকুলেটার

দিয়ে হিসেব করতে লাগল। আর সর্দারটা একটা ছোট্ট ডাইরি বার করে ডট্ পেনে নোট করতে লাগল। বাইরে দেখি বাসের ড্রাইভার দুটো দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে পিছনে দুটো করে ডাকাত ছোরা উঁচিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, অদূরে শিয়ালের ও ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে ডাকাতের সর্দার হিসেব করে দেখল, তারা টাকা-পয়সা, ঘড়ি-গয়না মিলিয়ে তিন হাজার নয় শ' টাকার মতন পেয়েছে।

ডাকাতের সর্দারটা একটু ভেবে আমাদের সবাইকে প্রায় চমকে দিয়ে তার শাক্‌রেদ দুটোকে বলে, প্যাসেঞ্জারদের যার যা জিনিস-টাকা-পয়সা সব ফেরত দিয়ে দাও।

আমরা অবাক হয়ে বলি, একি বলছেন?

—হ্যাঁ, তবে অন্য প্যাসেঞ্জাররা অপরের জিনিস বা টাকা নেবেন না।

প্রমাণ হলে খতম হয়ে যাবেন। আমি আমার পাঁচশ' টাকা এবং পুরনো টিসট রিস্টওয়াচ নিয়ে ডাকাতের সর্দারকে সবিস্ময়ে এবং সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সব ফেরত দিয়ে দিলেন কেন?

ডাকাতের সর্দার কর্কশ গলায় উত্তর দেয়, আমি কি পকেট থেকে এগার শ' টাকা দেব?

—মানে?

বাসের সব প্যাসেঞ্জার একসঙ্গে কোরাসে প্রশ্ন করে। ডাকাতের সর্দার মৃদু হেসে বলে, আমার এদিককার পুলিশের দারোগার সঙ্গে কন্ট্যাকট আছে। প্রতি বাস ডাকাতির জন্য তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। সেই দারোগাটা তো আগের স্টেশনে পাঁচ হাজার টাকা নেবার জন্যে ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে আছে। তোমাদের ওখান থেকে পেলাম উনচল্লিশ শ' টাকা। ও ব্যাটা বিশ্বাস করবে না। পাঁচ হাজার না দিলে ধরিয়ে দেবে। ফালতু ডাকাতি করে লাভ কি? কথা শেষ করে, বাইরে মুখ করে বলে—এই, ড্রাইভার দুটোকে ছেড়ে দে।

বাস স্টার্ট দিয়ে চলতে লাগল। আমি এই ডাকাতি আর ঐ ওৎ পেতে বসে থাকা, না-দেখা দারোগার কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের বিহারের মণিহারী গ্রামের সেই ছোটবেলায় দেখা দারোগাবাবু, অযোধ্যাপ্রাসাদ ঝা, যাকে সবাই কড়ে খাঁ বলে ডাকত, তাঁর কথা বারবার মনে পড়তে লাগল।

আগের স্টেশনে লুকিয়ে থাকা দারোগাকে দেখবার আমার কোনোই প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর আগের সেই স্বাস্থ্যবান ছ'ফুট লম্বা বিহারী কড়ে খাঁ—দারোগাবাবুকে বারবার দেখবার জন্য মনটা কেমন করে উঠল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসই করবে না, কড়ে খাঁর মতন ভালো লোক থাকতে পারে। কিন্তু তাঁরা ছিলেন। আমার এই জীবনে আবার এইসব মানুষের দেখা পাব কিনা জানি না!